বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৭০ - আষাঢ় ১৩৭১ · ১৮৮৫-৬ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

যাত্রাদলের মন্ত্রী
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০ · ১৮৮৫ শক

গদ্য-ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ছন্দ বল্‌তে বাঁধন বুঝায়। বাঁধনে রাখে অচল করে। কিন্তু ছন্দ বন্ধের কাজটা ঠিক তার বিপরীত। ছন্দেই কথাকে সুতরাং ভাবকে সচল করে তোলে। একদিকে নদী জলের তরলতায় আছে গতিবেগ, আর একদিকে আছে তার তট। সেই তটে সীমার বাধা। অবাধা এবং বাধা এই দুটোকে নিয়ে নদীর স্রোত। যাকে বলি জলা তার বাধা নেই— তার জলরাশি যতদূর ছড়াতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। ছড়ালেই আর সে চলে না। আমার তপ্‌সী মাঝি তাকে বলত বোবা জল। আঁকা বাঁকা তট জলকে দিয়েচে সীমা, সেই সীমাতেই তাকে চলন দিয়েচে, বিচিত্র ভঙ্গীর চলন। অন্যদিকে দেখ সরোবর, তার তটের বাধা চারদিকেই, তাই সে জমা করে রেখেচে জলকে। তাকে বার হতে দেয় না। নদীর তট জলকে ছড়িয়ে পড়বার দিকে বাধা দিয়েচে, চলবার দিকে তার পথ খোলসা। ছড়িয়ে পড়লে বেগও যায়, রূপও চলে যায়। সৃষ্টিতে রূপ আমাদের মনকে তোলে চেতিয়ে, কেননা সীমার মধ্যে সে বেগ পেয়েছে।

কাব্যের ছন্দে যে বাঁধন তাতে কথাগুলোকে ছড়াতে দেয় না। ছড়িয়ে পড়লেই শক্তি কমে, রূপ যায় যেন মূর্ত্তি ভাঙা মাটি হয়ে। তাকেই বলে অসংযমের অশক্তি, তার শৈথিল্য। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই।

> [২০] বিংশতি কোটি মানবের বাস
> এ ভারতভূমি যবনের দাস
> রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা
> আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
> সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,
> জনকত শুধু প্রহরী পাহারা
> দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

এখানে শব্দগুলোকে ছন্দের তটে দিয়েচে বেঁধে। এই ছন্দ পাশের দিকে এলিয়ে পড়তে দিচ্চে না বলেই সেই ধাক্কা পেয়ে কথাগুলো সামনের দিকে জোরে চলেচে দৌড় দিয়ে। এর বাঁধনটা ভেঙে দেওয়া যাক্। ভারত ভূমিতে বিংশতি কোটি মানব বসতি করিয়া থাকে তথাপি এই দেশ যবনের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিল ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত? কয়েকজন মাত্র প্রহরীর শাসনেই ইহাদের চক্ষুতে কি [১৯] অধুনা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে?— কথাগুলোর কোনো লোকসান হয়নি, বরঞ্চ গণনা করলে শতকরা পঁচিশ পার্সেণ্ট মুনফাই দেখা যায়। কেবল ছন্দে তারা সংযত ছিল, তার থেকে ছাড়া পেয়ে এলিয়ে পড়েচে। তারা যেন ঢালা বিছানায় চৌকো হয়ে বৈঠকখানায়

বসে পড়েচে; নিরলস বেগে জয়যাত্রায় চলতে আর গা লাগে না। ছন্দর সঙ্গে অছন্দের তফাৎ ঐ, একটা চলে, অন্যটা গদীয়ান হয়ে থাকে। যে চলে, সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে। যে বসে থাকে, সে ভাবে, সে কাজ করে, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাবপত্র দেখে, দল পাকায়।

[২০] সংসার শব্দ বা জগৎ শব্দ দ্বারা বুঝি সৃষ্টির রূপটাই চলদ্‌রূপ। অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে গ্রহচন্দ্র-তারা সমস্তই চল্‌চে। তার মানে সব কিছুর মধ্যেই সীমা আছে। বিচিত্র সীমার বিচিত্র ধাক্কা না পেলে গতিই থাকে না। সৃষ্টির প্রকাশ হয় না। এই গতিমান প্রকাশ তত্ত্বই ছবিতে গানেতে কাব্যে। তাই আমাদের পুরাণে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নটরাজের নৃত্যলীলা দেখেচে। সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন নাচ। অবিশ্রাম ছন্দ।

ছবি গান কাব্যকে আমরা নির্ম্মিতি অর্থাৎ construction না বলে সৃষ্টি বা creation বলি কেন? যেহেতু তাতে কেবল উপাদানের বাহ্য সংঘটনমাত্র নেই, তাতে উদ্ভাবনার একটা আন্তরিক গতিবেগ আছে। প্রাণের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের যোগ, এই প্রাণের স্পন্দনবেগের অন্ত নেই; স্পন্দিত আকাশের আলোক, কম্পিত বাতাসের শব্দ, হৃদয়াবেগের আঘাতবেগ প্রাণের ছন্দের সঙ্গে কেবলি ছন্দ মেলাচ্ছে। ছবি গান কাব্যও তেমনি আপন চলদ্‌বেগে চৈতন্যকে নানা প্রকার চাঞ্চল্যে বিশেষভাবে বিচলিত করে।

[২২] কাব্য গান ছবির মধ্যে সেই চলৎশক্তি দিয়েছে কিসে? [২১] গদ্যে "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতার শব্দগুলি একটা খবর কাঁধে নিয়ে আমাদের কানের ধারের মনটিতে কিছুক্ষণের জন্যে আড্ডা করে। [২২] কিন্তু যে আহ্বান "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" সে তো একটা স্থাবর ব্যাপার নয়। সে চলে বলেই চলমান চৈতন্যের সঙ্গে তার সাযুজ্য। তার বেগবান বাহনটা ছন্দ।

প্রাণীতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবি আছে। সে ছবি ঘোড়ার আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সন্ধান জানায়। সে ছবি কেটে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে ইচ্ছে করিনে। তার খবরটা স্থাবর পদার্থ। কিন্তু রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে সেটা দেখে খুসি হই। এই খুসিটা চৈতন্যের চাঞ্চল্য। ছবির মধ্যে এই খুসির সচল কারণ রয়ে গেল, সে পুরোনো হবেনা। তাকে বলা যায় পার্পেচুয়ল মুভমেণ্ট। যদি প্রশ্ন করো কারণটা কী? বলব ছন্দ। প্রাণীতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবিটা চারদিকেই বাঁধা, আমাদের পুকুরের মতো। একেবারে খাঁটি খবরে তাকে খোঁটাগাড়ি করে রেখেচে, নড়চড় হবার জো নেই। কিন্তু রূপকারের ঘোড়ার মধ্যে রূপকারের তুলি নটরাজের দৌত্য করেছে, একটা নাচের নাড়া দিয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে রূপকার আপন চলমান ধ্যানের দোলা দিয়েচে। সে ঘোড়ায় হয়তো খাঁটি খবর মিলবে না, মিল্‌বে একটা ছন্দ, যার নাড়া খেয়ে আমাদের চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে, এইতো বটে। বহু হাজার বৎসর আগে গুহাবাসী মানুষ গুহার দেয়ালে হরিণ এঁকেচে, তার দৌড় লাগচে আজো আমাদের মনে। ঐ হরিণের ছবিতে এককালের মনের ছন্দ আর এক-কালের মনে মৃদঙ্গ বাজাচ্চে।

বহুকাল পূর্ব্বের এই শান্তিনিকেতনেরই অনতিদূর আকাশে বর্ষার ঘন ঘটায় কবির প্রাণে বছরে বছরে বারে বারে আনন্দের দোলা লেগেছিল। সেই দোলা রয়ে গেছে একটা কবিতার ছবিতে।:— মেঘৈর্মেদুরম-স্বরম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। এতে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেটা নিতান্ত সামান্য:— আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ, যতসব বনভূমি তমাল গাছের দ্বারা শ্যামবর্ণ। এ খবরটা একবারের বেশি দুবার কেউ যদি জানাতে চায় তাকে ধম্‌কানি দিয়ে থামাতে হয়; কিন্তু ছন্দে কবি আপন চৈতন্যের যে আন্দোলন রেখে গেছেন, কত শত বৎসর হয়ে গেল, আজও তার বেগ থামলনা;— সে আমাদের চৈতন্যকে দোলা দেবামাত্র

আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কালো [২৪] তমাল বনের উপর নববর্ষার মেঘপুঞ্জ ঘনায়মান। কবির মনের অনেকদিনের সংহত খুসি চড়ে বসেচে এই ছন্দ পক্ষীরাজের পিঠে, নিত্যই চলেচে মনোহরণ করতে। কেনোপনিষদের প্রশ্ন এই যে, জগতে প্রাণকে প্রথম প্রৈতি, প্রথম গতিবেগ কে দিয়েছিল—যে বেগ আজও থামচেনা, নিরন্তর বিচিত্র হয়ে উঠচে তরুলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীতে? সৃষ্টিতে ছন্দের প্রেরণা যিনি দিয়েছিলেন। যে ছন্দে গ্রহ নক্ষত্র তালে তালে আজ পর্যন্ত দুলচে, যে আনন্দের আঘাতে প্রাণ তার অন্তরুচ্ছ্বসিত, ছন্দ বৈচিত্র্যে হিল্লোলিত। ঐ কবিতাটিতেও ছন্দে বাণী প্রাণবান হয়ে উঠল, তার অন্তরঙ্গ যোগ সাধন হয়ে গেল আমাদের চিরস্পন্দিত প্রাণের সঙ্গে। শ্রাবণের বৃষ্টিমুখরিত রাত্রে কতবার এই কবিতাটি মনে এসে নিশীথিনীকে কথা বলিয়েছে :—

রজনী শ্রাবণ ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ানরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ডীরোল, মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে,
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেনকালে।

এর বিষয়টা একটা সংবাদমাত্র, কিন্তু সমস্তটা একটা কবিতা অর্থাৎ সৃষ্টি। যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা কিছু চল্‌চে, নদী সমুদ্র গাছপালা, তার সঙ্গে এও চলচে।

গদ্যে অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু পদ্যের ছন্দে কবি ধ্বনিবান শব্দকে বাছাই করে বিশেষ ব্যূহে সাজিয়ে তোলে। ব্যূহ কথাটা এখানে ব্যবহার করা অসঙ্গত নয়। ভিড় এলোমেলো জমা হয় রাস্তায়, ভিড় চলে কিন্তু তার মধ্যে সাজাই বাছাই নেই। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত কেননা, যতগুলি সৈন্য আছে এই সাজাই বাছাইয়ের দ্বারা তাদের সম্মিলন থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি [২৬] করে। ছন্দের শব্দব্যূহে ভাষার তেমনি একটি শক্তিমূর্ত্তির সৃষ্টি হয়, অমনিতে যা অচল চিরকালের মতো তা সচলতা লাভ করে।

চিত্র সৃষ্টিতেও এই কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা বাছাই সাজাই আছে। প্রকৃতির অবিকল ফোটোগ্রাফিক নকল নেই। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তাতে প্রকৃতির অনেক জিনিষ শুধু যে বাদ পড়ে তা নয় প্রকৃতির থেকে তার বদলও হয় অনেক। কেননা, তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়া, হাঁ এইতো পেলুম। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ঠিক মতো সাজাই বাঁধাই হলেই সেই সৃষ্টির হৃৎপিণ্ড যেন চিরকালের মতোই ধুক ধুক করতে থাকে। আমাদের মনের নাড়িস্পন্দনের সঙ্গে তার তাল মিলে যায়। ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা, বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। ছবির মধ্যে একেই বলে ছন্দ। এই ছন্দ যখনই প্রথাগত শ্রেণীগত হয়ে পড়ে, তখনি এর বেগ হয় ক্ষীণ, তখনি এর মরণ।

ভারতবর্ষে বেদে আমরা ছন্দ প্রথম দেখি। সেই ছন্দে বেদের মন্ত্র। মন্ত্রগুলি ছোটো, তার শব্দগুলি স্বল্প। সেই মন্ত্রকে প্রাণের বেগ দেওয়া হয়েছে। সে প্রবাহিত হবে আমাদের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, উদ্বেল হবে আমাদের রক্ততরঙ্গে, আবর্তিত হবে আমাদের চিন্তার ধারায়। এই মন্ত্রের ক্রিয়া হতে থাকে আমাদের প্রাণে মনে, আমাদের স্মৃতির মধ্যে তা স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। এই হচ্চে ছন্দের গুণ।

ছন্দকে আমরা শব্দে বা রেথায় পাই একথা বল্‌লে কম করে বলা হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে। ভাবকে এমন করে সাজাতে হয় যাতে কেবলমাত্র তার অর্থবোধ হয়না সে আমাদের মনে সজীব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সযত্নে বাছাই করে ভাবের শিল্প রচনা করা চাই। বর্জ্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের প্রণালীতে ভাব পায় চলৎশক্তি। সাহিত্যে— ভাবের বাহন ভাষা, সেইজন্য যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয় সে ভাষার ছন্দ, তাকেই আমরা ছন্দ বলে স্বীকার করি। অনেক সময়ে জানিনে যে ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের [২৮] মনকে বিচলিত করে।

এ পর্য্যন্ত কাব্যে শব্দের ছন্দেই আমরা ভাব প্রকাশ করে এসেচি। তার বাঁধাবাঁধির মধ্যে অগত্যাই ভাবের বিস্তারকে সংযত করতে বাধ্য হতে হয়েছে। যা কিছু অনাবশ্যক তাকে বর্জ্জন করতে হয় নইলে অত্যাবশ্যকের স্থান সংকুলান হয় না। এই বর্জ্জনের দ্বারা সংযমের প্রভাবে ভাষা একটা শক্তি পায়। কিন্তু শুধু সংহত করাই যথেষ্ট নয়। ভাবকে তার নিজেরই একটি আন্তরিক উৎকর্ষের প্রেরণায় ব্যূহবদ্ধ করতে হয়, এই ব্যূহবন্ধনকে ছন্দ বলা যায়।

সত্যকে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার। তাকে বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যে, যাতে কোথাও সে অপরিণত না থাকে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, এবং তার কোনো অংশে বাহুল্য নেই বলেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই যে শব্দযোজনার সংযম সে যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যথাযোগ্যতার সংযম। এখানে শব্দগুলি লজিকাল পংক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের নামে যে আনন্দ লহরীকাব্য প্রচলিত তার ভাব লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান গতিবান, রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে সৌষম্যবদ্ধ।

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভার তিমির
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ক কিরণং,
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদন সৌন্দর্য্যলহরী
পরীবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্ত সরণিঃ ॥

[২৯] ঐ সীঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্য্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে সিঁদুর আঁকা আছে তোমার ঐ সিঁথিতে সে যেন তরুণ সূর্য্যের আলো, তাকে ঘন কবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে আটক করে রেখেচে।

সৌন্দর্য্যলহরীতে যে নারীর রূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতিমা। নিয়ত চলেচে তার সৌন্দর্য্যের প্রবাহ; পিছনে তার ঘন কবরীপুঞ্জে রাত্রি, সমুখে তার সিঁথির রেখার সিঁদূরে নতুন সূর্য্যের আলো। এই অল্পকথায় যে ভাবের স্তবকগুলি বাঁধা পড়েছে, তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্চি,—সে ছবি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

[৩০] যে ছন্দ দিয়ে আঁকা হলো এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। তাতে ভাবের স্বল্প গুটিকয়েক উপকরণ বাছাই করে সাজানো হয়েছে, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্য সচল কটাক্ষে অনেক না বলা কথার ইসারা রয়ে গেল।

এ'কেই বলি ভাবের ছন্দ। একদিন ছিল যখন ছাপা অক্ষরের রাজ্য পত্তন হয় নি। যেমন কলকারখানার আবির্ভাবে বস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হোলো তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দ সঙ্কোচের প্রয়োজন চলে গেছে, আজ সরস্বতীর আসন বলো তাঁর ভাণ্ডার বলো প্রকাণ্ড মাপের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন— তার হাতি ও ঘোড়া— তার স্মৃতি ও শ্রুতি ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় এখন যে যান ব্যবহার হচ্চে তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেল গাড়ীর মতো ; কোনোটা মালের গাড়ি, কোনোটা যাত্রীর গাড়ি। কোনোটাতে নিরেট বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী, অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক কামরা, অনেক চাকা,— এক সঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসঙ্কোচে গদ্যের ভূরি ভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় যখন বাক্যের এতবড়ো সদাব্রতের আয়োজন ছিলনা তখন ছন্দের সহায়তা ছিল অত্যাবশ্যক। তাতে শব্দের অতিব্যয় নিবারণ হতো, আর ছন্দ আপন সাঙ্গীতিক গতিশক্তিদ্বারা স্মৃতিকে সচল করে রাখত। সেই দিনে কাব্যে পদ্যছন্দের সতীন ছিল না, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের নিরনেক বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত দাবী তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই জন্যে আজকাল কাব্যশ্রেণীয় রচনা অনেক স্থলে সঙ্কীর্ণ পদ্য ছন্দের শাসন এড়িয়ে প্রশস্ত গদ্যরূপী ভাবচ্ছন্দের স্বাধীনতা দাবী করচে।

[২৯] করবী গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার ডালে ডালে জুড়ি জুড়ি সমান ভাগে পত্র বিন্যাস। কিন্তু বটগাছে সেই ক্ষুদ্র ভাগ অতিমাত্র চোখে পড়ে না। তাতে দেখি পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক। এই অসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য পেয়েছে। অথচ পাথরের পিণ্ডীকৃত যে ভাগ আছে পাহাড়ে এ সে রকম নয়। এর মধ্যে দেখা যায় প্রাণ অবলীলাক্রমে আপন নানায়তনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন রক্ষা প্রতিনিয়ত সম্পন্ন করচে ; এই প্রকাণ্ড নৃত্য বলদেবের নৃত্যের মতো, মহাদেবের নৃত্যের মত, নটীর নৃত্যের মতো নয়। এ'কেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্যরূপ কতকটা মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তররূপ।

[৩২] যেদিন কাব্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিল সেদিন প্রথম এই বেনোজল ঢুকল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কেবল যে মিল নেই তা নয়, তাতে পদের স্রোতপংক্তি ভাগের বেড়া ডিঙিয়ে পথ করে নেয় এবং থেমে যায় যেখানে সেখানে। তাতে চোখে লাইনের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু কান বলে ও তো চিহ্নমাত্র ওখানে পেরোবার বাধা নেই। অবশেষে এমন দিন এলো, যখন চিহ্নের দোহাইটারও বল রইল না। কাব্য স্পষ্টই নিঃসঙ্কোচে অসমান ভাগের পথে চলাফেরা সুরু করে দিলে। যে ভাগটার হাতে শাসনদণ্ড নেই কবিতা প্রত্যেকবার তার সাম্‌নে যেতে আসতে থেমে দাঁড়িয়ে সেলাম করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলে না। আমার কাব্য রচনায় মানসীতে আমি সব প্রথম পয়ারের এই মর্য্যাদা নষ্ট করেচি। কবিতাটির নাম নিষ্ফল প্রয়াস, তাতে না আছে মিল না আছে চোদ্দ অক্ষরের তর্জ্জনী সঙ্কেত। বোধকরি জনসাধারণের ভ্রূকুটিকুটিল মুখকে তখনো ভয় করতুম, সেইজন্যে ঐ একবার মাত্র আচার ভঙ্গ করে ভালোমানুষের মতো

চুপ করে গিয়েছিলুম। তারপর অনেক বৎসর পরে বেড়াভাঙা ছন্দ দলে দলে দেখা দিল বলাকায়, দেখা দিল পলাতকায়। আজকাল যখন সেই বেড়াকে মেনে নিই তখন সেটা ইচ্ছে করে, সাহিত্যিক লোকাচারের শাসনে বাধ্য হয়ে নয়।

এ'কে এখনকার ছন্দতাত্ত্বিকরা মুক্ত ছন্দ বলেন বুঝি। ঠিক জানিনে। পারিভাষিকে নামতে ভয় লাগে। আমার মতে এ'কে মুক্ত পয়ার ছন্দ বলা যেতে পারে—কারণ এর প্রত্যেক ভাগ যতই অসমান হোক সেটা পয়ার ছন্দেরই ভাগ। পয়ার ছন্দের ভাগ দুই চার ছয় আট দশ বারো মাত্রায় সংঘটিত, তিন পাঁচ সাত প্রভৃতি মাত্রায় নয়। মেঘনাদবধকাব্যে কোনো কোনো জায়গায় বড়ো যতি পড়েচে তিন মাত্রার শেষে। কিন্তু তার অনতিকাল পরেই ওর জুড়ি অপর তিন এসে দিয়েছে বিচ্ছেদভঙ্গ করে তাই ছন্দের ঐ খণ্ডতা শোকাবহ হয়নি। কিন্তু তিনমাত্রার শেষে স্থায়ীভাবে থামাকে এরকম ছন্দে অপঘাত অর্থাৎ ক্যাজুয়ল্‌টি বলেই গণ্য করতে হবে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত পয়ারের মাত্রাবন্ধন রীতি অনুসরণ করেই মুক্ত পদের ছন্দ রচনা চলেচে, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের। পূর্ব্বেই তার কারণটার আভাস দিয়েছি; পয়ারে [৩৪] ভাগের বৈচিত্র্য আছে; তার যতির জন্যে আসন পাতা যায় নানা স্থানেই। তার চলার রাস্তায় পান্থশালার অভাব নেই। কিন্তু যাকে আমি অসম বা বিষম মাত্রার ছন্দ বলি, অর্থাৎ যার পদভাগ তিন সংখ্যক মাত্রা কিম্বা জোড়-বিজোড় মাত্রা বহন করে, তাদের আমরা ছন্দের প্রচলিত বাঁধা আচার থেকে আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা দিইনি। বোধ হয় মনে করেছি তাদের স্বভাব এমন, যে, মুক্তি তাদের সইবে না। কিন্তু শাসন একেবারে শিথিল করা যায় না তা মানিনে। তাই ওদের জেনেনার দরজাটা একবার খুলে দিয়ে দেখতে চাই। প্রথম পরীক্ষা হোক তিন মাত্রার মহলে।

[৩১] বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ বহিয়া সজল
বেদনা, বহিয়া তড়িৎ-চকিত
ব্যাকুল আকুতি উৎসুকধরা
ধৈর্য্য হারায়। পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধপ্রলাপ, উল্লাস ভাসে
মদির গন্ধে পূর্ব্ব গগনে
শ্রাবণের বনে নব মেঘদূত
এলো, গগনের বাণীবর্ষণ
ফুলবর্ষণে মিলাতে বিলাতে।

[৩৪] পয়ার ছন্দের মতো স্বভাবতই এর গতি অবলীলা নয়। এর এবং জোড় বিজোড় মাত্রার ছন্দের গতিকে মরাল গমন বল্‌লে আশা করি মাঘ নৈষধের নায়িকারা অপমান বোধ করবেন না। ডাইনে বাঁয়ে

ঝোঁকে ঝোঁকে হেল্‌তে হেল্‌তে এদের চলন। এবার যে ছন্দটা পড়ব সেটা তিনদুই+তিনদুই মাত্রার ছন্দ। গানের ভাষায় তাকে বলে ঝাঁপতাল।

[৩১] চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। সুরের ব্যথা
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সমুখপথে পান্থ মম
গিয়েছে চলি ক্লান্ত পদে
দিগন্তরে। বিরহ বেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে,
ছন্দে তারি কুন্দফুল
কাঁদিয়া ঝরে; নবীন তৃণ
শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
গোপন তব উৎস হতে
উচ্ছলিল অশ্রুধারা
সেই সুদূর চরণপাতে।

[৩৪] তিনচারের মাত্রারও একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক্‌— এ'কে গানে বলে রূপক তাল।

[৩১] মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণ সহচরী! অরুণ গগনের
ছিলিতো সোহাগিনী, শ্রাবণ-বরিষণে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গরব প্রচারিছে সজল সমীরণে
দিশে দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল রজনীতে
প্রভাত আলোকেরে কহিলি নহে নহে[১]।

[৩৪] এবার দেখাব পাঁচচার মাত্রার ছন্দ। গানের তালে এর কোনো নমুনা আছে বলে জানিনে।

[৩৩] আপনাপরে সংশয়ে
চিত্ত তব শঙ্কিত
রে অভাগিনী। তাই আজি
শুভলগন গেল বহি।

---

১ পাণ্ডুলিপিতে দুইবার 'নহে' লেখার স্থান না থাকাতে লেখা আছে 'নহে ২'। অর্থাৎ কবির অভিপ্রেত পাঠ 'নহে নহে'। 'ছন্দ' গ্রন্থেও 'নহে নহে' পাঠই আছে।

বাহিরে সব স্বচ্ছ ছিল,
ছিলনা বাধা ; মধুরাতি
মুগ্ধ ছিল, কানে কানে
চন্দ্রমার সুধা-ঢালা
প্রিয়বচন শুনি ; ছিল
ফাল্গুন সে আপনারি
প্রসাদভারে মন্থর
মদির গতি ; সমীরণে
ঋতুপতির মন্ত্রটি
ধ্বনিতেছিল ; তারি বলে
বনমাধুরি-ভাণ্ডারে
দুয়ার গেল অবারিয়া
লয়ে আপন রিক্ততা
আগল রুধি অন্তরে
কাটালি রাতি একা একা।
অর্থহীন রসহারা
প্রহর গেল ঝাঁপ দিতে
স্বপ্নভাঙা প্রভাতের
দয়াবিহীন আলো-তলে।

[৩৪] এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে এই সব মুক্তপদিক ছন্দের কথাটা উঠেচে প্রসঙ্গক্রমে। মূল কথাটা এই যে কবিতায় ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটাআঁটির সমান্তরালে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্চে। তার প্রধান কারণ বলেছি কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয় তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনির্দ্দিষ্ট ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে [৩৬] তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই।

[৩৫] একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে, এখন মাসিকে সাপ্তাহিকে লেখা হয় সাদা গদ্যে ; ছাপার অক্ষরে থেকে যায় বলে মাথার মধ্যে ছন্দের পুঁটলিতে সেগুলো বয়ে বেড়াবার প্রয়োজন হয় না। একদিন পুরুষও আফিসে যেত পাল্কীতে, মেয়েও যেত শ্বশুর বাড়িতে। [৩৬] এখন রেলগাড়ির প্রভাবে মেয়ে পুরুষ উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। তেমনি ছাপার অক্ষরের আনুকূল্যে সাহিত্যে যখন আপনিই গদ্যের প্রভাব বেড়ে চলে, তখন কাব্যের গতিবিধির জন্যে বাঁধা ছন্দের ময়ূরপংখীটা সম্প্রতি আর অপরিহার্য্য বলে গণ্য হয় না। আমি দেখিয়েছি অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব প্রথমে এই পাল্কির দরজা গিয়েছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েচে বর্জ্জিত। ক্রমে ক্রমে সেই মুক্তির পথে ছন্দ কিরকম এগিয়ে চলেচে তার দৃষ্টান্ত আছে অনেক। কিন্তু ঝরণা ক্রমশ নদী আকারে প্রশস্ত হয়ে যখন সমুদ্রের কাছাকাছি আসে তখন তার তট স্পষ্ট দেখা যায় না তবু তট থাকে। কাব্যে দেখা দিচ্চে সেই লক্ষণ [।] অনেক সময়ে মুক্তগতি আধুনিক

পদ্যকে গদ্যের মতোই ছন্দোহীন বলে দেখতে হয় বটে তবু তার মধ্যে অনতিগোচরভাবে ছন্দ থাকে। (দৃষ্টান্ত)[২]

কিন্তু এ অবশেষটুকুও না থাকতে পারে। তাই বলেই যে গদ্যে পদ্যে অভেদ হয়ে যাবে তা বলতে পারিনে। কেননা ভাবের ছন্দ আছে। ভাবের ছন্দ ভাবের সংযমে, তার সঙ্গতিতে। ধনী ঘরের বধূ আপন ঘর সাজায় নানারূপের নানা রঙের ব্যয়সাধ্য অলঙ্করণে। দেখে মন ভোলে। কিন্তু সুবিহিত সুপরিমিত গৃহিনীপনায় ঘরে যে-শোভা বিস্তার করে তাতেও মন তৃপ্তি পায়। তাতে বাইরের উপকরণ বিরল, সেইজন্যই গৃহলক্ষ্মীর অন্তরের মাধুরী গভীর অর্থে জেগে ওঠে। কাব্যেও তাই। তাতে ছন্দের প্রগল্‌ভ ঐশ্বর্য্য কমে যেতে পারে কিন্তু ভাব আপন সহজ সুষমায় নূপুরঝঙ্কারহীন পদক্ষেপে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানে অভ্যর্থনা পায়। ভাষার কক্ষে এই অনতিভূষিত গৃহিনীপনাকে গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে চল্‌বেনা, যেমন চল্‌বে না আপিস্ ঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের অসজ্জার সঙ্গে তুলনা করা। কেননা আপিস ঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জ্জিত অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় আন্তরিক।

[৩৮] চীন-কবিতার তর্জ্জমা থেকে দৃষ্টান্ত দেখাই। মূলে ভাষার মধ্যে কী জাদুমন্ত্র আছে জানিনে; বোধ করি আমাদের ছন্দের সঙ্গে তার ছন্দের সাদৃশ্য নেই।

স্বপ্ন দেখলেম, যেন চড়েছি কোন উঁচু ডাঙায়
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চল্‌তে চল্‌তে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে; বড়ো ইচ্ছে হোলো জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নাম্‌তে চায় ঠাণ্ডা সেই গহ্বরে।
ঘুরলেম চারদিকে;— দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে।
জলের উপর পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহনের মধ্যে।
দড়ি নেই যে তাকে টেনে তুলি।
জানিনে প্রাণ কেন যে এত ব্যাকুল হোলো পাছে ঘড়াটা যায় তলিয়ে।
পাগলের মতো ছুট্‌লেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই, লোক নেই একজনো,
কুকুরগুলো ছুটে আসে আমার টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
দু'চোখ বেয়ে জল পড়ে, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।
শেষকালে জাগ্‌লেম নিজের কান্নার শব্দে।
ঘর নিঃশব্দ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোকে।

২ পাণ্ডুলিপির ৩৫-সংখ্যক পৃষ্ঠায় কবি একটু নোট লিখে রেখেছিলেন— 'পরিশেষ থেকে দৃষ্টান্ত'। কিন্তু কার্যতঃ 'পরিশেষ' কাব্য থেকে কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নি। এই খসড়ার উন্নততর সংস্করণগুলিতেও 'পরিশেষ' থেকে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয় নি। প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকীয় টীকায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়-অনুসারে উক্ত কাব্য থেকে 'অনতিগোচর' ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁওয়া উঠ্‌চে—
তার আলো পড়েচে আমার চোখের জলে।
[৪০] ঘণ্টা বাজ্‌ল, রাত দুপরের ঘণ্টা।
বিছানায় উঠে বসলুম, ভালো করে ভেবে দেখলুম সবকথা।
যে উঁচুডাঙা চক্ষে দেখেচি চাং-আনের সে কবর স্থান,
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি।
ভারী মাটি তার, ঢিবিগুলো উঁচু করে তোলা।
নীচে গভীর গর্ত্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেচি সেই মৃত মানুষরা কখনো কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া
তাই দুচোখ বেয়ে জল প'ড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।

এতে পদ্য ছন্দ নেই, কিন্তু বলা বাহুল্য এতে জমে উঠেচে ভাবের ছন্দ। এর মধ্যে শব্দের অলঙ্কার নেই, গৃহিণীপনা আছে। এ ঠিক গদ্যও নয়, পদ্যও নয় কিন্তু কাব্য। জাপানি টুক্‌রো কাব্যেরও ললাটে কেবল একটিমাত্র ভাবের টীকা পরানো, আর কিছু নয়। একটি নমুনা দিই।

ঐ পাথরের বাড়ির পাশে স্তব্ধ আছো দেওদার গাছ,
তোমার দিকে যখন তাকাই
মনে হয় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি প্রাচীন মহাযুগের মানুষদের সামনে।

এইখানে একটি চৈনিক কবিতার এক অংশ তর্জ্জমা করে দেখাতে লোভ হচ্চে। এর বিষয়টি সাদাসিধে, ভাষায় কারিগরি নেই, কিন্তু এ'কে কাব্য না বলে কী বলব।

সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মনে হোত সকলের সেরা।
ভাষার মুখরতায় তার নৈপুণ্য। সেই ভাষা বাঁচিয়ে রাখে তার ভাবনা, তার বাক্য।
চিহ্ন ও সঙ্কেতের এমন যোগাযোগ যাতে
তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেচে,
আপন প্রাণবায়ু খরচ করচে তাই নিয়ে।
[৪২] কেউবা গুঞ্জরিত করচে দুঃখের নিবিড়তা,
কেউবা বিশ্বসংসারে প্রচার করচে হৃদয়ের মহত্ত্ব।
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত,
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়।
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুই তোমার নেই জানা।
তোমার স্বর তুমি রচনা করো প্রতিক্ষণে নিজের জন্যেই।
বসে বসে ভাবছিলেম এই সব কথা,
তুলনা করছিলেম একের সঙ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ্।

এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এলো কালো মেঘ,
মাথর উপরে ঝলসে উঠল, গর্জ্জে উঠ্‌ল ঝড়,
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল
মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা।
চুপ করে গেল ঝিল্লির ধ্বনি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামজাবালের যে আখ্যান আছে সে গদ্যে লেখা। তাতে দেখতে পাই এই ভাবের ছন্দ। কথাগুলি অল্প, অতি সহজে সাজানো, তাই সমস্ত সত্য সমস্ত রস নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করতে তার বিলম্ব হয় না :—

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বল্‌লে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করব। কী গোত্র আমার।
তিনি বল্‌লেন, জানিনে, তাত, কী গোত্র তুমি। যৌবনে বহু পরিচর্য্যা-কালে
তোমাকে পেয়েছি তাই জানিনে তোমার গোত্র। জবালা আমার নাম, তোমার
নাম সত্যকাম, তাই বলো, তুমি সত্যকামজাবাল।

[৪৪] সত্যকাম বল্‌লে হারিদ্রুমত গৌতমকে, ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মচর্য্যে-উপনীত করুন।
তিনি বল্‌লেন—সৌম্য কী গোত্র তুমি!

সে বল্‌লে, আমি তা জানিনে। মাকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার গোত্র কী। তিনি উত্তর করেচেন—যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম তোমাকে পেয়েচি। জানিনে তুমি কী গোত্র। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, ব'লো আমি সত্যকামজাবাল।

তিনি তখন বল্‌লেন, এমন কথা অব্রাহ্মণ বল্‌তে পারেনা। সত্য থেকে নেমে যাওনি তুমি। সমিধ আহরণ করো, সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।

উপসংহারে সংক্ষেপে এই কথা বল্‌ব যে, আজ কাব্যের অধিকার ক্রমশই প্রশস্ত হতে চলেচে। গদ্যের সিংহদ্বারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানে সে আপন বেদী বানিয়েচে। তার সৃষ্টিকে গদ্য থেকে স্বতন্ত্র করে জানা যায় তার ভাবের ছন্দ থেকে।

একদিন আমি যখন কবির পালা সুরু করেছিলুম পদ্যে, তখন গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ যখন পালা সাঙ্গ করবার দিন এলো তখন দেখি কখন্ অসাক্ষাতে গদ্যে পদ্যে মিল হবার জন্যে রফারফি চলচে। যাবার আগে তাদের কবুলপত্রে আমাকেও একটা সাক্ষীর সই দিয়ে যেতে হোলো। আমার এই স্বভাব—আমি এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করতে পারিনে। তখনকার কালে মানুষ ছিল, যাদের ভালোবাসতুম, তাদের আসরে গান গেয়েছি। এখনকার কালেও মানুষ আছে যাদের ভালোবাসি, তাই মানতে হোলো এখনকার ভাষা।

তোমরা দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমাদের কালে আমাদের কালে
হৃদয়ে হৃদয়ে।
দিনের শেষে তাই নতুন পালা সুরু হোলো আমার।

[৭৬] আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে,
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়
পথিক বন্ধু, তোমাদেরি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিট্‌ল তোমাদেরও প্রয়োজন
লাগ্‌ল তোমাদেরও মনে॥

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ১৮-৪৬) থেকে মুদ্রিত। বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাগুলি পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক। প্রবন্ধটি পাণ্ডুলিপির জোড়-সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত। বিজোড়-সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি ফাঁকা। তবে কিছু-কিছু অংশ বিজোড়-সংখ্যক পৃষ্ঠাতেও লিখিত আছে এবং সেগুলি মূলপ্রবন্ধের কোন্ কোন্ স্থানে বসবে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। উপরে মুদ্রিত প্রবন্ধে সেগুলিকে যথাস্থানেই স্থাপন করা গেল পৃষ্ঠাঙ্কসহ।

এই প্রবন্ধের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৯ কার্তিক) 'পাঠপরিচয়' (পৃ ৪২৫-৩৩) এবং 'পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' (পৃ ৪৫২) অংশে।

১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির একটি অংশ (পৃ ১-১৮) বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৬৯ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'ছন্দ' নামে। বর্তমান 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধটি তারই পরবর্তী অংশ। পাণ্ডুলিপিতে এই দুটি প্রবন্ধের কোনোটিতেই শিরোনাম দেওয়া নেই। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দ' ও 'গদ্য-ছন্দ' নামে যে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই দুটি প্রবন্ধ তারই প্রাথমিক রূপ। বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এই দুটি প্রবন্ধেই পৃষ্ঠাঙ্কনির্দেশসহ বানান ইত্যাদি সর্ববিষয়েই পাণ্ডুলিপির পাঠ যথাযথরূপে অনুসরণের প্রয়াস করা গেল।

'অনেক সময় মুক্তগতি আধুনিক পদ্যকে গদ্যের মতোই ছন্দোহীন বলে দেখতে হয় বটে তবু তার মধ্যে অনতিগোচরভাবে ছন্দ থাকে।' রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের (পৃ ৮-৯ এবং পৃ ৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) সমর্থনে তাঁরই অভিপ্রায়-অনুসারে 'পরিশেষ' কাব্য (প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৯ ভাদ্র) থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে,
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এই অংশটুকু উদ্‌ধৃত হল 'বাঁশি' কবিতা থেকে। এই কবিতাটি পরে 'পুনশ্চ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪০ ফাল্গুন) গৃহীত এবং 'পরিশেষ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫০ বৈশাখ) থেকে বর্জিত হয়। 'পুনশ্চ' কাব্যের প্রথম সংস্করণেও (১৩৩৯ আশ্বিন) এমন সাতটি কবিতা স্থান পায় যাতে মিলও নেই, গদ্যের বিশেষ ভাষারীতিও নেই, অথচ পদ্য-ছন্দ আছে। এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে 'পরিশেষ' কাব্য থেকে বাঁশি প্রভৃতি এমন ছয়টি কবিতা গৃহীত হয় যেগুলি উক্তপ্রকার মিলহীন অনতিগোচর পদ্য-ছন্দে রচিত। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৯ কার্তিক), পৃ ১৮৭ পাদটীকা ২।

প্রবোধচন্দ্র সেন

কম্বোজ দেশের অবস্থান

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

প্রাচীন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম বিভাগ উদীচ্য বা উত্তরাপথ নামে পরিচিত ছিল। এই ভূভাগ পঞ্জাব হইতে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বলা যায়। প্রাচীনকালে উত্তরাপথে যে-সকল জাতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কম্বোজদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কম্বোজ জাতি ঐ অঞ্চলের ঠিক কোন্‌স্থানে বাস করিত, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

কাহারও মতে কম্বোজ দেশ উত্তর-আফ্‌গানিস্থানে অবস্থিত ছিল। আবার কেহ কেহ কম্বোজ জাতির বাসস্থান পূর্ব আফগানিস্থান বা কাফিরিস্থানে নির্দেশ করিয়াছেন। একদল পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মহাভারত (৭।৪।৫) অনুসারে অঙ্গরাজ কর্ণ রাজপুরে গিয়া কম্বোজদিগকে নির্জিত করিয়াছিলেন এবং এই রাজপুর কাশ্মীরের দক্ষিণে অবস্থিত রাজৌরী; সুতরাং বর্তমান রাজৌরী অঞ্চল প্রাচীনকালে কম্বোজ দেশের অন্তর্গত ছিল। আর একদল পণ্ডিতের মতে, কম্বোজ ভাষার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে যাহা জানা যায়, উহার সহিত আধুনিক ঘল্‌চা ভাষার সাদৃশ্য আছে; অতএব কম্বোজেরা বর্তমান পামীর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। কম্বোজ দেশের অবস্থান সম্পর্কে কেহ কেহ কালিদাসের রঘুবংশ এবং কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। কালিদাসের রঘু পারসীক দেশ হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হন এবং বংক্ষু (Oxus) নদীর তীরাঞ্চল (অর্থাৎ প্রাচীন বাহ্লীক বা আধুনিক বাল্‌খ্‌)-বাসী হূণদিগকে পরাজিত করিয়া কম্বোজ দেশে প্রবেশ করেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি তুখার এবং কম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই তুখারেরা তুখারিস্থান অর্থাৎ বর্তমান বাল্‌খ-বদখ্‌শান অঞ্চলে বাস করিত। দুঃখের বিষয়, কালিদাস ও কহ্লণের বর্ণনা হইতে কম্বোজ দেশের অবস্থান স্থিররূপে নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

ভারতের প্রাচীন লেখমালা ও সাহিত্যে সাধারণতঃ কম্বোজদিগের সহিত যবন (গ্রীক) ও গন্ধার জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান্‌ বুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতে ১৬টি মহাজনপদ ছিল বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে কেবল কম্বোজ ও গন্ধার উত্তরাপথে অবস্থিত ছিল। এই প্রসঙ্গে যবন জনপদের নাম শোনা যায় না। কিন্তু মহাবীর আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের পরবর্তী যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তরাপথে যবন জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্‌গানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আলেকজান্দার ঐ অঞ্চলে কতকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক এক দল গ্রীকসেনা উল্লিখিত নগরসমূহে ঘাঁটি রক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যু হয় এবং উহার কয়েক বৎসর পরেই মগধের মৌর্যসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত উত্তরাপথে অধিকার বিস্তার করেন। আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলিউকস নিকাতর পশ্চিম-এশিয়ার সম্রাট্‌রূপে অধিষ্ঠিত হইবার পর আফ্‌গানিস্থান হইতে মৌর্য অধিকার বিলুপ্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কেবলমাত্র বাহ্লীক বা বাল্‌খ্‌ অঞ্চলে গ্রীক প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল। যাহা হউক, এইজন্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের লেখাবলীতে মৌর্যপ্রজারূপে বার বার যবনজাতির উল্লেখ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

অশোকের ১৩শ শৈলানুশাসনের একস্থানে যবন ও অন্যত্র যবন-কম্বোজ উল্লিখিত আছে। আবার ৫ম শৈলানুশাসনে যবন-কম্বোজ-গন্ধারের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার সহিত মহাভারতের (১২।২০৭।৪৩) যৌন(যবন)-কম্বোজ-গন্ধার এবং বৌদ্ধদিগের মজ্‌ঝিমনিকায়ে উল্লিখিত যবন-কম্বোজ তুলনীয়। দেখা যাইতেছে যে, অশোক কখনও কেবলমাত্র যবন, কখনও যবন ও কম্বোজ এবং কখনও-বা যবন, কম্বোজ ও গন্ধার জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে উত্তরাপথে যবনজাতির প্রাধান্য অনুমান করা যাইতে পারে। মজ্‌ঝিমনিকায়ে বলা হইয়াছে যে, যবন-কম্বোজদিগের দেশে মাত্র দুইটি বর্ণ—আর্য এবং দাস; অর্থাৎ সেখানের সমাজব্যবস্থায় চতুর্বর্ণের স্থান ছিল না। অশোকের ১৩শ শৈলানুশাসনে ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যবনদেশে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ বাস করিত না। এখানে কম্বোজ জাতির অনুল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, কখনও কখনও যবন বলিতে যবন-কম্বোজদিগের দেশ বুঝাইত। হরিবংশ (১।১৪।১৬) এবং অনেকগুলি পুরাণে বলা হইয়াছে যে, যবন ও কম্বোজেরা মস্তক মুণ্ডন করিত। ইহাতে মনে হয়, ভারতীয়দের দৃষ্টিতে যবন ও কম্বোজগণের আচারব্যবহার অনেকটা একরকম ছিল।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মৌর্যপূর্ব যুগে যেমন কম্বোজ ও গন্ধার রাষ্ট্রদ্বয় ঘনিষ্ঠ ছিল, মৌর্য আমলে তদ্রূপ যবন, কম্বোজ ও গন্ধার জাতির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তরাপথ-প্রদেশে উল্লিখিত তিনটি জাতি কাছাকাছি জনপদে বাস করিত। এই তিন জাতির মধ্যে গন্ধারদিগের দেশের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ নাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী গন্ধার জনপদের দুইটি প্রধানা নগরী ছিল। তক্ষশিলা আধুনিক পশ্চিম-পাকিস্থানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডী জেলায় এবং পুষ্কলাবতী পেশোয়ার জেলায় অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন গন্ধার জাতি বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডী-পেশোয়ার অঞ্চলে বাস করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পালি দীপবংস ও মহাবংসে যবন দেশের প্রধান নগর অলসন্দ বা অলসন্দার নাম পাওয়া যায়। নামটি যে গ্রীক 'আলেকজান্দ্রিয়া'র ভারতীয় রূপ তাহাতে পণ্ডিতসমাজের সংশয় নাই। সম্রাট্ আলেকজান্দার আফ্‌গানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে-সকল নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার অধিকাংশেরই নাম ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। এইরূপে একটি আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria ad Caucasum) বর্তমান কাবুলের নিকটে অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন যে, পালিগ্রন্থের অলসন্দ নগর ঐ কাবুলের নিকটবর্তী আলেকজান্দ্রিয়া। আবার মিলিন্দপঞ্‌হ নামক পালি গ্রন্থে অলসন্দ দীপের উল্লেখ আছে। পালি 'দীপ' (সংস্কৃত 'দ্বীপ') শব্দ এখানে 'দোয়াব' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই অলসন্দ দুইটি নদীর মধ্যবর্তী একটি দোয়াবের নাম। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, কাবুলের সন্নিকটে অবস্থিত অলসন্দ নগরের চতুর্দিগ্‌বর্তী ভূভাগই এই অলসন্দ দোয়াব। অবশ্য ইতিপূর্বে বাহ্লীকের গ্রীকরাজগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ফলে যবন দেশের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছিল। মিলিন্দপঞ্‌হ বর্ণিত যবনরাজ মিলিন্দ (Menander) সাকল নগরে অবস্থান করিতেন। ইহা বর্তমান পশ্চিম-পাকিস্থানের অন্তর্গত সিয়ালকোট। যাহা হউক, সম্প্রতি কান্দাহারে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের যে শৈলানুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা মৌর্যকালীন উত্তরাপথে যবন ও কম্বোজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অশোকের কান্দাহার অনুশাসন দুই অংশে বিভক্ত। উহার প্রথমটি গ্রীক ভাষায় গ্রীক অক্ষরে লিখিত; অপরাংশের ভাষা ও অক্ষর আরামায়িক। পশ্চিম-পাকিস্থানে প্রাপ্ত অশোকানুশাসনের ভাষা প্রাকৃত; কিন্তু উহার অক্ষর আরামায়িকের বিকারজাত খরোষ্ঠী। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত লেখাবলীতে অশোক প্রাকৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইরাণের হখামণিষীয় সাম্রাজ্যের দলিলপত্রে আরামায়িক ভাষা ব্যবহৃত হইত। আফ্‌গানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে হখামণিষীয় অধিকার বিস্তারের সহিত ঐ অঞ্চলে আরামায়িক ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়।

কান্দাহার অনুশাসনের গ্রীক অংশটি অবশ্যই মৌর্য সম্রাটের যবন প্রজাগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তৎকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যবন জনপদের অন্যতম প্রধান নগর কান্দাহারে অবস্থিত ছিল এবং অশোকের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা সেখানেই অবস্থান করিতেন। বস্তুতঃ 'কান্দাহার' নামটি গ্রীক 'আলেকজান্দ্রিয়া'র রূপান্তর। পশ্চিম-এশিয়ায় আলেকজান্দারের নাম 'ইস্কান্দার' বা 'সিকান্দার' লিখিত হইত এবং 'আলেকজান্দ্রিয়া'কে বলা হইত 'ইস্কান্দারিয়া' বা 'স্কান্দারিয়া'। ইহা হইতে অল্‌-কান্দার বা অল্‌-কান্দাহার নামের উদ্ভব হয়। প্রাচীন য়ুরোপীয় লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়, বর্তমান কান্দাহারের উপকণ্ঠে সম্রাট্‌ অলেকজান্দারের নামে যে নগর নির্মিত হইয়াছিল উহার নাম ছিল Alexandropolis বা Alexandria Arachosiae (অর্থাৎ আরাখোসীয় জাতির দেশে প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া)।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি কান্দাহারের গ্রীক অনুশাসন অশোকের স্থানীয় যবন প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে উহার আরামায়িক অংশ কাহাদের জন্য উদ্দিষ্ট? অশোকের লেখাবলীতে যবন এবং কম্বোজগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রব লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, কান্দাহারের আরামায়িক অনুশাসন এই কম্বোজ জাতির উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং মৌর্য সাম্রাজ্যের কম্বোজ প্রজাগণ দক্ষিণ-আফ্‌গানিস্থান (গ্রীক Arachosia) জনপদে বাস করিত। অবশ্য ইহাতে প্রমাণ হয়না যে, অশোকের সাম্রাজ্যের অন্যত্র কম্বোজদিগের বসতি ছিল না কিংবা কম্বোজ জাতি বা উহার কিয়দংশ পরবর্তীকালে অন্য কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করে নাই।

আরামায়িক ভাষার সহিত কম্বোজদিগের সম্পর্ক হইতে স্থির করা যায় যে, কম্বোজ জাতি মূলতঃ ইরাণীয়। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতীয় সমাজে কম্বোজদিগের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে তাহাদের ভাষা, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই তাহাতে মনে হয়, দীর্ঘকাল উত্তরাপথে বাস করিবার পরেও কম্বোজেরা সম্পূর্ণরূপে ভারত সমাজে মিশিয়া যায় নাই। পরবর্তী কালে উত্তরাপথে শক, পহ্লব প্রমুখ জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ধীরে ধীরে কম্বোজ জাতির প্রতিষ্ঠা কমিয়া যায়। তাই মৌর্যোত্তর যুগে যবনকম্বোজের স্থলে 'শকযবন' প্রভৃতি সমস্তপদ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও মিলিন্দপঞ্‌হের শকযবন, রামায়ণের 'শকান্‌ যবনমিশ্রিতান্‌' এবং নাসিকপ্রশস্তিতে শাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির বর্ণনায় 'শকযবন-পহ্লবনিসূদন' বিরুদের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কম্বোজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে একটি বিষয়ে অনেকেই অবহিত হন নাই। উহা এই যে, কম্বোজ রাজধানী অবশ্যই একটি প্রধান বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত ছিল। ষোড়শ মহাজনপদের যুগে কম্বোজ ও

গন্ধার রাষ্ট্রের রাজধানী এইরূপ একটি পথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। পেতবথু সংজ্ঞক বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বাণিজ্যব্যপদেশে বণিকেরা কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত দ্বারকা হইতে কম্বোজ দেশে যাতায়াত করিত। যাঁহারা কম্বোজদিগকে পামীর অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আজিও দ্বারকা, রাওয়ালপিণ্ডী ও পেশোয়ার হইতে পামীরে পৌছিবার কোনো সহজ বাণিজ্যপথ নাই। অধিকন্তু, বাল্‌খ্‌—বদখ্‌শান ও পামীর অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। সুতরাং তাঁহার কম্বোজপ্রজাগণ পামীরবাসী হইতে পারে না।

বাংলায় পুরাণচর্চা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরাণের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কতকগুলি পুরাণ বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত, কল্কি, অগ্নি, শিব, বৃহন্নারদীয়, বৃহদ্ধর্ম, আদি, আঙ্গিরস, পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার প্রভৃতি পুরাণের উদ্ভবস্থান বঙ্গদেশ বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমানের মূল্য যাহাই হউক না কেন, পুরাণ বাঙালির জীবনে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। পুরাণ বা পুরাণ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ পাঠ, পুরাণ-ব্যাখ্যা, পৌরাণিক আখ্যানের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, নূতন নূতন কাহিনীর কল্পনা ও প্রচার তাহার হৃদয়কে যেমন ধর্মভাবে আপ্লুত করিয়াছে তেমনি উহাকে রসসিক্ত করিয়াছে। পাঁচালি কথকতা যাত্রা নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া পৌরাণিক কাহিনী বাঙালির হৃদয়রাজ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে— বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। আজও তাই পৌরাণিক কাহিনী সংবলিত চলচ্চিত্র অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। বস্তুতঃ পুরাণের আদর সমগ্র ভারতব্যাপী— সাধারণ সমাজে ইহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অন্য শাস্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি। তবে আমরা এখানে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের কথাই আলোচনা করিব। অন্য প্রদেশেরও অনুরূপ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

কতকগুলি পুরাণের বঙ্গদেশে প্রচলিত রূপ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হয়। দেবী-ভাগবতের টীকাকার মহারাষ্ট্রের শৈব নীলকণ্ঠের মতে ঐ গ্রন্থের গৌড় ও দ্রাবিড় দেশীয় পাঠভেদের মধ্যে গৌড়ীয় পাঠই অধিকতর সুসমঞ্জস। তাই তিনি গৌড়ীয় পাঠ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় হস্তলিপি আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে— বাংলাদেশের পুথিতে প্রক্ষিপ্তাংশ কম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার পাঠই অন্য প্রদেশের পুথির পাঠের তুলনায় শুদ্ধ। পুণা হইতে প্রকাশিত মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণের আদিপর্বের ভূমিকায় সম্পাদক সুক্‌থঙ্কর এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণের বঙ্গীয় পাঠ অনেক স্থলে অন্য প্রদেশের পাঠ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য উইন্টারনিট্‌স্‌এর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ও হরদত্ত শর্মার পদ্মপুরাণ ও শকুন্তলা বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পুথিশালায় নানা পুরাণের অজস্র পুথি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু পুথি বেশ প্রাচীন— চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩১১ শকাব্দে লিখিত পদ্মপুরাণের পুথি, ১৩৮৮ শকাব্দে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের পুথি ও ১৩৯৩ শকাব্দে লিখিত মহাভারত আরণ্য পর্বের পুথি আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি হরিবংশের পুথির তারিখ ১৩৮৭ শকাব্দ। বিভিন্ন বারব্রত পূজাপার্বণ ও তাহাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানা প্রচলিত অপ্রচলিত জ্ঞাত অজ্ঞাত পুরাণের যে প্রচুর খণ্ডিত অংশ মুদ্রিত অমুদ্রিত অবস্থায় দেশময় ছড়ান রহিয়াছে তাহাদের মূল্যও কম নহে। একযুগে জনসমাজে সেগুলির আদর ছিল। পৌরাণিক সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়াই ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বাঙালি তাহার পুরাণজ্ঞান লইয়া গর্ববোধ করিত। বেণীনাথ তাঁহার দুর্গাপূজাপদ্ধতি গ্রন্থে মৈথিলদের

পুরাণে অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে বাঙালির বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন বুঝা যায়। তিনি স্পষ্টতই বলিয়াছেন— মৈথিলেরা প্রায়শঃ পুরাণ দেখেন না, তাই এ বিষয়ে তাঁহাদের লেখায় পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করা সমীচীন নহে।[১]

বিভিন্ন পুরাণ ও পুরাণাংশের উপর বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত নানা সময়ে টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা, মহাভারতের অর্জুন মিশ্র, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির টীকা, মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু মনীষীর রচিত টীকা, ভাগবতের সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির টীকা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের গদাধর তর্কাচার্য, গৌরীবর শর্মা, নৃসিংহ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, রঘুনাথ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বাচস্পতি প্রভৃতি রচিত টীকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামায়ণের লোকনাথের টীকা কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। অর্জুন মিশ্রের টীকা ছাড়া মহাভারতের অন্য কোনো টীকা বর্তমানে পরিচিত নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা সর্বভারতপ্রসিদ্ধ— বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। ভাগবতের টীকাগুলি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ও বহু আলোচিত। দেবীমাহাত্ম্যের বাঙালি-রচিত বহু টীকার মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর টীকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণ অবলম্বনে রচিত যে-সমস্ত নিবন্ধগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের বেশির ভাগই বাঙালির লেখা। এই-সমস্ত গ্রন্থে পুরাণে আলোচিত বিষয়বস্তুর বিবরণ বা সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইয়াছে। ১৩৯৬ শকাব্দে (১৪৭৩ খৃ) রচিত পুরাণসর্বস্ব গ্রন্থখানি একসময়ে জনপ্রিয় ছিল মনে হয়। ইহার নয়খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে হলায়ুধের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা বরেন্দ্রভূমির বণিগ্‌বংশীয় কুলধর সত্যরাজ খান শুভরাজ খান গোবর্ধন পাঠকের দ্বারা রচনা করাইয়াছিলেন। নদীয়া রাজবংশের রাঘবরায়ের পুত্র রুদ্ররায় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাণসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুইখানিতে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে পুরাণ হইতে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। তীর্থমাহাত্ম্য প্রকরণে পুরাণ-সর্বস্বে কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে— পুরাণসারে অনেক বেশি তীর্থের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনতর পুরাণসর্বস্বের জগন্নাথমাহাত্ম্য প্রকরণে জগন্নাথের প্রসাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই— পরবর্তীকালের পুরাণসারে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারত ও ভাগবতাদি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সার সংকলন ও বক্তব্য বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াও কিছু-কিছু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে পুরাণের অনুশীলন এখনকার মত কেবল শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নহে। বাঙালি জনসাধারণের ভাষা ও সাহিত্যও পুরাণের প্রভাবে বিশেষরূপে প্রভাবিত ছিল। বাঙালির সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার প্রভূত উল্লেখ দেখা যায়। রামরাজত্ব, সীতাসাবিত্রীর মত স্ত্রী, লক্ষ্মণের মত ভাই বা দেবর বাঙালির আদর্শ। রামের তুলনা নাই— রাম এক অদ্বিতীয়। তাই 'এক' বুঝাইতে রাম শব্দের প্রয়োগ করা হয়। বর্ষার দিনে আকাশে ধনুকের মতো যে বিচিত্র রঙের বস্তুটি দেখিতে পাওয়া যায় বাঙালি তাহাকে রামধনু বলে। তাহার ধারণা— রামের ধনুক ছাড়া অন্যত্র এইরূপ বৈচিত্র্য

---

১ পুরাণাদর্শিনঃ প্রায়ো মৈথিলাস্তু বিশেষতঃ।
অতস্তেষাং লিপৌ শ্রদ্ধা ন হি কার্যা বিপশ্চিতা।

সম্ভবপর নয়। 'ধনুর্ভঙ্গ পণ' কথার মধ্যে সীতার বিবাহ উপলক্ষে হরধনুর্ভঙ্গ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'একা রামে রক্ষা নাই দোসর লক্ষ্মণ' এই প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে রামের অসাধারণ শক্তিমত্তার আভাস পাওয়া যায়। সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হিসাবে বাঙালি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নাম করে। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই পরিচিত উক্তির মধ্যে অশ্বত্থামানিধন প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সত্যমিশ্রিত মিথ্যা ভাষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভীম বাঙালির নিকট শক্তির আদর্শ— অতিভোজনের আদর্শ হিসাবে তিনি বৃকোদর নামে পরিচিত। দ্রৌপদীর রন্ধননৈপুণ্য, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, দুর্বাসার ক্রোধ, ত্রিশঙ্কুর আশাভঙ্গ ও মধ্যপথে অবস্থান, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, রক্তবীজের বংশ বাঙালির দৃষ্টান্ত-স্থল। কার্তিকের মতো রূপবান্ পুত্র বাঙালির কাম্য। ঘরের শত্রু বিভীষণ, কালনেমির লঙ্কাভাগ, কুচক্রী শকুনি মামা, দৈত্যগুরু কানা শুক্কুর (শুক্রাচার্য), যণ্ডামার্ক নামে উল্লিখিত শুক্রের পুত্র প্রহ্লাদের গুরু শণ্ড ও অমর্ক (ভাগবত ৭।৫।১), ভণ্ড বিড়ালতপস্বী (মহাভারত ৫।১৬০।১৬-৪১), দীর্ঘজীবী বহুদর্শী ভুষুণ্ডি (ভুশুণ্ড) কাক (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্বাণ প্রকরণ, পূর্বার্ধ, ১৪-২৭ সর্গ), লঙ্কাকাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ, মন্বন্তর, গন্ধমাদন, রাবণের অনির্বাণ চিতা, রাবণের গুষ্টি (গোষ্ঠী বা দল), সুপ্রাচীন মান্ধাতার আমল, বিকটাকৃতি দৈত্য অলম্বুষ (মহাভারত ৭।১০৮-৯), ঢেঁকিবাহন পরচ্ছিদ্রান্বেষী নারদ, সামান্য খুদের সাহায্যে মাননীয় অভ্যাগতের মর্যাদারক্ষক দরিদ্র অথচ মহনীয় বিদুর, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র ছুঁচো, এক পয়সায় অক্রূর সংবাদ শুনিব'র আগ্রহ, লম্বোদর গণেশের নাদুস-নুদুস চেহারা, শনির অশুভ দৃষ্টি, রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ-রচনা, চিত্রগুপ্তের সূক্ষ্ম হিসাবের নিদর্শন স্বরূপ তাহার খাতা— এ সমস্তই চলতি কথার মধ্য দিয়া বাঙালির নিকট অতি পরিচিত।

পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানও চলিয়া আসিতেছে। মাসের প্রথম দিন যাত্রা করা নিষিদ্ধ, অগস্ত্যযাত্রা নামে পরিচিত এই যাত্রা অগস্ত্যমুনির প্রত্যাবর্তনহীন দাক্ষিণাত্য-প্রয়াণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আশ্বিনী কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে তিন দিন অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান বাঙালির কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। মাঘী শুক্লা অষ্টমীতে অপুত্রক ভীষ্মের তর্পণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। অশ্বত্থামার শিরোমণি ছেদনের যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশমের জন্য প্রতিদিন তেল মাখার পূর্বে কিছু তেল মাটিতে ছিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা বাংলা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত অনেকে অনুসরণ করেন। চন্দ্রের গুরুপত্নী-গমনরূপ দুষ্কার্যের কথা স্মরণ করিয়া ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চন্দ্রের দর্শন

---

২ মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিন বার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্তি হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
কাশীদাসী মহাভারত— দেবসাহিত্য কুটীর, পৃ ৮৩৭

নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৩] এই চন্দ্র নষ্টচন্দ্র নামে পরিচিত। সাবিত্রীব্রতের মধ্য দিয়া সাবিত্রীর অপূর্ব পাতিব্রত্যের কাহিনী স্মরণ করা হয়।

বহুলপ্রচলিত লোকোক্তি ও আচরণের অন্তরালবর্তী কাহিনী সকলের জানা না থাকিলেও জনসমাজে ইহাদের প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য, আধুনিকপূর্ব যুগে কথকতা পাঁচালি কবির গান প্রভৃতির মধ্য দিয়া পুরাণের সহিত সাধারণ লোকের পরিচয় এখনকার কাল অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কথক পাঁচালিকার ও কবিগানের গায়কেরা নানা পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া খুঁটিনাটি আলোচনা করিতেন— মঙ্গলকাব্যাদির মধ্যে পুরাণের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকিত— জনপ্রিয় দেবদেবীদের সম্পর্কে লৌকিক পৌরাণিক বিচিত্র কাহিনীপ্রচারিত হইত। বিভিন্ন পুরাণ বা পুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া রচিত ও প্রচারিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যাও কম ছিল না। রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত ও তাহাদের প্রধান প্রধান চরিত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। এই সম্পর্কে কৃত্তিবাস কাশীদাস রঘুনাথ ভাগবতাচার্য অদ্ভুতাচার্য জগদ্রাম রামপ্রসাদ সঞ্জয় কবিচন্দ্র প্রভৃতি বহু কবির নাম অল্পবিস্তর পরিচিত। মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ভাগবতে নাই এমন অনেক লোকপ্রচলিত বা অন্য পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীও এই-সমস্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে— মূল গ্রন্থকে হুবহু অনুসরণ করিয়া অনুবাদরূপে এগুলি রচিত হয় নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের গোড়ার দিকে বাল্মীকির বাল্যজীবনের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে রত্নাকরের যে উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে তাহা বাল্মীকির রামায়ণে নাই— অধ্যাত্ম রামায়ণে অনুরূপ একটি কাহিনী আছে। তুলসীদাসী রামায়ণেও এই জাতীয় কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় (সূচনা, রামনাম মহিমা, চৌপদী ৩)। হরেকৃষ্ণ দাসের বাল্মীক পুরাণ নামক গ্রন্থে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি ১৭৮১) বাল্মীকির যে পূর্ব ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে বাল্মীকির পূর্বনাম বৃন্দা দৈত্য— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাল্মীক পুরাণের পুথিতে (৫৭০৭) নাম বঞ্জু দৈত্য। ইহার আকর অজ্ঞাত। কৃত্তিবাস-বর্ণিত ভগীরথের জন্মবিষয়ক বিচিত্র কাহিনীর মূল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত বশিষ্ঠ পুরাণ ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের পুথিতে পাওয়া যায়— শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণ আদিকাণ্ডে (পৃ ৮৪) এই খবর দিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনো কোনো পুথিতে প্রাপ্ত রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীর বিবরণ নারদীয় পুরাণের উত্তরার্ধের ৩২-৩৪ অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত হইয়া থাকিতে পারে। রাবণ-বধের পূর্বে দেবীর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে অকালে বোধন করিয়া রামের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের উপাখ্যানের আদিরূপ কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত ও দেবীভাগবতে পাওয়া যায়।

একাদশীর মাহাত্ম্য নির্দেশ প্রসঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত চন্দ্রহাস ও ভদ্রশীলের উপাখ্যান সংস্কৃতে জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বে (৫০ অধ্যায়) ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে (২১ অধ্যায়) পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভাব্য বিরোধ স্বীকার করিয়াও পাণ্ডবগণ কর্তৃক আশ্রিত দণ্ডীরাজাকে আশ্রয় দান ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী লইয়া একাধিক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার আকর হিসাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার, জৈমিনীয় সংহিতা, ভাগবত, বৃহৎকূর্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে।

---

৩ পশ্চিম-ভারতে প্রচলিত কাহিনী মতে এই দিন গণেশ পূজা উপলক্ষে পূজকদের গৃহে প্রচুর ভোজ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে গণেশ পথ দিয়া হেলিয়া দুলিয়া যাইতেছিলেন। গণেশের অবস্থা দেখিয়া চন্দ্র উপহাস করায় গণেশ অভিশাপ দেন ঐ দিন কেহ চন্দ্র দেখিবে না— দেখিলে মিথ্যা অপবাদভাগী হইবে।

ভাগবত অবলম্বনে পুরাতন বাংলায় রামায়ণ মহাভারতের মত পূর্ণাঙ্গ বিশেষ কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্যে কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে বহু কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া বিস্তর লৌকিক কাহিনীর (রাধার কলঙ্কভঞ্জন, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি) সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, প্রহ্লাদচরিত্র ধ্রুবচরিত্র উষাহরণ অক্রূরাগমন উদ্ধবসংবাদ নন্দবিদায় সুদামাচরিত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কাহিনী লইয়া রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। এই-সমস্ত গ্রন্থ-রচনায় হরিবংশ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। গঙ্গারাম দত্তের উষাহরণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি ৯৩৮, ১২৩৮) ভাগবত ও হরিবংশ উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত।

ভাগবত হরিবংশ ঐক্যতা করিয়া।
গঙ্গারাম দত্ত ভণে বাণী সঙরিয়া॥

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বাংলা কাব্যগুলির অন্যতম আশ্রয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড। রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু (ব. সা. প. পুথি— ১৩৩৯) ঐ পুরাণ অবলম্বনেই লিখিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত মধ্যে জন্মখণ্ড মত।
রচনা করিএ গ্রন্থ কৃষ্ণলীলামৃত॥

অন্যান্য পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে কালিকামঙ্গল, কালিকা-পুরাণ, কালিকাবিলাস, দুর্গামঙ্গল, দেবীমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের অন্তর্গত সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যের কাহিনী অনেক বাঙালি কবি বাংলায় বিবৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রামেশ্বরের নাম প্রসিদ্ধ। নানা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে তুলসীমাহাত্ম্য ও একাদশী-মাহাত্ম্য বিবৃত করিয়াও একাধিক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অবলম্বনে রচিত প্রাণনারায়ণ, রামসুন্দর প্রভৃতির গ্রন্থ, কবিচন্দ্র রচিত ভবিষ্যপুরাণ, কৈলাস বসু রচিত মহাভাগবত বা দেবীভাগবতের অনুবাদ, বরাহপুরাণের ছায়াবলম্বনে রচিত তিলকরামের বরাহ-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসুর 'বাঙ্গালাসাহিত্য— দ্বিতীয় খণ্ড' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩০২ প্রভৃতি) ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক যুগে নামকরা প্রায় সমস্ত পুরাণ গ্রন্থের আক্ষরিক গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে পূর্বোল্লিখিত পুরাণ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের তুলনায় সেগুলি সাধারণ জনসমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

বাংলায় পুরাণ নামে এমন কিছু-কিছু গ্রন্থও পাওয়া যায় যাহাদের নাম বা কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের কোনো যোগ নাই। বাল্মীকপুরাণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সীতাসুতের রচিত রামায়ণও এই নামে অভিহিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণ, হাকন্দপুরাণ, ধর্মপুরাণ, অনাদিপুরাণ, অনিলপুরাণ প্রভৃতি নামে পরিচিত গ্রন্থগুলির উপজীব্য বিষয় লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। দুর্গাপুরাণে (ব. সা. প. পুথি— ৮০৬) দুর্গার হিমালয়ে আগমন ও পূজালাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পুরাণের নামযুক্ত গ্রন্থেও বর্ণনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কালিকাপুরাণ নামক গ্রন্থে (ব. সা. প. পুথি ৯০৬) গৌরীর বিবাহ হইতে গণেশের জন্ম পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাণবল্লভ-কৃত কালিকাপুরাণে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি— ১৯৩১) বর্ণনীয় বিষয় দেবগণ-কর্তৃক মহাকালী দর্শন ও দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন। মুকুন্দভারতী-রচিত ব্রহ্মপুরাণে (ব. সা. প. পুথি— ২৮৯, ২৩৩২) শ্রীক্ষেত্র ও জগন্নাথের

বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণচরিতাশ্রিত ভবানন্দের হরিবংশের সহিত ঐ নামের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই। গ্রন্থের আকর হিসাবে ভবানন্দ যে কৌশিক পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ও রামায়ণ মহাভারতাদির মধ্যে বা স্বতন্ত্রভাবে পৌরাণিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এমন অনেক কাহিনীর প্রচলন রহিয়াছে যাহাদের আকর নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাহাদের অনেকগুলি মূলতঃ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল ইহারা গল্পপ্রিয় জনসাধারণকে আনন্দ দান করিয়াছে। এই-সমস্ত অজ্ঞাতমূল কাহিনীর মধ্যে হরগৌরী রাধাকৃষ্ণ চণ্ডী মনসা প্রভৃতির কাহিনী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিবায়ন চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গলে বিবৃত হরপার্বতীর দাম্পত্য জীবন ও চণ্ডীমনসার মাহাত্মমূলক কাহিনীগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালির মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ মানবজীবনের যে প্রতিচ্ছবি ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা পাঠক ও শ্রোতা মাত্রের হৃদয়কে স্বতই আকৃষ্ট করে। শনি ও লক্ষ্মীর দ্বন্দ্বের ফলে শ্রীবৎস রাজা ও রাণী চিন্তার লাঞ্ছনার কাহিনী, ব্যভিচারিণী অহল্যার পাষাণরূপ প্রাপ্তি ও রামপাদস্পর্শে মুক্তিলাভ, সর্পরূপে পরিণত পিতা নহুষের উদ্ধারের জন্য যযাতির নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রভৃতি অগণিত উপাখ্যান বাংলা রামায়ণ মহাভারতকে পরিপুষ্ট করিয়াছে— স্বতন্ত্রভাবে পাঁচালি যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সাধারণ বাঙালিকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছে। উল্লিখিত দেবদেবী ছাড়া অন্যান্য নানা দেবদেবী লইয়াও বহু কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত আছে। গণেশের গজমুণ্ডধারণের কাহিনী এইরূপ : নিজ আপত্তি সত্ত্বেও পার্বতীর অনুরোধে তাঁহার নবজাত পুত্র গণেশকে দেখিতে যাইয়া শনি যেই মাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন অমনি তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হস্তীর মুণ্ড ছেদন করিয়া আনিয়া উহা সেই দেহে যুক্ত করা হইল। শনির পিতা সূর্যের কাহিনী সূর্যব্রত উপলক্ষে মহিলারা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কাহিনীতে রুমুনা-ঝুমুনা রূপনা-ঝুপনা বা জয়া-বিজয়া নামে দুই ভগ্নীর করুণ জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়া সূর্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও প্রসঙ্গক্রমে সূর্যের সহিত বিশ্বকর্মার কন্যা সন্ধ্যার বিবাহ ও পুত্রকন্যারূপে সন্ধ্যার গর্ভে যম যমুনা, সন্ধ্যার প্রতিনিধি ছায়ার গর্ভে শনি এবং অশ্বিনী-রূপধারিণী সন্ধ্যার গর্ভে অশ্বিনীকুমারের জন্মের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত সূর্যের আর-এক পুত্র জীমূতবাহন, জীবিতবাহন বা জিতার বিচিত্রকাহিনী জীমূত-মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে জিতাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে ইহার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সমাজে বহুল-প্রচলিত অগণিত ব্রতকথার মধ্যে এই জাতীয় নানা পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেবদেবী ও নানা পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এইরূপ অজস্র কাহিনী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে। হিন্দুদের অনুরূপ জৈনদেরও সমৃদ্ধ পুরাণসাহিত্য আছে। জৈন আদিপুরাণ, জৈন উত্তরপুরাণ, জৈন পদ্মপুরাণ বা রামায়ণ, জৈন হরিবংশ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিছু-কিছু হিন্দু-পুরাণ কাহিনীর বৌদ্ধরূপ দশরথজাতক প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশের প্রচলিত বা বিলোপোন্মুখ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা হইলে ইহাদের বিকাশের ধারা আবিষ্কৃত হইতে পারে। সাধারণ পাঠকও এই আলোচনার ফলে কম আনন্দ পাইবেন না।

বঙ্গে মুসলিম-সংস্কৃতি

সৈয়দ মুজতবা আলী

আজ যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত পুস্তকপত্র থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হয় তা হলে এ দেশে মুসলমান ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিয়ে বিলক্ষণ তর্কের অবকাশ থাকবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, মুসলমান-আগমনের পরও প্রচুর সংস্কৃত পুস্তক লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পান নি সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর জমিজমার উপর হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফলে তাঁদের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা বিশেষ মন্দীভূত হয় নি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই আপন আপন লেখনী সঞ্চালনা করেছেন।[১] অল্লোপনিষদ্ জাতীয় দু চার খানা পুস্তক নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। বরঞ্চ এরা সত্যানুসন্ধানকারীকে পথভ্রষ্ট করে।

এ এক চরম পরম বিস্ময়ের বস্তু। দশম-একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমূদ বাদশার সভাপণ্ডিত আবূ-র্-রইহান মুহম্মদ অল-বীরূনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রামাণিক পুস্তকে একাধিক বার সবিনয়ে বলেছেন, 'আমরা (অর্থাৎ আরবীতে) যাঁরা জ্ঞানচর্চা করি, দার্শনিক চিন্তা আমাদের মজ্জাগত নয়। দর্শন নির্মাণ করতে পারে একমাত্র গ্রীক ও ভারতীয়েরা।'

সেই ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান-আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিও-প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বূ আলী-সিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালী[২] (লাতিনে অল-গাজেল), আবূ রুশ্‌দ্ (লাতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো-আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে

---

১ টয়িনবি সাহেব যে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেন বর্তমান লেখক সে নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। শুধু যেখানে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হবে সেখানেই এই নীতি মানা হবে। এস্থলে তাই শুধু উল্লেখ করি, যখনই কোনো জাতি বৈদেশিক কোনো ভিন্নধর্মাবলম্বীদ্বারা পরাজিত হয় তখন নূতন রাজা এঁদের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কোনো প্রধানকর্মে আমন্ত্রণ জানান না বলে এঁদের এক মানসিক পরিবর্তন হয়। এঁদের চিন্তাধারা তখন মোটামুটি এই: 'আমাদের ধর্ম সত্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা ম্লেচ্ছ বা যবন কর্তৃক পরাজিত হলেম কেন? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, আমরা আমাদের ধর্মের প্রকৃতরূপ বুঝতে পারি নি। ধর্মের অর্থকরণে (ইন্টারপ্রিটেশনে) নিশ্চয়ই আমাদের ভুল রয়ে গিয়েছে। আমরা তা হলে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেখি, ত্রুটি কোন্ স্থলে হয়েছে।' ফলে পরাজয়ের পরবর্তী যুগে তাবৎ সৃষ্টিশক্তি টীকাটিপ্পনী রচনায় ব্যয় হয়।

২ ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত পথপ্রদর্শক বা ইমাম। ইনি দার্শনিক— কিয়ৎকালের জন্য নাস্তিক— এবং পরিণত-বয়সে সূফী (মিস্টিক, ভক্তিমার্গ ও যোগের সমন্বয়কারী) হয়ে যান। এঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'কিমিয়া সাদৎ' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই পুস্তকের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিধুশেখর অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ '.টোলো পণ্ডিত' ছিলেন। স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য— গজ্জালীর মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে।

জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। তিনিও জানতে পেলেন না যে, তিনি প্লাতোর আদর্শবাদ দৃঢ়ভূমিতে নির্মাণ করার জন্য যেসব যুক্তি আকাশ-পাতাল থেকে আহরণ করছেন তাঁর পাশের চতুষ্পাঠীতেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের আদর্শবাদ সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি 'গুলাত' নাস্তিকদের জড়বাদ যেভাবে খণ্ডন করছেন, ব্রাহ্মণও চার্বাকের নাস্তিকতা সেই ভাবেই খণ্ডন করছেন। এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক-সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বূ আলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র—'য়ুনানী' নামে প্রচলিত (কারণ তার গোড়াপত্তন গ্রীক [আইওনিয়ান=য়ুনানী] চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর)—আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে। সিনা-উল্লিখিত যে-ভেষজ কি তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা ওষধিবনস্পতি এ দেশে (অর্থাৎ আরবে) জন্মে না, সেগুলো যে তাঁর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড়ে গজাচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না। কিঞ্চিৎ কল্পনাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করাও অসম্ভব নয় যে মৌলার বেগমসায়েবা সিনা-উল্লিখিত কোনো শাক তাঁকে পাক করে খাওয়ালেন, আর তিনি সেটি চিনতেই পারলেন না।

পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই। আওরেঙ্গজেবের অগ্রজ যুবরাজ মুহম্মদ দা রা শী কূ হ্। ইনিই সর্বপ্রথম দুই ধর্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক লেখেন। তার অন্যতম মজমা'-উল্-বহরেন, অর্থাৎ দ্বিসিন্ধুসঙ্গম। দারাশীকূহ বহু বৎসর অনাদৃত থাকার পর তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা বিশ্বভারতীতেই হয়। শ্রীযুত বিক্রমজিৎ হস্‌রৎ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'দারাশীকূহ্: লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' নামক একখানি অত্যুত্তম গ্রন্থ লেখেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনমত আমরা এই পুস্তক-খানির সদ্ব্যবহার করব।

তারও তিন শত বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ফার্সীতে রচনা করেন তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক, 'তুহাফতু অল্-মুওয়াহ্‌হিদীন': 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ'। রাজা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর পুস্তককে 'ত্রিরত্ন'ধারী বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন তাঁরাই জানেন রাজার শিক্ষাদীক্ষা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নিকট কতখানি ঋণী ও পরবর্তী জীবনে যদিও তিনি উপনিষদের উপর তাঁর ধর্মসংস্কারসৌধের দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তবু শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কণামাত্র হ্রাস পায় নি। প্রয়োজনমত আমরা তাঁর রচনাবলীরও সদ্ব্যবহার করব।

প্রায় ছশ বৎসর ধরে এ দেশে ফার্সীচর্চা হল। হিন্দুরা না হয় বিদেশাগত ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল না দেখাতে পারেন, কিন্তু যাদের রাজ্যচালনা করতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে এ দেশের ভাষা রীতিনীতি অল্পবিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তম সরকারি কর্ম পাবার জন্য বহু হিন্দুও ফার্সী শিখেছিলেন। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে: এ দেশে বহু হিন্দুর পদবী মুন্‌শী। আমরা বাংলায় বলি, লোকটির ভাষায় মুন্সিয়ানা বা মুন্‌শীয়ানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর (স্কিলফুল) ভাষা লেখে। এর

থেকেই বোঝা যায়, কতখানি ফার্সী জানা থাকলে তবে মানুষ বিদেশী ভাষায় এ রকম একটা উপাধি পায়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে: আমরা প্রচুর ইংরিজি চর্চা করেছি, কিন্তু ইংরেজ মুন্‌শী-জাতীয় কোনো উপাধি আমাদের কাউকে দেয় নি— বরঞ্চ আমাদের 'ব্যাবু-ইংলিশ' নিয়ে ব্যঙ্গই করেছে।· ·কিন্তু এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মুন্‌শী-শ্রেণীর যাঁরা উত্তম ফার্সী শিখেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কৃতের পটভূমি তাঁদের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাস্ত্রের সম্মেলন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু এঁরা ফার্সী শিখেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য— জ্ঞানান্বেষণে নয়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরিজি বিদ্যাভ্যাস করেছি বটে, তথাপি খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভব করেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য বাংলা দেশে আসার সময় পথিমধ্যে এক মোল্লার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই মোল্লা নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তখন মুসলমান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ভ্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না। মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা তথা মিথ্যাচারণ বর্জন করে সৎপথে চলে— অর্থাৎ কুরান-শরীফ-বর্ণিত নীতিপথে চলে তাকে— 'পয়গম্বরহীন-মুসলমান' বলা যেতে পারে, হজরৎ মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করে নি বলেই সে ধর্মহীন নয়। (আমরা এস্থলে 'কাফির' না বলে 'ধর্মহীন' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি, পরে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে)। অতএব অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় যে, বোধ হয় চৈতন্যদেব ঐ মতবাদেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তদুপরি চৈতন্যদেবের মত উদার প্রকৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে হজরৎ মুহম্মদকে অন্যতম মহাপুরুষ বা পয়গম্বররূপেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুত সে যুগে, এবং এ যুগেও বহু হিন্দু সজ্জন মহাপুরুষ মুহম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা, কাজী-কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ করা নিয়ে। কথিত আছে, সেবারেও তিনি যুক্তিতর্কে কাজীকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অনুমান এস্থলেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।

তবুও এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এ যাবৎ আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হন নি। এবং বিদেশাগত পণ্ডিত দার্শনিক এ দেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলাভের উদ্দেশ্যে— কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তের পর এঁদের অধিকাংশই তাঁদের চরম নিমকহারামীর পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চমুখে এ দেশের নিন্দাবাদ করে। নিন্দা করেছেন মুসলমান রাজা এবং আমীর-ওম্‌রাহেরই —হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।

ফার্সী সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন উপরে উল্লিখিত যুগকে ফার্সী সাহিত্যের 'ইণ্ডিয়ান সামার' 'পুনরুচ্ছলিত যৌবন' নাম দিয়েছেন। বস্তুত বর্বর মঙ্গোল অভিযানের ফলস্বরূপ ফার্সী সাহিত্যের যে অনাহার মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল সে তখন অন্নজল পায় মোগল-দরবারে। ইরান আজকের দিনে ভারতের কাছে তার জন্য কতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না, কিন্তু ভারতবর্ষে ফার্সী সাহিত্যের এই যুগ নিয়ে অতি অল্প আলোচনাই হয়েছে, তাও উর্দুতে, বাংলাতে কিছুই হয় নি।

এ তো প্রধানত সাহিত্য ও অন্যান্য বাঙ্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মনে হয় এই দেখে যে, ভুবনবিখ্যাত ষড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্লাতো-আরিস্ততল, সিনা-রুশ্‌দ্ নিয়ে সপ্তম দর্শন নির্মাণ করল না। কল্পনা করতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়— ভারতবর্ষ তা হলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিক্‌চক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে যেত— দেকার্ত কাণ্টের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক এ দেশেই জন্মাতেন!

পক্ষান্তরে মুসলমান যে-আরবী দর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মূররা বিতাড়িত হওয়ার ফলে আরব-জগতে দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এ দেশের মুসলমান দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাইরের সব উৎস সম্পূর্ণ শুষ্ক হল। হায়, এরা যদি পাকে-চক্রে কোনো গতিকে ষড়দর্শনের সন্ধান পেতেন!

এ তো কিছু অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক একদিকে নব্যন্যায় চর্চা করে, অন্য দিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের পথপ্রদর্শক। কবি ইক্‌বালের ঐতিহ্যভূমি আভেরস-আভেচেন্নার উপর— তাঁর সৌধনির্মাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কাণ্ট-হেগেলের।

আমরা এতক্ষণ যে অবস্থার বর্ণনা করলেম তার থেকে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত নয় যে, ভারতবর্ষে তা হলে হিন্দু মুসলমানের মিলন হয় নি। যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেন নি তিনি তাই নিশ্চিন্ত মনে আপন শাস্ত্র চর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাজিলরা ওয়াকফ্-সম্পত্তি পেয়ে গেলেন তাই তাঁরাও পরমানন্দে তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান-হদীসের চর্চা করে যেতে লাগলেন। একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ওয়াকফ্-সম্পত্তি নেই। চাষা তিলী জোলা কাঁসারী মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈদ্য কারকুন এবং অন্যান্য শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়। সে স্থলে হিন্দু মুসলমানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মুসলমানকেও হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হয়। তদুপরি উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা সংগীত স্থাপত্য বাদশা ও তাঁর অর্থশালী আমীর-ওমরাহের সাহায্য বিনা হয় না। বাদশারও দরকার হিন্দু রাজকর্মচারীর। কোনো দেশ জয় করা এক কর্ম, সে দেশ শাসন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া। বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিগ্বিজয় করার সময় রাজকর্মচারী সঙ্গে আনেন নি। আর আনবেনই বা কি? তারা এ-দেশের ভাষা জানে না, রাজস্বব্যবস্থা বোঝে না, কোন্ দণ্ডনীতি কঠোর আর কোন্‌টাই বা অতি সদয় বলে দেশের লোকের মনে হবে— এ সম্বন্ধে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বখ্‌শী (চীফ পে-মাস্টার, অ্যাকাউণ্টেন্ট্-কম্-অডিটার জেনরেল), কানুনগো (লিগেল রিমেম্ব্রেন্সার), সরকার (চীফ সেক্রেটারি), মুন্‌শী (হুজুরের ফরমান লিখনেওলা, নূতন আইন

নির্মাণের খসড়া প্রস্তুতকারী), ওয়াকে'-নওয়ীস্ (যার থেকে Waqnis), পর্চা-নওয়ীস (রাজকর্মচারীর আচরণ তথা দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করনেওলা) এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কারা ?

আমরা জানি, কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে এ সব কাজ করে আসছেন। এঁরাই এগিয়ে এলেন। মুসলমানপ্রাধান্য প্রায় দু শ বৎসর হল লোপ পেয়েছে, কিন্তু আজও এসব পদবী— প্রধানতঃ কায়স্থদের ভিতর— সম্পূর্ণ লোপ পায় নি।

এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য বহু জিনিস যে হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন।

শুধু ভাস্কর্য ও নাট্যকলা বাদশা-আমীর-ওমরার কোনো সাহায্য পায়নি। তার কারণ, ইসলামে মূর্তিনির্মাণ নিষিদ্ধ এবং নাট্যকলা ভারতের বাইরের মুসলিম জগতে সম্পূর্ণ অজানা।

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 'এসো, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পারে সেটা কারো মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মি ল ন হবে, হৃদ্যতা হবে।

এ পন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদূ নানক ইত্যাদি। পরম শ্লাঘার বিষয়, শান্তিনিকেতনেই এঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এত দিন ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান গুণী-জ্ঞানীরা যেসব মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেই সে-সময়ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁদের নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করেন। তাঁর 'দাদূ' 'কবীরে'র পরিচয় এ স্থলে নূতন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

সে পুণ্যকর্ম এখনো বিশ্বভারতীতে পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধবয়সের সহকর্মী বিশ্বভারতীর প্রধ্যাপক শ্রীযুত রামপূজন তিওয়ারীর 'সুফীমত-সাধনা ঔর সাহিত্য' সুচিন্তিত স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক হিন্দী সাহিত্য তথা মধ্যযুগীয় চর্চার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরণের গ্রন্থ সর্ব ভাষায়ই বিরল।

কিন্তু চিন্তাজগতে— দর্শন-ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞানবিজ্ঞানে— হিন্দু-মুসলমানের মিলনাভাব, অথচ অনুভূতির ক্ষেত্রে— চারুকলা সঙ্গীত লোকসাহিত্যে গণধর্মে— আশাতীত মিলন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা করতে হলে উভয় জনসমাজের মূলধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার গোড়া থেকে অধ্যয়ন করতে হয়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই নেই। যা-কিছু আছে তা সরল ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং স্বধর্মবিশ্বাসীর হৃদয়-মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য— বিধর্মীর সম্মুখে আপন ধর্ম যুক্তিবিচারের উপর নির্মাণ করে তাকে আকর্ষণ করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ নীতিও যে বিধর্মীর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হতে পারে সে দুশ্চিন্তাও এ সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করে নি। উপরন্তু

ইংরেজ-আগমনের পর এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক বিকট বিকৃত রূপ। সরল হিন্দু জানত না, খ্রীষ্টান এবং মুসলিম স্বার্থে সংঘাত লেগে যায় মহাপুরুষের মৃত্যুর অল্পদিন পরে, শত শত বৎসর ক্রুসেডের নামে একে অন্যের মরণালিঙ্গনে তারা সম্পিষ্ট ; ফলে খ্রীষ্টান কর্তৃক ইসলাম ও হজরৎ মুহম্মদের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক্য এ দেশে এসেছে 'নিরপেক্ষ গবেষণার' ছদ্মবেশ ধরে। সাধারণ সরল হিন্দু এ ছদ্মবেশ বুঝতে পারে নি। (এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুসলমান কিন্তু খ্রীষ্টানকে প্রাণভরে 'জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারেনি, কারণ কুরান-শরীফ যীশুখ্রীষ্টকে অন্যান্য মহাপুরুষদের একজন বলে যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি মুহম্মদের পূর্বে সর্বপ্রধান পয়গম্বর বলে তাঁকে বিশেষ করে 'রুহুল্লা' 'আল্লার আত্মা' 'পরমাত্মার খণ্ডাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান যুগ যুগ ধরে হজরৎ মুহম্মদকে 'ফল্‌স্‌ প্রফেট' 'শার্লট্যান' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও 'ঐতিহাসিক' ওয়েল্‌স্‌ তাঁর 'বিশ্ব-ইতিহাসে' মুহম্মদ যে ঐশী অনুপ্রেরণার সময় স্বেদসিক্ত বেপথুবান হতেন তাকে মৃগীরুগীর লক্ষণ বলে মহাপুরুষকে উভয়ার্থে লাঞ্ছিত করেছেন)।

রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সর্বদেশেই বিরল। এ দেশে তো অবশ্যই।

ইতিমধ্যে আর-একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব্‌ হয়েছে।

এতদিন যে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মুসলমানের ধর্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন নি তাতে হয়তো তাঁদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি, কিন্তু স্বরাজলাভের পর তাঁদের সে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্থান ইরান ইরাক সিরিয়া সউদী-আরব ইয়েমেন মিশর তুনিস আলজীরিয়া মরক্কো তথা মুসলমানপ্রধান ইন্দোনেশিয়া ও নবজাগ্রত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা স্থাপনা করতে হবে। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানও এ ফিরিস্তিতে অন্তর্ভুক্ত। এদের ধর্ম, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বাতাবরণ-পার্থক্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্তন—এসব এখন অল্পবিস্তর অধ্যয়ন না করে গত্যন্তর নেই। সত্য, আমাদের ইস্কুল-কলেজে এখনো আরবী-ফার্সীর চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পায় নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন হবে না। হিন্দুদেরও আরবী-ফার্সী শিখতে হবে। এবং এই সাত শ বৎসরের প্রাচীন আরবী-ফার্সীর শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যতই প্রয়োজনীয় হোক, এস্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর।

আমরা যে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্য আজ আর প্রাচীন মানচিত্র কাজে লাগবে না। ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথবা সন্দেহে সন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করলে আজ আর চলে না। ধর্মকেও আজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করতে হয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে থাকবে সহানুভূতিশীল হৃদয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বিনয় ঘোষ

গত শতাব্দীর তিরিশে বাংলাদেশের সমাজের উপর দিয়ে ছোটখাটো একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের বিস্তার ব্যাপক নয়, কিন্তু তার দাপট প্রবল। কলকাতা শহর ও তার উপকণ্ঠ ছিল প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র বঙ্গসমাজ অবশ্যই তাতে বিক্ষুব্ধ বা বিপর্যস্ত হয়নি। তা না হলেও বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে এই ঝড়ের ভয়ঙ্কর গুরুত্ব ছিল। নব্যশিক্ষিত তরুণের দল তখন বাংলার আকাশে কালবৈশাখীর মেঘের মতো ভেসে উঠে অকস্মাৎ এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ, পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান, এমন কি ধর্ম ও ধ্যানধারণা পর্যন্ত এদেশের তরুণদের চিত্তকে স্বদেশের মাটি থেকে উন্মূলিত করেছিল। সাত-সমুদ্রপারের ইয়োরোপীয় জীবনদর্শনগুলি বন্যাস্রোতে ভেসে এসে এদেশের সমাজের বহুকালোত্তীর্ণ আচারপ্রথার বদ্ধভাবগুলিকে রাতারাতি মুক্ত স্রোতস্বতীতে পরিণত করতে পারে নি। তরুণেরা ভেবেছিলেন তা পারবে— পাশ্চাত্ত্য আদর্শ নবযুগের ভগীরথ হয়ে এদেশে এক অভাবনীয় জীবনগঙ্গার অবতরণে সহায় হবে। কিন্তু এদেশের আবহমানা গঙ্গা তাতে বাদ সাধল, নূতন কোন বিদেশিনী গঙ্গার পক্ষে তার পাশ দিয়ে প্রবাহপথ তৈরি করা সম্ভব হল না।

অথচ ইয়ং বেঙ্গল বা 'ডিরোজীয়ান' নামে পরিচিত বাংলার তরুণেরা একদা এই অসম্ভব ও অস্বাভাবিককে বাস্তবে রূপায়িত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, যদি সাধারণ স্বপ্নের মতো নিদ্রান্তে সচেতন মনের পর্দার অন্তরালে তা অন্তর্ধান করে যেত। কিন্তু স্বপ্ন তখনই ভয়াবহ দিবাস্বপ্ন হয়ে ওঠে যখন স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তি তাকে করতলগত বাস্তব সত্য মনে করে তার পশ্চাতে ধাবমান হয়। ডিরোজীয়ানরা অনেকটা এই ধরনের তাজ্জব কাণ্ডই করেছিলেন, ভেবেছিলেন যে তাঁদের স্বপ্নাদ্য কামনা বাইরের সমাজে সত্যের শতদলের মতো ফুটে উঠবে। এই ভাবনা যখন সক্রিয় মূর্তি ধারণ করে সমাজবক্ষে সরোষে ও সদম্ভে পদচারণ করতে চাইল, তখনই সমাজের ভিতরে সংঘাত ও বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। ডিরোজিওপ্রবর্তিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র (১৮২৮-২৯) বিচার-বিতর্ক থেকে এই বিরোধের বিদ্যুতাভাস পাওয়া গিয়েছিল, তরুণ সিংহশাবকদের সমাজসংস্কারের আস্ফালনে প্রবীণ রক্ষণশীলেরা তো বটেই, ধীরবুদ্ধি দূরদর্শীরা পর্যন্ত রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। অতিবাম (ultra-left) তরুণদের সঙ্গে অতিদক্ষিণ (ultra-right) প্রবীণদের আদর্শসংঘাত ও মতবিরোধ অপ্রত্যাশিত নয়, দেশে দেশে কালে কালে সমাজগতির স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটে থাকে। কাজেই বিগত শতকের তিরিশে গোঁড়া ধর্মসভাপন্থীদের সঙ্গে প্রগতিবাদী ডিরোজীয়ানদের ভাবসংঘাতের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। নূতন জীবনদর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, অথবা বিদেশ থেকে তার আমদানি, চলমান ইতিহাসের বিচারে স্বাভাবিক ঘটনা। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্বের উপরেই, মানবেতিহাসের কোন কালে— এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও— উদ্‌ভাবনকেন্দ্রের অথবা উদ্‌ভাবকের মৌরসীস্বত্ব স্বীকৃত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তা যদি হত তাহলে সারা পৃথিবীতে আজও বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকত এবং তার বিস্তীর্ণ বক্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলাসমৃদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রগুলি বিরাজ

করত। সুতরাং বিরোধের বীজ কেবল যে বিদেশ থেকে আমদানি আদর্শের সঙ্গে এদেশীয় আদর্শের বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল তা নয়, বরং তার চেয়ে আরও অনেক বেশী পরিমাণে ছিল নবীনাদর্শের প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যে এবং স্বদেশীয় ঐতিহ্য-আদর্শের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও ঔদাস্যের মধ্যে। দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর এই স্বদেশোৎখাত চিত্ত ও চিন্তাকে স্বদেশাভিমুখী করার সামাজিক-ঐতিহাসিক আবশ্যকতা উনবিংশ শতকের বিশ-তিরিশ থেকে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক আবশ্যকতার দাবী পূরণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)।

তত্ত্ববোধিনী সভার পশ্চাদ্ভূমি

দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে তখন সভাসমিতি স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনার প্রবল আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। যতদূর জানা যায়, রামমোহন রায়ের উদ্‌যোগে এই ধরনের বিদ্বৎসভা আমাদের দেশে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হবার আগে আর কোন সভা এদেশে স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায় নি। ১৭৮৪ সালে সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর উদ্‌যোগে বাংলাদেশে প্রাচীনতম বিদ্বৎসভা 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় ৪৫ বছর ১৮২৯ সাল পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি "represented the elite of the European community in Calcutta at that time."[১] কাজেই এদেশীয় লোকের সামাজিক সভা বা বিদ্বৎসভার মধ্যে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'কেই বয়োজ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে হয়। আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত, জাতিভেদ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বাল্যবৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে সভ্যবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হত এবং আলোচনাকালে প্রত্যেকের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকত। সভার অধিবেশন হত পালাক্রমে সভ্যদের গৃহে।

আত্মীয় সভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের প্রবর্তনায় এই সভা স্থাপিত হয়নি। নব্যশিক্ষার আদিকেন্দ্র 'হিন্দুকলেজ' প্রতিষ্ঠার দু'বছর আগেই 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা রামমোহন কতকটা পাশ্চাত্য সভাসমিতির আদর্শেই—এবং হয়ত কতকটা ইয়োরোপীয়-নিয়ন্ত্রিত এদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে—আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু নব্য ইংরেজীশিক্ষিতদের আবির্ভাবের আগেই আত্মীয় সভা এদেশের আধুনিক গণতান্ত্রিক সভা-সমিতির পথিকৃতের কাজ করেছিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এই ধরনের সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা সঞ্চারিত হতে থাকে এবং কেবল তরুণেরা নয়, দেশের প্রবীণেরাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। মূল প্রেরণা অবশ্য মধ্যযুগীয় অচলায়তন-সমাজের হঠাৎ-মুক্ত বাতায়নপথের আলোক-বিচ্ছুরণ থেকে সঞ্চারিত হয়। সমাজে নূতন ভাবধারা, নূতন আচরণভঙ্গি প্রথম উচ্ছ্বাসে অতিরিক্ত মাত্রায় সংক্রামক হয়ে উঠতে চায়। প্রবীণদের উত্তরমেরু থেকে নবীনদের দক্ষিণমেরু পর্যন্ত ভাবসংক্রমণের অবাধগতি দেখা দেয়। আত্মীয় সভার পরবর্তী প্রবীণ নবীনদের 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৮), শিক্ষিত নবীনদের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮ ২৯), গোঁড়া হিন্দুদের

---

১ Centenary Review if Asiatic Society of Bengal, 1784-1883, Part I: "History of the Society" by Rajendralal Mitra.

১ সংখ্যা

১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক। অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীর গত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্য ক্রমে অথবা অন্যকোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থের অবিকল প্রতিলিপি অথবা তদভিপ্রেত সার সংগ্রহ কিম্বা বাক্যান্তর এই পত্রিকাতে সময়ে সময়ে প্রকাশ হইবেক।

স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্ব সাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

এই অমূল্য পত্রিকা, তাহার চিরজীবন এক বৎসের কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য

'ধর্মসভা' (১৮৩০), শিক্ষিতদের 'সর্বতত্ত্বদীপিক সভা' (১৮৩২), 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮) প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এদেশে উনবিংশ শতকে সভা-সমিতি স্থাপনের অর্থাৎ Freedom of Association-এর যে উৎসাহসঞ্চার হয়েছিল, পাশ্চাত্ত্য ইয়োরোপীয় সমাজেও এক শতাব্দী আগে অষ্টাদশ শতকে ঠিক অনুরূপ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সামাজিক ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন :

Closely connected with the growth of education and enlightenment . . . is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading mercantile towns . . . societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination.[২]

. . . the world had not known until the eighteenth century any society organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers ; but there had never been . . . anything like societies for the avowed purpose of *collective thinking and talking.*[৩] (*emphasis* লেখকের)

'তত্ত্ববোধিনী সভা' রামমোহনের আত্মীয় সভার আদর্শের উত্তরাধিকারীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ধর্মসংস্কার ছিল সভার প্রধান লক্ষ্য এবং মহত্তম কর্ম, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার ছিল তারই আনুষঙ্গিক কর্তব্য। ধর্মসংস্কার যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল তার কারণ বাংলার হিন্দুসমাজের ইতিহাসে তৎকালে যে গভীর ধর্মসংকট দেখা দিয়েছিল তা পূর্বে বা পরে বোধ হয় আর কখনও দেখা দেয়নি। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সমকালীন স্মার্তপণ্ডিতেরা যে ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, উনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের হিন্দুধর্মের সংকট কতকটা তার সঙ্গে তুলনীয়। ধর্মের আভ্যন্তরিক অবক্ষয় ও অপচয়ের সঙ্গে বহিরাগত ইসলামের হিন্দুবিদ্বেষ সংযুক্ত হয়ে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে হিন্দুধর্মকে এক গভীর সংকটের সম্মুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং তারই প্রতিরোধকল্পে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত নব্য-বৈষ্ণবধর্মের এবং রঘুনন্দনাদি স্মার্তপণ্ডিতদের নব্যস্মৃতির অভ্যুদয় হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহন রায় অনুরূপ ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে হিন্দুধর্মের ভিতরের অনাচার ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলা এবং অন্যদিকে বহিরাগত খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকদের হিন্দুধর্মের কুৎসা রটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ও সংস্কারসাধনে তিনি উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার যুগে এই দুই অপবাদের উপদ্রব তো ছিলই, তার সঙ্গে আরও একটি নূতন উপসর্গ সমাজে দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত হিন্দু তরুণসম্প্রদায় বিজাতীয় আদর্শমোহে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় স্বধর্মবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী গুরুদের এদেশী শিষ্যরা এবিষয়ে গুরুমারা বিদ্যাও আয়ত্ত করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার যুগে হিন্দুধর্মের সংকট এইভাবে ত্রিমুখী হয়ে উঠেছিল। বাইরের বিদেশী ও বিধর্মীদের আক্রমণ, ভিতরের গোঁড়ামি কদাচার ও কুসংস্কারের অধোমুখী আকর্ষণ এবং তৎসহ স্বদেশীয় নবীন শিক্ষিতদের বিস্ময়কর স্বধর্মবিদ্বেষ-জনিত সামাজিক

---

২ A. S. Turberville ed : Johnson's England, Oxford 1933, Vol. I, pp. 210-11.

৩ Encyclopaedia of Social Sciences, 1951, Vol. 6 : "Free-thinker" by Robert Eisler.

বিশৃঙ্খলা— হিন্দুধর্ম-বিরোধী এই ত্রিমুখী অভিযানের সম্মুখীন হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। সুতরাং ধর্মসংস্কার তার প্রধানতম কর্তব্য হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :[৪]

'প্রথমে ইংরেজি-শিক্ষার মত্ততায় বাঙালী ছাত্রদের মনে স্বদেশীবিদ্বেষের উৎপত্তি হয়েছিল। তখন শিক্ষা-প্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণই উন্নত culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

'প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খ্রীষ্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

'সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলাভাষায় প্রবর্তন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম হইতে স্বধর্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।'

'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপনের কাহিনী দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'তে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল, এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। প্রথমে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী চুণকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে দুর্গা পূজার কল্প আরম্ভ হইল ; আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শূন্য-হৃদয় হইয়া থাকিব ? আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম।···আমি প্রস্তাব করিলাম যে এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী' হউক, এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য্য-পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১ শে আশ্বিন[৫] রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই 'তত্ত্ববোধিনী' সভা সংস্থাপিত হইল।"

'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ' সভার প্রধান উদ্দেশ্য বলে ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য গভীর এবং সেই তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারলে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' অথবা তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এমন কথা হতে পারে যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারোদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা বা সাময়িকপত্রের পক্ষে বৃহত্তর লোকসমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব!

---

৪ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, ২৮১-৮৪ পৃষ্ঠা

৫ ৬ অক্টোবর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ
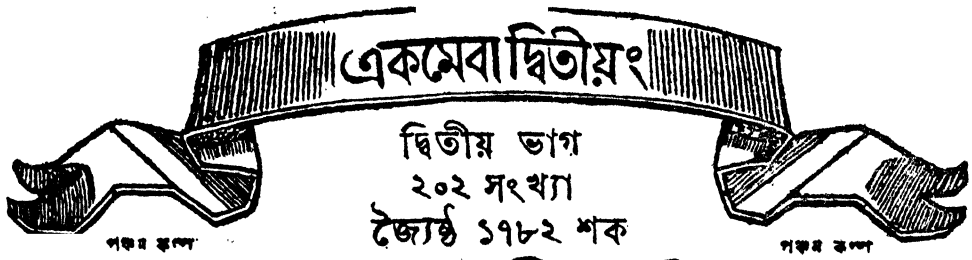
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১৭৮১ শকের শেষ দিনের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০চৈত্র বুধবার।

অদ্যকার দিন বর্ষের শেষ দিন। একটী বৎসর আমারদের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে। অদ্য আমরা সেই সর্ব্ব কল্যাণ দাতা—সেই সর্ব্ব সম্পদের সম্পদ দেবদেবের উপাসনা নিমিত্তে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, ইহা আমাদের কেমন সৌভাগ্য। অদ্য কি প্রকার পুষ্প দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব? অদ্যকার পুষ্প কৃতজ্ঞতা। আমরা যাঁহার ক্রোড়ে সম্বৎসর পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি—যাঁহার করুণা দিনে দিনে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সকলকে সিক্ত করিয়াছে, সকলে মিলিয়া তাঁহার পদে প্রণিপাত কর। অদ্য তাঁহার আরাধনাতে যেন মনের কোন সংকোচ না থাকে—খর্ব্বতা না থাকে; সকল ম্লানতা ও বিষণ্ণতা দূর করিয়া মনের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। গত বৎসরের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমাদের জীবনের সমস্ত পথে কেবল তাঁহারই করুণার প্রবাহ প্রবাহিত দেখি। আমরা তাঁহার প্রসাদে কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, কত ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি, কত সময় আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি নানা বিপদ ও ক্লেশের মধ্যে আমাদের বর্ম্ম ও দুর্গের ন্যায় হইয়াছেন। যে সকল সঙ্কট স্থানে পতিত হইয়া কখনই আশা ছিল না যে তাহা হইতে আর উত্তীর্ণ হইতে পারিব, সেই সকল সঙ্কটের মধ্য হইতে তিনি আমারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। কত সময় আশাশূন্য হইয়া চিন্তা ও ব্যাকুলতার তরঙ্গে অস্থির হইয়াছি, তখন তিনি সান্ত্বনা-বারি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার আমারদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। এমন সকল বিপদের সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বল অবসন্ন হইল, বুদ্ধি পরাভূত হইল, তখন কাহার প্রসাদে আমরা বল বীর্য্য লাভ করিয়াছি? কেবল সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই প্রসাদে। তিনি আমাদের সকল বিপদের প্রশমন, সকল সম্পদের মূল; চতুর্দ্দিক্ হইতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব উত্থিত হইতেছে—এই পবিত্র উপহার দিয়া তাঁহার পূজা কর।

এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিয়াছি, তখনও তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্নেহময় চক্ষু সকল সম-

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজে ধর্মসংকটই তখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে শিক্ষিত তরুণদের অজ্ঞতাপ্রসূত অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সেই অবজ্ঞার জন্য তাঁরা নাস্তিক ও খ্রীষ্টধর্মানুরাগী হয়ে উঠছিলেন। কাজেই প্রাচীন ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সার্থকতা ছিল তখন দু'টি— প্রথমত হিন্দুধর্মের উৎস সন্ধান করলে একেশ্বরবাদের সমর্থন পাওয়া যায়, একথা তখন উচ্চকণ্ঠে প্রচার করার প্রয়োজন ছিল। ইসলামধর্মের প্রথম আবির্ভাবকালে, তুর্কীদের সামরিক অভিযানের অনেক আগে, দক্ষিণভারত থেকে উদ্ভূত শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ' একদা একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রতিস্পর্ধী হয়েছিল। উনবিংশ শতকে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবে রামমোহনপ্রবর্তিত 'ব্রাহ্মধর্ম' এই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রামমোহনের বিদেশযাত্রা ও ব্রিস্টলে মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। খানিকটা সেই কারণেও ধর্মের ক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী মনোভাব প্রকট হয় এবং সুযোগ বুঝে খ্রীষ্টান মিশনারীরাও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মত্ত হয়ে ওঠেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠাকালে দেবেন্দ্রনাথকে তাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য বেশ বড় করে ঘোষণা করতে হয়। এই উদ্দেশ্য ঘোষণার দ্বিতীয় সার্থকতা হল, স্বদেশের বিভ্রান্ত তরুণচিত্তকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁদের সামনে ভারতের প্রাচীন হিন্দুধর্মের গঙ্গোত্রীর অপূর্ব রূপৈশ্বর্য উদ্ঘাটিত করে দেওয়া।

প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে ১০ জন মাত্র সভ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিন বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা হয় ১৩৮ জন এবং আরও কয়েক বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা দ্রুতহারে ৫০০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানকালেও এমন বিদ্বৎসভা আছে কি না সন্দেহ যার সভ্যসংখ্যা এত বেশী। উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে তত্ত্ববোধিনী সভা যে বাংলার বিদ্বৎসভার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার জন্য যে-সভা প্রতিষ্ঠিত, তার এত অদম্য আকর্ষণশক্তি কোথা থেকে এল, এবং তার যোগানই বা দিল কে, তা ভাববার বিষয়।

এ প্রশ্নের উত্তর হল— সমাজ। সমাজ তার প্রবাহপথে নিজেই সমস্যাসঙ্কুল আবর্ত রচনা করে, ভাবাদর্শের বন্যা সৃষ্টি করে, ভাবসংঘাতের তরঙ্গে আলোড়িত হয়। আলোড়নকালে সমাজবক্ষে একটা বিরাট শূন্যতা রচিত হতে থাকে, ভিন্নমুখী শক্তির টানাটানিতে মধ্যখানে একটা গহ্বর মুখব্যাদান করে ওঠে। তুফান স্তব্ধ হতে থাকলে আপনা হতেই সেই গহ্বরের ফাঁক ভরাট হতে থাকে। আঠারশ তিরিশের বিপুল বিক্ষোভ যখন প্রশমিত হয়ে এল, তখন দেখা গেল বাংলার নবজাত বুদ্ধিজীবীরা অনেকটা বয়ঃসন্ধির চিত্তচাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম কাটিয়ে উঠেছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও ততদিনে বেড়েছে। স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা, স্বধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য, প্রাচীন ও প্রবীণদের প্রতি অশ্রদ্ধা— নব্যশিক্ষিতদের এই সব মারাত্মক মানসিক উপসর্গ বিকারগ্রস্ত রুগীর ক্ষণস্থায়ী প্রলাপের মতো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। এই সময় জোড়াসাঁকোর এক নিভৃত কুঠরীতে অথবা সুকিয়া স্ট্রিটের কোন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য অধিবেশন হলেও, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষে ভোরের সূর্যের মতো তার কিরণ সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র আলোকিত করে তুলেছিল। এই আলোক যে সমাজের সর্বজনস্তরে অথবা সর্বকানাচে বিকীর্ণ হয়েছিল তা বলা যায় না। তা হওয়া তখন সম্ভবও ছিল না, এখনও সম্ভব নয়। প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের স্তরেই এই আলোক প্রসারিত হয়েছিল। নোঙরহীন মন ও

দিক্‌ভ্রান্ত চিত্ত যেন একটা আলোকোজ্জ্বল দ্বীপের সন্ধান পেয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে। তাই এই সভার প্রতি কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতো স্বল্পশিক্ষিত স্বভাবকবি থেকে আরম্ভ করে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো নিখাদ বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো নির্ভীক সমাজসংস্কারক, রামগোপাল ঘোষের মতো বিচক্ষণ ডিরোজীয়ান, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বধর্মনিষ্ঠ সদাচারী ঐতিহ্যবাদী, সকলেই একে একে তত্ত্ববোধিনী সভার বন্দরে তাঁদের মানসতরীটি ভিড়িয়েছিলেন। কেন ভিড়িয়েছিলেন? দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর সুস্থির সমন্বয়ের পথ খুঁজতে। কারও মতামত পোষণে সেখানে কোন মানা ছিল না, বুদ্ধিকে বন্ধক দিয়ে আসারও দরকার হত না সভাতে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে ছিল সভার ভিতরকার স্বদেশী পরিবেশ এবং দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা। একটা নূতন অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছিলেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এই সভার বৈঠকে, যা পূর্বে কখনও তাঁরা পাননি। কেবল বুদ্ধির টানে নয়, প্রাণের টানেও তাঁরা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে যাবার (১৮৫৯) ঠিক আগেই যদি তার সভ্যসংখ্যা আটশতাধিক হয়ে থাকে, তা হলেও মনে হয় যে বাংলাদেশে তার আগে বা পরে শিক্ষিতদের এত বড় প্রতিনিধিস্থানীয় সভা আর কখনও স্থাপিত হয়েছে কি না সন্দেহ। তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছর তিনেকের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেওয়া হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা, হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হিসেব করেও, হাজার উত্তীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

সভার উদ্‌যোগীরা ক্রমে একটি মুখপত্রের অভাব বোধ করলেন, বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথ। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয় অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি" (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। এর পর তিনি বলেছেন: "তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে এই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের কারণ ও উদ্দেশ্য দুইই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৭৬৫ শকের ১ ভাদ্র, ইংরেজী ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকা। ধর্মচর্চা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী শাস্ত্রানুবাদ সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 'লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

কিন্তু ধর্মচর্চা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারই যখন পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে ও ধর্মসংস্কারকর্মে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান কি তা-ই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মধর্মের নবজন্ম, ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন

"একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যটি শিরোভূষণ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই বাক্যটি ছাড়া আর কোন বচন প্রথম দিকে পত্রিকাকণ্ঠে শোভা পেত না। পরে দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্মের মূলসত্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তখন পত্রিকাকণ্ঠেও বিভিন্ন মন্ত্র ও বাণী মুদ্রিত হতে থাকে। এই বিষয়টি সাধারণত কারও দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়, কিন্তু এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনার মধ্যে তো বটেই, তার শিরোদেশের উদ্ধৃতিতেও ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যয়-সন্ধানী সংগ্রামের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশে, এবং বাংলাভাষায়, আর দ্বিতীয় কোন পত্রিকা নেই যা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রসঙ্গে এই দাবী করতে পারে।

১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ সালের) ১ ভাদ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তার চার মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ, ইংরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার)। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের এই আর এক দিন। ১৭৬১ শক হইতে (১৮৩৯ সাল) ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?" অনুষ্ঠানের সময় আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ সবিনয়ে নিবেদন করেন : "যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।" বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে মোট ২১ জন এইদিনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে দেবেন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট মন্তব্য করেছেনে : "ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল" (নবম পরিচ্ছেদ)। একথার অর্থ ও তাৎপর্য কি? তাৎপর্য গভীর।

পূর্বে 'ব্রাহ্মসমাজ' ছিল, এখন 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' হল। "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।" 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটি যে রামমোহন রায়ের কাল থেকেই প্রচলিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ২০ আগস্ট ১৮২৮ রামমোহন রায় যখন চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী ভাড়া করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকেই যে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটি গৃহীত হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণও পাওয়া গেছে। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের "পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান" ৬ ভাদ্র ১৭৫০ শকাব্দে, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রকাশিত হয় এবং তার আখ্যাপত্রে "ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা" পরিষ্কার মুদ্রিত হয়েছে দেখা যায়।[৬] কাজেই 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম রামমোহন-

৬ S. D. Collet: The Life and Letters of Raja Rammohun Roy: edited by Dilip

পরিকল্পিত নয়, একথা বলার কোন যুক্তি নেই। তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে 'ব্রাহ্ম' অপেক্ষা 'ব্রহ্ম' শব্দটি লোকসমাজে অনেক বেশী পরিচিত ছিল, তাই 'ব্রহ্মসভা' 'ব্রহ্মসমাজ' ইত্যাদি কথা তৎকালের সাময়িকপত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়, এমন কি ১৮২৯ সালের ৬ জুন তারিখে ব্রাহ্মসমাজের জমি ক্রয়ের কবালাপত্রেও দেখা যায় "ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে" কথাগুলি লেখা আছে। কিন্তু এই লোকপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার থেকে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামের প্রতিষ্ঠাকালীন উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা অযৌক্তিক। দেবেন্দ্রনাথ সেইজন্যই বলেছেন, "পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল", কিন্তু তার পরেই বলেছেন, "এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।" এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজ থাকলেও 'ব্রাহ্ম' শব্দটি অথবা 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি রামমোহন রায়ের সময়ে প্রচলিত হয় নি। রামমোহনপ্রবর্তিত ধর্ম মূলত ব্রাহ্মধর্ম হলেও সেই সময় "বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম" নামে তা অভিহিত হত। রামমোহন রায় নিজে অবশ্য তাঁর রচনাতে একাধিকবার 'ব্রাহ্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং যে প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় যে পৌত্তলিকতা বর্জন করে যাঁরা এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হবেন, ভবিষ্যতে তাঁরা 'ব্রাহ্ম' নামে অভিহিত হবেন, এরকম ধারণা তাঁর চিন্তার বহির্ভূত ছিল না। তাঁর সেই চিন্তাধারা ও কল্পনা দেবেন্দ্রনাথের কালে বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। দেবেন্দ্রনাথের সময়েও কিছুকাল ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে "বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম" এই দীর্ঘ নামটি চলে আসছিল। ১৮৪৭ সালের ২৮ মে (১৭৬৯ শক ১৫ জ্যৈষ্ঠ) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে এই নামের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম অবলম্বন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।[৭]

ব্রাহ্মধর্মে 'দীক্ষা' গ্রহণ করাকেই দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার" বলেছেন। এর আগে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে যাঁরা একত্রে এসে বসতেন, তাঁদেরই ব্রাহ্মধর্মপন্থী বলে মনে করা হত। কিন্তু এরকম মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে নিছক কৌতূহলবশেও অনেকে উপস্থিত হতেন। তা ছাড়া শুধু সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন উপাসনায় কেউ যোগ দিলেই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য অথবা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত কঠোর কর্তব্য পালনে অবিচলিত সংকল্প প্রকাশ পেত, এমন কথাও বলা যায় না। এই কারণে রামমোহনের সময়ে, এবং পরবর্তীকালে তাঁর অবর্তমানে, ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত অনুবর্তীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মাদর্শের সঙ্গে কর্মজীবনের কোন যোগ থাকত না, এমন কি ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করতে অনেকের বাধত না। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের এই দুর্বলতা দূর করার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে 'আনুষ্ঠানিক দীক্ষা' গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং সেই ধর্মের আদর্শের সঙ্গে ধর্মাবলম্বীর আচার-বিচারের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিধিবিধান পালনেরও নির্দেশ দেন। এই নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনেই ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে একটি 'বিশিষ্ট সমাজ' হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মধর্মীরা একটি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীতে পরিণত হন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর থেকে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্মের এই নবরূপান্তর ঘটে।

Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguly: Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, Third edition 1962: Chapter VI এবং Supplementary Notes দ্রষ্টব্য।

৭ আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২, পরিশিষ্ট ২৩

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
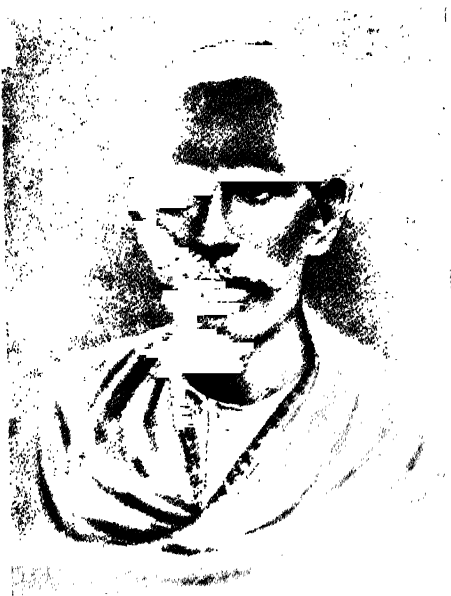
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্ষয়কুমার দত্ত
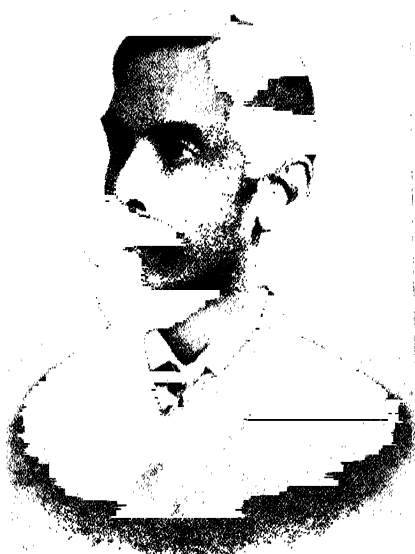
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের এই নবরূপান্তরিত পর্বের একমাত্র ও অন্যতম ধারক-বাহক হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকার জন্ম ও দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও মাত্র চার মাস কয়েক দিনের। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজ ঠিক পুনর্জীবন নয়, এক 'নবজীবন' লাভ করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম থেকেই এই নবজীবনের সূচনা হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই রূপান্তরের প্রতিটি পর্বের পদাঙ্ক অঙ্কিত আছে। এর পর ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এক বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে এবং তার পরে ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বাংলাদেশের সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হতে থাকে। আদর্শের প্রচারের ব্যবস্থা না থাকলে নিশ্চয় তার এরকম প্রসার কখনই সম্ভব হত না। এই প্রচারের ব্রত প্রধানত গ্রহণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকা না থাকলে শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকদের দ্বারা একাজ তখন সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

ব্রাহ্মধর্মের উৎস -সন্ধান

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পর প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মসংক্রান্ত একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাটি হল— বেদবাক্য ও বেদান্ত 'অভ্রান্ত' কি না। রামমোহন রায়ের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই ব্রাহ্মসমাজের ধর্মব্যাখ্যানের কর্তব্য পালন করতেন। রামমোহন নিজেই তাঁকে একাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে স্বভাবতঃই তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন বিদ্যাবাগীশ। তাঁর দৃষ্টি প্রধানতঃ বেদান্তের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকত। রামমোহনের উদারতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে তাঁর 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' যে সার্বভৌমিক রূপ গ্রহণ করেছিল, বিদ্যাবাগীশের আমলে অজ্ঞাতসারে তা প্রায় বেদান্তধর্মের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল। বিদ্যাবাগীশ প্রচার করতে লাগলেন যে বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য ও অভ্রান্ত, এবং বেদান্তঅনুগামী হয়ে পরমাত্মা-জীবাত্মার অভেদচিন্তাই হল মুখ্য উপাসনা। যতদিন বিদ্যাবাগীশ জীবিত ছিলেন (১৮৪৫ সালের ২ মার্চ পর্যন্ত) ততদিন তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে ১৮৩৮ সালে বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করেন। ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' এবং ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' স্থাপিত হয়। পাঠশালায় উপনিষদ পড়ানো হতে থাকে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও উপনিষদের বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রধানত বিদ্যাবাগীশের সাহায্যেই এই দু'টি কাজ করা হত। ধর্মবিষয়ে তাঁর রচনাই পত্রিকায় প্রকাশিত হত বেশী এবং তার মধ্যে বেদের অপৌরুষতা ও অদ্বৈতবাদী মতই ব্যক্ত হত। দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই ধর্মব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসহ মনে না হলেও, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও সভায় এই ধর্মমতই বিনা বিচারে গৃহীত হতে থাকে।

১৮৪৪-৪৫ সাল থেকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যখন বাধ্য হলেন, তখন বেদের অভ্রান্ততার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর খ্রীষ্টধর্মী প্রতিপক্ষরা প্রধানত এই ভিত্তিভূমিকে যত আক্রমণ করতে লাগলেন, তত দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ভিত্তিও টলমল করতে থাকল। বিদ্যাবাগীশপ্রবর্তিত বেদের অভ্রান্ততাকে সম্বল করে দেবেন্দ্রনাথ

তাঁর প্রতিপক্ষদের তর্কে হার মানাতে গিয়ে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লেন, তাঁর দলভুক্ত ঘোর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি তাঁর প্রতিপাদন সমর্থন করতে অস্বীকৃত হলেন। এর পর থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একদিকে যেমন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল, তেমনি বেদান্তের অভ্রান্ততা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখকদের প্রেরিত পত্রে দেবেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদও প্রকাশিত হতে থাকল। তখন পত্রিকার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায়' অক্ষয়কুমারপন্থী সভ্যদের সংখ্যাই অধিক ছিল, কাজেই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বাইরের প্রতিপক্ষদের সামলাতে গিয়ে নিজের ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠল।

রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ সত্যানুরাগী ও যুক্তিবাদী ডিরোজীয়ানরা, যাঁরা স্বভাবতঃই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরাও অনেকে এই সময় বেদান্তধর্মের অভ্রান্ততার ব্যাখ্যায় বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিধর্মী প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য যে-কোন অসার 'যুক্তির' আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ীর একখানি পত্রে ডিরোজীয়ানদের এই পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি এই : [৮]

My dear Rajnarain,

I cannot think much of the vedantic movements here or elsewhere. The followers of vedanta temporize. They do not believe that the religion is from God, but will not say so to their countrymen, who believe otherwise. Now, in my humble opinion, we should never preach doctrines as true, in which we have no faith ourselves. I know that the subversion of idolatry is a consummation devoutly to be wished for, but I do not desire it by employing wrong means. I do not allow the principle that means justify the end. . . . I wish to request the secretary of the *Tuttobodhini* Sabha to discontinue sending me the Society's paper (Patrika), as a person cannot subscribe to it who is not a member of the Society . . .

এই চিঠি থেকে মনে হয় যে কেবল তত্ত্ববোধিনী সভা বা ব্রাহ্মসমাজে নয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জীবনেও এই সময়, সাময়িকভাবে হলেও, এক সংকট দেখা দেয়। এই উভয়সংকট দেবেন্দ্রনাথের ধর্মানুসন্ধিৎসায় ইন্ধন যোগান দিল। আগেই তিনি আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যকে (বেদান্তবাগীশ) বেদাধ্যয়নের জন্য কাশী পাঠিয়েছিলেন, এবারে আরও তিনজনকে ঐ একই উদ্দেশ্যে কাশী পাঠালেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেও কাশী যান, বেদান্ত বিষয়ে চরম অনুসন্ধানের সংকল্প নিয়ে। কাশীতে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার ফলে বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসমুক্ত হন। এই বিশ্বাসমুক্তি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে ১৭৬৯ শকের বৈশাখ (১৮৪৭ সালের এপ্রিল) থেকে উপনিষদের এই বিখ্যাত মন্ত্রের উদ্ধৃতিতে ঘোষিত হতে থাকে :

---

৮ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৮০-৮১ পৃষ্ঠা।

তত্রাপরাঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃসামবেদোথর্ব্ববেদঃশিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে॥

ছাত্ররা সকলে কাশী থেকে ফিরে আসার পর এবিষয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তের অভ্রান্ততায় ও ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্টতায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। "এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্দ্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না। শত সহস্র যুগ যুগান্তরের অর্জ্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্ব্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল; বিনা রক্তপাতে একটি মহান্ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল।...এই স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না।"[৯]

রামমোহন বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় একস্থানে বলেছেন— পরমেশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন, এই দুই হল পরম মুখ্য উপাসনা। এই উক্তি কেন্দ্র করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-ধর্মবীজ প্রত্যক্ষ করেন। এই বীজ হল চারটি:

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করলেন।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং অপ্রতিমমিতি।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ নিত্য নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয় নিরবয়ব নির্বিকার একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কারও সঙ্গে তাঁর উপমা হয় না।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র তাঁর উপাসনাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তস্মিন্ প্রীতি স্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁকে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "১৭৭০ শকে দেবেন্দ্রনাথ এই বীজচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া তাঁহার বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পরে সেই বাক্স হইতে তিনি উক্ত কাগজখানি বাহির করিয়া উক্ত বীজচতুষ্টয় আর একবার আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া যখন তিনি তাহাতে পরিবর্ত্তিত করিবার কোন কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন যে এই বীজগুলি ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মমতের বীজরূপে গৃহীত হইতে পারে, এবং তখন তিনি সেই বীজচতুষ্টয় ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজরূপে প্রদান করিলেন।"[১০]

ব্রাহ্মধর্মের এই নবরূপান্তর পর্বে পর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটি (তত্রাপরাঋগ্বেদো ··) ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাস থেকে ১৭৭৩ শকের কার্তিক মাস পর্যন্ত (৪ বছর ৬ মাস) মুদ্রিত হয়। ১৭৭৩ শকের অগ্রহায়ণ মাস থেকে উপাসনা কাকে বলে তা বোঝাবার জন্য "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনাঞ্চ তদুপাসনমেব" কথা কয়টি উক্ত মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়।

---

৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৯ শক, ৮৮৬ সংখ্যা

১০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৯ শক, ৮৮৬ সংখ্যা

তারপর ১৭৭৭ শক থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শীর্ষে ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় বীজটি ("তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং· ·), উপাসনার বচনটি সহ উদ্ধৃত হতে থাকে। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ মাস থেকে (১৮৫৭ এপ্রিল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কণ্ঠে ব্রাহ্মধর্মের চারটি বীজই পরিপূর্ণরূপে মুদ্রিত হতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের পরিবর্তনের ধারাটি যে এইভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কণ্ঠে উদ্ধৃত বিভিন্ন বাণীর মধ্যে পর্বে পর্বে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সমাজতত্ত্ব

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ধর্মের যে আদর্শ ও প্রত্যয়সমষ্টি কেন্দ্র করে রামমোহনের কালে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল, চতুর্থ দশকে তার যে পরিবর্তন হল নিশ্চয় তা বিনা ঐতিহাসিক কারণে হয় নি। ব্রাহ্মধর্ম ও তার সামাজিক সংস্থা 'ব্রাহ্মসমাজ'— উভয়েই নবযুগের একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি। তা যদি হয় তাহলে "it becomes the task of the sociological history of thought to analyse· · all the factors in the actually existing social situation which may influence thought—" এবং এই "sociologically oriented history of ideas" ছাড়া— অর্থাৎ চিন্তার ও ধ্যান-ধারণার সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস ছাড়া, ইতিহাস আলোচনা অথবা তার ধারা বিশ্লেষণ অনেকটাই ব্যর্থ হয়। যে-কোন একটা যুগকে বুঝতে হলে, অর্থাৎ সেই যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে বাস্তব সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীরা এই সমীক্ষাকেই "situational determination of knowledge" বলেছেন।[১১]

বাংলাদেশে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকে যে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের যে কত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান, ঐতিহাসিকরা আজও তার বিজ্ঞান-সম্মত বিচার করেন নি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিচ্ছিন্ন আকারে কিছু রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা সবই প্রায় বৃত্তাকারে যান্ত্রিক ঘটনাচক্রে চক্রমণ। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কতবার মতদ্বৈধের ফলে সংস্থাগত বিচ্ছেদ ঘটেছে তা অনেকের কণ্ঠস্থ, সনতারিখও নখদর্পণে, কিন্তু ঘটনান্তরালবর্তী কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক শক্তির প্রক্রিয়ায় এই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, তা ঠিক আত্মস্থ হয় নি। ঘটনার খোসাটা আমরা দেখেছি, তার শাঁসটা দেখিনি। যেমন দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র এবং কেশবোত্তর যুগের বিচ্ছেদ বহু আলোচিত, কিন্তু রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যবধান তেমন আলোচিত নয়। তার কারণ ১৮৬৫-৬৬ ও ১৮৭২-৮০ এই দুই পর্বের বাইরের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের নিনাদ কর্ণভেদী, তাই তা আলোচনামুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকর্মে প্রবৃত্ত হন, ঘটনা তখনও নেহাৎ কম ঘটেনি, বরং তাৎপর্যবিচার করলে সেই সব ঘটনার ওজন হয় অনেক বেশী। কিন্তু তা কর্ণভেদী শব্দে সাময়িকপত্রে বিস্ফোরিত হয়নি, হয়ত দেবেন্দ্রনাথের গৃহের নির্জন কক্ষে অথবা তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কর্ণধারদের নিভৃত আলোচনা-বৈঠকে, অথবা সুদূর বারাণসীর চতুষ্পাঠীতে বেদান্তের গভীর অনুশীলনে মৃদু-শব্দে ধ্বনিত হয়েছে, যা কারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করার কথা নয়। অথচ বিগতশতাব্দীর চতুর্থ দশকে

১১ Karl Mannheim: Ideology and Utopia, London 1960, P. 69.

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এই রামমোহনোত্তর নবরূপায়ণ পরবর্তীকালের মতভেদ ও সংস্থাভেদের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক উৎপত্তি পূর্বে হলেও, প্রকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই সময়েই হয়। তত্ত্ববোধিনী যুগের এইটাই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কীর্তি।

রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্মবীজ বপন করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই তার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল, কিন্তু অনাদৃত টবের চারাগাছটিকে স্বদেশের মাটিতে রোপণ করে লালনপালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী-যুগের কর্মীরা। তাঁদেরই যুগে ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার হয়েছিল, বৃহত্তর জনসমাজে প্রচার হয়েছিল এবং ব্রাহ্মসমাজ মহানগরকেন্দ্রিক একটি ক্ষুদ্র উপাসনালয় থেকে জাতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠার পর তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার এবং বিচ্ছেদও স্বাভাবিক। কোন ভাবাদর্শের ও প্রতিষ্ঠানের চলংশক্তি যদি রহিত না হয়, তার দুর্বার অগ্রগামিতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে গণতান্ত্রিক নীতিবলে তার বহুমুখী বিকাশও স্বাভাবিক। ব্রাহ্মসমাজেরও এই বহুমুখী বিকাশ 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' ও 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজের' মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাতে তত্ত্ববোধিনী-যুগের কীর্তিমহিমা একটুও ম্লান হয়নি, বরং যুগের ও মতের ব্যবধানে ক্রমেই তার গৌরবদীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই কারণেই সেই যুগের ঘটনাপ্রবাহের এবং তার অন্তর্লীন চলংশক্তির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার পর (১৮৩০) প্রধানত দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৬০৲ টাকা থেকে ৮০৲ টাকা অর্থসাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম চালানো হত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁর বেদান্তব্যাখ্যায় কোনপ্রকারে সমাজের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। বেণ্টিঙ্ক যখন আইনবলে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেন (১৮২৯) এবং তার প্রতিবাদ-আন্দোলন থেকে গোঁড়া হিন্দুদের 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩০), তখন থেকেই ব্রাহ্মসমাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রাচীনপন্থীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। রামমোহন রায় তখন এদেশেই ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের প্রচণ্ড আক্রোশ যখন সতীদাহ নিবারণের পর সশব্দে ফেটে পড়ে তখন তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, এবং ঝড়ের ঝাপ্‌টাও তাঁকে অনেকটা সহ্য করতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই কথা স্মরণ করে তাঁর 'পঞ্চবিংশতি' পুস্তিকায় বলেছেন, "তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় 'নাচ তামাশা' নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহারদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মসভার দল সতী-দগ্ধ করিবার দল।··সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন।"[১২] ব্রাহ্মসমাজের এই ঘোর সংকটকালে রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করতে বাধ্য হন, তারপর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১২ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা

রামমোহনের বিদায়কাল থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্যন্ত (১৮৩১-১৮৪২) দশ-এগারো বছর ব্রাহ্মসমাজ কোনরকমে টিকে ছিল বলা চলে। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন; "প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্ম-সমাজ দেখি, তখন তাহাতে লোকের সমাগম অতি অল্পই ছিল। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাশ চাদর পাতা থাকিত, তাহাতে পাঁচজন কি ছয়জন উপবেশন করিতেন;· · আর পশ্চিম দিকে চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত।"[১৩] "ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল— স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যতদূর পর্য্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল।"[১৪] এই দুর্গতির কারণ কি ?

দুর্গতির অন্যতম কারণ হল— রামমোহনের সহযোগীদের মধ্যে অধিকাংশেরই ব্যক্তিত্ব ছিল খর্বাকৃতি, যতদিন রামমোহন ছিলেন ততদিন বিরাট মহীরুহের আশ্রয়ে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজে এসে জড়ো হতেন। রামমোহনের অবর্তমানে বিরোধীপক্ষের হুম্‌কিতে ও আক্রমণে তাঁদের অনেকের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ল। কেবল যে গোঁড়া ধর্মসভাপন্থীদের আক্রমণে তাঁরা নুয়ে পড়লেন তা নয়, তার সঙ্গে যখন তরুণ ডিরোজীয়ানরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের দৌর্বল্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন, তখন তাঁরা প্রায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার উপক্রম করলেন। এছাড়া প্রত্যেকেরই বৈষয়িক আসক্তি-জনিত সামাজিক ভয়ও ছিল যথেষ্ট, সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আদর্শের সপক্ষে সংগ্রাম করার মতো চরিত্রবলও সকলের ছিল না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের আচরণের সঙ্গেও তাঁদের প্রচারিত আদর্শের কোন সামজস্য রক্ষিত হত না। এইজন্য ইয়ং বেঙ্গলের কাছে তাঁরা উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং তরুণরা সাধারণত তাঁদের 'half-liberal' বলতেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা নিজেদের স্বার্থে তাঁদের বৈদান্তিক ধর্মাদর্শের দুর্মর সমালোচনা করতেন। ধর্মসভাপন্থী গোঁড়া হিন্দুদের জাতক্রোধ ছিল তাঁদের উপর। উনবিংশ শতকের সমগ্র তৃতীয় দশকের ইতিহাস হল— ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এই ত্রিমুখী আক্রমণ এবং তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের ক্রমিক অধঃপতনের ইতিহাস। তাই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যখন প্রথম যোগাযোগ হয় তখন তিনি দেখেন— "সেই প্রকার নিভৃত-রূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।"[১৫] অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে নীতিবিরুদ্ধ 'অবতারবাদ' ও 'পৌত্তলিকতার' উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

এই ধরনের সব ঘটনার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। তারপর তার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় (১৮৪৩)। উদ্দেশ্য— প্রথমত নব্যশিক্ষিত তরুণদের অন্ধ হিন্দুধর্মবিদ্বেষকে সুপথে চালিত করা; দ্বিতীয়ত বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মবিরোধী নিন্দাবাদের জবাব দেওয়া এবং দেশের তরুণদের মধ্যে ধর্মান্তরের অভিযান প্রতিরোধ করা; তৃতীয়ত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজনেতাদের ব্রাহ্মসমাজবিরোধী বিষোদ্‌গীরণ বন্ধ করা; চতুর্থত বেদান্ত-উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রচার করে অসত্যের অপপ্রচার রহিত করা। একাজ করতে হলে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্‌ দৃঢ় করে গড়তে

---

১৩ পঞ্চবিংশতি, ২০-২১ পৃষ্ঠা

১৪ পঞ্চবিংশতি, ১৯ পৃষ্ঠা

১৫ পঞ্চবিংশতি, ১৬ পৃষ্ঠা

হয়, এবং তা গড়া কিছুতেই সম্ভব নয় ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সঠিকরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি যখন শিক্ষিতজনের আকর্ষণ বাড়তে থাকল তখন তার ভিতর দিয়ে খানিকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁরা কৌতূহলী হলেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা গেল না। "যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে— কাহাকে আমরা আমাদের বলিয়া বলিতে পারি ?"[১৬] সমস্যার সমাধান করা হল ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং সেই দীক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করে। সেই প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ১৮৪৩ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ, আরও বিশজন-সহ, ব্রাহ্মধর্মে একত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এতদিন ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হল। ব্রাহ্মসমাজও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তারপরেও ব্রাহ্মধর্মবীজ রচনা করে এই প্রতিষ্ঠাকে আরও পোক্ত করতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের ৭ পৌষের মিলনোৎসবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হল ব্রাহ্মধর্মের এই নবজন্মোৎসবকে স্মরণ করা। আজ থেকে ১২০ বছর আগে, এদেশের সমাজ-জীবনের এক গভীর সংকটকালে, ব্রাহ্মধর্মের এই নবজন্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের এই পুনর্জন্ম হয়েছিল; সেই সংকটের প্রকৃত রূপ আজ কল্পনাতেও উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে হয় না। সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ সনাতনধর্মী হিন্দুসমাজের আক্রমণ, বিদেশী রাজধর্মী খ্রীষ্টান মিশনারীদের সুপরিকল্পিত হিন্দুসমাজবিরোধী অভিযান এবং তার উপর এদেশের বিভ্রান্ত নব্যশিক্ষিত তরুণদের স্বধর্মবিদ্বেষ— এতগুলি সুসংহত শক্তির বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করার জন্য 'ব্রাহ্মসমাজ'কে সেদিন দৃঢ় আদর্শভিত্তির উপর সুসংগঠিত করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই ভিত্ রচনা করেছিল নূতন প্রতিজ্ঞা ও ধর্মবীজপুষ্ট 'ব্রাহ্মধর্ম'। তারই বাহন হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

ব্রাহ্মধর্ম হল, এবার তার প্রচার প্রয়োজন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেই প্রচারের ভার গ্রহণ করল। শুধু পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারও যথেষ্ট নয়, অন্তত কাজের গুরুত্বের তুলনায়। সুসংগঠিত প্রচার প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ থেকে যে প্রচারকার্য হতে পারে এ ধারণা আগে কারও ছিল না। রামমোহনের ট্রাস্টডীডেও উপাসনার কথা আছে, প্রচারের কথা নেই। কাজেই স্থির হল যে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মিলনের পর, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রচারের ভার গ্রহণ করবে। ১৭৬৩ শকের শেষদিকে দুই সভার মিলন-প্রস্তাব গৃহীত হল এবং ১৭৬৪ শকের বৈশাখ মাসেই (১৮৪২ সাল) উভয়ের মিলন সাধিত হল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সভ্যদের সঙ্গে মতভেদ হতে আরম্ভ হল এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনে অনেক সময় 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায়' সেই মতদ্বৈধের প্রকাশ হতে থাকল। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' উঠিয়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। বাংলার বিদ্বৎসমাজের একটা বড় অংশের দৃষ্টি সভার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত একটানা ত্রিশ বছর নানা ঘটনার সমাবেশে যে সামাজিক সংবর্তের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা অনেকটা কেটে গেছে, ইয়ং বেঙ্গলের তরুণের নস্যাৎ-প্রবণতা (iconoclasm) প্রশমিত হয়েছে, ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষিতশ্রেণীর মন স্বদেশাভিমুখী হয়েছে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের দাপট কিছুটা সংযত হয়েছে, বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন সমাজনেতাদের আবির্ভাবে সমাজে প্রগতিশীল ভাবধারা খরস্রোতা হয়েছে, ব্রাহ্মসমাজের সহযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে এবং তা স্বাবলম্বী ও স্বধর্মনিষ্ঠ জাতীয়

১৬ পঞ্চবিংশতি, ২১ পৃষ্ঠা

প্রতিষ্ঠানে প্রসারিত হয়েছে। অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়েছে মনে করে তার সমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধা নেই।

ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বাংলাদেশের নবযুগের নব্য-অভিজাতশ্রেণীর (new Aristocracy) ধর্মবিশ্বাসের মুখসংস্কাররূপে। এই নব্য-অভিজাতরা ছিলেন, রামমোহনের কালে, মুখ্যত শহরকেন্দ্রিক এবং বাণিজ্যস্বার্থসংশ্লিষ্ট ও ভূসম্পত্তির মালিক সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠী (group), ঠিক সামাজিক শ্রেণীতে (social class) তখনও তাঁরা পরিণত হননি। কিন্তু তাঁদের এই গোষ্ঠীচেতনা, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই, বেশ দানা বেঁধেছিল। জীবনদৃষ্টির দিক থেকে এই দানাবন্ধনে কিছুটা শৈথিল্য ছিল বটে, তবে সমাজদৃষ্টির ক্ষেত্রে তার গাঢ়বন্ধতা উপেক্ষণীয় ছিল না। পুরাতন সামন্তযুগের অভিজাতদের সঙ্গে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য ছিল এইদিক থেকে। জীবনটাকে তাঁরা একটা মধ্যযুগীয় ছকবাঁধা মানবাতীত আধ্যাত্মিক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী কোন ভাগ্যনিয়ন্তাগোষ্ঠীর যে-কোন অমোঘ অনুশাসন তাঁরা পরিত্যাজ্য মনে করেছেন, জড়পিণ্ডবৎ স্থূল 'সমষ্টির' (collective) আচারপ্রথার অর্গল অচ্ছেদ্য মনে হলেও তাকে ছেদন করতে চেয়েছেন, এবং বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির প্রকাশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অতীতের বহুযুগপ্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার যাচাই করতে চেয়েছেন। এই বীক্ষণেচ্ছা ও বিদ্রোহ থেকে নবযুগের 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' উদ্ভূত হয়েছে।

হিন্দুধর্মকে বাহ্যাচারসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমানসের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্লোকে অভিষিক্ত করা এবং তার অন্তঃসলিলা ভাবমাধুর্য ও মহিমা প্রকাশ করাই ছিল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। এই মহিমা কেবল একেশ্বরের উপাসনার ঔপনিষদিক সত্যে প্রকাশ পায়নি, তার বিশ্বজনীন রূপের মধ্যেই হিন্দুধর্মের অন্তর্মাধুর্য ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্মের পরিশোধন যেমন রামমোহনের কাম্য ছিল, তেমনি তাঁর জীবনের ধ্যান ও কল্পনা ছিল হিন্দুধর্মের এই অন্তর্মাধুর্যের উপর সর্বধর্মসমন্বয়ের ও বিশ্বজনীন মানবধর্মের (Universal Religion) ভিত্ রচনা করা। ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রোহ কোলাহলমুখর না হলেও, এইদিক থেকে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। এইজন্য মূলত তার বিদ্রোহ হল বাহ্য আচার, বাহ্য অনুষ্ঠান, বাহ্য ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রানুশাসন, বাহ্য পৌত্তলিকতা ও প্রথাপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ লোকচিত্তকে ধর্মক্ষেত্রে বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী (subjective) করা। ইওরোপের 'প্রোটেস্ট্যান্ট' ধর্মান্দোলনের (Protestantism) সঙ্গে এবিষয়ে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একটা আত্মিক সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। নীবুর (Niebuhr) বলেছেন, "From the point of social history Protestantism may be defined as the religious phase of modern, western civilization."[১৭] সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্টইজম্‌কে পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার ধর্মান্দোলনের 'আধুনিক' পর্ব বলা যায়। ঠিক সেইরকম সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে 'আধুনিক' ভারতীয় সভ্যতার ধর্মান্দোলন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য উভয়ের সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নয়, তা ছিলও না। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন প্রথমদিকে ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যযুগীয় বন্ধনমুক্তির ব্যাপারে মন্থরগতি ছিল, পরে অবশ্য ধনিক বণিকশ্রেণী

---

১৭ Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 12, pp. 71-75: "Protestantism" by H. Richard Niebuhr.

ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রভাব বিস্তৃত হলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দ্রুত সামঞ্জস্য স্থাপন করতে প্রোটেস্ট্যান্টরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মসমাজ, অন্তত অর্থনীতিক্ষেত্রে, কখনও মধ্যযুগীয় দাসত্বকে নীতিগতভাবে মেনে নেয় নি, প্রথম থেকেই এক্ষেত্রে তার আদর্শ ছিল বন্ধনমুক্ত অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ। অর্থনীতিক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মক্ষেত্রেও তেমনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। এই আদর্শের ঘোষণার মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ এদেশে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের অগ্রদূত হয়ে ওঠে। জেকব বুরখার্ট রেনেসাঁস-যুগের আধুনিক মানুষের নূতন ধর্মভাব প্রসঙ্গে বলেছেন, "These modern men· ·were born with the same religious instincts as other Mediaeval Europeans. But their powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective."[১৮] নবযুগের মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ধর্মও একান্ত 'ব্যক্তিগত' উপাসনা ও উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশেও এই একই ঐতিহাসিক লক্ষণ দেখা যায়।

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন, "At the beginning of modern times, the Protestant movement set up in the place of revealed salvation, guaranteed by the objective institution of the Church, the notion of the subjective certainty of salvation...Thus Protestantism rendered subjective a criterion which had hitherto been objective· ·"[১৯] এদেশের ব্রাহ্মসমাজও অনুরূপ ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। লুইস মামফোর্ড বলেছেন, "the peculiar office of Protestantism was to unite finance to the concept of godly life." তার দার্শনিক ভিত্তি ছিল ইহজাগতিক, সময় শ্রম অর্থ বস্তু ইত্যাদির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলি হল "the realities and the imperatives of the middle class philosophy."[২০] আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের নূতন মধ্যবিত্তের এই জীবনদর্শন ব্রাহ্মসমাজেও প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিকতাক্ষেত্রে কখনও মধ্যযুগীয় সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। নৃত্য গীত উৎসবে ও সর্বদেশীয় অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নে তাঁর গৃহ সর্বদা মুখর হয়ে থাকত। তাঁর অন্যতম সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাসিতার ক্ষেত্রে তৎকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। মামফোর্ড বলেছেন, "bourgeois individualism"-এর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "the ritual of conspicuous expenditure" সমাজে দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে।[২১] দ্বারকানাথ ও রামমোহনের অন্যান্য সহযোগীদের বিলাস-চরিতার্থতার কাহিনী এই "বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই" ঐতিহাসিক সাক্ষী। কাজেই আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়কালে তা প্রগতির পরিপন্থী নয়।

কেবল ভোগবিলাস (conspicuous consumption) বা অর্থ নয়, সময়ও (time) অর্থের অনুকূল এবং অর্থের মতোই মূল্যবান। ভোগবিলাসের দিল্‌দরিয়া অর্থব্যয়ে নবযুগের মানুষের যে যুক্তি ছিল,

---

১৮ Jacob Burckhardt : The Civilisation of the Renaissance in Italy, Part VI, p. 303.

১৯ K. Mannhein : Ideology and Utopia, p. 31.

২০ Lewis Mumford : Technics and Civilisation, London 1934, p. 43.

২১ Lewis Mumford : Technics and Civilisation, p. 102.

রাজা-বাদশাহের আর্থিক অমিতব্যয়ে তা ছিল না। বণিকবুদ্ধিপ্রবল আধুনিক অর্থান্বেষী মানুষের কাছে অর্থব্যয় ছিল আরও অধিক আয়ের সোপান মাত্র, আর মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহের কাছে তা ছিল শুধু ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির উল্লাস। কিন্তু নবযুগের জীবনদর্শনে যেহেতু 'time is money', সেই হেতু সময়ের অপব্যয় তার কাছে অচিন্ত্য। দোল-দুর্গোৎসব, পাল-পার্বণের 'collective' অনুষ্ঠানে অর্থের উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক অপব্যয় তো বটেই, সময়ের অপরিমিত অপচয়ও যথেষ্ট হয়। অতএব ধর্মাচরণে এই জরদ্‌গব 'সমষ্টির' গতানুগতিকতা বা গড্ডলিকাপ্রবাহ কদাচ আধুনিক 'ব্যক্তির' কাম্য নয়। বাংলার উদীয়মান ধনিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে তাই ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা, এবং 'economical' ('time' ও 'money' দু'দিক দিয়েই) 'ব্রহ্মোপাসনা' শ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শরূপে গৃহীত হল। উপাসনাও 'প্রাত্যহিক' হবার কোন বাধ্যতা নেই, 'সাপ্তাহিক' হলেও চলে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনটিও উপাসকদের ফুরসতের দিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি লক্ষণীয়: [২২]

> প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁহাদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে আজও এইজন্য 'বুধবার' একটি পবিত্র দিন বলে গণ্য হয়ে থাকে। কেবল উপাসনাপদ্ধতির 'ইকনমি' নয়, উপাসনাগৃহটিও ছিম্‌ছাম ও সুবিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক! তাই দেখা যায়, এদেশের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-সভাগৃহের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টান গির্জা-স্থাপত্য ও আসবাব-বিন্যাসের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। অন্তত কলকাতার 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' অভ্যন্তরের পরিপাটির সঙ্গে কলকাতার ইয়োরোপীয় গির্জাভ্যন্তরের সাদৃশ্য অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু এই সাদৃশ্য বিদেশী স্থাপত্যের অনুকরণেচ্ছাজাত নয়, আধুনিক যুগের ইয়োরোপীয় মানুষের ধর্মভাব-সঞ্জাত (attitude to religion) সাদৃশ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই মিলন অভিনন্দনীয়, নিন্দনীয় নয়।

এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মসমাজ সর্বক্ষেত্রে আধুনিক কালোপযোগী জীবনদৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ধর্ম সমাজশিক্ষা অর্থনীতি রাজনীতি— জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বন্ধন ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন থেকে মুক্তিই ছিল তার লক্ষ্য। নবযুগের বাংলার, এবং ভারতেরও, নবজাগরণের ও সামাজিক প্রগতির অগ্রদূত ছিল ব্রাহ্মসমাজ। শুধু সমাজের বন্ধনমুক্তি নয়, অসংখ্য কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে ব্যক্তিসত্তার মুক্তিও ছিল তার কাম্য। আধুনিকযুগের ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা অংশ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অবলম্বন ও অনুসরণ করে নবযুগের অগ্রগতির পথে যাত্রা করেছিল। রামমোহনের যুগে এই ধনিক ও মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বা বুদ্ধিজীবীর (intelligentsia) গণ্ডি ছিল অতিসংকীর্ণ। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হবার পর ইংরেজীশিক্ষার সূত্রপাত হলেও, ১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক-মেকলের উদ্‌যোগে ইংরেজীশিক্ষার অনুকূলে সরকারী নীতি ঘোষিত

২২ পঞ্চবিংশতি, ১৭ পৃষ্ঠা

হবার আগে পর্যন্ত নব্যশিক্ষার অবাধ অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। বাধা যখন অপসারিত হয়ে গেল, এবং তার সঙ্গে ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয়দের সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগ হল, তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথও নিষ্কণ্টক হল। নূতন মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রতিষ্ঠা হল আধুনিক বিদ্যা (education) ও বিত্ত (money), এই দু'য়ের ভিত্তির উপর। বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই সামাজিক প্রতিষ্ঠাকালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আবির্ভূত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে 'ব্রাহ্মধর্মের' নবজন্ম ও 'ব্রাহ্মসমাজের' পুনর্জন্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের বিস্তারে ও আদর্শপ্রচারে তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের বিস্তারে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকা

১৮৪২-৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের পর কলকাতার জোড়াসাঁকো-চিৎপুর অঞ্চল থেকে ক্রমে তার প্রসার হতে থাকে শহরের বাইরে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই প্রসারকার্যে প্রধান উদ্‌যোগী হয়েছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "১৭৬৭ শকের পৌষমাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না।"[২৩] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা অল্পদিনের মধ্যে ৭০০ হয়ে গেল।[২৪] ৫০০ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 'ব্রাহ্ম' এবং তত্ত্ববোধিনীর মতো মাসিকপত্রের ৭০০ গ্রাহক হওয়া শতাধিক বছর আগে যে কতখানি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল আজ তা ভাবা যায় না। আর দেবেন্দ্রনাথ তৎকালে নবদীক্ষিত ব্রাহ্মদের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন তা একমাত্র গভীর আদর্শনিষ্ঠা ও নবজীবনের অনুপ্রেরণা থেকেই উদ্‌ভূত হওয়া সম্ভব। এই উদ্দীপনা থেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রসারণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে এবং নাগরিক বেশ ছেড়ে তা ধীরে ধীরে জাতীয় বেশ ধারণ করেছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রসারধারা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ক্রমে তার বাহু বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অঞ্চল অতিক্রম করে, বাংলার বাইরে উত্তর ও দক্ষিণভারতে বিস্তৃত হয়েছে। ১৮৪২-৪৩ সাল থেকে ১৮৫৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত উত্তর-কলকাতার আদিকেন্দ্রের বাইরে ১৩টি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ২টি শহরতলী ভবানীপুর ও বেহালায় এবং ১১টি কৃষ্ণনগর ঢাকা কুমারখালি চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ কুমিল্লা বর্ধমান ফরিদপুর বলুহাটি বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলে। পরবর্তী দশকে, ১৮৬০-৬৯ সালের মধ্যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ২৫টি এবং বাংলার বাইরে আসামে ১, বিহারে ৪, উড়িষ্যায় ৩, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ৫, মধ্যভারতে ২, পশ্চিমভারতে ২, সিন্ধুপ্রদেশে ২ ও দক্ষিণভারতে ৩টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।[২৫] কলিকাতাবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র 'সমাজ' থেকে ব্রাহ্মসমাজ গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপধারণ করে। অবশ্য পঁচিশ বছরে এই অগ্রগতিকে দ্রুতগতি বলা যায় না। কিন্তু যে সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল— শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী—

---

২৩ আত্মজীবনী, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা

২৪ পঞ্চবিংশতি, ১৮ পৃষ্ঠা

২৫ S. D. Collet-এর Brahmo Year Book থেকে সংকলিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর History of the Brahmo Samaj, Vol. II পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তার প্রসারও ঐ সময় (১৮৪২-৬৯) মন্দগতি ছিল, তদুপরি বাংলাদেশে যতটুকু ছিল, বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে তাও ছিল না। এই কথা মনে রাখলে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি নগণ্য মনে হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের এই প্রাথমিক প্রসারপর্ব প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল বিস্তৃত, ১৮৪৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। এর প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল— প্রসারকার্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সোৎসাহে অংশগ্রহণ। পূর্ববঙ্গে ঢাকা প্রভৃতি শহরে ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, "the first adherents were most of them high officers under Government; and the movement was entirely a movement of the leaders of the educated community of the time."[২৬] অন্তত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেশ বড় একটা অংশ যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতা ও শহরতলী-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকদের বৃত্তির (occupation) একটি তালিকা করলে ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

। শিক্ষক ।	। সরকারী কর্মচারী । জজ, সব-জজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কলেক্টর, পদস্থ কর্মচারী	। উকিল ব্যারিস্টার ।
রাজনারায়ণ বসু	শিবচন্দ্র দেব	আনন্দমোহন বসু
রামতনু লাহিড়ী	শম্ভুনাথ পণ্ডিত	দুর্গামোহন দাস (বরিশাল)
শিবনাথ শাস্ত্রী	রমেশচন্দ্র মিত্র	অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেশচন্দ্র দত্ত	ব্রজসুন্দর মিত্র (ঢাকা)	রাখালচন্দ্র রায় (বরিশাল)
যদুনাথ চক্রবর্তী	কাশীশ্বর মিত্র	
বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	চণ্ডীচরণ সেন	
দীননাথ সেন	যাদবচন্দ্র বসু (ঢাকা)	
ভগবানচন্দ্র বসু (আচার্য জগদীশচন্দ্রের পিতা)	গোবিন্দচন্দ্র বসু (ঢাকা)	
ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)	তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বরিশাল)	
গোবিন্দচন্দ্র গুহ (ময়মনসিংহ)	রামকুমার বসু (ঢাকা)	
পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য (বরিশাল)		

ঢাকায় ছিল সরকারী কর্মচারীদের প্রাধান্য, ময়মনসিংহে ছিল শিক্ষকগোষ্ঠীর। এইভাবে বৃত্তি-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রধানত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, উকিল ব্যারিস্টার ও শিক্ষকরাই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন। বিদ্যা ও বিত্তের জোরে মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রতিষ্ঠা না হলে, এই উৎসাহের প্রকাশ হত কিনা সন্দেহ। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট এবং ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জের সরকারী চাকুরিনীতি নব্যশিক্ষিত এদেশীয় মধ্যবিত্তের স্বার্থের অনুকূলে ঘোষিত না হলে, তাঁদের পক্ষে নূতন মর্যাদার (status) মানদণ্ড 'বিত্ত' ও 'বিদ্যা'র জোরে

---

২৬ History of the Brahmo Samaj, Vol. II, p. 312.

সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করা সম্ভব হত না, এবং তা না সম্ভব হলে ব্রাহ্মসমাজের প্রসার তো দূরের কথা, অস্তিত্বরক্ষা করাই সমস্যা হয়ে উঠত।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই যুগটাকে 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। এই স্বর্ণযুগের অন্যতম মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকা না থাকলে ঐ সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসার হত কিনা বলা যায় না। মুদ্রিত অক্ষরই তখন সরেজমিনের প্রচারকদের চেয়ে বেশী গতিশীল ও শক্তিশালী ছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হলেও, সর্বত্র গমনাগমনের পথ ও যানবাহনের তখনও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তার উপর একনিষ্ঠ প্রচারকও তখন দুর্লভ ছিল। একখানি পত্রিকা একশত প্রচারকের কাজ করত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:[২৭]

In this act of propagation, the *Tattwabodhini Patrika* rendered great help. There having been no regularly appointed missionaries of the Samaj at that time, the *Patrika* largely fulfilled the want. In the course of a few years Samajes sprang up in many stations outside Calcutta through the influence of that Paper. Some amongst the educated men, who were its readers, imbibed the new principles, took counsel together and established Samajes in their own localities.

অবশ্য কেবল ব্রাহ্মসমাজের আদর্শপ্রচারই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, কিন্তু একমাত্র নয়। আধুনিক নবযুগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আদর্শ, শিক্ষা ও সাহিত্যও ছিল তার উপজীব্য। সেবিষয় পরে আলোচ্য। 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'ধর্মতত্ত্ব' 'তত্ত্বকৌমুদী', 'সমদর্শী' প্রভৃতি পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারে পরবর্তীকালে সহায় হলেও, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দান এক্ষেত্রে অতুলনীয়।

---

২৭ History of the Brahmo Samaj, Vol. II, p. 310.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশের দুই উদ্দেশ্য। এক, জনপ্রিয় গ্রন্থকে সর্বজনের মধ্যে প্রচার করা, যাহাতে অনায়াসে এবং অল্প মূল্যে সে গ্রন্থ জনসাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা করা। আর এক, পণ্ডিতের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্য জিজ্ঞাসু গবেষকের জন্য দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য করা।

প্রথম জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা বিরল নহে। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের বটতলা সংস্করণ গ্রন্থগুলি তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। বর্তমানে সম্ভ্রান্ত প্রকাশকরাও পুরাতন সাহিত্য সাগ্রহে প্রকাশ করিতেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের বহুবিধ সংস্করণ বাজারে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে কোনো একটি সংস্করণের সঙ্গে আর একটি সংস্করণের সম্পূর্ণ মিল নাই। এমন কি, যে মূল পুঁথি ধরিয়া এই সকল বই প্রথম মুদ্রিত হয় সেই পুঁথির সঙ্গেও ইহাদের মিল আছে কিনা তাহা চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না। এই সকল গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য তাহার সার্থকতার পথে কোনো ব্যাঘাত হয় না। দেশের জনগণের কাছে রাম-সীতার কাহিনীর যে মূল্য যে আবেদন, পাঠগত পার্থক্যে ভাষাগত পার্থক্যে শব্দগত পার্থক্যে তাহার কিছুমাত্র অপহ্নব ঘটে না। বরং কালানুক্রমিক স্বাভাবিক পরিবর্তনই রসগ্রহণের পক্ষে অধিকতর আনুকূল্য করে।

কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন প্রায় পাঁচ-শ বছর পূর্বে। আমরা তাঁহার রচনা দেখি নাই। পাঁচ-শ বছরের পুরাতন কোনো রামায়ণের অথবা অন্য কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থের পুঁথি আমাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং আজিকার ভাষার সহিত কৃত্তিবাসের ভাষার পার্থক্য কত গভীর ছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু অনুমান করিতে পারি। কৃত্তিবাসের পরবর্তী এবং কৃত্তিবাসের অপেক্ষা অল্পখ্যাত অনেক কবির কাব্যের ভাষায় প্রাচীনতর রূপ দেখা যায়। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অতিশয় লোকপ্রিয় ছিল। এই লোকপ্রিয়তার জন্যই জনসাধারণের মৌখিক ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির ভাষাও বদলাইয়াছে। এক পুঁথি হইতে আর এক পুঁথি নকল করা হইয়াছে। আবার তাহার নকল এবং তাহারও নকল হইয়াছে। এইভাবে যতবারই নকল হইয়াছে ততবারই একটু একটু করিয়া কালোপযোগী এবং স্থানোপযোগী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে কালে এবং যে অঞ্চলে পুঁথি নকল হইয়াছে সেই কালের এবং সেই অঞ্চলের ভাষার ছাঁদ তাহাতে অবশ্যই পড়িবে, অর্থাৎ পড়া স্বাভাবিক।

এযুগে আবার যখন ওই সকল বই মুদ্রিত হয় তখন প্রকাশকরা কোনো না কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির হাত দিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করাইয়া লন। প্রথমে কোনো একটি পুঁথি হইতে একটি মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করা হয়। কেহ কেহ আরও এক বা একাধিক পুঁথির পাঠ মিলাইয়া লন। যেখানে পাঠান্তর আছে সেখানে সম্পাদক যে পাঠ তাঁহার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় সেইটিই গ্রহণ করেন। যেখানে কোনো শব্দের বা ছত্রের অর্থবোধে বাধা হয় সেখানে ইচ্ছা মত এক শব্দ তুলিয়া দিয়া আর এক শব্দ বসাইয়া দেন, কখনো কখনো নূতন ছত্র রচনা করিয়া দেন। তাহাতে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল যে ঘটে না

এমন নয়, কিন্তু তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। কোনো কোনো গ্রন্থের সম্পাদনা প্রশংসাযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণ মহাভারতের কথাই বলি। দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের হাতে এই সকল গ্রন্থের যে সব সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য। যে সকল অংশ আধুনিক যুগে রুচিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেই সব অংশ তাঁহারা বর্জন করিয়াছেন, প্রয়োজন-বোধে ভাষার সংস্কার এবং মার্জনাও করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থও অনেক আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অনেক গ্রন্থই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল বই সাধারণ পাঠকের জন্য মুদ্রিত হয় নাই। পণ্ডিতরা পড়িবেন, গবেষকরা পড়িবেন, সাহিত্যের ইতিহাস ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁহারা জিজ্ঞাসু তাঁহারা পড়িবেন। সুতরাং এ-সব বইয়ের সম্পাদনা অন্য প্রকারের। এ ধরনের গ্রন্থে আদর্শ পুঁথির পাঠ অক্ষুন্ন রাখাই রীতি। কালি উঠিয়া যাওয়ায় অথবা কালি পড়িয়া যাওয়ায় অথবা পোকায় কাটিয়া দেওয়ায় অথবা অনুরূপ কোনো কারণে যদি দুই চারিটা শব্দ নিতান্তই অদৃশ্য বা অপাঠ্য হইয়া যায় তাহা হইলে সম্পাদক কখনো কখনো ঐ স্থলে নিজের অনুমিত পাঠ বসান, কিন্তু কতটা পুঁথিতে আছে আর কতটা তাঁহার অনুমান তাহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন। পুঁথির যে পাঠ স্পষ্টতঃ ভুল তাহাও সম্পাদক এক কলমের আঁচড়ে কাটিয়া দেন না। পুঁথির পাঠ অব্যাহত রাখিয়া সম্পাদক যথাস্থানে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন। যে শব্দ বা পাঠ তিনি নিজে বসাইতেছেন তাহা কি কারণে বসাইতেছেন সে কথাও তাঁহাকে যুক্তি দিয়া বলিতে হয়। গ্রন্থসম্পাদনের ইহাই রীতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সম্পাদক অধিকাংশ স্থলেই এই রীতি একাগ্রতা ও অভিনিবেশ সহকারে পালন করিয়াছেন। তাহার ফলে যে পাঠক মূল পুঁথি বা উহার আলোকচিত্রানু-লিপি দেখিবার সুযোগ পাইবেন না তিনিও মূল পুঁথির পাঠ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন। বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করি নাই, মধ্যে মধ্যে মূল পুঁথি এবং প্রায় প্রতিপদেই মূলের আলোকচিত্রানুলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

পুঁথির লেখা তিন হাতের, কিন্তু তিনজনের মধ্যে একজনই বেশির ভাগ লিখিয়াছেন। পুঁথির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৭; ইহার মধ্যে তৃতীয় হাতের লেখা মোটে ৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় হাতের ২০ এবং বাকী সবই অর্থাৎ ৩৮৩ পৃষ্ঠা প্রথম হাতের।

পুঁথিটি আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করিলে একটি জিনিস চোখে পড়ে—সেটি হইল লিপিকরদের সতর্কতা। একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক। 'লিপিকর' শব্দটা এই প্রবন্ধে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। পুঁথির পৃষ্ঠায় অনেক কাটাকুটি এবং অশুদ্ধি সংশোধন আছে—এগুলির অধিকাংশই লিপিকরদের স্বহস্তে করা। দুই চারিটি ক্ষেত্রে লিপিকর ব্যতীত অন্য লোকের হস্তাক্ষরের চিহ্ন দেখিতেছি। পুঁথির কোনো পাঠক পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ এই সংশোধনগুলি করিয়া থাকিবেন। তবে চতুর্থ হস্তাক্ষরের নিদর্শন অতি সামান্যই। 'লিপিকর'দের সতর্কতা বলিতে পাঠ-সংশোধনকারী এই জাতীয় পাঠকের কথাও ভাবিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি তিন লিপিকরের মধ্যে একজন তো মাত্র চার পৃষ্ঠা নকল করিয়াছেন। তাঁহার এই

সামান্য লেখার মধ্যে তেমন কোনো অশুদ্ধি বা তাহার সংশোধন দেখিতেছি না। কিন্তু অন্য দুইজন লিপিকরের লেখায় অনেক ভুল আছে। অধিকাংশ ভুল ঘটিয়াছে দ্রুত লিখনের জন্য। অন্যমনস্কতাও অনেকগুলি ভুলের মূল কারণ। লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছে। লিপিকর সেগুলি তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিয়াছেন এবং পরে যাহা লিখিবার লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে উপরে বা নীচে তোলাপাঠ দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কোথাও কোথাও পংক্তির মধ্যে অনাবশ্যক অক্ষর বা শব্দ বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নাই; কিন্তু পরে পড়িয়াছে এবং সংশোধিত হইয়াছে। এ সংশোধন লিপিকরের স্বহস্তকৃত হইতে পারে, অথবা পরবর্তীকালে কোনো পাঠকও করিয়া থাকিতে পারেন।

এইরূপ কয়েকটি ভুল এবং সংশোধনের নিদর্শন দিতেছি। কোন্ পদের কোন্ ছত্রে এইরূপ ভুল ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নোক্তরূপ সংকেত ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,—

বা-৫।৪।২ অর্থাৎ বাণখণ্ডের পঞ্চম পদের চতুর্থ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্র। বং-২৩।ধ্রু।১ অর্থাৎ বংশীখণ্ডের ত্রয়োবিংশ পদের ধ্রুবপদ স্তবকের প্রথম ছত্র। খণ্ডের নামের আদ্যক্ষর দ্বারা খণ্ডগুলি নির্দেশিত হইয়াছে। যথা,— জ = জন্ম, নৌ = নৌকা, দা = দান, ভা = ভার, বৃ = বৃন্দাবন, য = যমুনা, যকা = যমুনান্তর্গত কালিয়দমন, যব[১] = যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণ, যহা = যমুনান্তর্গত হার, বা = বাণ, বং = বংশী, বি = রাধাবিরহ।

তা-৭।২।৩— লিপিকর লিখিতে চান "ফুল পিন্ধিলে সে খাইলে তাম্বুল" কিন্তু আগের পংক্তিতে আছে "ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালি"। এক মুহূর্ত আগে "ফুলে তাম্বুলে" লিখিয়াছেন, মনের মধ্যে শব্দ দুইটার গুঞ্জন তখনও শেষ হয় নাই। ফলে, "ফুল পিন্ধিলে" লিখিতে গিয়া লেখক "ফুলে তাম্বুলে" লিখিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু "তাম্বু" পর্যন্ত লিখিতেই ভুলটা নজরে পড়িয়া যায়। তখন ওইখানেই কলম থামাইয়া "তাম্বু"টা কাটিয়া ফেলেন, আর "ফুলে"র ে-কারটাও কাটিয়া দেন। তাহার পর বাকী অংশটুকু যথারীতি নকল করা হয়।

---

১ যমুনাখণ্ড বলিয়া কৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে কোনো খণ্ডের নাম নাই। বৃন্দাবন খণ্ডের পর যে খণ্ড আরম্ভ হইল তাহার নাম "যমুনান্তর্গত কালিয়দমন খণ্ডঃ"। এই খণ্ডের পদসংখ্যা ১০। এই খণ্ডের শেষে যথারীতি সমাপ্তিবাক্য আছে "ইতি যমুনান্তর্গত কালিয়দমন খণ্ডঃ সমাপ্তঃ"। ইহার পর যে খণ্ডটি আছে তাহার আদিতে বা অন্তে "অথ অমুক খণ্ডঃ" বা "ইতি অমুক খণ্ডঃ সমাপ্তঃ"— এইরূপ কোনো নির্দেশ নাই। সুতরাং ওই খণ্ডের নাম জানা গেল না। হয়তো লিপিকর ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বা আর কাহারও নজরে পড়ে নাই। বসন্তবাবু এই খণ্ডটির নাম দিয়াছেন "যমুনাখণ্ডঃ"। খণ্ডটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, পদসংখ্যা ২২। ইহার পরবর্তী খণ্ডের নাম "যমুনান্তর্গতহারখণ্ডঃ"। এ নাম মূল কবিরই দেওয়া। আলোচ্য তিনটি খণ্ডই একটি বৃহত্তর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেই বৃহত্তর খণ্ডটিকে যদি কোনো এক নামে অভিহিত করিতে হয় তো তাহাকেই "যমুনা খণ্ড" নাম দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় খণ্ডাংশকে যমুনা খণ্ড বলিলে সমগ্রের সহিত অংশের গোলমাল বাধিয়া যায়। আমাদের মনে হয় বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দ্বিতীয় অংশের নাম হওয়া উচিত "যমুনান্তর্গত-বস্ত্রহরণখণ্ডঃ"। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাসে বস্ত্রহরণ একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। বস্ত্রহরণ অপেক্ষা হারহরণ গৌণ। অথচ "হারখণ্ড" নাম দেওয়া হইয়াছে "বস্ত্রহরণখণ্ড" নাম নাই। তাই মনে হয় ভুলবশতঃই আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডাংশের নাম— "বস্ত্রহরণখণ্ড"— ছাড় পড়িয়াছে। আমরা এই অংশকে যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড, সংক্ষেপে 'যব', বলিয়া অভিহিত করিব। তিন খণ্ডাংশ সমন্বিত সমগ্র খণ্ডটিকেই যে কবি "যমুনাখণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিতে চান তাহার প্রমাণ আছে। হারখণ্ডের শেষে 'ইতি যমুনান্তর্গতহারখণ্ডঃ' এরূপ না লিখিয়া লেখা হইয়াছে "ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ" অর্থাৎ তিন খণ্ডাংশ মিলিয়া যে যমুনাখণ্ড, এখানে তাহারই সমাপ্তি হইল, কোনো খণ্ড অংশের নয়— ইহাই বুঝিতে হইবে।

তা-১৩ এবং তা-১৪ এই দুই পদের মধ্যে এই শ্লোকটি লেখা হইয়াছিল। "নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা। জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্॥" পরে এটি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার দেখিতেছি তা-১৪ পদের পর শ্লোকটি পুরাপুরি লিখিত হইয়াছে। এইটিই উহার স্বস্থান। জানিতে কৌতূহল হয় লিপিকর পরের শ্লোক পূর্বে বসাইয়া ফেলিলেন কেন? এই ভুলের কারণ কি? পুঁথির প্রাসঙ্গিক পাতা একটু ভাল করিয়া দেখিলে কারণটা অনুমান করা সহজ হয়। তা-১৩ পদের শেষ পংক্তি "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" এবং তা-১৪ পদের শেষ পংক্তিও অবিকল ওইরূপ। শেষ পংক্তির রূপৈক্যবশতই এই গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। শ্লোকটি শেষ করিবার পূর্বে যে এ ভুল লিপিকরের নজরে পড়ে নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারি।

অনুরূপ আর একটি ভুল দেখিতে পাই তা-২১ পদের ৩য় পংক্তির পর। ৭ম পংক্তি "এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥" ভুল করিয়া ৪র্থ পংক্তির স্থানে লেখা হইয়া গিয়াছিল, পরে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দা-২৪।১২।২-এর পর ১৩শ স্তবকের প্রথম পংক্তির স্থলে লেখা হইয়া গিয়াছিল "শ্রীফল যুগল তোহোর তনে"। লিপিকর এটি কাটিয়া আবার যথাস্থানে— অর্থাৎ চার পংক্তি পরে— বসাইয়া দিয়াছেন।

দা-৩০।১।২ এইরূপ ছিল "মথুরাক যাহা রঙ্গে"। হওয়া উচিত "মথুরাক যাসি বিকেঁ"। ভুল কেন হইল? ভুল হইল তাহার কারণ কয়েকটি ছত্র পরেই "রাধা মুখ তুলি চাহা রঙ্গে"— এই পংক্তিটি দেখিতে পাই। লিপিকরের পক্ষে ওই পংক্তিটিই গণ্ডগোলের কারণ হইয়াছে। "মথুরাক" লেখার পর যখন লিপিকর আদর্শ পুঁথির দিকে তাকাইয়াছেন তখন চক্ষু উদ্দিষ্ট স্থান হইতে একটু নীচে নামিয়া "মুখ তুলি চাহা রঙ্গে"র উপর পড়িয়াছে। আর ওই "চাহা রঙ্গে" রূপ লইয়াছে "যাহা রঙ্গে"। কিন্তু পরের ছত্র লিখিবার আগেই যে ভুলটা লিপিকরের নজরে পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ, লিপিকর "যাহা রঙ্গে" কাটিয়া তাহার পর "বিকে" লিখিয়াছেন এবং "যাহা"র উপরে "যাসি" লিখিয়াছেন তোলাপাঠে।

দা-৩৮।২।১ এইরূপ আছে: "শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।" লিপিকর প্রথমে "শিশত সিন্দুরা" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে "সিন্দুরা" কাটিয়া লিখেন "শোভএ তোর কামসিন্দুর।" পরবর্তী পংক্তি পুঁথিতে এইরূপ আছে: "প্রভাত সমএ যেন উরি গেল সুরা।" সম্পাদক মহাশয় ২য় স্তবকের ১ম পংক্তির শেষ পদ "কামসিন্দুর" আছে দেখিয়া অন্ত্য মিলের খাতিরে "সুরা" কাটিয়া "সুর" করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আদর্শ পুঁথিতে "কামসিন্দুরা"ই ছিল। ২য় স্তবকের ১ম পংক্তির ১ম শব্দের পর যে "সিন্দুরা" শব্দটি লেখক ভুল করিয়া বসাইয়াছিলেন তাহার আ-কার আসিল কোথা হইতে? ভুলেরও একটা কারণ অবশ্য থাকিবে। আমরা বলি পরে "সিন্দুরা" দেখিয়াই লিপিকর পূর্বে "সিন্দুরা" লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার লিখিবার সময় আকারটা ছাড়িয়া গিয়াছেন। এটাও একটা ভুল। কিন্তু এটা হইল omission অর্থাৎ নেতিমূলক ভুল। প্রথমটা commission অর্থাৎ ইতিমূলক ভুল। ইতিমূলক ভুল প্রমাণ করা যায়, নেতিমূলক ভুল প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু এখানে সে প্রমাণও আছে। অন্ত্যমিলের জন্য পরের পংক্তির শেষের শব্দ "সুরা" ছিল। এই "সুরা"কে কাটিয়া "সুর" করার কোনো প্রয়োজন নাই। কবি অ-কারান্ত শব্দকে বহুবার আকারান্ত করিয়াছেন। "সুরা"র আকার লেখক অন্যমনস্কতাবশতঃ লিখেন

পুঁথির পৃষ্ঠা ৩৯ক। মুদ্রিত গ্রন্থের (৭ম সং) পৃষ্ঠা ৩০-৩১

লেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥ এআ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥ মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥ এতবড় রাজা ভৈল ধনের কাতর। পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥ কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী। আপণে সুণ ল বোল রাধা ল[১] গোআলী ॥ ২ ॥ মোর দধি ঘ্বতে কেহে তোহ্মে মাহাদাণী। তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মে ত মাউলানী ॥ ৩ ॥ বাটে বাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে। ভাণ্ড মাথে ঘোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥ সবেঁ ঘোল পোণ হেন দধির পসারে। মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞি গোআরে ॥ ৫ ॥ পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে। তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥ সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে। কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥ তোহ্মে ত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া। স্বগ্‌র্গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া

১ বোল রাধা ল', বোল' ও ল' তোলাপাঠে।

পাণ্ডুলিপি ৩৯ক পৃষ্ঠা প্রসঙ্গে বক্তব্য। উপরের মার্জিনে "বোল" এবং "ল" এই দুইটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত। পাশে "৩" অঙ্ক। অর্থাৎ "বোল" এবং "ল" বসিবে ৩য় ছত্রে। ৩য় ছত্রে দুইটি চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন দেখা যাইতেছে, একটি "সুণল" র পরে, আর একটি "রাধা"র পরে। এই দুইটি চন্দ্রবিন্দুই যথাক্রমে "বোল" এবং "ল"র স্থান নির্দেশ করিতেছে। ৪র্থ ছত্রে "৩" এই তিন অঙ্ক দেখুন। একটি কাটা "৩" ও ৪র্থ ছত্রে দেখা যাইতেছে। এই "৩"টি স'ক কলমে কাটা। কিন্তু কাটিবার ফলে অঙ্ক টি টি অপাঠ্য বা অস্পষ্ট হয় নাই।

নাই, সচেতনভাবে লিখিয়াছেন। আলোচ্য পদে কতগুলি অন্ত্য শব্দে আকার যুক্ত হইয়াছে দেখুন।— "কুন্তলভারা", "শ্রবণযুগলা", "আনুপামা", "কমলদলসমা", "দশন উজলা", "উতপলা", "কোকযুগলা", "কলেবরা", "পর্ব্বতকুহরা", "উপামা"। সুতরাং ২য় স্তবকের ১ম ও ২য় চরণের পাঠ এইরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ এইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয় :

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুরা।
প্রভাত সমএ যেন উরি গেল সুরা॥

নকল করিবার সময় পরের শব্দ যে আগে বসিয়া যাইতে পারে— যেমন "সিন্দুরা" বসিয়াছিল— এই পুঁথির পাতায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

দা-৪১।২।১ মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ আছে: "তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী।" লিপিকর "তোর" শব্দের পর "মোর" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে কাটিয়া দিয়াছেন। ওই পংক্তির দ্বিতীয়ার্ধে যে "মোর" আছে নিশ্চয় সেটি দেখিয়াই ভুল করিয়াছিলেন।

দা-৫০।২।৩— লিপিকর লিখিয়াছিলেন "আতি কঠিনী কুচ মাঝা মাঝা খিনী দেহা।" পরে "কঠিনী"র ী-কার কাটিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী "খিনী"র প্রভাবে "কঠিনী" হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "মাঝা" শব্দটা দুইবার লেখা হইয়া গিয়াছিল, তাহার একটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থলে তোলাপাঠে "তোর" শব্দটি বসানো হইয়াছে। মনে হয়, লিপিকর যে আদর্শ পুঁথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন তাহার পাঠে "মাঝা" শব্দটি একবারই ছিল। ছন্দের বিচারে তাহাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অর্থের দিক্ দিয়াও দুইটি "মাঝা"কে সমর্থন করা যায় না। কাজেই লিপিকর ভুল করিয়া যে দুইটা "মাঝা" লিখিয়াছিলেন তাহা যখনই বুঝিতে পারিলেন তখনই একটা কাটিয়া দিলেন। কিন্তু "তোর" শব্দটি তোলাপাঠে কি লিপিকরই বসাইলেন? বসাইলে কেন বসাইলেন? "তোর" শব্দের যোগে পাঠের কোনো উৎকর্ষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং "তোর" না থাকিলেই ছন্দ নির্দোষ হয়। আমাদের মনে হয়, আদর্শ পুঁথিতে "তোর" ছিল না, এবং লিপিকর নিজে এই "তোর" শব্দ বসান নাই। পরবর্তীকালে অন্য কোনো লোক পুঁথি পড়িতে পড়িতে নিজ জ্ঞান এবং অভিরুচি অনুসারে দুই একটি সংশোধন করিয়া থাকিবেন। তোলা পাঠের "তোর"টি এইরূপ একটি সংশোধন। তাহার একটি প্রমাণও দাখিল করিতেছি।

তোলাপাঠে "তোর" শব্দের পাশে ছত্রসংখ্যা-জ্ঞাপক একটি "৩" অঙ্ক আছে। পুঁথির মূল পাঠে তিন সংখ্যা সূচক অঙ্ক সর্বদাই "৩" রূপে লিখিত। "৩" বড় একটা নজরে পড়ে না। কিন্তু তোলাপাঠের তিন প্রায় সর্বত্রই আধুনিক "৩"। তিনজন লিপিকর ব্যতীত অন্ততঃ চতুর্থ একজনের হাত যে পুঁথিতে পড়িয়াছিল এই '৩' অঙ্ক তাহার প্রমাণ।

দা-৬১।১২।২— লিপিকর প্রথমে লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন "কেহ্নে করহ হেন পড়িহাসে।" পরে "পড়িহাসে" কাটিয়া "আভিহাসে" করিয়াছেন। "পড়িহাস" শব্দটা বহুবার প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়াই ইহা লিপিকরের অতি পরিচিত এবং সহজেই কলমের মুখে আসিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে "আভিহাসে" শব্দটি এই একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর মনে হইতেছে এই শব্দের প্রয়োগ আর দেখি নাই। লিপিকরের দৃষ্টি একটু অসতর্ক হইলে এই শব্দটি কৃষ্ণকীর্তন হইতে বাদ পড়িত। এই শব্দটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। অভিলাষ অর্থে "হাইবাস" শব্দটি পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাংলায় দেখা যায়।

স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন অধিবাস হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। "আভিহাস" নিঃসন্দেহে ওই "হাইবাস"-এর প্রাকৃতর রূপ। শব্দটি যে বাদ পড়িয়া যায় নাই এজন্য আমরা লিপিকরের নিকট কৃতজ্ঞ।

দা-৬৭।১।২— "সকট"। আদর্শ পুঁথিতে ছিল "সকট" (শকট অসুর)। লিপিকরের হাতে 'সকল' লেখা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী শব্দ লিখিবার পূর্বেই ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই কেবল "ল"টি কাটিয়া পরে "ট" বসাইয়া দিয়াছেন। এইরকম একটি ঘটনা ঘটিয়াছে দা-৭২।৭।৩ ছত্রে। মুদ্রিত ছত্রটি এইরূপ: "নরসিংহরূপে হিরণ্য বিদারিলোঁ।" লিপিকর "হিরণ্য" লিখিতে গিয়া ভুল করিয়া "হরি" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ভুলের কারণ আছে। আলোচ্য পদটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। "হিরণ্য বিদারিলোঁ" এক ত্রিপদগুচ্ছের দ্বিতীয় পদ। ওই কবিতার মধ্যেই আর এক ত্রিপদগুচ্ছের দ্বিতীয় পদ "হরি বনমালী"। "হিরণ্যে"র জায়গায় ওই "হরি" চলিয়া আসিয়াছিল। পরবর্তী পদ লিখিবার আগেই ধরা পড়িয়া যায়। এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে ভুল ধরা পড়িলে বেশী কাটাকুটি করিতে হয় না, পৃষ্ঠার উপরে বা নীচে তোলাপাঠে বেশী লেখার দরকার হয় না। দা-৭৬।ধ্রু।১ম ছত্রে লিপিকর "কহিবোঁ কাএ" লিখিয়াছিলেন, লিখিয়াই বুঝিলেন ভুল হইয়াছে, "কাএ"র স্থানে "কাহারে" হইবে। অমনি "কাএ"র "এ" কাটিয়া "হারে" বসাইয়া দিলেন।

দা-৯৬।২।২— এখানে "কমণ" কাটিয়া "কৌণ" করা হইয়াছে। এই সংশোধনটিও লক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত শব্দসূচীতে দেখিতেছি— "কৌণ" শব্দটি এই একবারমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যদিও "কোণ" "কোন" শব্দের প্রয়োগ অবিরল। লিপিকর আদর্শ পুঁথির উপর কলম চালান নাই তো? "কমণ" এর স্থানে "কৌণ" বসানোতে ছন্দের অবশ্য একটু উৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

দা-১০৭।১।১— পদটির আরম্ভে লেখা হইয়াছিল "ঈসত হাসিআঁ", পরে উহা কাটিয়া দেওয়া হয়। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এইরূপ। ১০৮ সংখ্যক পদের প্রথম ছত্র "ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।" লিপিকর ভুল করিয়া ১০৭ সংখ্যক পদ ছাড় দিয়া ১০৮ সংখ্যক পদ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনুরূপ ভুল ঘটিয়াছিল নৌকা খণ্ডের ৬ সংখ্যক পদে। ওই পদের তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রের পর লেখা হইয়াছিল "আতি উল্লসিত মতি সব সখি লআঁ," পরে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসলে ওটি ওই পদেরই চতুর্থ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্র, ভুল করিয়া লিপিকর আগে লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

নৌ-২১।২।২-এর পরেও ওই রকম ভুল হইয়াছিল। ৫ম স্তবকের ১ম ছত্রের পাঠ "না জাণিআঁ তত্ব চড়িতে বুইলোঁ নাএ" ২য় স্তবকের ২য় ছত্রের স্থানে বসিয়া গিয়াছিল। লিপিকর সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাটিয়া দিয়াছেন।

নৌ-২১।১০।২— "এখনে করিবোঁ পার নাহিঁ কিছু ভএ।" লিপিকর প্রথমে লিখিয়াছিলেন "এখনে করিবোঁ ভয়" পরে "ভয়" কাটিয়া দিয়াছেন। চরণের অন্ত্যপদ "ভএ" লিপিকরের অসতর্কতাবশতঃ চরণের মধ্যে আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু "ভএ" টা "ভয়" হইল কেন?

ভা-১৩।২।২— "রূপার ভাণ্ডে সাজাইল ঘী।" লিপিকর প্রথমে "রূপার ভাণ্ডত" লিখিয়াছিলেন কিন্তু ওই পর্যন্ত লিখিয়াই বুঝিলেন ভুল হইয়াছে। তখনই "ভাণ্ডত" কাটিয়া দিয়া "ভাণ্ডে" লিখিলেন। ৩ সংখ্যক চিত্রামুলিপি দ্রষ্টব্য।

ভা-২৭।১।১— "কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ।" লিপিকর প্রথমে "ভাষ" স্থানে "লাজ"

লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইডিয়মের দিক্ দিয়া "ভাষ" অপেক্ষা "লাজ" নিশ্চয় ভাল। তাই লিপিকরের কলমে "লাজ"টাই আগে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু "লাজ" যে ওখানে বসিতে পারে না তাহার অন্য কারণ আছে। লিপিকরের সেটা নজরে পড়িতে বিলম্ব হয় নাই।

বৃ-৮।৬।২—"চান্ডলী স্থকল লোচনে।" লিপিকর মধ্যের শব্দটির বানান করিয়াছিলেন "স্থকোল", পরে ো-কার কাটিয়া দিয়াছেন। এই ধরণের সংশোধনে লিপিকরের সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী পাঁচ ছয় ছত্রের মধ্যে "আঁকোড়" এবং "আকোরল" এই দুইটি শব্দ আছে। ওই দুই শব্দের "কো"র প্রভাবে "স্থকল" এর বানান "স্থকোল" হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃ-২৯ । ধ্রু । ৩—"প্রাণ কাহ্নাঞিঁল" এই ছত্রের পরে "সব কোপ খণ্ডিলোঁ" লেখা ও কাটা। পদটির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় ভুলটি কি কারণে ঘটিয়াছিল। ওই পদেরই প্রথম স্তবকের শেষ দুই ছত্র এইরূপ আছে: "প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল সব কোপ খণ্ডিল এখনে।" ধ্রুব পদের তৃতীয় ছত্রেও "প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল" আছে, তাহা দেখিয়াই লিপিকর গোলে পড়িয়াছেন। ভুল করিয়া "সব কোপ খণ্ডিলোঁ" বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু পুরা লাইন লিখিবার পূর্বেই ভুল নজরে পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া দিয়াছেন। পূর্ববর্তী চরণের শব্দ ভুল করিয়া পরবর্তী চরণে লিখিয়া ফেলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যকা-৪।১।২ চরণে লিপিকর "আইল সেই থানে"র স্থলে "আইল ততিথনে" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, কারণ প্রথম চরণে "ততিথনে" ছিল।

আবার পরের শব্দও পূর্বে চলিয়া আসে সে দৃষ্টান্ত আগে পাইয়াছি, এখানে আর একটি পাইতেছি। যব-২।১৩।১-২ দেখুন। "তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ। তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ॥" লিপিকর প্রথমে "ঘাটোঁর" জায়গায় "আউটোঁ" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নাই, ধরা পড়িয়াছে পরে। তখন "আউটোঁ" কাটিয়া নূতন করিয়া "ঘাটোঁ" লিখিবার স্থান কাগজে নাই। কাজেই "আউ" কাটিয়া তোলাপাঠে একটি "ঘা" লিখিতে হইয়াছে। তোলাপাঠের সংশোধন এই পুঁথিতে অনেক আছে। সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখাইব। এখানে প্রধানতঃ সেই ভুলগুলি লক্ষ্য করিতেছি, লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেগুলির প্রতি লিপিকরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

যব-১২।৪।৩—"সে পাণী সোধিলোঁ তার আশে।" লিপিকর "সে পাণী তোষি" পর্যন্ত লিখিয়া "তোষি" কাটিয়া "সোধিলোঁ" লিখিয়াছেন। এই পদের মধ্যবর্তী একটি ছত্রে "তোষ" শব্দটি আছে। "তোষি" তাহারই প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শব্দটা সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই "পাণী"র সহিত অর্থের অসংগতি দেখিয়া লিপিকর তৎক্ষণাৎ যথাযথ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

যহা-৫।২।২—এই ছত্রটিতে একটু অস্পষ্টতা আছে। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন পাঠটি এইরূপ হইবে:

"ছিফিলেক রাধা কবল দস হাটাল।" প্রথম সংস্করণে এই পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে। পরে সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন:

"ছিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।" ৫ম সংস্করণ ১০৪ পৃঃ দেখুন। পুঁথির লিখিত একই পাঠ দুইবার দুইরকম পড়া হইল কেন? দুই শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক পুঁথিতে নিয়মিত থাকে না সত্য এবং প্রসঙ্গ অনুসরণে সম্পাদক যথাস্থানে ফাঁক দিবেন ইহাও প্রত্যাশিত। "রাধা কবল দস হাটাল" "রাধাক বলদ সহাটাল" হইতে পারে। কিন্তু "সহাটাল" "সিংহটাল" হইবে কি করিয়া? পুঁথির প্রাসঙ্গিক ছত্রের শেষাংশ "বলদাসহটাল"।

পুঁথির পৃষ্ঠা ৪১খ। মুদ্রিত গ্রন্থের (৭ম সং) পৃষ্ঠা ৩৮

দিল বিরোধা ॥ আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী। আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ ১ ॥ হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথু
রা নগর। আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর ॥ ধ্রু ॥ দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর। কোণোহো দানীর পোত্রঁ না দিল
উত্তর ॥ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি বড়[১] ডুরুবার ॥ যাণাইবোঁ কং স যেন করএ বিচার ॥ ২ ॥ গোআলার ঝি আহ্মে অতিশ
য় বালী। মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥ এক বেলি কাহ্নু মোর রাখুক সমান। দয়া করি কাহ্নু মোরে দেউ জী
উ দান ॥ ৩ ॥ কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চ রণে। একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে ॥ নিবারহ কা
হ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুরঃ[২] কৃষ্ণঃ স
তৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥ আতি রুপসী পদুমিনী জাতী দেখি থীর নহে মনে। তোর বিরহে চি

১ বড়' তোলাপাঠে। ২ চতুরঃ' তু' তোলাপাঠে।

পাণ্ডুলিপি ৪১খ পৃষ্ঠা প্রসঙ্গে বক্তব্য। উপরের মার্জিনে লেখা "বড় ৩" দেখুন। ইহার অর্থ ৩য় ছত্রে "বড়" শব্দ ছাড় পড়িয়াছে। সোজাসুজি নীচের দিকে তাকাইলে ৩য় ছত্রে একটি অর্ধচন্দ্র চিহ্ন দেখা যাইবে। এই সংকেতস্থলেই বড় বসিবে। নীচের মার্জিনে লেখা "তু ৬" দেখুন। পুঁথির "তু" বর্তমান কালের "ত্ত" এর মত। "তু ৬" এর অর্থ ৬ষ্ঠ ছত্রে "তু" ছাড় পড়িয়াছে। উপরে চোখ তুলিলেই নীচের দিক্ হইতে হইতে ৩য় ছত্রে অর্ধচন্দ্র সংকেত দেখা যাইবে। এই পৃষ্ঠাতেও পাঠের মধ্যবর্তী তিন (৩) অঙ্ক এবং মার্জিনের তিন (৩) অঙ্ক লক্ষণীয়। পৃষ্ঠার ২য় ছত্রে সাফ কলমে কাটা "রহাটে।" লক্ষ্য করুন। লিপিকর প্রথমে "মথুয়ার হাটে" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে শেষের তিনটি অক্ষর কাটিয়া তাহার বদলে "নগর" বসাইয়াছেন। এই সংশোধনের কথা মুদ্রিত পুস্তকে উল্লিখিত হয় নাই।

"দ" এর পর যে দাঁড়ি চিহ্ন দেখা যাইতেছে তাহা "দ"-এর া-কারও হইতে পারে আবার পরবর্তী "স"-এর ি-কার হওয়াও অসম্ভব নয়। ইকারের উত্তল অংশ [⌒] পুঁথিতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব প্রথম সংশয় "বলদাস—" না "বলদসি—"? এবার দ্বিতীয় সংশয়ের কথা বলি। "স"-এর মাথার উপর একটি ফুটকি চিহ্ন আছে। দুটি ফুটকি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এমনও হইতে পারে। আর একটি অনুরূপ চিহ্ন আছে "হা"র আকারের উপর। কোনো অক্ষরের উপরে একটি বা দুইটি বিন্দু চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে বিন্দুর নিম্নবর্তী বর্ণটি তুলিয়া দিতে হইবে। আমরা আজকাল "d" (delete) চিহ্ন যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি সেকালের লিপিকর বিন্দুর দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। তুলিয়া দিবার জন্য যেমন বিন্দু চিহ্নের ব্যবহার ছিল তেমনি আবার ক্ষুদ্র বৃত্তের ব্যবহার ছিল অনুস্বার বুঝাইবার জন্য। বিন্দুর সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য অল্পই। বিন্দুটা দশমিক চিহ্নের (˙) কাছাকাছি। আর বৃত্তটার চেহারা শূন্যের (০) মত। বৃত্ত বুজিয়া গেলেই বিন্দু। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে "স"-এর উপরিস্থিত চিহ্নটিকে বিন্দু মনে করিয়াছিলেন। সেই কারণে প্রথম সংস্করণে ছাপিয়াছিলেন "রাধা কবল দস হাটাল"। কিন্তু বিন্দু তো দেখিতেছি "স"-এর উপরে, দাঁড়ির উপরে নয়। তবে "স" না কাটিয়া দাঁড়ি কাটিলেন কেন বোঝা গেল না। তাহা ছাড়া এইভাবে সম্পাদন করিয়াও যে বাক্যটি পাওয়া গেল সম্পাদক মহাশয় তাহার একটা অর্থ দিলেন বটে, কিন্তু সে অর্থ যে তাঁহার নিজেরই মনঃপূত হয় নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। আরও সতর্কভাবে বিচার করিয়া তাঁহার মনে হইল বিন্দু চিহ্নটা যখন দাঁড়ির উপর নাই তখন দাঁড়িটা (া-কারই হউক বা ি-কারই হউক) তুলিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। তুলিতে হইলে "স"কে তুলিতে হয়। কিন্তু "স" তুলিলে অর্থ আরও দুষ্কর হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার মনে হইল, যে-বিন্দুকে ডিলিটের চিহ্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা তো অনুস্বারের চিহ্নও হইতে পারে। ওই সঙ্গে "ই"এর পরবর্তী আকারের উপরের বিন্দুচিহ্নের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ওই চিহ্নটি যে তুলিয়া দিবার সংকেত সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে সংশয় রহিল না। এইরূপ চিন্তা এবং তদনুযায়ী সংশোধনের পর ছত্রটির রূপ দাঁড়াইল এইরূপ: "হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল॥" ইহাতেই যে অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল তাহা মনে হয় না। কিন্তু সে আলোচনা এখন করিব না। বর্তমান আলোচনায় আমরা কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতেছি যে কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠ লিপিকরদের হাত হইতে সম্পাদক বসন্তবাবুর হাত পর্যন্ত কতবার কতভাবে এবং কিরূপ সতর্কতার সহিত পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছে।

বা-৮।২।৪—"কেমনে তোষিব আর হেন নারীজনে।" "তোষিব"র স্থানে লিপিকর "সহিব" লিখিতে গিয়াছিলেন কিন্তু "সহি" পর্যন্ত লিখিয়াই ভুল বুঝিতে পারেন এবং তখনই "সহি" কাটিয়া "তোষিব" লিখিয়া দেন।

বা-২৭।৪র্থক্রা।১— মূল পাঠ ছিল: "রাধার মধু তারপিল কাহে।" কিন্তু "তারপিল" শব্দের "র পি"-র মাঝামাঝি জায়গায় মাথার উপরে (· ·) দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দু চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি এই বিন্দু চিহ্ন বর্ণবর্জনের সংকেত। কিন্তু ঠিক জায়গায় না বসাইলে এই সংকেত গণ্ডগোলের কারণ হয়। এখানে তাহাই হইয়াছে। বসন্তবাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন "র" বর্ণটি বাদ দেওয়াই সংশোধকের অভিপ্রায় ছিল। তাই প্রথম সংস্করণের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন,— "'তারপিল' কাটিয়া 'তাপিল' করা আছে।"[১] পরে

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১ম সংস্করণ, ২৯১ পৃষ্ঠা

তাঁহার মনে হইয়াছে "র" নয় "ি-কার"টা তুলিয়া দেওয়াই লিপিকরের উদ্দেশ্য। পরবর্তী সংস্করণের পাদটীকায় সেই মত ব্যক্ত হইয়াছে— "তারপল, প'র ইকার কাটা"।[২] বসন্তবাবুর প্রথম প্রস্তাব অনুসারে আলোচ্য ছত্রের পাঠ হয় "রাধার মধু তাপিল কাহ্নে।" দ্বিতীয় প্রস্তাব স্বীকার করিলে পাঠ হয় "রাধার মধু তারপল কাহ্নে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বসন্তবাবু প্রথম প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকেই শুদ্ধ ও লিপিকরের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতেছেন। এই দুইটি পাঠের কোনোটিই কিন্তু স্বতঃসম্পূর্ণ নয়। সম্পাদক মহাশয় "রাধার"-এর পর একটি "আধর" শব্দ নিজে বসাইয়াছেন। "আধর" শব্দ যোগ করিলে ছন্দের উৎকর্ষ ঘটে অর্থেরও উন্নতি হয়, তৎসত্ত্বেও এখানে নূতন শব্দের অনুপ্রবেশ বাঞ্ছনীয় মনে হয় না। এই ছত্রটির দিকে লিপিকরের দৃষ্টি পড়িয়াছে, একটি বর্ণ অতিরিক্ত বসিয়াছে বলিয়া সেটি তুলিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আদর্শ পুঁথির সহিত ছত্রটি তিনি যে লেখার পর একবার মিলাইয়া দেখিয়াছেন ইহাতে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তৎসত্ত্বেও যদি কোনো শব্দ ছাড় পড়িয়া থাকে তা সে ছাড় আদর্শ পুঁথিতেই ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। এখন "আধর" বাদ দিয়াই ছত্রটির অর্থ বিচার করা যাক।

প্রথম প্রস্তাব "রাধার মধু তা পিল কাহ্নে।" রাধারূপ পুষ্পের যে মধু, কৃষ্ণরূপ ভ্রমর তাহা পান করিলেন। এ অর্থ তো স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে কষ্ট কল্পনা কিছুই নাই। তুলনীয়— "রাধাঞে কৈল কুজনে। মধুপীল হৃষ্ট কাহ্নে।"— বি-৫২। এ ছত্রে বাহির হইতে আনিয়া "আধর" বসাইলেও অর্থে বাধা হয় না। কিন্তু "আধর" যখন অপরিহার্য নয় তখন নাই দিলাম।

এবার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি দেখি। "রাধার মধু তারপল কাহ্নে।" সমগ্র ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা না দিয়া সম্পাদক মহাশয় কেবল "তারপল" শব্দের টীকা দিয়াছেন। সে টীকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম।

"তারপল— বিদ্যাপতিতে,— ঐসন দুহুমন তলপই পুন পুন উপজল অধিক বিকারে॥ দারুণ প্রেম থেহ নাহি মানত পলকে পলকে তলপায়॥ পশ্চিম রাঢ়ে তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।" বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তড়পানোর সহিত "তারপল" শব্দকে সংযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। রাঢ়ে তড়পানো যে-অর্থে প্রচলিত এস্থলে কি সে-অর্থ সংগত হইবে? যদিই বা হয়, "মধু"র সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায়? আমাদের বিশ্বাস বর্ণবর্জনের যে নির্দেশ তাহা ি-কার সম্পর্কে নয় র-এর সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

বং-৯।১।৩— "চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি দিব আহ্মে।" "আণি"র স্থলে প্রথমে "আণিআঁ" লিখিত হইয়াছিল পরে "আঁ" কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। "আঁ" কাটায় কি লাভ হইল? প্রথম দর্শনেই মনে হয় ছন্দের কিছু উন্নতি হইয়াছে। সত্যই কিছু উন্নতি হইয়াছে কিনা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। পদটি যে ছন্দে লেখা তাহার গঠন এইরূপ :

আবসি সৌ- অরি তোর নেহে।
কাহ্নাঞিঁ আ- সিব কুঞ্জ গেহে।
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে।
সরূপে বু- ইলোঁ। তোর থানে।
হেন বেলে মাঝ বৃন্দা- বনে।
কাহ্নাঞিঁ বাঁ- শীত দিল সানে।

২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৭ম সংস্করণ, ১১৫ পৃষ্ঠা

এই ছন্দের মধ্যে "চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণিআঁ দিব আহ্মে" অথবা "চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি দিব আহ্মে"— কোনোটাই ঠিকমত মেলে না। বরং প্রথম শব্দটিকে অতিপর্ব ধরিলে "আণিআঁ" পাঠই সংগত মনে হয়। পড়িয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

কিসক ম- রিতে চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আ- ণিআঁ দিব আহ্মে॥

"আঁ" না থাকিলেই বরং ছন্দের পক্ষে ক্ষতি হয়।

এক এক সময় এমনও মনে হয় যে সব সংশোধন আদর্শ পুঁথির অনুসরণে করা হয় নাই। মূলের পাঠের উপর লিপিকর অথবা আর কেহ কোথাও কোথাও অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন। (লিপিকর তিনজন ব্যতীত অন্ততঃ আরও একজনের হাত যে পুঁথিতে পড়িয়াছিল অন্যত্র তাহার প্রমাণ দিয়াছি।) আলোচ্য ক্ষেত্রে আদর্শ পুঁথিতে সম্ভবতঃ "আণিআঁ"ই ছিল এবং লিপিকরও "আণিআঁ" লিখিয়াছিলেন। পরে পড়িতে গিয়া অশুদ্ধ মনে হওয়ায় নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে "-আঁ" কাটিয়া দিয়াছেন।

দুই চারি স্থলে সংশয়ের অবকাশ থাকিলেও অধিকাংশ সংশোধনেই সংশোধকের সতর্কতার পরিচয় সুস্পষ্ট। যেমন,— বি-৮।৫।১ ছত্রে "নেতে ধড়ী" ছিল। "তে"র একার কাটিয়া "নেত ধড়ী" করা হইয়াছে। "নেত"ই হওয়া আবশ্যক।

কোথাও কোথাও অতি সতর্কতার পরিচয় আছে। বি-৯।২।১— "লাগ পাহা" ছিল, পরে "হা"র া-কার কাটিয়া "লাগ পাহ" করা হইয়াছে। সংশোধনকারী দেখিলেন পদটি অনুজ্ঞাবাচক তাই অশুদ্ধ মনে করিয়া তিনি া-কার কাটিয়া দিলেন। তাহার যে সত্যই প্রয়োজন ছিল তাহা নয়। চার পংক্তি পূর্বে আছে ;— "যে পথে উদ্দেশ পাহা সে পথে আপণে যাহা।" এখানে "পাহা" শব্দটি অনুজ্ঞাবাচক না হইলেও া-কার আছে, তাহা হইলে চার পংক্তি পরে া-কার কাটি কেন? আদর্শ পুঁথিতে কি "পাহ"ই ছিল? না এটি লিপিকরের স্বয়ংকৃত সংশোধন?

বি-২৬।৫।২— প্রথমে লেখা হইয়াছিল "আহ্মার সকল দোষে খণ্ডহ বিদূরে।" পরে "দোষে"র একার কাটিয়া "দোষ" করা হইয়াছে। কর্মকারকে ে-কার থাকিবার বাধা নাই, তবে এক্ষেত্রে ে-কার না থাকিলেই ভাল হয়। বি-২৪ পদে "খণ্ড" ক্রিয়ার কর্মরূপে "দোষ" শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। "দোষে"র ব্যবহার একবারও নাই।

বি-২৭ পদের ২য় স্তবকের ৪র্থ এবং ৩য় স্তবকের ১ম ছত্রের মধ্যে এই ছত্রটি লেখা হইয়াছিল :

কিসক পাতসি রাধা তো ডোম্ব চাণ্ডালী॥

কিন্তু পরে এটি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছত্রটি যে ওই পদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। ২য় স্তবকের ৩য় ও ৪র্থ ছত্রে এবং ৩য় স্তবকের ১ম ও ২য় ছত্রে যথাযথ অন্ত্যানুপ্রাস আছে।

২য় স্তবক ৩য় ছত্র : সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে কেলি।
২য় স্তবক ৪র্থ ছত্র : মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী॥
৩য় স্তবক ১ম ছত্র : দূতা দিআঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী।
৩য় স্তবক ২য় ছত্র : তবেঁ নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী॥

দুই জোড়া অন্ত্যানুপ্রাসের মধ্যে লিপিকর ওই ছত্রটি কোথা হইতে পাইলেন? ভুল বশতঃ অন্য পদের

পুঁথির পৃষ্ঠা ৯২।খ। মুদ্রিত গ্রন্থের (৭ম সং) পৃষ্ঠা ৭০

আঁ ভার দধি বিকে মথুরার রাজে। দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে ল ভাবে[১] মজিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥ সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ স
জাইআঁ রূপার ভাণ্ডেত সজাইল[২] ঘী। সে ভার দেব বনমালী বহেল উলসিলী গোআলার ঝী ॥ ২ ॥ ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ
গেল ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী। সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী ॥ ৩ ॥ লাজ পা
আঁ কাহ্নাঞি ভার এড়িআঁ মিল দেখি সব সখিগণ হা সে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
॥ ৪ ॥ রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ বচসা ভরণাদ্বৃ ন্ধে তবায়ন্তাবিকঃ কৃতঃ। ইদানীং নাশিতস্তেন দধ্যাদি
করবাম কিং ॥ মো যবে জাণিবোঁ কাহ্নাঞি পেলাইব ভার। তবে কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার ॥ বহুমূল পসার করিআঁ ছা
রখার। পাঞ্চ সঙ্গতি কাহ্ন করিল আন্ধার ॥ ১ ॥ এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি। অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্ন

১ ভাবে'র উপর তোলাপাঠে পাপে' করা। ২ ভাণ্ডত' কাটিয়া ভাণ্ডে' করা এবং তোলাপাঠে সজাইল'।

পাণ্ডুলিপি ৯২।খ পৃষ্ঠা প্রসঙ্গে বক্তব্য। উপরের মার্জিনে "সজাইল ২"। ইহার অর্থ ২য় ছত্রে উল্লিখিত শব্দের নীচে "সজাইল" বসিবে। মার্জিনে লিখিত শব্দের নীচে ২য় ছত্রে এই বাক্যাংশটি আছে— "রূপার ভাণ্ডত ঘী.।"। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে "ত" অক্ষরটির উপরে ডাহিন দিকে দুইটি বিন্দুচিহ্ন আছে। ইহার অর্থ "ত" বর্ণটি ওখান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। "ত" অক্ষরের বামে একটি অর্ধচন্দ্র চিহ্নও দেখা যায়। ইহার অর্থ, ওখানে নূতন কিছু বসিবে। বোঝা গেল ওখানেই "সজাইল" শব্দটি বসাইতে হইবে। "ভাণ্ড" শব্দে কি ভাবে একটি ক্ষুদ্র ে-কার যোগ করা হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করুন। উপরের মার্জিনে আর একটু ডাইনে "পাপে ১" লেখা আছে। ওই শব্দের ঠিক নীচেই আছে "ভাবে"। ভাবে শব্দটির দুই দিকে দুইটি বিন্দুচিহ্ন আছে। বামেরটি স্পষ্ট, দক্ষিণেরটি ভাল বোঝা যায় না। সংশোধকের অভিপ্রায় "ভাবে"র বামে "পাপে" বসাইতে হইবে। নীচের মার্জিনে "সঙ্গ"র স্থলে "দুর্গ" লক্ষণীয়। দুর্গর পাশে "৭" থাকা উচিত ছিল, কিন্তু "১" আছে। উপর হইতে ৭ম ছত্র হইলেও নীচের দিক্ হইতে ১ম ছত্র বলিয়া "দুর্গ ১" লেখা হইয়াছে। নীচের মার্জিনে যে ছত্রাঙ্ক থাকে তাহার গণনা উপরের ছত্র হইতেও করা হয় নীচের ছত্র হইতেও করা হয়। এই পৃষ্ঠাতেও তিন অঙ্ক "ও" এইরূপ আছে। "সজাইল"র "জ" এবং পাঠের মধ্যবর্তী "জ"এর আকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

ছত্র আসিয়া যাইতে পারে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত এই পুঁথিতে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহা হয় নাই। হয় নাই তাহার প্রমাণ "কিসক…চাণ্ডালী" ছত্রটি আশপাশে আর কোথাও দেখিতেছি না। যতদূর মনে হইতেছে সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই ছত্রটি আর কোথাও নাই। ইহা হইতে কি অনুমান করিতে পারি ?

১. ছত্রটি লিপিকর স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথি আমাদের হাতে আসিয়াছে উহাতে তিনজন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। আলোচ্য অংশটি যিনি লিখিয়াছেন তিনি দ্বিতীয় জন। কৃষ্ণকীর্তনের মোট পত্রসংখ্যা ২০০২। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় জনের লিখিত পত্রসংখ্যা মাত্র দশ। আলোচ্য ছত্রটি ইঁহারই রচনা হইতে পারে। "ডোম্বচাণ্ডালী" শব্দটি সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে আর একবারও ব্যবহৃত হয় নাই। সেটাকেও একটা গৌণ প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। "ডোম্বচাণ্ডালী পাতা" একটা ইডিয়ম, অর্থ ছোটলোকের মত ব্যবহার করা। এই ইডিয়মটির প্রতি দ্বিতীয় লিপিকরের ব্যক্তিগত আসক্তি থাকিতে পারে, অনেকের এরকম থাকে। যদি তাহাই হয় তো লিখিয়া আবার কাটিলেন কেন ? তাহার উত্তর,— রচয়িতা নিজে কাটেন নাই, জোড়া জোড়া ছত্রের মধ্যে একটা বিজোড় ছত্র দেখিয়া পরে আর কেহ কাটিয়াছেন।

২. এমনও হইতে পারে, লিপিকরের সম্মুখে যে আদর্শ পুঁথি ছিল, অতিরিক্ত ছত্রটি তাহাতেই ছিল ; কবি নিজেই রচনা করিয়া ছিলেন। ছত্রটি বিজোড় হইলেও অন্ত্যমিলে বিরোধ নাই, অর্থেরও সংগতি আছে। মূল কবির পক্ষে এ ভুল কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। লিপিকরও যাহা দেখিয়াছেন যেমন দেখিয়াছেন নকল করিয়াছেন। পরে ছত্রটি অতিরিক্ত মনে হওয়ায় কাটিয়াছেন।

৩. তৃতীয় অনুমান : আদর্শ পুঁথিতেই লাইনটি লেখা এবং কাটা ছিল। মূলের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা বশতঃ লিপিকর কাটা অংশও লিখিয়া কাটিয়াছেন।

বি-৪৮ ও বি-৪৯ পদদ্বয়ের মধ্যে ওইরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছে। এখানে দুই চরণের একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটি এই :

নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং।
মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা॥

শ্লোকটি যে মূল কবির ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখি না। এটি কাটা হইল কেন ? এবং কাহার হাতে কাটা হইল ? কেন কাটা হইল একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।—

বি-৪৮ পদে বড়াই কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা রাধার দুঃখ বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কবির মনে এইরূপ পরিকল্পনা ছিল যে ইহার পর কৃষ্ণের মুখ দিয়া দুই চারিটা অভিমানের কথা বলাইবেন। কৃষ্ণ বলিবেন, রাধা আমাকে ভালবাসে না, আমার কথা স্মরণ করে না, তাহার বিরহবেদনা ইত্যাদি সব বাজে কথা। কিন্তু জয়দেব তাহাতে বাদ সাধিলেন। গীতগোবিন্দ সম্মুখে রাখিয়া বড়ু চণ্ডীদাস রাধার বিরহ বর্ণনা করিতেছিলেন।

বি-৪৮ পদ— "তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে॥" ইত্যাদি। এই পদটিকে গীতগোবিন্দের ৯ম গীতির অনুবাদ বলা চলে। গীতগোবিন্দের ৯ম গীতি এইরূপ।— "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।" ইত্যাদি।

কবির যদিও ইচ্ছা ছিল পরবর্তী পদে যাহা বলিবার কৃষ্ণের জবানিতে বলিবেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। জয়দেবের কোমল কান্ত মধুর পদ অনুসরণ করিয়া রাধার বিরহবেদনাই বর্ণনা করিয়া চলিলেন। সুতরাং বড়াইর উক্তি চলিতে লাগিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বি-৪৯ পদটিও জয়দেবের একটি গীতের অনুবাদ। বি-৪৯ পদ— "নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে" ইত্যাদির সহিত তুলনীয় গীতগোবিন্দের ৮ম গীত— "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্" ইত্যাদি।

কাজেই কৃষ্ণের মুখে অভিমানের বাণী আর বসানো হইল না। সংস্কৃত শ্লোকটি অবান্তর হইয়া পড়িল। তথাপি কবি বোধ হয় স্বহস্তে তাহা আর কাটেন নাই এবং লিপিকরও যথারীতি তাহা নকল করিয়াছেন। পরে ভাল করিয়া পাঠ পরীক্ষা করিবার সময় লিপিকরই সম্ভবতঃ শ্লোকটির অসংগতি দেখিয়া কাটিয়া দিয়াছেন।

এ পর্যন্ত আমরা প্রধানতঃ দুই রকমের ভুল লক্ষ্য করিলাম। এক রকমের ভুল যাহা প্রায়ই লিখিবার সময় ধরা পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত হইয়াছে। যেমন, "সকট" লিখিতে গিয়া "সকল" লেখা হইয়া গেল কিন্তু তাহার পর আর কিছু লিখিবার আগেই ভুলটা নজরে পড়িল। অমনি লেখক "ল" কাটিয়া "ট" বসাইয়া দিলেন। এই সংশোধনের জন্য লাইনের উপরে বা নীচে নূতন করিয়া কিছু লিখিবার দরকার হইল না।

আরও এক রকমের ভুল দেখিলাম সেটা এই ধরনের।— কোথাও কোথাও এক বা একাধিক শব্দ বা সম্পূর্ণ ছত্র অনভিপ্রেতরূপে এবং অস্থানে লিখিত হইয়া গিয়াছে। সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ুক বা পরেই ধরা পড়ুক ভুল যেই বুঝিতে পারা গিয়াছে অমনি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওই সংস্কৃত শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় ভুলেরও একটা সুবিধা আছে, নূতন কথা বসাইতে হইতেছে না, কেবল বর্জনীয় অংশ বর্জন করিলেই হইল।

যেখানে বর্জনীয়কে বর্জন করিলেই চলে না নূতন কিছু যোগ করিতে হয় সেইখানেই তোলাপাঠের ব্যবহার হইয়া থাকে। আমরা যেমন লিখিতে লিখিতে ছাড় পড়িয়া গেলে অভিপ্রেত স্থানে একটা চিহ্ন বসাইয়া উপরে বা পাশে লেখ্য বস্তুটি লিখিয়া দিই সে-কালের লিপিকাররাও সেইরূপ করিতেন। কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে দেখিতেছি, ছাড়ের নির্দেশ রূপে চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ওই চিহ্নের সোজাসুজি, হয় উপরের বা নীচের মার্জিনে, (পাশের মার্জিনে নয়) লেখ্য শব্দ লিখিত হইয়াছে। ইহাকেই তোলাপাঠ বলা হয়। ওই শব্দের পাশে একটি সংখ্যাবাচক অঙ্কও লেখা থাকে। কোন্ লাইনে ছাড় পড়িয়াছে ওই অঙ্ক হইতে তাহা বোঝা যায়। কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে তোলাপাঠের সংখ্যা কম নহে। (চিত্রানুলিপি দ্রষ্টব্য।) লিপিকরই করুন আর যিনিই করুন পুঁথির প্রত্যেকটি পাতার লেখা যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া শুদ্ধি অশুদ্ধি পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল এই ভূরিপরিমাণ তোলাপাঠ তাহার সাক্ষ্য।

তা-৫ পদের প্রারম্ভে রাগতালাদির নির্দেশ আছে এইরূপ— "দেশাগরাগঃ॥ রূপকং॥" ইহার পরেই চিহ্ন দিয়া তোলাপাঠে লেখা হইয়াছে "অথবা কানড়া॥ যতিঃ॥" কেবল পদের মধ্যস্থ পাঠের সংশোধন নয়, সুরতাল সম্পর্কেও এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি লিপিকর সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অবশ্য এই রাগতালের বিকল্প বিধান মূল কবির না হইয়া লিপিকরের প্রক্ষিপ্ত 'অবদান' হওয়া অসম্ভব নয়।

তা-৮।৩।৪— মূলে ছিল "ঘন ঘন দিল আলিঙ্গনে"। পরে "দিল"র "দি" কাটিয়া গেলাপাঠে "কৈ" করা হইয়াছে। "দিল"র স্থলে "কৈল" অবশ্য অধিকতর সংগত হইয়াছে।

তা-৯।৩।২ চরণে "বড়ায়ি" শব্দ প্রথমে ছিল না, তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। তাহাতে ছন্দের উন্নতি হইয়াছে।

অতিশয় সুস্পষ্ট এমন অনেক ভুল পুঁথিতে রহিয়া গিয়াছিল তোলাপাঠের সাহায্যে যেগুলির সংশোধন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

তা-২১।৪।৩— ছত্রটি ছিল "তবেঁসি মর মোর দুখ পালা এ"। "মর" র "ম" এবং "র" এর মধ্যে চিহ্ন দিয়া তোলাপাঠে "নে" বসানো হইয়াছে। "মর" স্থলে "মনের" হওয়ায় অর্থটা পাওয়া গেল, ছন্দেরও উন্নতি হইল।

দা-২।৩।৪— "মোঞ্রে আপোষ হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার।" "আপোষ" শব্দের "পো" এবং "ষ"-এর মধ্যে তোলাপাঠে "ঙ" বসিয়াছে। এই তোলাপাঠ সংশোধন না প্রক্ষেপণ বলা কঠিন। গ্রন্থমধ্যে "আপোষ" শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু "আপোঙষ" আর দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতেই সন্দেহ হয় আদর্শ পুঁথিতে "আপোঙষ" নয়, "আপোষ"ই ছিল।

দা-৬।২।৫— "করিলোঁ খণ্ডব্রত"। "করিলোঁ"র "রি" কাটিয়া তোলাপাঠে "ই" করা হইয়াছে। এটি ভুল সংশোধনের দৃষ্টান্ত নয়, পরিমার্জনার নিদর্শন। করিলোঁ কইলোঁ এবং কয়িলোঁ তিন রূপই গ্রন্থ মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং "করিলোঁ"কে ভুল বলিয়া সংশোধন করা হইয়াছে এরূপ মনে করি না। যতদূর মনে হয় ছন্দের উৎকর্ষ সাধনের জন্য "কইলোঁ" করা হইয়াছে। আলোচ্য চরণটিতে প্রয়োজন ৬ মাত্রার, কিন্তু আছে ৭ মাত্রা— "করিলোঁ খণ্ডব্রত। "করিলোঁ"কে "কইলোঁ" করিলে তিন মাত্রাকে চাপিয়া চুপিয়া দুইয়ে আনা যায়। যিনিই সংশোধন করুন পদের উন্নতি হইয়াছে একথা মানিতেই হইবে। তবে এ উন্নতিবিধানের অধিকার তাঁহার ছিল কি না সেটা সংশয়ের বিষয়। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছন্দোদুষ্ট পংক্তি গ্রন্থমধ্যে এমন কি এই পদের মধ্যেই অনেক আছে।

দা-১৫ পদের প্রারম্ভে রাগতালাদির নির্দেশ প্রথমে লেখা হয় নাই, তোলাপাঠে দেওয়া হইয়াছে। দা-৩৯ এবং নৌ-৮ পদেও রাগের নির্দেশ প্রথমে ছিল না, তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। ছত্রখণ্ডের দ্বিতীয় পদের উপরে রাগ তালাদির নির্দেশরূপে একটি শব্দ প্রথমে ছিল— "শ্রীরাগঃ"। পরে তোলাপাঠে "রূপকং" বসানো হইয়াছে। বংশী খণ্ডের নবম পদের গোড়ায় কেবল "ধানুষীরাগঃ" ছিল। তোলাপাঠে উহার পর "একতালী" বসানো হইয়াছে। লেখার পর মূলের সহিত মিলাইবার সময় এগুলি ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দা-২৫।ধ্রু।২— "পাঁজী পুথী চিরিবোঁ বাম হাথে।" "পুথী" ও "চিরিবোঁ"র মধ্যে "তোহ্মার" শব্দ তোলাপাঠে দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দের সংযোজনে ছন্দের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

দা-২৬।৪।৩— "এহাক জাণী রাধা পুর মোর আশ।" "জাণী"র পর তোলাপাঠে "আঁ" বসানো হইয়াছে। ইহাতে ছন্দের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রার যে অল্পতা ছিল তাহার পূরণ হইয়াছে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার যে দুইটি প্রকার কৃষ্ণকীর্তনে পাই তাহার একটি হইল— ঈ-কারান্ত অথবা ই-কারান্ত আর একটি -আঁ, (-এ্যা,-এ্যাঁ, -ইআঁ, -ইএ্যা, -ইএ্যাঁ) -অন্ত। প্রথম রূপের উদাহরণ—মানী, মাঙ্গী, মারি, মেলি, হাণী, চলি, চুম্বী ইত্যাদি। দ্বিতীয় রূপের দৃষ্টান্ত— চাহাঁ, পাএ্যাঁ, খাআঁ, ছুইআঁ, জাণাআঁ, জিআইআঁ, ডুবিআঁ, গাম্বাআঁ, দেখাআঁ, হাণিআঁ, হইআঁ, সোঅরিআঁ, লাগিআঁ ইত্যাদি। দ্বিতীয়রূপে -ঈকারের

পুঁথির পৃষ্ঠা ২১৫।খ।   মুদ্রিত গ্রন্থের (৭ম সং) পৃষ্ঠা ১৪৯

লিনে ॥ ২ ॥ দেখি পল্লব শয়নে । আঙ্গাররাশি সমানে । মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥ বাম করতে ব
দনে । দিআঁ গগনে নয়নে । তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥ খনে হাসে খনে বোষে । খনে কাঁপএ ত
রাসে । খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥ চলিতেঁ তোহ্মার পাশে । নারে মদনের রো
ষে । বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১] (না
হং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং । মিথ্যাব চনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা) ॥ নিন্দএ চা
ন্দ চন্দন রাধা সব খনে । গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ করে মনসিজশর কুসুম শয়নে । ব্রত করে প
াযিতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥ আল কাহ্নাঞি ল রাধা বিরহদহনে । দগধিলী[২] ভৈলী তোহ্মার[৩] শ

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং । মিথ্যা বচন জাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা ।' শ্লোক লেখা ও কাটা । ২ পুথিতে দগধিনী' । ৩ তোহ্মার কারণে', হ্মা' তোলাপাঠে ও দরশনে' কাটিয়া শরণে' করা ।

পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ২১৫।খ প্রসঙ্গে বক্তব্য । "নাহং মনসি…বৃথা" (৪-৫ ছত্র) এই অংশটি কিভাবে দুইদিকে দুইটি বন্ধনী চিহ্ন দিয়া কাটা হইয়াছে দেখুন । দুইটি চিহ্নের মধ্যে দ্বিতীয়টি যেমন স্পষ্ট, প্রথমটি তেমন স্পষ্ট নয় । "দরশনে" শব্দটিও বন্ধনীবদ্ধ করিয়া বর্জন করা হইয়াছে । বর্জিত অংশটি পড়িতে অসুবিধা হয় না, অথচ বর্জিত বলিয়া সহজেই বোঝা যায় ।— ছত্র ৭ । এই পৃষ্ঠার নীচের মার্জিনে "হ্মা ৭" লেখা আছে । ইহার অর্থ ৭ম ছত্রে মার্জিনে লিখিত অক্ষরটির ঠিক উপরে একটি "হ্মা" অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে । উপরে তাকাইলেই দেখা যাইবে "তোর" শব্দটির মাঝামাঝি একটি চন্দ্রবিন্দুর মত চিহ্ন দেখা যাইতেছে । এই চিহ্নটিই ছাড়ের সংকেত । এই সংকেতের দ্বারা বলা হইল "তোর" স্থলে "তোহ্মার" হইবে । ২য় ছত্রে তিন (ঙ) অঙ্কটিও দ্রষ্টব্য ।

ব্যবহার গ্রন্থমধ্যে বিরল। "হাণী, হাণিআঁ" আছে, কিন্তু "হাণীআঁ" নাই। "জিণি, জিণী, জিণিআঁ" আছে কিন্তু "জিণীআঁ" নাই। "মানি মাণী মাণিআঁ" আছে কিন্তু "মাণীআঁ" নাই। -ঈআঁ-অন্ত অসমাপিকা গ্রন্থ মধ্যে দুই একটির বেশী দেখি নাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে "জাণী" বানান দেখিয়া মনে হয় মূলে "আঁ" ছিল না, "আঁ"র প্রবর্তন লিপিকরের বা আর কাহারও। সংশোধনকারী যদি ওই সঙ্গে "ণী" কাটিয়া "ণি" করিতেন তাহা হইলে সন্দেহ হইত না।

দা-৩০।৩।৫—এইরূপ ছিল। "নিতি নিতি যাসি দধি বিকে।" তোলাপাঠে "দধি"র পর "দুধ" শব্দ বসানো হইয়াছে। "দুধ" সংযোজনে অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়াই উৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

দা-৩০।৩।৬ ও ৮— এই দুইটিই ত্রিপদীর জোড় ছত্র। প্রথমে ছিল যথাক্রমে "পাএর বাজে নূপুর" এবং "লাস বেশ করে চুর"। তোলাপাঠে "চুর" এবং "পুর"-এর মধ্যে একটি করিয়া একার দেওয়া হইয়াছে। ফলে ছত্র দুইটি এইরূপ দাঁড়াইল— "পাএর বাজে নূপুরে" এবং "লাস বেশ করে চুরে"। এ-কার না থাকাতে কি ক্ষতি হইয়াছিল? এ-কার দেওয়ার ফলে কি লাভ হইল? "নূপুর" ও "চুর"— মিলের পক্ষে ভালই ছিল। বাক্যবিন্যাসের দিক্ দিয়াও একার যোগের গুরুতর প্রয়োজন ছিল না। একার বিহীন "নূপুর" ও "চুর"ই সংগততর মনে হয়। তবু যে একার দেওয়া হইল তাহার কারণ এইরূপ অনুমান করি।

দা-৩০ পদটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। সমগ্র কবিতায় ত্রিপদীর তৃতীয় পদের সংখ্যা মোট আঠার। এই আঠারটির মধ্যে ষোলটিরই শেষ অক্ষর একারান্ত। যেমন,— মথুরাক যাসি বিকে। লাসবেশ তোর কিকে॥ রাধা মুখ তুলি চাহা রঙ্গে। কি করিব তোর খঙ্গে॥ ইত্যাদি। পাঠ-পরীক্ষক দেখিলেন প্রায় প্রত্যেকটি অন্ত্য পদই যখন একারান্ত তখন "নূপুর" এবং "চুর" এই দুইটি শব্দকেও একারান্ত করিয়া দিলে ঐক্য বজায় থাকে। আমাদের মনে হয় একার বসাইবার ইহাই একমাত্র কারণ।

দা-৪২।৩।১— প্রথমে ছিল "এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞি না কর আজ"। তোলাপাঠে "কর" এবং "আজ" শব্দের মধ্যে "বে" বসানো হইয়াছে। স্পষ্টতঃই এই "বে" ছাড় পড়িয়াছিল।

দা-৪৭।ধ্রু।২— প্রথমে ছিল "পাপের খণ্ডন বুঁধী আহ্মে জাণী।" "আহ্মে"র পর তোলাপাঠে "ভালে" বসানো হইয়াছে। ছন্দের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল। এ সংশোধন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে কিন্তু এটি লিপিকরের স্বহস্তকৃত নয়। তোলাপাঠে যে "ভালে" শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহার পাশে একটি "৩" অঙ্ক আছে।

দা-৪৮।২।২—প্রথমে ছিল "আপণে সুণল রাধা গোআলী"। তোলাপাঠে "রাধা"র পূর্বে "বোল" এবং পরে "ল" যোগ করা হইয়াছে। "আপনে সুন ল বোল রাধা ল গোআলী"। একই ছত্রে দুইটি "ল" সুশ্রাব্য না হইলেও ছন্দের দিক্ দিয়া উন্নতি হইয়াছে। এখানেও তোলাপাঠের পাশে "৩" অঙ্ক থাকায় মনে হয় এ সংশোধনও লিপিকরের নয়, অন্য হাতের।

দা-৫০।২।৪— প্রথমে ছিল "হেন রূপ যৌবনে পাতসি নেহা"। "যৌবনে"র পর তোলাপাঠে "না" যোগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়াই উন্নতি হইয়াছে। এ সংশোধনও লিপিকরের নয়। "৩" অঙ্ক এখানেও আছে।

দা-৫০ ও দা-৫১ এই দুই পদের মধ্যবর্তী সংস্কৃত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "জগাদ" লিখিতে গিয়া লিপিকর "জগা" লিখিয়াছিলেন। "দ" টা যে ছাড় পড়িয়াছিল পরে তাহা নজরে পড়ে, এবং সম্ভবতঃ লিপিকর নিজেই তোলাপাঠে "দ" বসাইয়া দেন।

এই রকম একটি সুস্পষ্ট ভুল ছিল ১০২।৫।৩ ছত্রে। প্রথমে ছিল "আন্ধাত আধি কোণ দেব আছে" পরে "আধি" ও "কোণ"এর মধ্যে তোলাপাঠে "ক" বসাইয়া "আন্ধাত আধিক কোণ দেব আছে" করা হইয়াছে।

দা-৬৫।২।১— ছিল "কাঞ্চলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডিবোঁ হার"। পরে "ছিণ্ডিবোঁ"র "ছি" রাখিয়া "ণ্ডিবোঁ" কাটা হইয়াছে এবং তাহার স্থলে তোলাপাঠে "ণ্ডসি" বসানো হইয়াছে। "ছিণ্ডিবোঁ" উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎ-কালের রূপ। এখানে বসা উচিত মধ্যম পুরুষের বর্তমান। সুতরাং "ছিণ্ডিবোঁ" যে লিপিকরের ভুলে বসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

দা-৬৮।২।৩— প্রথমে ছিল "এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি দুরুবার। পরে "আতি" ও "দুরুবারে"র মধ্যে তোলাপাঠে "বড়" বসানো হইয়াছে। (২ সংখ্যক চিত্রানুলিপি দ্রষ্টব্য।) তাহাতে ছত্রটি দাঁড়াইল এইরূপ : "এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি বড় দুরুবার"। "দুরুবার" এর দুর্বারতাকে বলবত্তর করিবার জন্যই যে "বড়" শব্দটি আনয়ন করা হইয়াছে তাহা বোঝা যায়, কিন্তু ইহার ফলে ছন্দে দোষ ঘটিয়াছে। "বড়" যোগ করিবার পূর্বেও যে ছত্রটি নির্দোষ ছিল তাহা নহে, এক মাত্রা কম ছিল। "এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল। আতি দুরুবার"। প্রথম পর্বে আটের স্থলে সাত মাত্রা হইতেছে। ছত্রটি এইরূপ হইলে ভাল হইত,— "এবেঁ (সি) কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি দুরুবার"। সংশোধনকারী এত তলাইয়া দেখেন নাই। তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে ছত্রটিতে মাত্রা কিছু কম পড়িয়াছে। কোথায় কম পড়িয়াছে কতটা কম পড়িয়াছে তাহা ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি "বড়" বসাইয়া দিলেন। তাহাতে মাত্রা বাড়িল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। এক মাত্রা কম ছিল, এখন এক মাত্রা বেশী হইল। সংশোধনকারী তোলাপাঠে "বড়" বসাইয়া ওই সঙ্গে যদি প্রথম শব্দ "এবেঁ"টি কাটিয়া দিতেন তাহা হইলে অভিপ্রেত ফল ফলিত। পড়িয়া দেখুন,—

এবেঁ | কাহ্নাঞি ভৈ (= ভই) ল আতি | বড় দুরুবার।
যানাইবোঁ কংস যেন | করএ বিচার॥

"বড়" র পর "৩" অঙ্ক আছে, সুতরাং এ সংশোধনও লিপিকরের নয়।

দা-৬৮ ও ৬৯ পদের মধ্যবর্তী সংস্কৃত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "চতুরঃ" শব্দের "তু" ছাড় পড়িয়াছিল। পরে তোলাপাঠে "তু" বসানো হইয়াছে।

দা-৬৯।১২।৪— প্রথমে ছিল "বাঘ না খাএ"। ছত্রের গোড়ায় তোলাপাঠে "ভুখিল" বসানো হইয়াছে। অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়াই এই সংযোজন সার্থক হইয়াছে।

কবির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংশোধনকারী নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। দা-৮১ পদের ২য় স্তবক দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন

লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ চুর।
হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর॥
শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ।
যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মাহাদাণ॥

উদ্ধৃত স্তবকের তৃতীয় ছত্রের শেষের শব্দ "বাণ" পাঠ-পরীক্ষককে ভ্রমে ফেলিয়াছে। তিনি "বা" ও "ণ"-এর মধ্যস্থলে একটি "র" বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা "বাণ" হইবে না "বারণ" হইবে। হাতী মারা

বীরত্বের নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে নয়। তাহা ছাড়া হস্তী হননের জন্য শোণিতপুর নামক স্থানে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? ব্যাপারটা এই।—

"বাণ" পুরাণোক্ত নৃপতি এবং "শোণিতপুর" তাঁহার রাজধানী। বাণের কন্যা উষা পিতার অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বিবাহ করায় বাণ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। কবি এই বাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথির পাঠ-পরীক্ষক তাহা বুঝিতে না পারিয়া "বাণ"কে "বারণ" করিতে চাহিয়াছেন।

দা-৯৩।১।২— প্রথমে ছিল "বাটে তুরুবার কাহ্নাঞি নান্দের"। তোলাপাঠে "নান্দের" শব্দের পর "সুন্দর" বসানো হইয়াছে। পূর্ববর্তী ছত্রের অন্ত্য শব্দ ছিল "নগর"। "নগর"-এর সহিত "সুন্দর"-এর মিল ভালই হইল। মাত্রাসংখ্যার অভাব ছিল তাহারও পূরণ হইল। অর্থেরও উন্নতি হইয়াছে। নন্দের পুত্র অর্থে "নান্দের সুন্দর"-এর ব্যবহার পুঁথির মধ্যে আরও পাই। বি-১৯।৩।১-২ দ্রষ্টব্য।— "বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর। তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর॥" আদর্শ পুঁথিতে "সুঁন্দর" শব্দ ছিল এবং নকল করিবার সময় যে লিপিকর তাহা ছাড়িয়া গিয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই।

দা-৯৮।৩।১— প্রথমে ছিল "ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরা হাট"। "মথুরা" ও "হাট" শব্দের মধ্যে তোলাপাঠে একটি "র" বসানো হইয়াছে। এই "র" এর অন্তর্ভুক্তি সংশোধকের সতর্ক পর্যবেক্ষণের পরিচায়ক। ওই পদেরই ৭ম স্তবকের ১ম ছত্রে আর একটি সংশোধন আছে! প্রথমে ছিল "রাজা তুরুবার পাটে আতি তুরুবার"। "তুরুবার" যে দুইবার থাকিবার কথা নহে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু গোড়াতে ধরা পড়ে নাই, মিলাইবার সময় পড়িয়াছে। আদর্শ পুঁথিতে প্রথম "তুরুবার" স্থলে "খরতর" ছিল। লিপিকর তদনুসারে সংশোধন করিলেন। সবটা কাটিলেন না, প্রথম তিনটি অক্ষর "তুরুবা" পর্যন্ত কাটিয়া দিলেন এবং তোলাপাঠে উহার উপর "খরত" বসাইয়া দিলেন।

নৌ-৫।৮।১— ছিল "হট জায়িতেঁ"। পরে "হ" এবং "ট"-এর মধ্যে তোলাপাঠে একটি আকার বসাইয়া "হট" কে "হাট" করা হইয়াছে। পুঁথি নকল করিবার পর গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার পাঠ যে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আদর্শ পুঁথির সহিত নকল করা পুঁথিটির পাঠ মিলাইয়া দেখা হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশোধনগুলি তাহার প্রমাণ।

নৌ-২৫।৯।১— ছিল "এ বোল সুণিআঁ মনের হরিষে"। তোলাপাঠে "সুণিআঁ"র পরে "কাহ্নাঞি" বসানো হইয়াছে। ছন্দের জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। তবে "কাহ্নু" করিলে আরও ভাল হইত। "কাহ্নাঞি"র পর "৩" অঙ্ক আছে। সুতরাং এই সংশোধন লিপিকরের নয়।

নৌ-২৬।ধ্রু।২— "না তুলিহ জলের ভিতর" ছিল। "ভিতর" কাটিয়া তোলাপাঠে "উপর" করা হইয়াছে। লিপিকর ভুল করিয়া "ভিতর" লিখিয়াছিলেন। ভুলের কারণ ছিল। পাঁচ ছয় ছত্র পরেই আছে "মোরে জলের ভিতর"। আরও কয়েক ছত্র পরে একস্থানে আছে "এহা জলের ভিতর"। এইগুলি লিপিকরের চোখে পড়ায় মন বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই কারণেই "জলের উপর" লিখিতে গিয়া "জলের ভিতর" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

নৌ-২৬।৩।১— ছিল "যে কর সে কর"। পরে তোলাপাঠে ছত্রের শেষে একটি "তুঞি" বসানো হইয়াছে। ছন্দের জন্য এই দুই মাত্রার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় "তুঞি" রূপটি পুঁথির মধ্যে আর দেখিতে

পাইতেছি না। "তোঞ্ঁি" অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে, "তোঞ্রি"ও আছে। ইহা ছাড়া "তো" "তোঞ্র", "তোঞ্রে" "তোঁ"— এই রূপগুলিও প্রচুর আছে। "তুঞ্রি" রূপটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একটি তোলাপাঠে। তাই মনে হয় এই সংশোধনটিও লিপিকরের নয়, অন্য হাতের।

এই পদে আর দুইটি তোলাপাঠ আছে, দ্বিতীয় স্তবকের ১ম ও ৩য় ছত্রে। ছত্রদুইটি এইরূপ ছিল,— "যত ছিল মনে তোর" এবং "তাহার কারণে কৈলে"। তোলাপাঠ সংযোজন করায় দাঁড়ায়,— "যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞ্রিল" এবং "তাহার কারণে কৈলে কাহ্নাঞ্রিল"। এই পদের ১ম স্তবকের ১ম ও ৩য় এবং ধ্রুবপদের ১ম ছত্রের শেষে "কাহ্নাঞ্রিল" ছিল। লিপিকর তাহা দেখিয়াই সম্ভবতঃ সংগতির অনুরোধে পরবর্তী স্তবকের ১ম ও ৩য় ছত্রে "কাহ্নাঞ্রিল" বসানো উচিত মনে করিয়াছেন। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় ৩য় ও ৪র্থ স্তবকের ক্ষেত্রে সে কথা স্মরণ করেন নাই। সম্পাদক বসন্তবাবু তাঁহার মুদ্রিত সংস্করণে ওই দুই স্থলেও "কাহ্নাঞ্রিল" বসাইয়া দিয়াছেন।

ভা-২।১।২— ছিল "চামড় গাছের কাটিলেক ডাল"। পয়ারের পক্ষে স্পষ্টতঃই দুই মাত্রা কম। তোলাপাঠে "গাছের" শব্দের পর "বাছি" বসাইয়া ক্ষতি পূরণ করা হইয়াছে। ওই স্তবকের ৩য় ছত্রে শেষের শব্দ "করী" ছাড় পড়িয়াছিল, তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে।

ভা-৩।২।১— ছিল "দেখ আইহনের মা রাধার রিতে"। তোলাপাঠে "রিতে"র পূর্বে "চ" বসাইয়া "চরিতে" করা হইয়াছে। "রিতে" থাকিলে অর্থের দিক দিয়া ক্ষতি হইত না। কিন্তু "চরিতে" করায় ছন্দেরও উন্নতি হইল।

ভা-৪।ধ্রু।১— প্রথমে ছিল "সাহুড়ির বোলে ডরায়িলী রাহী"। পয়ারে দুই অক্ষরের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। তাহা পূরণের জন্য "বোলে"র পর তোলাপাঠে "সুনি" বসানো হইয়াছে। "সুনি" বসানোর ফলে "বোলে"র একার কাটিয়া "বোল" করা আবশ্যক হইয়াছে। সংশোধিত ছত্রটি দাঁড়াইল এইরূপ।— "সাহুড়ির বোল সুনি ডরায়িলী রাহী"। একই ছত্রে পুরাতন কিছু পরিবর্জিত এবং নূতন কিছু সংযোজিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন,— আদর্শ পুঁথিতে কি "সাহুড়ির বোল সুনি ডরায়িলী রাহী"ই ছিল? এবং লিপিকর কি ভুল করিয়া "সাহুড়ির বোলে ডরায়িলী রাহী" লিখিয়া পরে পাঠ মিলাইবার সময় ভুল দেখিয়া সংশোধন করিয়াছিলেন? অথবা আদর্শ পুঁথিতেই "সাহুড়ির বোলে ডরায়িলী রাহী" ছিল, লিপিকর ঠিকই নকল করিয়াছিলেন, পরে পাঠের উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য নিজেই সংশোধন সমার্জন করিয়াছেন? আমাদের মনে হয় আদর্শ পুঁথিতে ছিল "সাহুড়ির বোলে ডরায়িলী রাহী"। ইহাতে অর্থের কোনো বাধা হয় না, ইডিয়মেরও না। ছন্দে একটু কম পড়ে, তবে সে রকম ছন্দোদুষ্টি কৃষ্ণকীর্তনে বিরল নহে। সংশোধন লিপিকরের স্বকৃত।

ভা-৬।৪।২— তোলাপাঠে "ত" বসাইয়া "জলধি সেতু বান্ধি"র স্থলে "জলধিত সেতু বান্ধি" করা হইয়াছে।

ভা-৭।১।২— এখানেও একটি "তে" বসাইয়া "সাপের মুখে"র স্থলে "সাপের মুখেতে" করা হইয়াছে। এই পদেরই ৪র্থ স্তবকের ৩য় ছত্র ছিল "সঙ্গে আসিবে লঅ দধিভারে"। মধ্যে তোলাপাঠে "যবেঁ" বসাইয়া করা হইয়াছে "সঙ্গে আসিবে য [বেঁ] লঅ দধিভারে"।

ভা-৮ পদের আরম্ভে "বড়ারী রাগঃ" ছিল তাহার পর তোলাপাঠে আবার "কানড়া রাগঃ" বসানো হইয়াছে। একটি পদই কি দুই রাগে গেয়? মূল কবি নিশ্চয় দুইটি রাগের নির্দেশ দেন নাই। দ্বিতীয় রাগটি

লিপিকরের মৌলিক প্রস্তাব! ওই পদেরই ১ম স্তবকের ১ম ছত্র ছিল— "ব্রহ্মা বেদ ইন্দ্রে হরিব পাণী"। "বেদ" এবং "ইন্দ্রে"র মধ্যে তোলাপাঠে "হরিবেক" বসানো হইয়াছে। শব্দটা যে ছাড় পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভা-৮ পদেরই ১ম স্তবকের ৪র্থ ছত্রটি এইরূপ ছিল,— "ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত মতী"। লিপিকর তোলাপাঠে একটি "সু" বসাইয়া "মতী" কে "সুমতী" করিয়াছেন। মনে হয় ইহাও আদর্শ পাঠে ছিল। এই সংশোধনের ফলে ছত্র দুইটিই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ভা ৯।ধ্রু।১— এইরূপ ছিল "লঅ ভার কাহ্ন তোর বিমতী"। পয়ারের চরণ, সুতরাং তিনমাত্রা কম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। "তোর" শব্দের "তো" এবং "র"-এর মাঝখানে তিনটি অক্ষর বসাইয়া সেই তিনটি মাত্রা পূরণ করা হইয়াছে। তিনটি অক্ষর এই,— "হ্মেনাক"। সম্পূর্ণ ছত্রটি হইল "লঅ ভার কাহ্ন তোহ্মে না কর বিমতী"।

ভা-১০।১।৩— প্রথমে ছিল "ভার গরুঅ নহে গরুঅ লাজ"। "ভার"কে তিন মাত্রার এবং দ্বিতীয় "গরুঅ"কে চার মাত্রার মাপে সম্প্রসারিত করিয়া পড়িলে, প্রথম পর্বের সাত মাত্রাকে আটে এবং দ্বিতীয় পর্বের পাঁচ মাত্রাকে ছয়ে আনা যায়। বস্তুতঃ ছত্রটি যে মাপে খাটো তাহা পাঠ-পরীক্ষকের কানে ধরা পড়িয়াছে। তিনি ঘাটতি পুরণ করিবার জন্য "লাজ" শব্দের পূর্বে একটি "বড়" শব্দ তোলাপাঠে বসাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ হইল,— "ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ"। চৌদ্দটি অক্ষর হইল, মাত্রা সংখ্যাও চৌদ্দ পাওয়া গেল। কিন্তু অক্ষর পিছু একটি করিয়া মাত্রা হইল না। চরণটির মাত্রাবিভাগ হইল এইরূপ।—

।। ।।। ।। | ।। ।। ।।
ভার গরুঅ নহে | গরুঅ বড় লাজ ॥

প্রথম পর্বে আট মাত্রা কিন্তু অক্ষরসংখ্যা সাত। দ্বিতীয় পর্বেও অক্ষরসংখ্যা সাত, কিন্তু মাত্রা ছয়। এই পর্বে "গরুঅ"কে সংকুচিত করিয়া দুই মাত্রায় আনিতে হইতেছে। তোলাপাঠে "বড়" শব্দ সংযোজনে লাভ খুব বেশী হয় নাই।

ভা-১১।৩।৪— ছিল "ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি এখো কাজ"। পরে "এখো"র "খো" কাটিয়া তোলাপাঠে "কো" করা হইয়াছে। এক + হো = এখো। অপ্যর্থক এই "হো"র ব্যবহার কৃষ্ণকীর্তনে অজস্র। যেমন,— তবেঁ হো, এবোঁ হো, তভোঁ, কভোঁ, কভোঁহো,। এই "হো" আধুনিক বাংলায় "ও" হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে তথাপি অর্থে "তবোঁ" কদাপি অর্থে "কবোঁ", যখনই অর্থে "যবোঁ" বা "জবোঁ" দেখা যায় না। "একো" আছে কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে কৃষ্ণকীর্তনের রচনা কালে মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতা প্রায় পুরাপুরিই বজায় ছিল। কমার লক্ষণ একেবারেই দেখা যায় নাই এমন কথা বলা যায় না, তবে তাহা অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এ অবস্থায় "এখো" কাটিয়া "একো" করিলে একটু আশ্চর্য বোধ হয়। এই অনুমান হয় যে পুঁথির যে পাঠ-পরীক্ষক "খো" কাটিয়া "কো" করিয়াছেন তিনি মূল কবির সমকালের লোক নহেন, তাঁহার অনেক পরবর্তী। আর এই পাঠ-পরীক্ষকই যদি লিপিকর হইয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে মূল কবি ও লিপিকরের মধ্যে অন্ততঃ শতাব্দীকালের ব্যবধান ঘটিয়াছে।

ভা-১৩।ধ্রু।৪ আগে ছিল,— "ভাবে মজিলা দেবরাজে"। (৩ সংখ্যক আলোকচিত্রাম্বলিপি দ্রষ্টব্য।) পরে "ভাবে"র উপর তোলাপাঠে "পাপে" বসানো হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে "ভাবে" শব্দটি যেমন আছে তেমনি রাখিয়া তাহার পরে "পাপে" বসাইবার নির্দেশ আছে, না "ভাবে" কাটিয়া তাহার স্থলে "পাপে"

বসাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে? সম্পাদক প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলেন " 'ভাবে' কাটিয়া 'পাপে' করা আছে"। পরে তাঁহার ধারণা হইয়াছে— "ভাবে" কাটা হয় নাই। পরবর্তী সংস্করণে পাদটীকায় মন্তব্য পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছেন " 'ভাবে'র উপর তোলাপাঠে 'পাপে' করা"। অর্থাৎ "ভাবে" কাটা হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম সংস্করণের মন্তব্যটিই অধিকতর সংগত বলিয়া মনে হয়। কেন হয় বলিতেছি।—

আমাদের ধারণা, শব্দ কাটা মানেই সাফ কলমে কাটা, লিখিত ছত্রের মাঝামাঝি বাম হইতে ডাইনে কলম চালাইয়া যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে সে রকম কাটা আছে কিন্তু খুব কম। যেখানে সাফ কলমে কাটা আছে সেখানেও কাটা অংশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কোথাও কোথাও বন্ধনী ( ) চিহ্নে আবদ্ধ করিয়াও কাটা বোঝানো হইয়াছে। মুদ্রিত আলোকচিত্রলিপিতে তাহার নিদর্শন দেখা যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই কাটার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি বিন্দুচিহ্নের দ্বারা। পূর্বেই বলিয়াছি কর্তনীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উপরের দিকে বামে একটি এবং দক্ষিণে একটি দশমিকের মত বিন্দু চিহ্ন বসাইয়া দেওয়া হয়। লেখার উপর কালির আঁচড় কাটিলে পাতা অপরিচ্ছন্ন হয়, সেটা সেকালের লিপিকররা চাহিতেন না, বিন্দুচিহ্ন দিয়াই অনেকে কাজ চালাইতেন। আলোচ্য ছত্রে এইরূপ একটি বিন্দুচিহ্নের অস্তিত্ব বোঝা যায়। একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে "ভাবে"র উপরে বাম দিকে বিন্দুটি দেখা যায়। ওই শব্দের ডান দিকেও যে ওই রকম আর একটি বিন্দু ছিল, মুছিয়া গিয়াছে তাহা অনুমান করিলে অসংগত হইবে না।

যদি মনে করি "ভাবে" কাটা হয় নাই তাহা হইলে ছত্রটি এইরূপ দাঁড়ায়,— "ভাবে পাপে মজিলা দেবরাজে"। ছন্দের দিক্ দিয়া ছত্রটি অতিশয় দুষ্ট হইয়াছে। তোলাপাঠ না থাকিলেও ছন্দ নির্দোষ হয় না। "ভাবে মজিলা দেবরাজ"— নয় মাত্রা হয়। 'ভাবে"কে টানিয়া তিন মাত্রা করা চলে, তাহা হইলে ছত্রটির মাত্রাসংখ্যা হয় দশ। তোলাপাঠ দিলে বাড়িয়া এগার অথবা বার হইবে। আলোচ্য পংক্তিটির মাত্রাসংখ্যা হওয়া উচিত আট। বিনা তোলাপাঠেই এক বা দুই মাত্রা বাড়িয়া আছে। তোলাপাঠ যোগ করিলে দোষ বৃদ্ধিই পায়, কমে না। লিপিকর বা পাঠ-পরীক্ষক ছন্দ বিষয়ে এতটা উদাসীন বলিয়া মনে করিব কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস "ভাবে" কাটিয়াই তোলাপাঠে "পাপে" বসানো হইয়াছিল। কিন্তু কাটার দাগটা অস্পষ্ট হওয়াতেই সংশয়ের উদয় হইয়াছে। এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি,— তোলাপাঠে যে "পাপে" শব্দটি বসানো হইয়াছে সেটির হস্তাক্ষর লিপিকরের নয়।

আলোচ্য পংক্তির মাত্রাসংখ্যা আট হওয়া উচিত বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি? পদটি ত্রিপদী— ৬+৬+৮ মাত্রার। একথা সত্য যে কবিতাটির সকল চরণেই মাত্রাসংখ্যার সামঞ্জস্য নাই। প্রথম চরণটিকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। সেটি এইরূপ—

চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।

"তেরছ কৈল (কইল) সীকা" যে আট মাত্রার পংক্তি তাহাতে কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণটি দেখুন।—

সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রুপার ভাণ্ডত ঘী।

কবি যে ৬+৬+৮ মাত্রাদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। তবে সর্বত্র

সে আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্ম ছন্দোবোধ তাঁহার ছিল না; একথা মানিতেই হইবে। তবে প্রাচীন কালের প্রায় সব রচনাই গেয় বলিয়া সেকালের কবিরা সুরের উপর অনেকখানি বরাত দিয়া নিজের কাজ হালকা করিয়া ফেলিতেন। মাত্রা কম পড়িলে টানিয়া বাড়ানো এবং বেশী হইলে চাপিয়া কমানোর দায়িত্ব বর্তাইত গায়কের উপর। কৃষ্ণকীর্তন যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এ গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি পদও পাওয়া যাইবে না যাহা ছন্দের বিচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আমরা যে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথমার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার প্রথম পদে ৬ এবং তৃতীয় পদে ৮ মাত্রা ঠিকই আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদে দুই মাত্রা বেশী। সংশোধক ছন্দের ছকটা ধরিতে পারেন নাই। তাহার একটি কৌতুকজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি "ভাগুত"র পরে তোলাপাঠে "সজাইল" শব্দটি নূতন বসাইয়াছেন। আর ওই সঙ্গে "ভাগুত"র "ত" অক্ষরটি কাটিয়া "গু"এর বাঁ পাশে একটি একার বসাইয়া দিয়াছেন। উঁহার ধারণা হইয়াছে ত্রিপদীর এই তৃতীয় পদটি দশাক্ষরী। বস্তুতঃ এই পংক্তিটির অক্ষরসংখ্যা বাড়াইয়া দশ করিতে গিয়া ছন্দ নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল দ্বিতীয় পদের দুই মাত্রা কমানো। তাহা না করিয়া তিনি তৃতীয় পদে দুই মাত্রা বাড়াইয়াছন। আমরা এ পর্যন্ত যতগুলি সংশোধন লক্ষ্য করিয়াছি অধিকাংশই সংশোধকের চিন্তা ও সতর্কতার সাক্ষ্য বহন করে। তবে এই পদটির ক্ষেত্রে একটু অসতর্কতা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন ঘটিল? পদটি পড়িলে দেখিব আসল অপরাধ সংশোধকের নয়, অপরাধ মূল কবির। তিনি ত্রিপদী ছন্দের কবিতা লিখিয়াছেন বটে কিন্তু হ্রস্ব ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মধ্যে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। কবিতার আরম্ভের যে অংশ প্রথমে তুলিয়াছিলাম সেটি প্রায় বিশুদ্ধ হ্রস্ব ত্রিপদী। আবার একবার উদ্ধৃত করি :

চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।

মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৮। ওই পদেরই তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয়ার্ধের সহিত তুলনা করুন :—

সোনার রূপার ভাগু তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী।

ইহার মাত্রাসংখ্যা ৮+৮+১০। দুইটি স্বতন্ত্র ছন্দ মিশিয়া গিয়াছে। পাঠ-পরীক্ষক সেইজন্যই গোলে পড়িয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন কবিতাটির মূল ছন্দ দীর্ঘ ত্রিপদী। যে দুইটি সংশোধন দেখিলাম সেই ক্ষেত্রেই মাত্রাসংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে অর্থাৎ যাহা হ্রস্ব ত্রিপদী বা তাহার কাছাকাছি ছিল তাহাকে দীর্ঘ ত্রিপদী করা হইয়াছে। কিন্তু ৬+৬+৮ মাত্রার চরণও অনেক রহিয়া গিয়াছে। সবগুলিকে ৮+৮+১০ করা হয় নাই। আলোচ্য সংশোধনটি যে লিপিকরের স্বহস্তকৃত নয় তাহারও একটি প্রমাণ আছে। মূল পাঠের বর্গীয় জ সর্বদাই [ড] এইরূপ। কিন্তু "সজাইল" র "জ" একালের 'জ' এর মত।

ভা-১৪।১।৪—প্রথমে ছিল "পাঞ্চ সঙ্গতি কাহ্ন করিল আন্ধার"। পাঠ-পরীক্ষক "সঙ্গতি"র "সঙ্গ" কাটিয়া তোলাপাঠে "দুর্গ" করিয়াছেন। (৩ সংখ্যক আলোকচিত্রাম্নুলিপি দ্রষ্টব্য।) স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে এই সংশোধনকারী 'অবস্থা' অর্থে "সঙ্গতি" শব্দটা পছন্দ করিতেছেন না। তিনি "সঙ্গতি"র স্থলে "দুর্গতি" করিতে চাহিয়াছেন। মূল কবির কখনও তাহা অভিপ্রেত ছিল না। সংশোধনকারী একটু অবহিত হইলে দেখিতে

পাইতেন যে "পাঞ্চ সঙ্গতি" ইডিয়মটি গ্রন্থমধ্যে আরও কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,— "আজ্ঞি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী"— দা-৬১। "রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী"— যব-১৮। অবস্থা অর্থে গতি শব্দের প্রয়োগ ভাষায় প্রচলিত। "সঙ্গতি"ও এখানে অবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ ভাব বুঝাইতে "পাঞ্চ আবথা" (<অবস্থা)র ব্যবহারও কৃষ্ণকীর্তনে বিরল নহে। যেমন,— "কাহ্নাঞিঁর হাথে পাঞ্চ আবথা বড়ায়ির মাথা খাআঁ"—দা-১০৩, "নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে"— বং-২৯, "আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা"—তা-১৩। "পাঁচ আবথা"র অর্থ বিপদ, দুর্গতি। "পাঞ্চ সঙ্গতি"রও একই অর্থ। "পাঁচ" এই অঙ্কবাচক শব্দটি "আবথা" বা "সঙ্গতি" শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হইতে পারে। "দুর্গতি"র সহিত পারে না। "পাঞ্চ আবথা" "পাঞ্চ সঙ্গতি" প্রচলিত ইডিয়ম ছিল, "পাঞ্চ দুর্গতি" ইডিয়ম নয়। কৃষ্ণকীর্তনে "পাঞ্চ দুর্গতি" একবারও পাওয়া যায় না।

"পাঞ্চ আবথা" এই ইডিয়মের প্রয়োগ কি ভাবে প্রচলিত হইল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনুমান করি "পঞ্চত্ব" হইতেই ইহার উদ্‌ভব। হিতোপদেশের সেই যে "শৃগালঃ পঞ্চত্বং গতঃ" তাহার কথা সকলেরই মনে আছে। বাল্যকালে কোনো এক "বোধিনী"তে ওই বাক্যের যে ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছিলাম তাহার আক্ষরিকতা এতই অত্যুগ্র যে আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। অনুবাদটি এই— "The jackal was reduced to the state of five"। "পাঁচ আবথা" আসলে মৃত্যু, তাহা হইতে বিপদ দুর্গতি ইত্যাদি অর্থ আসিয়া গিয়াছে। "পাঞ্চ সঙ্গতি" সম্পর্কেও একই কথা। তবে "পাঞ্চ সঙ্গতি" ও "পাঞ্চ আবথা" এই দুইয়ের মধ্যে "পাঞ্চ আবথা"ই অধিক প্রচলিত ছিল। "সঙ্গতি" শব্দের ব্যবহার এরূপ ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত ছিল না; অন্ততঃ পাঠ-সংশোধকের এই ইডিয়মটি জানা ছিল না। তাই তিনি "সঙ্গতি" কাটিয়া "দুর্গতি" বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক বসন্তবাবুও মনে করেন মূল কবির রচনায় "সঙ্গতি"ই ছিল "দুর্গতি" নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। তোলাপাঠে যে "দুর্গ" শব্দ বসানো হইয়াছে তাহা অন্যের হস্তাক্ষর, লিপিকরের নহে। মূল পাঠে রেফযুক্ত গ যখনই লেখা হইয়াছে তখনই গ-এর দ্বিত্ব করা হইয়াছে। যেমন "স্বগর্গ", "স্বগগ"। তোলা পাঠে একটি গ-এর উপর রেফ আছে, গ-এর দ্বিত্ব হয় নাই। ৩ সংখ্যক চিত্রানুলিপি দ্রষ্টব্য।

ভা-১৫।২।২—ছিল "আর শির তুলী না দেখিব তার।" পরে তোলাপাঠে "তুলি"র পর "মুখ" বসানো হইয়াছে। ইহার ফলে ছন্দ এবং অর্থ উভয় দিক দিয়াই উন্নতি হইয়াছে।

ছ-৬।ধ্রু।১— আলোচ্য ছত্রের শেষের শব্দটি ছিল 'সরোঅরময়ী'। উহার "অ" কাটিয়া তোলাপাঠে "ব" বসানো হইয়াছে। এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। কবি নিশ্চয় "সরোঅর" লিখিয়াছিলেন প্রচলিত উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া। এই গ্রন্থেই অন্যত্র "সরোঅর" শব্দ এই বানানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য— "হংস রএ সরোঅরে"— দা-৪৬। পাঠ-পরীক্ষক সম্ভবতঃ মনে করিয়াছেন, "সরোঅর"কে সংস্কৃত করিয়া "সরোবর" করিলে কাব্যের মাহাত্ম্য বাড়িবে।

ছ-৭।৩।৪— কৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে প্রত্যেক স্তবকের শেষে "॥ ১ ॥", "॥ ২ ॥", "॥ ধ্রু ॥" এইরূপে সংখ্যার নির্দেশ আছে। আলোচ্য স্তবকের শেষে কেবল একটি [॥] জোড়া দাঁড়ি ছিল। পাঠ-পরীক্ষক তোলাপাঠে বসাইয়াছেন "৩॥"। এটি সতর্ক পরীক্ষার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ছ-৯।৩।২— ছিল "আম্মা ভাঙিবারে কেহে পাত উপকারে"। "উ" কাটিয়া তোলাপাঠে "প"র পরে "র" বসাইয়া "পরকারে" করা হইয়াছে।

বৃ-৩।৪।২— ছিল "মনত গুণিঞাঁ বোল আপণে"। পয়ারের পক্ষে পংক্তিটি হ্রস্ব হইয়াছে বটে তবে এ রকম হ্রস্বতা বিরল নহে। কিন্তু তিন অক্ষরের একটি শব্দ বসাইতে পারিলে ভাল হয়। তোলা-পাঠে "বোল" শব্দের পর "উপায়" বসানো হইয়াছে। ইহাতে ছত্রটির পাঠসৌকর্য বাড়িয়াছে। এই পদেই অনুরূপ ক্ষেত্রে "উপায়" শব্দটিই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন, "আপণে উপায় তোক্ষে কহ মোর ঠাঁয়ি।" — বৃ-৩।৯।২। তোলাপাঠে "উপায়" শব্দের পাশে "৩" অঙ্ক থাকায় অনুমিত হয় এই সংশোধনটিও লিপিকরের নয়, অন্যের হাতের।

পাঠ-পরীক্ষক যে ছন্দের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন সংশোধনের প্রকৃতি দেখিয়া তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। আলোচ্য পদেরই ১১ সংখ্যক স্তবকের ২য় ছত্র ছিল,—"হেন বোল সমাক কিছু ভরছিঞাঁ"। "হেন বোল"-এর পর তোলাপাঠে একটি "তা" বসানো হইয়াছে। এই "তা"র পাশে আধুনিক "৩" অঙ্ক চিহ্নিত আছে, সুতরাং ইহাও লিপিকরের স্বকৃত সংশোধন নয়। এই পদেরই ১৩শ স্তবকের ২য় ছত্রে ছিল "ভাল বুঝিলোঁ রাধা গমন উপাএ"। পয়ারের পক্ষে নিতান্ত খারাপ নয়, বরং ভালই বলিব। "ভাল" কে তিন মাত্রা করিয়া বেশ পড়া যায়। কিন্তু পাঠ-পরীক্ষকের কানে সম্ভবতঃ মাত্রাসংখ্যা একটু কম ঠেকিয়াছিল। তাই তিনি "রাধা"র পর একটি "মোর" বসাইয়া দিয়াছেন। পরিবর্তিত চরণে "ভাল" দুই মাত্রা থাকিবে বটে কিন্তু "বুঝিলোঁ"কে কমাইয়া দুই করিতে হইবে। পরিবর্তনের ফলে ছত্রটির যে ছন্দ বিষয়ে কিছু উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অর্থের যে একটু গণ্ডগোল ঘটিয়াছে সংশোধক তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তোলাপাঠে যে "মোর"টি বসাইয়াছেন সেটি "তোর" হওয়া উচিত ছিল।

বৃ-৪।৪।২— এখানেও তোলাপাঠে একটি "তা" বসাইয়া ছন্দের উন্নতি সম্পাদন করা হইয়াছে। তোলাপাঠ বসাইবার পর পংক্তিটি হইয়াছে "প্রণাম করিঞাঁ বুইল তা সন্ধার পাএ"। অবশ্য পূর্বপদে "তা"-এর যতটা প্রয়োজন ছিল বর্তমান পদে ততটা ছিল না। বর্তমান পদে "সন্ধার"কে টানিয়া চার মাত্রা করা চলে। কিন্তু পূর্বপদে "সমাক" ছিল তাহাকে চার মাত্রা করা কঠিন ছিল।

বৃ-৫।১।১— ছিল "তোর রতি আর্শে গেলা আভিসারে"। অর্থের দোষ ছিল না কিন্তু ছন্দে একটু খাটো ছিল। তোলাপাঠে "আর্শে"র পূর্বে "আশো" বসাইয়া চৌদ্দ মাত্রা পূরণ করা হইয়াছে।

বৃ-১০।৩।৪— "তথাঁক না লইহ সংকতী"। করা হইয়াছে "তথাঁক না লইহ লোক কেহ সংহতী"। "সংকতী"র "ক" যে ভুল ছিল এবং উহার স্থানে "হ" হওয়া উচিত ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে এ সংশোধনও লিপিকরের নয়। "ক" স্থানে তোলাপাঠে যে "হ" লেখা আছে তাহার পাশে ছত্রজ্ঞাপক "৩" অঙ্ক আছে। "লোক কেহ" শব্দ দুইটিও তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। এই ছত্রের তোলাপাঠ লিপিকরের নয়। লিপিকরের নয় বলিয়াই, মনে হয়, সংশোধন মূল দেখিয়া করা হয় নাই। তাহা না হইলেও সংশোধনে ছত্রটির কিছু উন্নতি হইয়াছে। পয়ারের পক্ষে ছত্রটির মাত্রাসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল, শব্দদুইটি যোগ করাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অক্ষর চৌদ্দ হইলেও মাত্রা অবশ্য পুরাপুরি চৌদ্দ হয় নাই, তবু পাঠযোগ্য হইয়াছে।

বৃ-১৭।৩।৩— ছিল "কে না উপহাসে"। এই ছত্রটিতে আট মাত্রা থাকা আবশ্যক, কিন্তু অনেক কম আছে। সংশোধক "না"র পর তোলাপাঠে একটি "হিঁ" বসাইয়া কিছুটা বাড়াইয়াছেন। তবু আর এক মাত্রার অভাব থাকিয়া গিয়াছে। অবশ্য আলোচ্য পদে অল্প মাত্রার চরণ আরও আছে, লিপিকর বা আর কেহ অন্য কোনো চরণে হাত দেন নাই।

বৃ-১৮।১।৬— ছিল "আধর লোভে"। করা হইয়াছে "আধর আমিঁআ লোভে"। শব্দটি লিপিকরের হাতে যে ছাড় পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সংযোজন সার্থক এবং সংগত সংযোজন, কিন্তু হাতের লেখা অন্যের, লিপিকরের নহে।

বৃ-২০।২।৩— ছিল "জত পরাধ কৈ জাণহ আপণে"। দ্রুতলিখন অথবা অসতর্কতা বশতঃ দুটি অক্ষর পড়িয়া গিয়াছিল তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। তাহাতে ছত্রটির পরিবর্তিত রূপ হইয়াছে,— "জত আপরাধ কৈল জাণহ আপণে"।

যব-১০।ধ্রু।১— ছিল "ধীরেঁ ধীরেঁ যা গোআলিনী সুণ মোর বোল"। পুঁথির সংশোধক তোলাপাঠে একটি "হা" বসাইয়া "যা" স্থলে "যাহা" করেন। এই সংশোধনের কি প্রয়োজন ছিল তাহা ভাল বোঝা যাইতেছে না। প্রথমতঃ অনুজ্ঞায় "যা" এবং "যাহা" দুই রূপই বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং সে দিক্ দিয়া "যাহা" করিবার অত্যাবশ্যকতা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ "যাহা" করায় ছন্দের উৎকর্ষ ঘটে নাই। অর্থেরও নয়। সম্পাদক মহাশয় একটা "ধীরেঁ" শব্দ মুদ্রিত পুস্তকে তুলিয়া দিয়াছেন। অর্থ বা ছন্দের সৌকর্যার্থে বসন্তবাবু স্বীয় দায়িত্বে যে সব পরিবর্তন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব।

যব-১১।ধ্রু।২—"কি কারণে ঝগড় করহ সব খন"। "করহ" শব্দে "হ" প্রথমে ছিল না, তোলাপাঠে দেওয়া হইয়াছে। এই তোলাপাঠ দেওয়ায় পাঠের সুস্পষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য পদের ৩য় স্তবকের ২য় ছত্রে একটি "মন্দ" শব্দ তোলাপাঠে দেওয়া হইয়াছে। ছত্রটি ছিল এই,—"তোহ্মে কি না জানহ ভাল সখিগণ"। সংশোধিত রূপ হইয়াছে,— "তোহ্মে কিনা জানহ মন্দ ভাল সখিগণ"। অর্থের দিক্ দিয়া শব্দটি আকাঙ্ক্ষিত। "জানহ" কে "জান" করা চলে। গ্রন্থমধ্যে একই অর্থে "জানহ" এবং "জান" এই দুই রূপই বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সংশোধক "মন্দ" বসাইয়াছেন তিনি "হ"টা কাটিয়া দিতে পারিতেন এবং তাহা করিলে ছত্রটি সুখপাঠ্য হইত।

যব-১৪।৪।২— ছিল "তবে নাহিঁ নাহে পানী লআঁ চলে"। "নাহে"র পর তোলাপাঠে "ডরে" বসানো হইয়াছে। ওই পদেরই ৫ম স্তবকের ২য় ছত্র ছিল "এবেঁ মিছ কর ডর যমুনার"। "ডর"-এর পর তোলাপাঠে "জলে" বসানো হইয়াছে। উল্লিখিত দুই ছত্রের "ডরে" ও "জলে" যে বাদ পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সংশোধন সার্থক হইয়াছে।

যব-১৬।২।১— ছিল "ষোল সহস্র গোপী এ দামোদর"। তোলাপাঠে "এ"র পর "কলা" বসিয়াছে। লিখিবার সময় দুটি অক্ষর যে ছাড় পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে ভুল হয় না। সংশোধিত রূপ হইল,— "ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদর"। ওই স্তবকের ২য় ছত্র— "ডুবিআঁ মাইলেন্ত জলের ভিতরে"। "মাইলেন্ত" এবং "জলের" এই দুই শব্দের মধ্যে "কাহ্নাঞিঁ" শব্দ তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। এ সংশোধনও সার্থক এবং মূলের সহিত মিলাইয়াই করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যমুনান্তর্গত হারখণ্ডের প্রারম্ভেই লেখা হইয়াছিল "ইতি যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ"। সংশোধক "ইতি"

কাটিয়া তোলাপাঠে "অথ" লিখিয়াছেন। হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় লিপিকরই এ সংশোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিকর আদৌ "ইতি" লিখিয়াছিলেন কেন? ভুলের কারণ কি?

পূর্বেই বলিয়াছি যমুনাখণ্ডান্তর্গত দ্বিতীয় অংশের—যাহার নাম দিয়াছি যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড— আরম্ভ অথবা সমাপ্তির নির্দেশ নাই। হয়তো আদর্শ পুঁথিতেই ছাড় ছিল এবং লিপিকর তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। লিপিকর যমুনান্তর্গত দ্বিতীয় অংশ শেষ করিয়াই দেখিলেন আদর্শ পুঁথিতে আছে "অথ··· হারখণ্ডঃ"। একটা খণ্ড শেষ হইলেই "ইতি অমুকখণ্ডঃ" লেখাই রীতি। লিপিকর তদনুসারে "অথ··· হারখণ্ডঃ" দেখিয়াও সংস্কারবশতঃ "অথ"র স্থানে "ইতি" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ভুল বুঝিয়া "ইতি" কাটিয়া অথ করেন।

যহা-৪।৩।৪— ছিল "দুই কান্ধ ফুলা বহাইআঁ দধিভারে"। "ফুলা"র পর তোলাপাঠে "য়িল" বসানো হইয়াছে। অর্থ ও ব্যাকরণের দিক্ দিয়া বাক্যটির উন্নতি হইলেও এই সংযোজনের ফলে ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে।

বা-১৪।১।২—ছিল "কংস মারিবারে আবতার কৈল"। মধ্যে তোলাপাঠে "আহ্মে" বসাইয়া "কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল" করা হইয়াছে। আদর্শ পুঁথিতে "আহ্মে" নিশ্চয় ছিল। "আহ্মে" না থাকিলে বাক্যটি অর্থ এবং ছন্দ উভয় দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বোধ হয়।

বা-১৬।১।১— ছিল "পরিহাসে মাইলোঁ তোকে"। পরে "মাইলোঁ"র "মা" কাটিয়া তোলাপাঠে উহার স্থলে "বু" বসানো হইয়াছে। স্পষ্টতঃই ভুল হইয়াছিল। আদর্শে যে "বুইলোঁ" ছিল তাহা পরবর্তী এই ছত্র হইতে বেশ বোঝা যায়,— "এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস"।

বা-১৯।৫।৪— ছিল "হেন তিরীবধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে বুলে"। "সঙ্গে"র পর তোলাপাঠে "তোর" বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংযোজন সার্থক এবং অপেক্ষিত। আদর্শ পুঁথিতে নিশ্চয় ছিল।

বা-২০।৩।১— ছিল "তোঞিঁ বুয়িলী রাধা মোরে দিল গালী"। এখানে তোলাপাঠে "বুয়িলী" শব্দের পর একটি "বড়ায়ি" বসানো হইয়াছে। আদর্শে ছিল অথবা সংশোধক স্বাধীনভাবেই শব্দটি বসাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। তবে এটা নিঃসংশয় যে এই তোলাপাঠের সংযোজনে বাক্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পয়ার চৌদ্দ মাত্রার ছত্র। প্রথমে ছিল তের অক্ষর। একটি দুই অক্ষরের শব্দ "তোঞিঁ"কে টানিয়া তিন মাত্রা করিলেই কাজ চলিয়া যাইত। মূল কবিরও অভিপ্রায় সেইরূপই ছিল বলিয়া মনে হয়। ছন্দোলিপি দেখুন,—

। । ।।। ।।   । । ।। ।।
তোঞিঁ বুয়িলি রাধা। মোরে দিল গালী।

পড়িতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ৮+৬ মাত্রার ভাগ সহজেই করা যাইতেছে। সংশোধিত ছত্রে অক্ষর সংখ্যা ষোল, চৌদ্দ মাত্রায় আনিতে গেলে দুইটি তিন অক্ষরের শব্দকে চাপিয়া চার (২+২=৪) মাত্রায় আনিতে হয়। শব্দের উপর সে উৎপীড়নটা একটু অস্বাভাবিক হয়। সংশোধিত ছত্রের ছন্দোলিপি দেখুন,—

। । ।। ।। । । । । ।। ।।
তোঞিঁ বুয়িলী বড়ায়ি রাধা। মোরে দিল গালী।

হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে হয় এ সংশোধন লিপিকরের নহে।

বা-২৩।২।২— ছিল "মা খঞ্জিল তুঈ পাশে" তোলাপাঠে "মা"র পর "ণিকেঁ" বসাইয়া করা হইয়াছে মাণিকেঁ খঞ্জিল তুঈ পাশে"। স্পষ্টতঃই ছাড় পড়িয়াছিল।

বং ১।৮।১— ছিল "যমুনার ঘাটে বাঁশীনাদ স্নুনী"। তোলাপাঠে "ঘাটে"র পর "রাধা" বসানো হইয়াছে। সংশোধনের হস্তাক্ষর লিপিকরের নয় বলিয়াই মনে হইতেছে। যাঁহার হাতেই হউক "রাধা" সংযোজনের ফলে ছত্রটির উন্নতি হইয়াছে।

বং ৪।২।৪— ছিল "তথাঁ বা কেমনে পায়িব চক্রপানী"। "পায়িব"র পর তোলাপাঠে "দেব" বসানো হইয়াছে। এই সংযোজনটিও সার্থক হইয়াছে।

বং ৫।১।১— ছিল "আইল বড়ায়ি রাখহ পরাণ"। পরে "বড়ায়ি" এবং "রাখহ"র মধ্যে তোলাপাঠে "মোর" বসানো হইয়াছে। এই সংশোধন লিপিকরের স্বহস্তকৃত, কাজেই মনে হয়, আদর্শ পুস্তকেও "মোর" ছিল, নকল করিবার সময় ছাড় পড়িয়াছিল।

বং ৫।৪।১— ছিল "আহ্মা বচন শুন তোহ্মে বড়ি মা"। "আহ্মা" পরে "র" বসাইয়া "আহ্মার" করা হইয়াছে। এ সংশোধন সম্পর্কে মন্তব্য অনাবশ্যক।

বং ৭।২।৩— ছিল "আপনা চিহ্নিআঁ থাক আইহনে রাণী"। "আইহনে"র পর তোলাপাঠে "র" বসাইয়া "আইহনের" করা হইয়াছে। এটিও আগের মত সুস্পষ্ট ছাড়।

বং ১৭।৩।১— ছিল "যমুনার তীরে কদমের তলে"। মধ্যে তোলাপাঠে "বড়ায়ি" বসাইয়া করা হইয়াছে "যমুনার তীরে বড়ায়ি কদমের তলে"। হাতের লেখা সম্ভবতঃ লিপিকরের নয়। তবে সংশোধন সার্থক।

বং ১৮।৩।২— ছিল "খন পায়িবাক"। তোলাপাঠে "এ" বসাইয়া করা হইয়াছে "এখন পায়িবাক"। "এ"টি লিপিকরের লেখায় ছাড় পড়িয়াছিল। "এ"র পাশে "৩" অঙ্ক থাকায় বোঝা যাইতেছে এ সংশোধন লিপিকরের নয়।

বি-৮।৯।২— ছিল "বাছা রাখিবারে জাএ সে গোকুলে"। তোলাপাঠে "রাখিবারে"র পর "কাহ্ন" বসাইয়া করা হইয়াছে "বাছা রাখিবারে কাহ্ন জাএ সে গোকুলে"। সংশোধনের ফলে ছত্রটির উন্নতি হইয়াছে।

বি-৮।১১।১— ছিল "বৃন্দাবনে কাহ্নাঞি ভালমতে"। তোলাপাঠে "কাহ্নাঞি"র পর "চাইহ" বসানো হইয়াছে। এ সংশোধনটিরও প্রয়োজন ছিল। এই তোলাপাঠটি মুদ্রিত পুস্তকে ধরা হয় নাই।

বি-১০।৩।২ ছিল "যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নে"। তোলাপাঠে "যেহ্নে"র পরে "মনে" বসানো হইয়াছে। তাহার পর "হ্নে"র এ-কার কাটা হইয়াছে। সংশোধনের পর ছত্রটির রূপ হইল,— "যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে"। অর্থের বিচারে "যেহ্নে" থাকায় কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ছন্দের জন্য তুই মাত্রার প্রয়োজন ছিল। যিনিই করুন এই সংশোধনের দ্বারা ছত্রটির উৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

বি-১২।২।২— ছিল "কাহ্নাঞি তেজুক তোর নেহে"। তোলাপাঠে "হো" দিয়া "তোর"কে "তোহোর" করা হইয়াছে। লিপিকর "তোর" লিখিয়াছিলেন, "তোর"টাই স্বভাবতঃ আসে। তাহা ছাড়া ছন্দের দিক্ দিয়াও "তোহোর" অপেক্ষা "তোর"টাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তবে "হো" যোগ করা হইল কেন? পাঠ মিলাইবার সময় কি লিপিকর আদর্শ পুঁথিতে "তোহোর" দেখিয়া "হো" বসাইয়াছেন? না, তাহাও

নয়। কারণ তোলাপাঠের "হো"র পর "৩" অঙ্ক আছে। সুতরাং এ সংশোধন লিপিকরের হইতে পারে না। আর লিপিকর ব্যতীত আর যে বা যাঁহারা পরবর্তীকালে পাঠ পরীক্ষা এবং সংশোধন করিয়াছেন তাঁহাদের হাতের কাছে আদর্শপুঁথি ছিল এমন মনে করিবার কারণ দেখি না। সংশোধক নিজের ইচ্ছানুসারেই এই "হো" যোগ কবিয়াছেন, কিন্তু এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি তাহা বোঝা যাইতেছে না।

বি-১২।৩।১— লিপিকর পুঁথিতে "ষোল সহস্র" লিখিয়াছিলেন। পরে তোলাপাঠে "হ" বসাইয়া "ষোল"কে "ষোলহ" করা হয়। এই "হ"-এর যোগে কিন্তু ছত্রটির উন্নতি হইয়াছে।

বি-১২।৪।৩—এই ছত্রটি লিখিতে গিয়া লিপিকর দুইটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রথমে "তবেঁ" লিখিতে গিয়া "তো" লিখিয়া ফেলেন। "তো" লিখিয়াই বুঝিলেন ভুল হইয়া গিয়াছে, তখন "তো"র বাঁয়ের একারটি কাটিয়া ডাহিনের আকারটিকে ে-কারের মত একটু বাঁকা করিয়া দিলেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে, পুঁথির া-কার এবং ে-কারের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই। সুতরাং া-কারকে ে-কারে পরিণত করা খুবই সহজ। যাহাই হউক লিপিকর এইভাবে া-কারকে ে-কার করিয়া তাহার পর "বঁ" বসাইলেন। "তো" এইভাবে "তবেঁ" রূপ পাইল। তাহার পর লিখিলেন "তোরে বা কাহ্ন সম্ভাসে"। এই অংশেও একটা ভুল হইয়া গেল। "বা" এই অক্ষরটি "কাহ্ন"র আগে না বসিয়া পরে বসিবে। তখন লিখিত "বা" কাটিয়া তোলাপাঠে "কাহ্ন"-এর পর "বা" বসাইতে হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে এই সংশোধনের কথা বলা হয় নাই।

বি-১৫।৪।২— ছিল "এবেঁ তাক চাহি দেশে"। তোলাপাঠে "বন" যোগ করিয়া করা হইল "এবেঁ তাক চাহি বনদেশে"। এটিও ছাড়ের দৃষ্টান্ত।

বি ১৬।২।৪— ছিল "তথাঁ গেলে তার পাইব দরশন"। করা হইল "তথাঁ গেলে রাধা তার পাইব দরশন"। "রাধা" তোলাপাঠে। সংশোধনে ছত্রটির উন্নতি হইয়াছে।

বি-১৬।৩।৪— এই ছত্রেও দুই মাত্রা কম পড়িয়াছিল। প্রথমে ছিল "ছাড়িতে না পারে কদমের তল", "পারে"র পর "সে তো" যোগ করা হইয়াছে।

বি-১৬।৩।২— ছিল "তথাঁ তোর মনোরথ হয়িঁব সকল"। "সকল" এর "ক" কাটিয়া "ফ" করা হইয়াছে। লিপিকর ভুল করিয়া "ফ" কে "ক" করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বি-১৮।৩।১— ত্রিপদীর প্রথম দুই পদ, প্রয়োজন ৬+৬ মাত্রা। কিন্তু মূলে ছিল ৪+৬। "সব খন নান্দের নন্দন"। পড়িতে গিয়াই ভুল ধরা পড়ে। প্রথম পদে অতিরিক্ত দুই মাত্রা আবশ্যক। তোলাপাঠে দুই মাত্রার শব্দ "মোরে" বসাইয়া করা হইল "সব খন মোরে নান্দের নন্দন"।

বি-১৮।৪।২— ছিল "কি মোর বসতি আশে"। "আশের" "আ" কাটিয়া "বা" করা হইয়াছে। পরের ছত্রে আছে "কি মোর জীবন আশে"। এই "আশে" দেখিয়াই লিপিকর ভুল করিয়া পূর্ব পদে "আশে" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন পরে মিলাইতে গিয়া সংশোধন করিয়াছেন। সংশোধন করিলেন বটে কিন্তু একটি ত্রুটি রহিয়া গেল। লিপিকর "আশে"র "আ"টি কাটিলেন কিন্তু তালব্য শ কাটিয়া দন্ত্য স করিলেন না। কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকর বানান সম্পর্কে উদাসীন, বানানে যথেচ্ছাচারের জন্য হয়তো মূল কবিকেও দায়ী করা যাইতে পারে। তা সে দায়িত্ব যাহারই হউক না কেন, কৃষ্ণকীর্তনের বানানে যে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব তাহাতে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু এত অনিয়মের মধ্যেও কোথাও কোথাও দুই

একটি নিয়মের নিদর্শন দেখা যায়। যেমন,—"বাস" শব্দটি যখনই লেখা হইয়াছে তখনই "স" দিয়া বানান করা হইয়াছে, একবারও তালব্য শ দিয়া হয় নাই। এখানেও হইত না, যদি লিপিকর প্রথমেই "আশে" না লিখিয়া "বাসে" লিখিতেন। কিন্তু "আশে" লিখিবার পর "আ" কাটিলেই কাজ চলিয়া যায় বলিয়া আর "শে"তে হাত দিলেন না। পুঁথির পাঠ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে লিপিকর যখনই কোনো সংশোধন করিয়াছেন তখনই পরিচ্ছন্নতার দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। যতটুকু নিতান্ত না কাটিলে নয় ততটুকুই কাটিয়াছেন; এবং সে কাটাও সর্বত্র সাফ কলমে কাটা নয়, মাথায় বিন্দু চিহ্ন দিয়া কাটা। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য পুঁথির পাতা এবং পাঠ যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখা। এই কারণেই লিপিকর "আশে" র "আ" কাটিয়াছেন, কিন্তু তালব্য "শ" কাটিয়া দন্ত্য স করেন নাই।

বি-২৪।৪।১— ছিল "বারেঁ বারেঁ যত বুয়িলোঁ। আহঙ্কারে"। "যত"র পর তোলাপাঠে "তোক" বসাইয়া ছন্দ সংশোধন করা হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি তোলাপাঠের অনেকগুলিই দুই মাত্রার শব্দ। যেমন,— "রাধা", "কাহ্ন", "তোক", "মোক", "তোর", "মোর", ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে তোলাপাঠের সংযোজনে অর্থেরও উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ছন্দের উন্নতিই সংশোধকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমাদের মনে হয় লেখার পর যখন লিপিকর আদর্শের সঙ্গে পাঠ মিলান তখন আদর্শ ও প্রতিলিপির প্রতি ছত্রের প্রতিটি শব্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া দেখা সম্ভব হয় নাই। প্রতিলিপিটি পড়িতে পড়িতে যেখানে কানে ঠেকিয়াছে সেইখানেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজন মত হয় কিছু জুড়িয়াছেন, নয় কিছু কাটিয়াছেন। তোলাপাঠে সংযোজিত দুই অক্ষরের শব্দ এই বিরহখণ্ডেই নিতান্ত কম নয়। এখানে কয়েকটি তুলিয়া দেখাইতেছি:

বি-২৫।২।১— ছিল "বড়ার বহুআরী তোহ্মে হনের রাণী"। করা হইয়াছে "বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই হনের রাণী"।

বি-২৬।৪।১— ছিল "মোর যৌবনে পড়িলাহা ভোলে"। করা হইয়াছে "মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে"।

বি-২৭।২।২ ছিল— "আহ্মে ত ভাগিনা দেব সমতুলে"। করা হইয়াছে— "আহ্মে ত ভাগিনা তোর দেব সমতুলে"।

বি-৩২।১।৪— ছিল "তোহ্মে যোগী হৈলা সকল তেজিআঁ"। করা হইয়াছে "তোহ্মে জবেঁ যোগী হৈলা সকল তেজিআঁ"।

বি-৩২।২।১— ছিল "পরাণে না মার দেব গদাধরে"। করা হইয়াছে "পরাণে না মার মোরে দেব গদাধরে"।

বি-৩২।ঞ্চ।১— ছিল "না জাইবোঁ ঘর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ"। করা হইল "না জাইবোঁ ঘর আর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ"।

বি-৩৪।৭।১— ছিল— "না বোল নিরাস"। করা হইয়াছে "না বোল মোরে নিরাস"।

বি-৩৫।৪।২— ছিল "জুনি সুধি পাএ রাজা কংশাসুর"। করা হইয়াছে "জুনি সুধি পাএ রাধা রাজা কংশাসুর"। সমগ্র পুঁথির মধ্যে এই একটি মাত্র তোলাপাঠ দেখিতেছি যাহার পাশে তিন অঙ্ক "৩"— এই ভাবে লেখা। এই সংশোধন লিপিকরের হওয়া সম্ভব।

বি-৪৯৷ঞ্৷৩— প্রথমে লেখা হইয়াছিল "দগধিনী ভৈলী তোর দরশনে"। পরের ছত্র আরম্ভ করিবার পূর্বেই লিপিকর বুঝিতে পারেন ভুল হইয়াছে। ছত্রটি হইবে "দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে"। তখনই তিনি বন্ধনী চিহ্নে আবদ্ধ করিয়া "দরশনে" শব্দটি কাটিয়া দিলেন এবং তাহার পর "শরণে" লিখিলেন। (৪ সংখ্যক চিত্রানুলিপি দ্রষ্টব্য।) ভুল ধরা পড়িবার পূর্বেই যদি আরও কিছুটা লেখা হইয়া যাইত তাহা হইলে "শরণে" শব্দটিকে তোলাপাঠে বসাইতে হইত। এ ছত্রে তোলাপাঠে একটি মাত্র অক্ষর বসাইতে হইয়াছে। "তোর"কে "তোহ্মার" করিবার জন্য তোলাপাঠে "হ্মা" বসানো হইয়াছে।

পত্রাবলী সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় পর্ব

শান্তিনিকেতন, ৪ঠা অক্টোবর ১৯১৪

মনে হচ্ছে, আবার যেন আমি কুয়াশার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছি, আর যে দায়িত্বের বোঝা এতদিন আমাকে চেপে ধরেছিল তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছি। এখন আমার মন অনেকটা হালকা হয়েছে, তাতেই আশা হয়, এতদিনে বুঝি আমি আমার সত্যিকারের মুক্তি পেয়ে গেলাম।

আমরা সবাই সুরুল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। এই জায়গাবদলটুকুতে আমার উপকার হয়েছে। ডাক্তার মৈত্র আপনার সম্বন্ধে আমাকে একখানা খুব বড়ো চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলছেন, আবার যদি অসুখে পড়তে না চান তো ভবিষ্যতে আপনাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

শান্তিনিকেতন, ৭ই অক্টোবর ১৯১৪

আমার আর-একটি অন্ধকারের যুগ কেটে গেল। সত্যিই সেটি আমার পক্ষে মস্ত পরীক্ষার কাল গেছে। নিজের মুক্তির জন্য তার প্রয়োজনও অবশ্য ছিল। যে পরিবেশে ছিলাম, তার থেকে যে সরে আসছি তা বেশ বুঝতে পারি। নতুন জায়গার একাকিত্ব আর পুরোনো ফেলে-আসা দিনের স্মৃতিবেদনা— দুইই আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তবে, আনন্দের আভা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, আর জানি, সেই আলোর প্রসাদ শিগগিরই আমি পাব।

উপদেশ দেওয়া আমাকে বন্ধ করতেই হবে। দয়ালু দেবদূতের ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টাও কখনো করব না। আলো কেবল যেন আমি হাতে ধরেই না থাকি, বরং অন্তরের আলোতে আমার চিত্ত যেন সর্বদা উদ্ভাসিত থাকে— এই প্রার্থনাই নিয়ত করছি।

দার্জিলিঙ, ১১ই নবেম্বর ১৯১৪

যথার্থ প্রেম এক আশ্চর্য জিনিস। আমরা কখনো তাকে নিজের প্রাপ্য বলে ধরে নিতে পারি না। আপনার ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য, ভেবে পাই না কি করে আমি তা পেলাম। সম্ভবতঃ সব মানুষেরই এমন কিছু মূল্য থাকে যা তার নিজের আজানা— তা দিয়েই সে অপরের ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সত্য তার চেয়ে ঢের বড়ো। তাই যে ভালোবাসা আমরা যুক্তি দিয়ে দাবি করতে পারি না, তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি। আমাদের মধ্যে অনন্তের যে অংশ রয়েছে, তারই প্রতি এই প্রেম। যে অংশ অতিপ্রত্যক্ষ, তার প্রতি নয়।

কেউ কেউ বলেন, যাকে ভালোবাসি তাকে কল্পনায় আমরা বড়ো করে দেখি। কিন্তু বস্তুত ভালোবাসি বলে তার মধ্যেকার বড়ো অংশটুকু আমরা ধরতে পারি। এই আদর্শসত্তাটিই আসলে তার বাস্তবসত্তা।

মানুষের মধ্যে এই অসংগতি চিরকাল রয়েছে— অযোগ্যতার মধ্য দিয়েই আমাদের যোগ্যতার প্রকাশ

হয়, আর ভালোবাসা আমাদের সেই পথের শেষে পৌঁছে দিয়ে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দেয়। ভালোবাসা না পেলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, আমরা ঠিক যেমনটি আছি তার চেয়ে আমাদের মূল্য ঢের বেশি।

শ্রীযুক্ত রুদ্রকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। তাঁকে বলবেন, আমি চিঠির অরণ্যে পথ হারিয়েছি। পৃথিবীর চতুর্দিকে ধন্যবাদ বিতরণ করে করে এমন অবস্থায় এসেছি যে, কৃতজ্ঞতার কণামাত্রও বুঝি আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট রইল না।

কলিকাতা, ১২ই নবেম্বর ১৯১৪

বিদ্যালয়ের এই আর্থিক দুর্গতি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তা জানি, কিন্তু সেই কল্যাণটুকু আকর্ষণ করে নেবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাও তো আমাদের থাকা চাই। সত্যের উপর আমাদের বিশ্বাস সক্রিয় রাখতে হবে, অথচ আমাদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান ক্ষুণ্ণ হলেও চলবে না। সমস্ত আশ্রমকেই তার নির্জীব নিষ্ক্রিয় অবসাদ থেকে জেগে উঠতে হবে। এই বিপদের সময়ে বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা না রেখে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সংযম ও উপস্থিতবুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

আমাদের বিদ্যালয়টি একটি প্রাণবান প্রতিষ্ঠান। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোটো, সেও যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা তার নিজেরই সমস্যা। কিছু যদি আমরা পেতে চাই তবে আমাদের দিতেও হবে। আশ্রমের ছোটো ছোটো শিশুরাও যেন এই অসুবিধার কথা কিছু কিছু জানতে পারে। এর দায়িত্বের কিছু অংশ তারা নিজেরাও বহন করছে জেনে তারাও যেন গর্ববোধ করতে পারে।

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর ১৯১৪

সমালোচক আর ডিটেকটিভ— এই দু ধরণের লোকই স্বভাবত সন্দিগ্ধ। যেখানে কোথাও কিছু নেই, সেখানেও তাঁরা রূপক আর বোমার গন্ধ পান। তাঁদের বিশ্বাস করানোই মুশকিল যে, আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আমার 'রাজা' নাটকের সমালোচনার বিষয়ে আপনি উল্লেখ করেছেন। মানুষের আত্মায় যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোনো ভেদ নেই। মানবপ্রকৃতির পাপাকাঙ্ক্ষার প্রতীক লেডি ম্যাকবেথ। সুদর্শনাও সেই ধরণের একটি কাল্পনিক চরিত্র। যাই হোক, এর তাৎপর্য সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিমত কি— তাতে কিছু এসে যায় না। তারা যা আছে তাই— সেজন্য কোনো নিয়মের কোঠায় তাদের বন্দী করা কঠিন।

শীত কাটাবার পক্ষে রামগড় জায়গাটি বেশ ভালো বলেই শুনেছি। তাই সেখানে গিয়েই সামনের ক'টি মাস চুপচাপ কাটিয়ে দেব ভাবছি। তবে সেটি আমার একটি গোপন বার্তা, আপনি কিছুতেই সেটি বাইরে প্রকাশ করবেন না। যেখানে যাই ঘটুক, আমাকে চিঠিপত্রের নাগালের বাইরে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ একাকী থাকা এখন আমার প্রয়োজন। বাৎসরিক সভা বা ভাষণ বা সম্মেলন— তাছাড়া আরও যত সব বিরক্তিকর ব্যাপার আছে, যাতে মানুষ নিজেকে না জড়ালেও পারে, অথচ যা মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকবে সেসমস্ত আমি এড়াতে পারব যদি এভাবে মানুষের অগম্য স্থানে থাকতে পারি। আপনি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠে সবে যখন আশ্রমে ফিরছেন, তখনই আমার চলে যাওয়া আমার পক্ষে

অন্যায় ঠিকই ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতে আপনি ছাত্র ও শিক্ষকদের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারবেন এবং তাতেই আমার অনুপস্থিতির বেদনা আপনার পুষিয়ে যাবে।

আগ্রা, ৫ই ডিসেম্বর ১৯১৪

আমাদের বোলপুরের ছেলেরা রিলিফ ফাণ্ড খোলবার জন্য চিনি আর ঘি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে— মডার্ন রিভিউতে এই খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। আপনার কি মনে হয় এটা উচিত কাজ হয়েছে? প্রথমত, কাজটি হল আপনাদের বিলেতের স্কুলের ছাত্রদের অনুকরণ, তাদের নিজেদের চিন্তাপ্রসূত নয়। দ্বিতীয়ত, ছেলেরা যতদিন আমাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে ততদিন তারা তাদের খাদ্যের এমন কোনো অংশই বাদ দিতে পারে না যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ ছেলেরা মাংসের মধ্যেই অনেকখানি চর্বিজাতীয় খাদ্য পায় বলে চিনি ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু আমাদের শান্তিনিকেতনের ছেলেরা যারা খুব অল্পপরিমাণে দুধ খেতে পায় তাদের নিরামিষ খাদ্যে চর্বির অংশ এতই কম যে, তাদের পক্ষে এ খুবই অনিষ্টকর।

তাদের পাঠ্যবই কেনা বন্ধ করে দেবার অধিকার যেমন তাদের নেই, তেমনি এ ধরণের আত্মত্যাগের পথ বেছে নেবারও তাদের কোনো অধিকার নেই। তাদের পক্ষে আত্মত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায় হবে কায়িক পরিশ্রম করে কিছু অর্থ উপার্জন করা। বিদ্যালয়ের কিছু সাধারণ সেবার কাজ ওরা করুক— বাসনমাজা, জলতোলা, কুয়োখোঁড়া, কিংবা যে পুকুরটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা বুজিয়ে দেওয়া— এ ধরণের গড়ে তোলার কাজ কিছু তারা করুক। এটা সব রকমেই ভালো। তা ছাড়া এতে তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষাও হয়ে যাবে। অপরের অনুকরণ না করে ছেলেরা নিজেরা ভেবে দেখুক, কি ধরণের কাজ ওরা আরম্ভ করতে চায়।

এলাহাবাদ, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৪

আমাদের আশ্রমে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীলে ও উন্মুক্ত প্রান্তরের সবুজে আপনি পথ হারিয়েছেন, ভাবতে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনার যাবার আগেই যে আমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাতেও আনন্দ হচ্ছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, জগতের নিগূঢ় সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য মনের যে শান্তিময় বৈরাগ্যের প্রয়োজন— তা আপনি আমাদের আশ্রমেই পাবেন।

এতদিনে নিশ্চয় আপনি ধরতে পেরেছেন যে, আমার মধ্যে এমন-একটা পলাতক মনোভাব রয়েছে যা অন্যদের যেমন আমাকেও তেমনি এড়িয়ে চলে। আমার প্রকৃতিতে এই উপাদানটি রয়েছে বলে আমাকে আমার পরিবেশটি সব সময় উদার এবং উন্মুক্ত রাখতে হয়। যে স্বপ্নাতীতকে মুহুর্মুহু আমার জীবনে প্রত্যাশা করছি তার জন্য স্থান রাখতে হবে তো। বিশ্বাস করুন, মানুষের প্রতি আকর্ষণ আমার খুব প্রবল ; তবু আমি অন্যের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়তে পারি না যাতে আমার জীবনের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই স্রোত যে অন্ধকারে নির্জনে বয়ে যায়, তা আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি ভালোবাসতে পারি, কিন্তু মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ যাকে মাখামাখিভাব বলেন, সে গুণ আমার মধ্যে নেই। আরও যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার মধ্যে এমন-একটা শক্তি কাজ করছে যা অন্য-কিছুতে আমার কোনো রকম অনুরাগ সহ্য করতে পারে না, সব সময়ে কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্যে আমাকে তার নিজস্ব করে রাখতে চায়।

এই উদ্দেশ্যটি যদি নৈতিক হত তাহলেও সহজে সহ্য করা যেত— শুধু সহ্য করা কেন, সাদরে বরণ করে নেওয়াও চলতে পারত। কিন্তু এ যে আমার জীবনের নিগূঢ় অভিপ্রায়, তাই তার ক্রমোন্নতির জন্য এর প্রয়োজন। অন্যান্য জীবনস্রোতের সংস্পর্শে এলেই তা খানিকটা বাধা পায়। কথাগুলি একটু অহংকারের মতো শোনায় হয়তো। কিন্তু আমি যে ব্যক্তির জীবনপ্রেরণার কথা বলছি, সে তো আমার 'অহং'এর বাইরে। স্বীকার করতেই হবে, আমার মধ্যে আমার যে প্রভু বাস করেন তিনি কোনো কাল্পনিক নৈতিক আদর্শমাত্র নন। তিনি একজন ব্যক্তি। তাঁর কাছে আমাকে খাঁটি থাকতেই হবে। তার জন্য লোকে যাকে সুখ বলে, তাও আমাকে ছাড়তে হবে। হয়তো লোকে আমাকে ভুল বুঝবে, ত্যাগ করবে, ঘৃণা করবে। স্বভাবত আমি মানুষের সঙ্গ ভালোবাসি, আর বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গ তো আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। কিন্তু অনেক সময় তার প্রয়োজন আছে বুঝেও আমি তাদের কাছে নিজেকে ছাড়তে পারি না। সময় এবং স্থানের যে উদার প্রাচুর্য আমি সর্বদা আমার চতুর্দিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি, সে তো আমার নিজের নয় যে তাকে আমি নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করব। এই একাকিত্ব মাঝেমাঝে আমার পক্ষে একান্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষতি আমার যথেষ্টই পুষিয়ে যায়। তা ছাড়া এ কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে, যাঁরা জানেন এর থেকে কি প্রত্যাশা করা যায়, একদিন এর পরিণতি দেখে তাঁরা খুশি হবেন।

মানবাত্মা হচ্ছে স্বর্গোদ্যানের ফুল। উৎসুক হাতের চাপে যখন বদ্ধ থাকে তখন নয়, প্রচুর উন্মুক্ত আলো-হাওয়াতে ছাড়া পেলে তবেই তার সৌন্দর্যের ও সুগন্ধের পূর্ণবিকাশ ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই—

The World is too much with us ; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers ;
Little we see in Nature that is ours ;
We have given our hearts away, a sordid boon ! [১]

আমার ভালোবাসা নিরাভরণ ও মূক। যৌবনে পুষ্পোদ্গমের ঋতুতে তার সাজ ছিল মহার্ঘ— ফলভারে অবনত বৃক্ষের বদান্যতা তাতে ছিল। কিন্তু এখন যে তার বীজ ছড়াবার সময় এসেছে— তাই তার খোসার বন্ধন ভেদ করে তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সাজসজ্জার আড়ম্বর ত্যাগ করে কেবল জীবনের গভীরতাটিকে বহন করছে। তাই সেই গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে কেউ কিছুই পাবেনা— কারণ সেখানে যে পাবার জিনিসটি নেই। কিন্তু নিস্তব্ধতায় যার বিশ্বাস আছে, আর নীরবে গ্রহণ করার ক্ষমতা যার আছে— সে কখনোই নিরাশ হবে না।

---

১ "এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওআর্ড্‌স্‌অর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কোনো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতি পরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই।"—দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৬।

১৯১৪ সালের খ্রীষ্টোৎসবের দিন নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি কবি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন—

বি চা র

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়!
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচার-ঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
তাদের মত্ততা-পানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।
হে সুন্দর,
তোমার বিচার-ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার!
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহ-শেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা-মাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

চোরা-ধন দুর্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি, মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে ;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে ;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে ?
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারি ১৯১৫

তাড়াতাড়ি লেখা আপনার শেষ চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম যে আপনি তখন খুব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলেন। আপনার মন এখনও সেই মায়ারাজ্যে বাস করে যেখানে ছায়াগুলিও যথেচ্ছ বড়ো হয়ে উঠে সামান্য ব্যাপারেই মানুষকে অসুখী করে তোলে। আমি দেখছি, সুখ জিনিসটাই আপনার পক্ষে ক্লান্তিকর, তার প্রতিক্রিয়া আপনার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যের চেয়েও আপনার এই অবস্থাটি আমার কাছে বেশি উদ্বেগজনক।

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারি ১৯১৫

আমার অসুস্থতার খবর দিয়ে আপনাকে ভাবনায় ফেলতে চাই না, তবু আশ্রমে আমার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে খবরটা আপনাকে দিতেই হল। আমার শরীর প্রায় ভেঙে পড়ার মতো হয়েছে। তাই আমাকে আবার একবার পদ্মার নির্জনতায় পালাতেই হবে। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও বিশ্রামই এখন আমার একান্ত দরকার।

কখনও যদি আপনার রোগের পুনরাক্রমণের সূচনা দেখেন, তবে সাহস হারাবেন না। কোনো রকম অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না এবং মনের বিক্ষোভ যাতে না আসে সে চেষ্টা করবেন, আর বেশ ঘুমোবেন। খুব জোর করে নিজেকে কোনো বিষয়ে, এমনকি ভগবানের প্রতিও একান্ত সজাগ করে রাখা, ভালো

নয়। কারণ আমাদের প্রকৃতি তা সহ্য করতে পারে না। পরিপূর্ণ পাওয়ার ফলেই প্রায় মনে বিষাদ বা নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। আমাদের চেতন প্রকৃতির যা প্রয়োজন তার সঞ্চয়ের জন্য আমাদের মগ্নচৈতন্যকে অনেকখানি সময় দিতে হয়।

কলিকাতা, ৩১শে জানুয়ারি ১৯১৫

শুনছি আপনি সত্যিই অসুস্থ হয়েছেন। তা চলবে না। কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখান। তিনি যদি পরামর্শ দেন তবে কাল সকালেই আমার সঙ্গে শিলাইদা চলুন। বোলপুর যেতে আর আমার সাহস নেই। আমি ক্লান্তির এমন চরম সীমায় পৌঁছেছি যে, এরকম স্বার্থপরভাবে সরে থাকার অধিকার আমার আছে। সব দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বলে আমি একটুও আর লজ্জিত নই। আমাকে সমস্ত মনে-প্রাণে একা থাকতেই হবে।

আপনি কিন্তু একটুও দেরি করবেন না। আপনার সম্বন্ধে আমরা বড়োই উদ্বেগে রয়েছি। আপনাকে কিছুতেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেওয়া হবে না।

শিলাইদা, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি তীব্র নৈরাশ্য ও অবসাদে কষ্ট পাচ্ছিলাম। কিন্তু আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আবার আমি আরও শতবর্ষ বাঁচতে চাই— অবশ্য যদি আমার সমালোচকরা রেহাই দেন, তবেই। সে সময় আমার শরীর ক্লান্ত ছিল, তাই সামান্যতম আঘাতও যে মূর্তি ধারণ করেছিল তা হাস্যকর। সে যাই হোক, আমার মধ্যে এখনও যে সেই শিশুটি বেঁচে রয়েছে, যে মানুষের কাছে আদর পাবার লোভ এখনও ছাড়তে পারে নি তা দেখে আমি খুশি হয়েছি। আমার সমালোচকদের চেয়ে আমি নিজে অনেক উর্ধ্বে— এ কথা যেন আমি কখনও না মনে করি। সভায় বক্তার আসনে না বসে শ্রোতাদের সঙ্গে সমান আসনে বসে আমি তাদের মতো করেই শুনতে চাই। আমার লেখা যখন তাদের অপছন্দ হয় তখন সেই নিরাশার অনুভূতিও আমার পক্ষে হিতকর। তখন যদি আমি বলি, গ্রাহ্য করি নে তবে যেন কেউ আমার কথায় বিশ্বাস না করেন।

মানবজাতির একটি বড় অংশই নীরব। তার মধ্যেই আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন আশা করি। আমার ধারণা, তাঁরা আমার লেখা পড়তে খুবই ভালোবাসেন— যদিও ভালোমন্দ কিছুই বলেন না।

এখানে এখন আমি বোটে একটা খুব সুন্দর জায়গায় রয়েছি। মুকুল নন্দলাল ও অন্য একজন আর্টিস্ট আমার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁদের আনন্দের উৎসাহ আমাকেও উজ্জীবিত করে। প্রতিটি ছোট জিনিস তাঁদের ঔৎসুক্য জাগায়। এমনি করে তাঁদের তরুণ চিত্ত আমাকে সাহায্য করে, অভ্যাসের জড়তায় এতদিন যেসব জিনিস লক্ষ্য করি নি—তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিলাইদা, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

এখানে পৌঁছেই আমি নিজেকে ফিরে পেলাম। তাই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পেরেছি। জীবনের সব রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নিজ জীবনের অভ্যন্তরেই সঞ্চিত থাকে। একাকী নির্জনতায় গেলে তবে সেটা খুঁজে পাই। এই নির্জনতাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী। এর মধ্যে যে কত আশ্চর্য জিনিস আছে তার অন্ত নেই। এ জায়গাটি আমাদের এতই কাছে, তবু যেন নাগালের বাইরে। না, আর কথা বাড়াতে

চাই না। আমার এই অনুপস্থিতি এবং নীরবতা— দুয়ের জন্যই আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আমি আমার মনটাকে আর-একটুও বিক্ষিপ্ত করতে পারছি না।

আপনার শরীর এখন আগের চেয়ে ভালো থাকে— এটি আমার একান্ত অন্তরের কামনা।

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

রবিবার পর্যন্ত কলকাতায় আছি। যদিও আমি চেষ্টা করব, তবু এর আগে তার মুঠো থেকে ছাড়া পাব এমন আশা করি নে। যাই হোক, সোমবার নিশ্চয় গিয়ে বোলপুর পৌঁছব। তখনও খানিকটা দুর্বল ও অপটু থাকতে পারি, কোনো কাজের ভার নেবার শক্তি হয়তো হবে না।

মহাত্মা এবং শ্রীমতী গান্ধী এতদিনে বোলপুর পৌঁছে গেছেন আশা করছি। শান্তিনিকেতনে তাঁরা তাঁদের যোগ্য অভ্যর্থনা নিশ্চয় পেয়েছেন। দেখা হলে আমি নিজে তাঁদের ভালোবাসা জানাব।

আমাদের আশ্রম সেই নিগৃহীত রাজপুত ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। দেশের লোকদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়াতেই যে সে নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছে, এটি যেন সে বোধ করতে পারে।

সি. এফ. এণ্ডরুজ -লিখিত ভূমিকা

এর পরের কয়েকটি মাস কবির মানসিক উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, অবশেষে অতি ধীরে ধীরে সেই কষ্টের হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের আরম্ভভাগে এই বেদনা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তার একটি কারণ, যুদ্ধহেতু পৃথিবীর বিপর্যয়, অন্য কারণ বেলজিয়ামের জন্য তাঁর আন্তরিক সমবেদনা। এই সময়ে একই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজিতে তাঁর তিনটি কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারি, সেই সময়ে তাঁর মধ্যে কী দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। এর প্রথম কবিতাটির নাম The Boat man— নেয়ে (মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে)। এটি লেখার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন— সেই নির্জন প্রাঙ্গণে যে মেয়েটি ধূলায় বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলজিয়ামেরই প্রতীক। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবিতাটি হল The Trumpet— শঙ্খ ('তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব')! তৃতীয় কবিতাটির নাম The Oarsmen—কাণ্ডারী ('দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন')। এর দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্তী কালের দিকে। কারণ, বিশ্বাসের যে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ এতে হয়েছে তার প্রয়োজন হবে তখনই যখন পুরাতন পৃথিবীর আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে ফেলে নতুন পৃথিবীতে পৌঁছবার জন্য তরঙ্গক্ষুব্ধ অসীম সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে হবে।

চতুর্থ কবিতাটি [বিচার] তখনও প্রকাশিত হয় নি। পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কবি সেটি আমায় দেন, সেবার খ্রীষ্ট-জন্মোৎসবে তিনি আশ্রমের শিক্ষকছাত্র সকলের সামনে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। তাতে খ্রীষ্টকে তিনি 'শান্তির রাজা' বলে অভিহিত ক'রে দেখিয়েছেন য়ুরোপ কিভাবে তাঁর নামকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে।

অনুবাদ শ্রীমলিনা রায়

পরমাণুর নিউক্লিয়স। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিদ। দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

আচার্য প্রমথনাথ বসু। মনোরঞ্জন গুপ্ত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা ৯। মূল্য প্রতিটি এক টাকা।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদ্ কিছুকাল ধরে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের কয়েকটি সুলিখিত গ্রন্থ এঁরা স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থ বিজ্ঞান-পরিষদের ঐ উদ্যোগের নিদর্শন।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উপযোগিতা অনেকেই নতুন করে উপলব্ধি করছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বিজ্ঞান নিয়ে উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ লেখা হচ্ছে অল্পই।

'পরমাণুর নিউক্লিয়স' চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ। রবীন্দ্রসমসাময়িক ও রবীন্দ্রোত্তর যুগে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রায় যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, চারুচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এঁরা তিনজনেই একদিকে যেমন যশস্বী বিজ্ঞানশিক্ষক, অপরদিকে তেমনি নিপুণ সাহিত্যশিল্পী। তিনজনই রবীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যে যুগ পর্যন্ত চারুচন্দ্র জীবিত ছিলেন তার অনেক পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই অতি আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যতটা পরিচয় চারুচন্দ্রের রচনায় পাই, রামেন্দ্রসুন্দর বা জগদানন্দের রচনায় ততটা প্রত্যাশা করা যায় না। এদিক থেকে দেখলে, চারুচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচনা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিস্ময়কর বৈচিত্র্য চারুচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার অনেক সংবাদই তিনি সরল ও সুখপাঠ্য বাংলায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে চারুচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

দীর্ঘকাল ধরে চারুচন্দ্র বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান' প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়। তার পর একে একে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জীবন ও আবিষ্কার কাহিনী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বিষয়গৌরব তথ্যসমাবেশ ও রচনা-পারিপাট্যের দিক থেকে 'পরমাণুর নিউক্লিয়স' তাঁর সবচেয়ে পরিণত ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিছুকাল পূর্বে 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' (১৩৫৮) রচনা করে তিনি শিক্ষিত বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে তিনি যে কৃতিত্বের সঙ্গে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন তা বিস্ময়কর। 'পদার্থবিদ্যার নবযুগে' চারুচন্দ্র অতি আধুনিক যুগের পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে যে আলোচনা শুরু করেছিলেন, 'পরমাণুর নিউক্লিয়সে' তা একটি পরিণতি লাভ করল। এই হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থটি 'পদার্থবিদ্যার নবযুগের' পরিপূরক। দুটি গ্রন্থকে মিলিয়ে পড়লে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রায় সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরমাণু সম্বন্ধে অতি আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। পরমাণুর যে একটি নিউক্লিয়স আছে, সেই নিউক্লিয়সে কি কি মূল পদার্থ আছে, কতগুলো করে আছে, তাদের আয়তন কি,

তাদের মধ্যে কি রকমের শক্তি কাজ করছে, বাইরের আঘাতে তারা কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, এই গ্রন্থে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আলোচনা শেষ পর্যন্ত পরমাণুর নিউক্লিয়সেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র আলোচনাটি করা হয়েছে পরমাণবিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই সংগত কারণেই পরমাণুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ধর্ম ও প্রকৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে বেকারেল, কুরী ও রাদারফোর্ডের আবিষ্কার-কাহিনী গল্পের মতো সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্‌ফা-রশ্মি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পরমাণুর আভ্যন্তরিক চিত্র এবং আইসোটোপের কাহিনী যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে নিউক্লিয়স ভাঙার কথা, নিউট্রন ও পজিট্রনের কাহিনী এবং নিউক্লিয়সের পরিবর্তন ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার কথা আলোচিত। দশম ও একাদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মেসন হাইপেরন এবং নিউট্রিনো। শেষের দুটি অধ্যায়ে নিউক্লিয়সের গঠন ও অভ্যন্তরস্থ শক্তি নিয়ে আলোচনা করে পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার তত্ত্ব বর্ণিত। মূল গ্রন্থটি হল বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত 'রাজশেখর বসু' বক্তৃতা। পরিশিষ্টে পরমাণু ভাঙা সম্বন্ধে পজিট্রন নিউট্রন ও নিউক্লিয়সের শক্তির বিষয়ে আর-একটি অধ্যায় সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য আরও বেড়েছে।

গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভাষার সরসতা এবং তথ্যসমাবেশে নিষ্ঠা। রচনা কঠিন হয়ে পড়বার আশঙ্কায় লেখক দুরূহ গাণিতিক তত্ত্বকে এড়িয়ে যান নি; সেই তত্ত্বকে আলোচনায় স্থান দিয়ে সরল ভাষায় তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

'পরমাণুর নিউক্লিয়স' শুধুমাত্র বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু ও সাহিত্যরসিক পাঠককেই তৃপ্তি দেবে না, যাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চার কথা ভাবছেন, গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁরাও অনুপ্রাণিত হবেন।

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিদ' আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। চিকিৎসার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বাণিজ্য ও ব্যাবসাজগতেও ভেষজ-উদ্ভিদের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। তা ছাড়া, আমাদের ভারতবর্ষে ভেষজ-উদ্ভিদের সাহায্যে রোগ-নিরাময়-প্রচেষ্টা সুদূর বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। চরক-সুশ্রুতের সংহিতায় রয়েছে এর চরম উন্নতির নিদর্শন। তান্ত্রিক যুগেও রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে ভেষজ-উদ্ভিদের নব নব প্রয়োগ-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল। অতএব, বর্তমান প্রয়োজনের দিক থেকে তো বটেই, দেশীয় ঐতিহ্যের দিক থেকেও এই ধরণের গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে কুঁচ ঘৃতকুমারী ছাতিম বাসক বেল প্রভৃতি সতেরোটি প্রয়োজনীয় ভেষজ-উদ্ভিদের কথা আলোচিত। এখানে এক-একটি উদ্ভিদের জন্য স্বতন্ত্র এক-একটি অধ্যায় নির্দিষ্ট। প্রতি ক্ষেত্রেই উদ্ভিদ বা ফলের দেশীয় এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-সম্মত নামের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পর এক-একটি উদ্ভিদের প্রকৃতি, চাষব্যবস্থা, গুণাগুণ, ব্যবহারবিধি, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে সেই উদ্ভিদ নিয়ে আধুনিক যুগের গবেষণার কথা আলোচিত। আলোচনা জায়গায় জায়গায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। তবে লেখকের রচনারীতি প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখক উদ্ভিদের ভেষজ গুণ নিয়ে আধুনিক যুগের গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় গবেষণার কথা। ফলে, দেশীয় গাছগাছড়া নিয়ে ভারতে কি ধরণের গবেষণা চলছে তা

জানবার সুযোগও পাঠকরা পেয়েছেন। যেমন, ওলট কম্বল ও কুঁচ নিয়ে ড. চোপরার গবেষণা, বেল নিয়ে ড. অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সর্পগন্ধা নিয়েও ইতিমধ্যে আমাদের দেশে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু লেখক সর্পগন্ধার প্রসঙ্গ কেন যে একেবারেই উল্লেখ করেন নি তা বোঝা গেল না।

পরিভাষার ব্যবহারে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক প্রগতিশীল; অর্থাৎ, বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোকে অনুবাদ না করে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবেই বাংলায় ব্যবহার করেছেন। যেমন, ফরম্যালডিহাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, পটাসিয়াম সালফেট ইত্যাদি। পরিভাষার ব্যবহারে লেখকের এই প্রগতিশীল মনোভাব নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু যদি দেখা যায়, একই জিনিস বোঝাতে একজন লেখক ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তবে তা সমর্থন করা চলে না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক একই বস্তু বোঝাতে কয়েকটি জায়গায় দু রকমের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'লৌহ' বোঝাতে 'আয়রন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ৪, ১১ ও ৭৩ পৃষ্ঠায়; এবং 'লৌহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ১০, ৪৯, ৬৬ ও ৬৯ পৃষ্ঠায়। মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বহু বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দকে সোজাসুজি বাংলায় গ্রহণ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাই বলে যে শব্দগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত, তাদের বোঝাতে গিয়ে বিদেশী শব্দ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। লৌহ তাম্র স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি নামগুলো আমাদের সমাজে বহুদিন থেকেই চালু রয়েছে। অতএব, এদের বোঝাতে গিয়ে বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করাই বোধ হয় সমীচীন।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, ফেরাস সালফেটকে বাংলায় তবে কি বলব? উত্তরে বলা যায়, ফেরাস সালফেটই বলব। ইংরেজরাও লৌহ বোঝাতে আয়রন লেখেন। কিন্তু লৌহের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বোঝাতে ফেরাস ফেরিক ইত্যাদি শব্দের আশ্রয় নেন। অতএব, এসকল যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে বিদেশী নামগুলো ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। পুরো অথবা আধাআধি অনুবাদ করে নূতন শব্দ সৃষ্টি না করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক জায়গায় জায়গায় আধাআধি অনুবাদ করেছেন। যেমন, ম্যাগনেসিয়াম লবণ। এখানে ম্যাগনেসিয়ামের কোন্ লবণ তা উল্লেখ করে সেই লবণের বিদেশী নাম ব্যবহার করলেই ভালো হত। এরূপ করলে, পরিভাষার ব্যবহারে লেখক যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে রচনার সংগতিও বজায় থাকত।

তবে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি বেশ সুলিখিত। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক নির্বিশেষে সকলেরই গ্রন্থটি পড়তে ভালো লাগবে।

মনোরঞ্জন গুপ্তের 'আচার্য প্রমথনাথ বসু' একটি বৈজ্ঞানিক জীবনীগ্রন্থ। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার একটি বিশিষ্ট দিক বৈজ্ঞানিক জীবনীসাহিত্য। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিতে' (১৮৫০) বৈজ্ঞানিক-জীবনীর উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা এ দেশে দেখা যায় নি। এই শতকে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তা' ছাড়া পঞ্চানন নিয়োগী 'বৈজ্ঞানিক জীবনী: ১ম ভাগ'গ্রন্থে (১৯১৫) প্রাচীন ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। অনিলচন্দ্র ঘোষের 'বিজ্ঞানে বাঙালী'তে (১৩৩৮) বিজ্ঞানচর্চায় কয়েকজন বাঙালির

অবদানের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু মনস্বী বাঙালি বৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বসুর জীবন নিয়ে কোনো গ্রন্থ রচনার প্রয়াস ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। যতদূর জানি, এ ব্যাপারে মনোরঞ্জনবাবুই পথিকৃৎ। এই গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি দূর করার জন্যে তিনি শিক্ষিত বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ইতিপূর্বে মনোরঞ্জনবাবু— ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক-জীবনী পর্যায়ে এটি তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রমথনাথের বাল্যকাল, স্বদেশে ও বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করে ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁর আবিষ্কার ও শিল্পোদ্যোগ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সঙ্গে সংযোগ এবং জামসেদপুরে টাটার লোহার কারখানা স্থাপনের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। লেখক সংগত কারণেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথের খনিজ আবিষ্কারের উপর। তবে প্রমথনাথের পারিবারিক জীবনের কথাও এখানে যথাযোগ্য নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত। কিন্তু সুচিন্তিত কোনো অধ্যায়-বিভাগ না থাকার ফলে সাধারণ পাঠকদের বইটি পড়তে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থের শেষদিকে প্রমথনাথের বাংলা ও ইংরেজি রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় পাঠকরা এই বৈজ্ঞানিকের রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। তবে প্রমথনাথের একমাত্র বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' (১৮৮৪) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে ভাল হত।

পরিশিষ্টে প্রমথনাথের যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ এবং পুস্তকের তালিকা দেওয়ার ফলে গ্রন্থটির মর্যাদা বেড়েছে। লেখক এমন কতকগুলি প্রবন্ধের নামোল্লেখ এবং উৎসনির্দেশ করেছেন যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে দেখা যায় নি। গ্রন্থটির প্রারম্ভে যে জীবনপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তা ঐতিহাসিক উপাদানের দিক থেকে মূল্যবান। তবে 'প্রারম্ভ কথা'য় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে বিজ্ঞানচর্চায় নবজাগরণের প্রসঙ্গ আরও একটু বিস্তারিত হলে ভালো হত।

লেখকের রচনারীতি প্রাঞ্জল। তবে কতকগুলো অশুদ্ধ বানান জায়গায় জায়গায় রচনার সৌকর্য নষ্ট করেছে। যেমন, ঊর্ধ্ব বোঝাতে উর্দ্ধ (পৃ ৩), দীর্ঘজীবীর স্থলে দীর্ঘজীবি (পৃ ৫), আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আকাঙ্খা (পৃ ১০, ৪৭), উচ্ছ্বসিত না লিখে উচ্ছসিত (পৃ: ২৩) ইত্যাদি।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একদিন যে নবজাগরণ দেখা গিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক বসু এখানে প্রমথনাথের জীবনাদর্শ ও আবিষ্কার নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, আমাদের আলোচ্য তিনটি গ্রন্থই সুলিখিত। জাতীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থগুলি স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো, আউষের খেত জলে ভরো ভরো,
কালীমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।

ওই শোনো শোনো পারে যাবে ব'লে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাবার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—
দরো দরো বেগে জলে পড়ি জল ছলো ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাবার বন্ধ হয়েছে আজি রে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন, ধবলীরে আনো গোহালে—
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি, মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরো ঝরো ধারে ভিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল—
ওই বেণুবন দোলে ঘন ঘন পথপাশে দেখো চাহি রে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II পা -র্সা । না নধা I ^ন^ধা -পা । পা -া I হ্মা পা । পা পা I হ্মা হ্মা । গা রা I
নী ল্ ন বং ঘ ॰ নে ॰ আ ষা ঢ় গ গ নে তি ল

I গা -পা । পা -রা I ^র^গা রা । সা -া I -া -া । সা ধ্‌া I সা -া । সা -রা I
ঠাঁ ই আ র্ না হি রে ॰ ॰ ॰ ও গো আ জ্ তো ॰

I গা -া । -া -া I পা -না । না -ধা I -পা -হ্মা । -গা -হ্মা I পা -না । না ধা I
রা ॰ ॰ ॰ যা স্ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ যা স্ নে ঘ

I পা ক্ষা । গা রা I সা -া । -া -া I পা গা । পা ধা I ধা -র্সা । র্সা -া I
রে র বা হি রে ॰ ॰ ॰ বা দ লে র ধা ॰ রা ॰

I র্সাঃ -নঃ । র্সা -া I র্সা না । ধা ধর্সা I না না । ধা পা I র্সা র্গা । র্গা র্গর্রা I
ঝ ॰ রে ॰ ঝ রো ঝ রো॰ ঝ রো ঝ রো আ উ ষে র॰

I র্গর্রাঃ -র্সঃ । র্সা -না I ধা -না । নর্সা না I ধনা -াধ । ধপা -া I গপা পা । পা পা I
খে ত্ জ ॰ লে ॰ ভ রো ভ ॰ রো॰ ॰ কা লি মা খা

I পা -ক্ষা । ধপা -ক্ষা I গা ক্ষা । পা পা I পা -া । পা পক্ষা I গক্ষা -া । গা -া I
মে ॰ ঘে ॰ ও পা রে আঁ ধা র্ ঘ নি॰ য়ে॰ ॰ ছে ॰

I -া -া । -া -ক্ষা I পা -না । ধা পক্ষা I গা -া । -া -া I র্সা র্সা । র্সা -া I
॰ ॰ ॰ ॰ দে খ্ চা হি॰ রে ॰ ॰ ॰ ও গো আ জ্

I র্সাঃ -নঃ । র্রর্সা -না I ধা -র্সা । না -ধা I -পা -ক্ষা । -গা -ক্ষা I পা -না । না ধা I
তো ॰ রা ॰ যা স্ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ যা স্ নে ঘ

I পা ক্ষা । গা রা I সা -া । -া -া I পর্সা -া । র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা -া I
রে র বা হি রে ॰ ॰ ॰ ও ই শো নো শো ॰ নো ॰

I র্সনানর্রা । র্রা র্র্সা I র্রর্সা -না । না -ধা I ধনা না । না নধা I ধা ধপা । ক্ষা ধা I
পা॰ রে॰ যা বে॰ ব ॰ লে ॰ কে॰ ডা কি ছে॰ বু ঝি॰ মা ঝি

I পা -া । -া -ক্ষা I গা ক্ষা । পা -া I পা -ক্ষা । পা -া I পক্ষা -ধা । পা পা I
রে ॰ ॰ ॰ খে য়া পা ॰ রা ॰ বা র্ ব॰ ন্ ধ হ

I ক্ষা গা । রগা রা I সা -া । -া -া I গা গা । গা গা I গা -া । -া -া I
য়ে ছে আ জি রে ॰ ॰ ॰ পূ বে হাও য়া ব ॰ ॰ য়্

I সগা গা । গা -া I গা -া । -া -া I গপা পা । -া পা I পা গক্ষা । গা -রা I
কূ লে নে ই কে ॰ উ ॰ তু॰ কূ ল্ বা হি ॰ য়া ॰

I সা রা । গা গা I গা -া । -া -া I র্সা র্সা । র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা -না I
উ ঠে প ড়ে ঢে ॰ উ ॰ দ রো দ রো বে ॰ গে ॰

I ধা না । [ন]র্সা র্সনা I না -া । না নধা I [ধ]না -া । [ন]ধা -পা I পা -হ্মা । গা মা I
জ লে প ড়িং জ ল্ ছ লোং ছ ল্ উ ॰ ঠে ॰ বা জি

I গা -া । -া -া I গা হ্মা । পা -া I পা -হ্মা । পা -া I পহ্মা -ধা । পা পা I
রে ॰ ॰ ॰ খে য়া পা ॰ রা ॰ বা র্ বং ন্ ধ হ

I [প]হ্মা গা । [র]গা রা I সা -া । -া -া I গা -পা । পা পা I পাঃ -হ্মাঃ । [ধ]পা -হ্মা I
য়ে ছে আ জি রে ॰ ॰ ॰ ও ই ডা কে শো ॰ নো ॰

I গা মা । মা মা I মা [ম]গা । [র]সা রা I গা -া । গা -া I [র]গা রা । সা রা I
ধে নু ঘ ন ঘ ন ধ ব লী ॰ রে ॰ আ নো গো হা

I [র]পা -া । -গা -া I গা হ্মা । পা পা I পা -া । পহ্মা -[গ]হ্মা I গা -া । -া -হ্মা I
লে ॰ ॰ ॰ এ খ নি আঁ ধা র্ হং ॰ বে ॰ ॰ ॰

I পা [প]না । না ধা I পা হ্মা । গা -া I সা রা । গা গা I [র]গা গা । গা রা I
বে লা টু কু পো হা লে ॰ ধ ব লী রে আ নো গো হা

I সা -া । -া -া I {র্সা র্সা । র্সা -া I র্সা র্সা । র্সা -া I না নর্রা । র্রা -র্সা I
লে ॰ ॰ ॰ দু য়া রে ॰ দাঁ ড়া য়ে ॰ ও গোং দে খ্

I [র্র]র্সা -না । না -ধা I ধা না । [ন]র্সা র্সা I [ন]র্সা -না । না -ধা I [ধ]না না । না নধা I
দে ॰ খি ॰ মা ঠে গে ছে যা ॰ রা ॰ তা রা ফি রিং

I [ন]ধা -পা । পা -া} I পর্সা র্সা । -া র্সনা I [ধ]না -া । না নধা I [ধ]নাঃ -ধঃ । ধা -পা I
ছে ॰ কি ॰ রাং খা ল্ বাং ল ক্ কী জাং নি ॰ কো ॰

I পা -হ্মা । -গা -া I গা হ্মা । পা -না I [ন]ধা -া । পা -হ্মা I গা মা । গা -া I
খা ॰ ॰ য়্ সা রা দি ন্ আ ॰ জি ॰ খো য়া লে ॰

I -া -া । -া -া I সা রা । গা গা I গা -া । গা -রা I সা -া । -া -া I
০ ০ ০ ০ এ খ নি আঁ ধা র্ হ ০ বে ০ ০ ০

I পা না । না ধা I পা হ্মা । গা -া I সা রা । গা গা I রগা গা । গা রা I
বে লা টু কু পো হা লে ০ ধ ব লী রে আ নো গো হা

I সা -া । -া -া I র্সা র্সা । র্সা -া I র্সা -া । র্সা -া I ধা -র্সা । না ধা I
লে ০ ০ ০ ও গো আ জ্ তো ০ রা ০ যা স্ নে গো

I পা -হ্মা । গা -হ্মা I পা -না । না ধা I পা হ্মা । গা রা I সা -া । -া -া I
তো ০ রা ০ যা স্ নে ঘ রে র বা হি রে ০ ০ ০

I সগা গা । -া গা I গা -া । -া -া I মগা গা । গা গা I গা -া । রগা রা I
আ০ কা শ্ আঁ ধা ০ ০ র্ বে লা বে শি আ র্ না হি

I সা -া । -া -া I {পা গা । পা ধা I ধা -র্সা । র্সা -া I র্সা র্সা । র্সা -া I
রে ০ ০ ০ ঝ রো ঝ রো ধা ০ রে ০ ভি জি বে ০

I র্সা -না । র্রর্সা -া I র্সা র্সর্গা । র্গা র্গর্রা I র্গর্রা -র্সা । র্সা না I ধা -না । র্সা -র্সনা I
নি ০ চো ল্ ঘা টে০ যে তে০ প থ্ হ য়ে ছে ০ পি ০

I ধপা -া । -া -া} I পা -না । না নধা I ধনা না । ধা -া I ধহ্মা -ধা । ধা ধপা I
ছ০ ০ ০ ল্ ও ই বে ণু০ ব০ ন দো ০ লে০ ০ ঘ ন০

I পা পা । পা পা I পহ্মা -ধা । পা -া I -া -া । পা -হ্মা I গা মা । গা -া I
ঘ ন প থ পা০ ০ শে ০ ০ ০ দে খ্ চা হি রে ০

I -া -া । -া -া I র্সা র্সা । র্সা -া I র্সা -া । র্সা -না I ধা -র্সা । না ধা I
০ ০ ০ ০ ও গো আ জ্ তো ০ রা ০ যা স্ নে গো

I পা -হ্মা । গা -হ্মা I পা -না । না ধা I পা হ্মা । গা রা I সা -া । -া -া II II
তো ০ রা ০ যা স্ নে ঘ রে র বা হি রে ০ ০ ০

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

নূতন বর্ষের এই প্রথম সংখ্যায় আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দলাভ করেছি।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধ দিয়ে এই সংখ্যার উদ্‌বোধন করা হল ; এই একই পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত রচনা 'ছন্দ'-নামে বিশ্বভারতী পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" (১৩৬৯) গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে। তদুপরি এই প্রবন্ধটির শেষে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হল।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত কম্বোজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার রচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলায় পুরাণের চর্চা সম্বন্ধে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠ সম্বন্ধে শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধতর করেছে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে বা সমবায়ে গঠিত হয়েছে ভারতবর্ষের, তথা বাংলাদেশের, সংস্কৃতি। শক হূনদল পাঠান মোগল সকলেই একত্র হয়েছে এখানে। সৈয়দ মুজতবা আলী এইরূপ একটি সংস্কৃতির— মুসলিম-সংস্কৃতির— বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার আরও কয়েকটি সংখ্যায় এই আলোচনা প্রকাশিত হবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গত শতকে বাংলাদেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে অনেক বিবর্তন সংঘটিত হয় ; সে-কালীন সমাজের চিত্র সংগ্রহ করতে হলে সে-কালীন পত্রপত্রিকার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধ তারই নিদর্শন।

এণ্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের অনুবাদের দ্বিতীয় কিস্তি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

স্বী কৃ তি

রবীন্দ্রনাথের 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনসংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'যাত্রাদলের মন্ত্রী' চিত্র রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা থেকে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বলরামের দেহত্যাগ

শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭০ · ১৮৮৫ শক
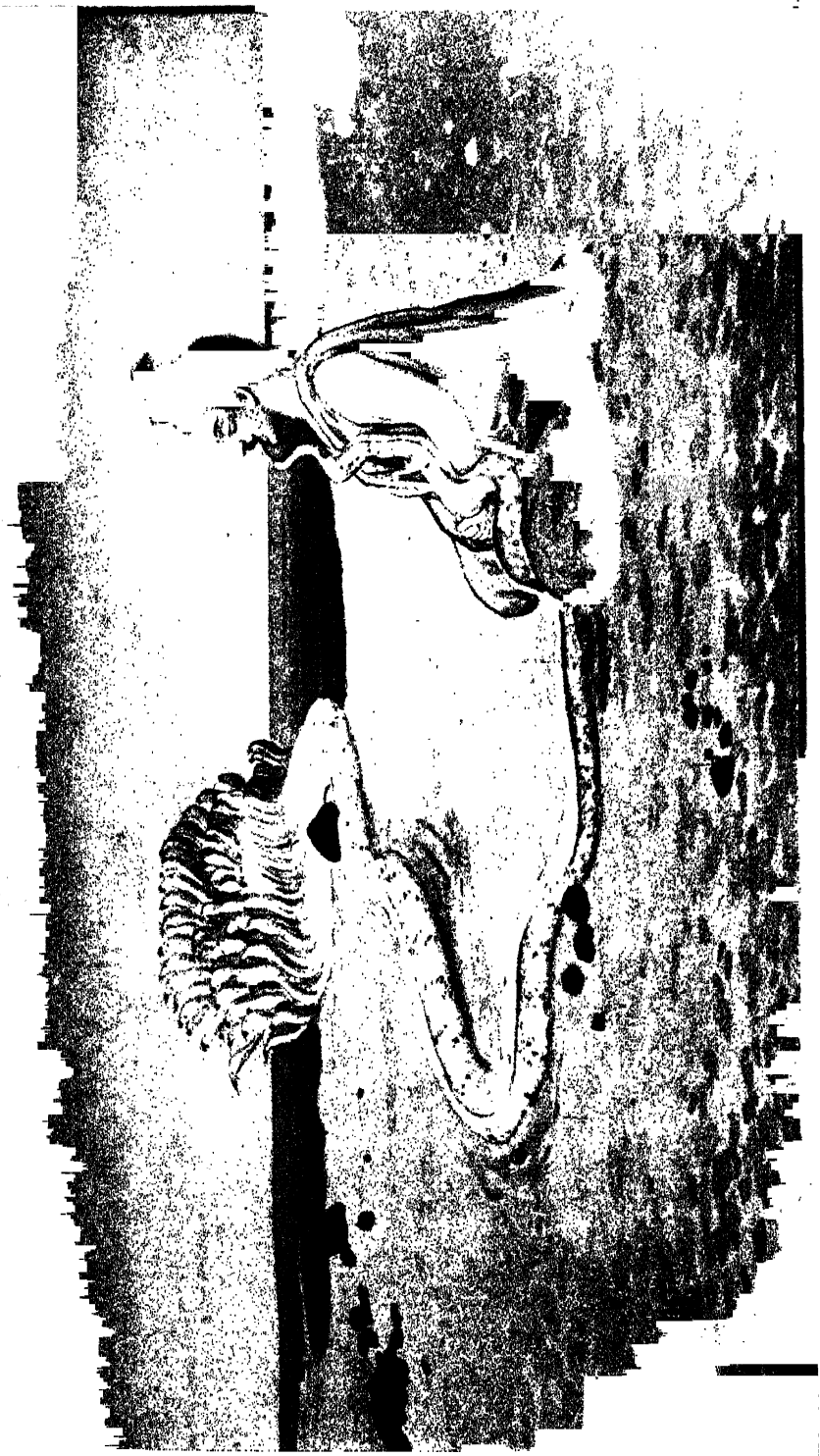
চিঠিপত্র শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পুরী]
[৪।৭।৩৯]

মহিষী

তোর চিঠি থেকে আমার মনে পড়ল ক্ষণিকার প্রথম কবিতাটি। অর্থাৎ জীবনটাকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া। ঘটনার ভাবনার বাসনার প্রবাহ চলেছে— সেই চলমান স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতেই জীবনটা তৈরি হয়ে উঠচে, এক মুহূর্তের সঙ্গে আর এক মুহূর্তের সম্বন্ধসূত্রে— যেটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে এসে ঠেকে তার চেয়ে বেশি দাবি করলেই তাল কেটে যায়। অভিজ্ঞতা সমস্তকেই স্পর্শ করবে, উপলব্ধি করবে, কোনো কিছুকেই ধরে রাখবে না— ধরে রাখবার ব্যগ্রতাকেই যদি মোহ বলি তবে বলতে হবে সেটা ত্যাজ্য। কিন্তু স্বাদবিহীন রসরিক্ত স্পর্শকে যদি নির্মোহ বলা হয় তবে সেটা আরো ত্যাজ্য। কেননা সেটা জীবনের ধর্ম নয়। সমস্ত উপলব্ধির সমষ্টিকেই বলে জীবনের সমগ্রতা। এই সমগ্রতাকে লাভ করতে হলে বৈরাগ্য চাই। এই বৈরাগ্যের অভাবে চলা বন্ধ হয়।

"আমি সব নিতে চাই রে—"

যদি তা চাই তাহলে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে কোনো একটা দানকে আঁকড়ে বসে থাকলে সব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যে যথার্থ কবি সে একাগ্র নয় সে সর্বানুভূঃ, সমস্তর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার অনুভবের ধারা, কোনো একটা জায়গায় আট্‌কে যায় না। যদি যেত তবে তো সে অনুভূতির কূপমণ্ডুক হোত। মোহ নিয়ে তোর সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলুম তার মর্মটা এই— মোহই তো স্বাদ গ্রহণের শক্তি— অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয় যদি সে শক্তি না থাকে। মোহ কথাটার বদনাম হয়ে গেছে কিন্তু রস কথাটার হয় নি— ঈশ্বরকে বলে রসো বৈ সঃ— তাঁর আনন্দ বন্দী নয়, মুক্ত, সমস্তের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

বিক্রমজিৎ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোর চিঠি পড়লুম। যাদের মন একান্ত কোনো একে আবদ্ধ নয়, যাদের মন বহুব্যাপক দূরপ্রসারিত তাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করাই চলে, গভীরভাবে ব্যবহার করা চলে না।

এই যদি তোর মত হয় তাহলে কেবল যে বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদেরকে আন্তরিক আত্মনিবেদন থেকে বর্জন করতে হয় তা নয় তাহলে জ্ঞানী বিজ্ঞানীদেরও সঙ্গ পরিহার্য— কেন না তাঁদের মন কোনো একটা বাঁধা সংস্কারে নিহিত নয়, তাঁরা মুক্তভাবে বিচিত্র সত্যের ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করেন। যারা একান্ত প্রাদেশিক গোঁড়ামি নিয়ে স্বাদেশিকতার চর্চা করে তারাই কি শ্রদ্ধেয়, যাঁরা সর্বমানবের অভিমুখে হৃদয় প্রসারিত করেন সর্বমানুষের সেবায় আমার এণ্ড্রুজ সাহেবের মত স্বদেশিকের যাঁরা নিন্দাবহন করেন তাদেরি কি চিত্ত অগভীর। পুরাতনকে কেবলি ছেড়ে দিয়ে নতুনের দিকে যাবার কথা কেন বলেছিস? পুরাতন যাদের কাছে চিরনতুন নয় তারা তো কবিই নয়। কবি যেখানে যথার্থ কবি সেখানে সে পুরানো নতুন সকলের মধ্যে চিরন্তনকে উপলব্ধি করতে পারে সাধারণে তা পারে না। আমি তো নানা চিন্তা নানা কর্ম নানা ভাবধারা মানবের নানা সংস্রবের মধ্যেই আজ পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছি, যদি বৈষয়িক, বা পারিবারিক বা কোনো একমাত্র কর্মবিশেষে নিযুক্ত থাকতে পারতুম, তাহলে কেবল যে আরাম পেতুম তা নয় নিজের অনেক ক্ষতি বাঁচাতে পারতুম— পৃথিবীর পনেরো আনা লোকই তো সেই রকম কোনো একটা এক আঁকড়ে থাকে— তারা আত্মনিবেদনের বৃহৎ যজ্ঞের বাইরে কোন বিহারী হয়ে কাটিয়ে দেয় তারাই আদর্শ পুরুষ নাকি। রসো বৈ সঃ, যথার্থ কবিও তাই। তার রসের বিশ্ব দেয়াল দেওয়া নয়। সেইতো বলে আমি সব নিতে চাইরে— সব নিতে পারে যে সে মন বিরল বটে কিন্তু সব নিতে চায় যে মন সেও নমস্য— বিশ্বকর্তাকে সেই যথার্থ শ্রদ্ধা করে। কবির বাইরে আর একজন যে মানুষ, তার চিত্ত কৃপণ হতে পারে সংকীর্ণ হতে পারে, তার সঙ্গে নিজের বিশ্বাস ও রুচি অনুসারে যেমন খুসি ব্যবহার চলতে পারে— কিন্তু আমার চিঠিতে কবির কথাই বলেছিলেম, তার সঙ্গে তার সর্বব্যাপী আনন্দ অনুভূতিতে যদি যোগ দিতে না পারিস নতুন পুরাতন সব কিছুর মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশ দেখতে না পাস তবে কাকে চাস তুই দেখতে। তার ভিতরকার ক্ষুদ্র মানুষকে? যাকে সে নিজেই শ্রদ্ধা করে না? সেই ক্ষুদ্রের রহস্য ও জানবার শক্তি কি যার তার আছে? কবির সঙ্গে অকবি ছোটোর সঙ্গে বড়ো জটিল হয়ে জড়িয়ে রয়েছে, বোঝবার চেষ্টা না করেও ব্যবহার করবার চেষ্টা করাই ভালো। যদি অসম্ভব হয় তাহলেই বা কি উপায় আছে? আমার কথা যদি বলিস আমি সংসারের নানা পাত্র থেকেই পান করেছি আনন্দ সুধা— বিশ্বে যে আমন্ত্রণ পেয়েছি সে ব্যর্থ হয়নি। চাওয়ার ধন অনেক পাইনি সেও সত্যি, কিন্তু যা পেয়েছি সে আরো বেশি সত্যি। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৬

বিক্রমজিৎ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

নূতন সৃষ্টির পত্তন করতে হলে তার আকাশটাকে পরিষ্কার করতে হয়। বাহিরের সৃষ্টির দ্বারা আমরা বেষ্টিত, তারই অন্তর্গত আমরা, তাকে লুপ্ত করার চেষ্টার মানে নিজেকে বঞ্চিত করা। অপ্রমত্ততার আনন্দে তার যথার্থ আনন্দরূপ অনুভব করতে পারা যায়— তার সঙ্গে মিলন হবে কিন্তু বন্ধন থাকবে না একেই বলি বহির্বিষয় থেকে মুক্তি। আমি সেই পথেই চলবার চেষ্টা করি— এই যাত্রার মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

চারদিকের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেই সহজ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই— সাধনার অহঙ্কারের চেয়ে

অহঙ্কার আর নেই— তপস্বী সাজা সকল সং সাজার অধম। যে বেশে পাঠানো হয়েছে আমাকে, সেই বেশেই শেষ পর্যন্ত থাকব, মাঝে মাঝে ধুলো লাগবে, মনোযোগ থাকবে ঝেড়ে ফেলতে। আর বেশি কিছু নয়, সকল পথিকের সঙ্গে এক পথেই চলব, গান গাইতে শিখেছি গান গেয়ে যাব।

দাদামশাই

এই যেটুকু লিখলুম মনে সঙ্কোচ বোধ করচি অন্তরাত্মার সঙ্গে সত্যের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

[১৮।১২।৪০]

অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা অমিতা দেবী পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্রবধূ। ১৯২৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তপতী নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমজিতের ভূমিকায় ও অমিতা দেবী রানী সুমিত্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

উপেন্দ্রকিশোর

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিশু ও কিশোরের উপযোগী সাহিত্য -সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভাবের নৈপুণ্য ও রসজ্ঞান প্রয়োজন এবং সেই নৈপুণ্য ও রসজ্ঞান অর্জন করিতে হইলে শিশু ও কিশোরের মন বুঝিতে পারিবার উপযুক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সাহিত্যিকের নিজের মনে-প্রাণে নিহিত থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অন্য শাখাপ্রশাখারই মত নূতন ধারার সৃষ্টি সম্ভব নয়। এবং তাহারই অভাব শিশু ও কিশোর সাহিত্যে দীর্ঘদিন ছিল, পুস্তকের পর্যায়ে এবং পত্রিকার পর্যায়েও।

সেই অভাবের পূরণ হয় শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা 'সখা' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি 'সখা'র আবির্ভাব হয়। ইহার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। প্রমদাচরণ ছিলেন দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মনে অপরিসীম উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল বাংলার শিশু ও কিশোরদিগের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনা আনয়নের জন্য। সেইজন্য পত্রিকাখানিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি অশেষ ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেন, যাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 'সখা' সেইকালের বালকবালিকাগণের নিকট প্রিয়বন্ধুরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রমদাচরণের সৌভাগ্য ছিল যে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েক জন লেখক তাঁহার এই উদ্যমে আন্তরিকভাবে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নামে একজন তরুণ লেখক। যে সুন্দর রচনাসম্ভারে 'সখা' প্রথম হইতেই সুসজ্জিত হইয়া শিশু ও কিশোরদিগের মনোলোভা রূপ গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশই ছিল সম্পাদক প্রমদাচরণ এবং মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই লেখকত্রয়ের রচিত। সেই যুগের শিশু ও কিশোরদিগের মন 'সখা' কিভাবে নন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য আমরা, যাহারা তাহার অব্যবহিত পরের যুগের কিশোর ছিলাম, আমাদের পূর্ববর্তী যুগের কিশোরদের— যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা দশ-বারো বৎসরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের— কথাবার্তায় প্রভূত পরিমাণে পাইয়াছিলাম। এবং আমরা তখনকার দিনে ঘরে-ঘরে বাঁধানো 'সখা'র বহু খণ্ড দেখিয়াছি।

'সখা'-সম্পাদক প্রমদাচরণ কঠোর পরিশ্রমে ও দারিদ্র্যভারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁহার পরে প্রথমে অন্নদাচরণ সেন ও পরে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আরও কয় বৎসর ইহার পরিচালনা করার পর 'সখা' বন্ধ হয়। তাহার পর ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় 'সাথী' ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। ইহার নাম প্রথমে ছিল 'সাথী' পরে এই নামেরসহিত 'সখা' যুক্ত হয় এবং ১৮৯৪ হইতে ইহা 'সখা ও সাথী' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। তাহার পরের বৎসর প্রকাশিত হয় তৎকালে প্রসিদ্ধ শিশু ও কিশোরদিগের মাসিক 'মুকুল' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়। এইগুলি প্রকাশনের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, এক বৎসর পৃথকভাবে চলিবার পর উহা 'ভারতী'র সহিত যুক্ত হয়।

এই কয়খানি শিশু ও কিশোরদিগের মাসিক পত্র বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যে নূতন যুগের

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৮৬৩ - ১৯১৫

সূচনা করে এবং এই যুগে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের প্রবাহে কয়েকটি নূতন ধারা যুক্ত হইবার পর ঐ সাহিত্য সতেজ ও গতিশীল প্রবাহে পরিণত হয়। ইহা সম্ভব হয় কয়েকজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী লেখকের উৎসাহে ও পরিশ্রমে, যাঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় ও অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও অল্পদিনের জন্য 'বালক'-পত্রিকাটি নিজের লেখায় ভূষিত করেন। আরও পরে শিশুর কল্পনা দিয়া রচিত তাঁহার 'শিশু'র কবিতাগুলি বাংলার শিশু সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যের আর একজন প্রতিভাশালী লেখক আসেন বিংশ শতাব্দীর মুখে, তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই যুগ-প্রবর্তকদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শুধু এ কথা বলিলেই তাঁহার কৃতিত্ব ও কীর্তির সকল কথা বলা হয় না। সে সকল কথা বলিতে হইলে তাঁহার কর্মজীবনের প্রায় সমস্ত পরিসর এই আলোচনার মধ্যে টানিতে হয়। তিনি শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ যখন করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়ে তাঁহার প্রয়াস চলিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকায় ১৮৮৩ সালে এবং মৃত্যুর অল্প পূর্বেও তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকাটি যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে তাহার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন, নির্দেশ দিয়াছেন এবং যতদিন কলম ধরিবার শক্তি ছিল, লিখিয়াছেন ও ছবি আঁকিয়াছেন।

তিনি বাংলার শিশু ও কিশোরদের মন বুঝিতেন। তাঁহার মৃত্যুর (৪ঠা পৌষ ১৩২২) পর মাঘ ১৩২২ সংখ্যার 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁহার যে জীবন-আলেখ্য প্রকাশিত হয় তাহাতে সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে বলা হইয়াছিল— "তোমরা তাঁহাকে না চিনিলেও, তিনি তোমাদিগকে, বাঙলার সকল বালক-বালিকাকে, শিশুদের মনটিকে— বেশ চিনিতেন। তাই যেটি বলিলে আর যেমনভাবে বলিলে বেশ সহজে তোমরা বুঝিবে, তোমাদেরমনের মত হইবে, তোমাদের প্রতি গভীর স্নেহের পরবশ হইয়া, বহু পরিশ্রম ও যত্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিপুণতা প্রয়োগে তোমাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে 'ফূর্তি' দিয়া ভালো করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন।"

এই বিবরণের প্রত্যেকটি কথা যথার্থ। শিশুর শব্দসমষ্টি (vocabulary) অতি সংক্ষিপ্ত, সামান্য দুই-তিন শতও নয়। এবং সেই শব্দগুলি যোজনা করার ব্যাকরণও অতিমাত্রায় সংকুচিত। কিশোরের ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য দুইয়েরই প্রসার বর্ধিত, কিন্তু তাহা হইলেও বয়স্কদিগের বিশেষত শিক্ষিতজনের তুলনায় তাহার পরিসর ও পরিমাণ অনেক কম। বিদ্যাসাগর-যুগের শিশু ও কিশোরসাহিত্যের ভাষা সরল হইলেও সাধারণ কথিত ভাষার মত সহজ ও স্নিগ্ধ ছিল না। সে যুগের লেখকেরা শিশু ও কিশোরকে গল্প বলিতে এবং উপদেশ ও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজেদের মনোমত ভাষায়, নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে দেখিয়া। ফলে বিষয়বস্তু মনোগ্রাহী হইলেও বলিবার ভঙ্গিতে বড় ও ছোট, বিজ্ঞ ও অল্পজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদটা বজায় ছিল এবং অনেক কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়া বুঝাইতে হইত।

শিশুর ও কিশোরের মন বুঝিয়া বয়স্কের উচ্চাসন হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের মনোমত সহজ কথিত ভাষায় তাহাদের জন্য লেখার রীতিপদ্ধতি সর্বপ্রথমে যে কয়জন প্রচলিত করিয়াছিলেন

তাঁহাদের মধ্যে অগ্রবর্তী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে যে শৈলী এখন সাধারণ ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় তাহার প্রবর্তন সর্বপ্রথমে করেন শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং কিছু পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সে কারণেই নূতন যুগের অন্যতম স্রষ্টা রূপে উপেন্দ্রকিশোরের আসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতি এক আদর্শের সৃষ্টি করে— যাহা সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আজও আদৃত ও অনুসৃত হইতেছে। ইঁহাদের পরে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা ইঁহাদের নির্দেশ ও পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, কোনো ভিন্ন পথ তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, তবে পথ আরও প্রশস্ত ও সরল করা হইয়াছে এবং সেইকারণে নূতন সৃষ্টি ও সৃজনের কাজও সহজসাধ্য হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোরের লিখিবার বিষয়বস্তুর কথা এইবার বলিতে হয়। এক প্রশস্ত প্রান্তরের উপর তাঁহার লেখনী শিশু ও কিশোরের মনকে লইয়া ফিরিয়াছে। একদিকে শিশুর মনভোলানো উপকথা ও ছড়া, কিশোরের মনোরঞ্জনকারী গল্প ও নাটিকা ও অন্য প্রান্তে কোটি কোটি বৎসর পূর্বেকার বিরাট ও ভয়ংকর জীবের কথা ও কোটি কোটি যোজন দূরের নভোমণ্ডলের কথা। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে অন্য-কোনো একজন লেখক এইরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে লিখিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

উপেন্দ্রকিশোর 'সখা' পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ দিয়া। তিনি শিশুর ও কিশোরের মন শুধু ভুলাইতেই চাহিতেন না, তাহাদের মনে সাধারণ জ্ঞান প্রসার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও চেতনা জাগ্রত করিবার চেষ্টাও শেষদিন পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই তাঁহার 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছোটোদের রামায়ণ' যেমন একদিকে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে, অন্যদিকে তাঁহার 'সেকালের কথা' অনন্য হইয়া আছে; ইহা একমাত্র পুস্তক যাহাতে এই পৃথিবীর অতি সুদূর অতীত প্রাক্‌মনুষ্য যুগের জীবজন্তুর কথা সরল ও সহজ ভাষায় কিশোরদের জন্য লিখিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোরের লিখিত প্রবন্ধ ও গল্পের ভাষা শিশু ও কিশোরের মনের মত করিয়া রচিত হইত। বৈজ্ঞানিক বিষয়েও সেই একই ধারা চলিত। উপরন্তু তাঁহার ছিল চিত্রাঙ্কনে অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাষা যেখানে সীমায় পৌছাইত সেখানে তাঁহার আঁকা ছবি শিশু ও কিশোরের মনকে লইয়া যাইত আরও আগে। কি গল্পের চরিত্র বা ঘটনা, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু— অল্পবয়স্ক ও সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকা লেখার বর্ণনায় ও ছবির আকারে-প্রকারে সে সকলের মর্মকথা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিত। তিনি 'সেকালের কথা' চিত্রিত করিয়াছিলেন নিজে ছবি আঁকিয়া। সেই ছবি সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের তৎকালীন ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর সার্‌ টমাস হল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যে, ছবিগুলি এখানের ছোট ছেলেদের চিত্তরঞ্জক বইতে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহা এত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অঙ্কিত যে ওগুলি বিলাতি প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য। শিশু-কিশোরদের সাহিত্য-জগতে একাধারে লেখক ও চিত্রকর উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বে আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা নাই এবং এইরূপ অনুপম ভাষার সহিত অপরূপ চিত্রের যোজনা তাঁহার সমসাময়িক অবনীন্দ্রনাথ এবং পরে তাঁহার পুত্র সুকুমার ও কন্যা সুখলতা করিয়াছেন, অন্য বিশেষ কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না।

উপেন্দ্রকিশোর শুধু ছোটদের মনই বুঝিতেন এমন নহে, তিনি বুঝিতেন যে শৈশবে ও কৈশোরে যে স্পৃহা ও যে চেতনা অঙ্কুরিত হয়, পরের জীবনে তাহার বিকাশ সম্ভব। বস্তুতই বাংলা শিশুসাহিত্যের

জগতে উপেন্দ্রকিশোরের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। আজ আমাদের উপর ক্ষুদ্রত্বের অভিশাপ চলিতেছে, তাই সেই সৌভাগ্যের কথা আমাদের মনে স্থান পায় না।

একজনের লিখিত বিষয়কে চিত্রে রূপ ও আকৃতি দান অন্য আর কাহারও পক্ষে সহজ নয়, কেননা যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার মানসপটে যে ছবি কল্পনার বা চিন্তার সাহায্যে উদিত হইয়াছে তাহা অন্যের মানসপটে প্রতিফলিত করা দুরূহ ব্যাপার। উপেন্দ্রকিশোরের 'সেকালের কথা' যেসকল চিত্রে ভূষিত বা সুকুমার রায়ের উদ্ভট কল্পনা যেভাবে তাঁহার নিজের আঁকা ছবিতে রূপায়িত হইয়াছে তাহা কোনো ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বাল্যকালে দেখা 'সেকালের কথা'র একটি ছবি এখনও আমার মনে জাগিয়া আছে। একটি বিরাটকায় জীব যেন ইডেন গার্ডেনে গাছের সারির পিছন হইতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখিতেছে। মাঠের সীমানার উঁচু ঝাউ গাছের উপর তাহার কাঁধ ও মাথা জাগিয়া আছে। ছবিতে অঙ্কিত জীবটির নাম ছিল বোধ হয় ব্রন্টোসরস এবং তাহার মুখাবয়ব ও বিশাল দেহের বর্ণনা ভাষায় দিয়া উপেন্দ্রকিশোর ঐভাবে চিত্রে তাহা রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ও চিত্রণ কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছিল সে বিষয়ে হল্যাণ্ড সাহেবের মত পূর্বেই লিখিয়াছি। এই ছবি কি অন্য কেহ আঁকিয়া দিতে পারিত ?

কথা কাহিনী ও বিবৃতিতে একই হাতের লিখন ও আলেখ্য এবং তাহাতে ভাষার ও চিত্রের সমান সার্থকতা ও সাফল্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাত্র তিন-চারি জন দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ সুন্দরভাবে প্রসারিত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছেন একমাত্র উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী। শুধু শিশুসাহিত্যের ভাষায় নূতন ধারা আনয়নই তাঁহার স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু সেই ভাষাকে অনুপম চিত্রসজ্জায় ভূষিত করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইবার অধিকার পূর্ণরূপে অর্জন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ক্ষণভঙ্গুর স্মৃতি ও চরিত্র এবং কীর্তির মান নিরূপণে বিকার এখন আমাদের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নইলে বাংলার শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের স্থাননির্ণয় এত বিস্তারিত ভাবে করিতে হইত না।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভার স্ফুরণ কিন্তু শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যে নূতন চেতনা আনিয়া ও নূতন রূপ প্রবর্তন করিয়াই শেষ হয় নাই। তিনি কলাবিদ্ ছিলেন এবং নানাভাবে সংগীতে ও চিত্রশিল্পে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। এবং তাহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন ফলিত আলোক-বিজ্ঞানের ফটো-টেক্‌নিক শাখার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সমীক্ষা-পরীক্ষা গবেষণা ও যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের দ্বারা।

সংগীত সম্বন্ধে স্পৃহা তাঁহার কৈশোরেই আরম্ভ হয়। সংগীত-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও শিক্ষার নিদর্শন আমরা পাই তাঁহার কয়েকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধে যাহা 'সাধনা' ও 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। সেইসকল প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই কিভাবে সংগীতসাধনায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রযুক্ত হইয়াছে। বেহালা ছিল তাঁহার প্রিয় যন্ত্র, যদিও হারমোনিয়াম ফ্লুট ইত্যাদিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। হারমোনিয়াম-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্সের দ্বারিকাবাবুর অনুরোধে। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে হারমোনিয়ামে ভারতীয় সংগীতের অনিষ্ট হইতেছে এবং

সেইজন্য তিনি ঐ বইয়ের আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই। সংগীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল।

তিনি বিদেশী প্রথায়, কাঁধে রাখিয়া ও চিবুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বেহালা বাজাইতেন এবং ছড় ধরিবার ও চালাইবার বিদেশী রীতিই তিনি ব্যবহার করিতেন। ফলে তাঁহার বেহালায় যে দীর্ঘ তান ও স্বরের সূক্ষ্ম ধ্বনিভেদ হইত তাহা দেশীপ্রথায় বেহালাকে বাহুলগ্ন করিয়া দ্রুতচালনার উপযোগী করিয়া ছড় ধরিলে সম্ভব হইত না। গানের সহিত তাঁহার বেহালায় সংগত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ ছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের এগারোই মাঘের সমস্বর গীত-উৎসব সংগীতের সহিত তাঁহার বেহালার সংগত একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

তিনি নিজেও অনেক গান রচনা ও গানে স্বর যোজনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত 'জাগো পুরবাসী' এখনো মাঘোৎসবের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। অন্য আর-একটি গান 'জয় দীন-দয়াময়'। এগুলি স্বরতাললয়ের সহিত কথার সুন্দর যোগে অনুপম। কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত এই দুই শাখাতেই তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার ছিল। উপরন্তু তিনি দীর্ঘদিনের শাস্ত্রসম্মত শিক্ষাদীক্ষার ফলে উহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন। তাঁহার স্বভাবগত গুণ ছিল যে কোনো বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা বা কৌতূহল জাগ্রত হইলে তিনি তাহাতে গভীর ভাবে অনুশীলন করিতেন।

তাঁহার সংগীতচর্চার আর একটি দিক আমার বাল্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত। শিশু ও কিশোর বালক-বালিকারা ছিল তাঁহার স্নেহভালোবাসার পাত্র। সেইজন্য তাহাদের গান শিক্ষাদানের জন্য সেই সময়ের 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে'র সহিত তিনি গানের ক্লাস খুলিয়াছিলেন এবং পরম ধৈর্য ও যত্নের সহিত ছোটদের সংগীতশিক্ষার কাজ প্রায় একাকী চালাইতেন। ইহাতে তাঁহার সময় ও পরিশ্রমই শুধু ব্যয় হইত না, আর্থিক ব্যয়ও ছিল যন্ত্রপাতির মেরামতে, যাতায়াতে। তিনি ছোটদের আনন্দে এতদূর সন্তুষ্ট হইতেন যে অন্য কিছু লাভের কথা তাঁহার মনে স্থানও পাইত না। 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে'র ঐ গানের ক্লাস এমনি আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, যদিও আমি তখন পিতার[১] কর্মস্থল এলাহাবাদ হইতে ছুটিছাটায় শুধু কলিকাতায় আসিতে পাইতাম, কিন্তু সেই ছুটির মধ্যে অতি আগ্রহের সহিত সেই ক্লাসে যাইতাম—সামান্য কয়দিনের আনন্দলাভের জন্য। বাল্যজীবনে সংগীতের কি প্রভাব, কিভাবে উহা শিশু ও কিশোরের মন-প্রাণ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন করে, উপেন্দ্রকিশোর তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার শত কাজের মধ্যেও এই গানের ক্লাস চালনার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের রচিত গানে নিজেই স্বর যোজনা করিয়া ও নিজে গাইয়া তিনি বহু বালকবালিকাকে শিখাইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার বেহালা ও কণ্ঠের সহিত তাহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিত। দীর্ঘ ষাট বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও সে কথা মনে পড়ে।

চিত্রাঙ্কনে তাঁহার স্বভাবজাত ক্ষমতা ছিল। তিনি যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ছাত্র তখন তৎকালীন বাংলার ছোটলাট সার্ এশ্‌লি ইডেন ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া বালক উপেন্দ্রকিশোরের খাতায় তাঁহার নিজের ছবি অঙ্কিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোরকে বলেন "তুমি

---

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইহারই চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়ো"। ছোটলাটের ক্লাস-পরিদর্শন করিবার সময়েই সেই ছবি বালক উপেন্দ্রকিশোর আঁকিয়া ফেলেন।

দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ কলাকৌশল ও শিল্পজ্ঞান যুক্ত হওয়ায় পরবর্তী জীবনে এই স্বাভাবিক প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটে। তিনি পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কনে তৈলযুক্ত রং ও কালিকলম ব্যবহার করিতেন এবং জলের মাধ্যমে বর্ণযোজনায় তিনি কুশলী শিল্পী ছিলেন। চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি রীতি ও কৌশল তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হওয়ায় তিনি ইচ্ছামত বা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রথার ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তিনি তৈলবর্ণে অঙ্কিত করিতেন। গিরিডির উপবন ও শৈলমালা, পুরীর সমুদ্র ও দার্জিলিং অঞ্চলের হিমালয়ের দৃশ্যের বহু চিত্রণ তিনি করিয়াছিলেন ঐভাবে। অন্যদিকে পুস্তকে বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, গল্প বা সন্দর্ভের বিষয় সম্পর্কিত ছবি তিনি কালিকলমেই আঁকিতেন বেশির ভাগ। তুলি ও জলরঙ্ দিয়া নানা বর্ণে ঐরকম কিছু ছবি আঁকিয়া দিতেন। যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমনি চিত্রাঙ্কনেও তিনি তাঁহার কাজ পারিপাটি ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন।

লেখার বিষয়বস্তু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাইরেও তাঁহার শিল্পীমন বিচরণ করিত। অনেকগুলি পৌরাণিক ঘটনা ইত্যাদির দৃশ্য ও প্রাচীন ইতিকথার চরিত্র তিনি জলরঙের মাধ্যমে আঁকিয়াছিলেন। এইগুলি আঁকিবার কার্যরীতি (টেকনিক) বিদেশী ছিল বলা যায়, কেননা তাঁহার দৃশ্যাবলীতে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) এবং মনুষ্য ও জীবজন্তুর শরীরসংস্থান ও শারীরিক অনুপাত বিদেশী চিত্রাঙ্কনের রীতি অনুযায়ী ও যথাযথ হইত। কিন্তু ঐসকল চিত্রাঙ্কনে তিনি বিদেশী প্রথামত জীবন্ত নরনারীকে সাজাইয়া ও মডেল রূপে দাঁড় করাইয়া তাহা দেখিয়া আঁকিতেন না। সেইজন্য তাঁহার এই জাতীয় চিত্রে কোনো বাস্তবের প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ থাকিত না, থাকিত শিল্পীমানস-কল্পিত চিত্রের দৃশ্যমান রূপায়ণ। এবং সেই রূপায়ণে শিল্পী কি ভাবের বশে চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন ও চিত্রে কি রসের নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন তাহাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইত।

যে সময়ে তিনি এইসকল ছবি আঁকিতেছেন ঠিক সেই সময়েই শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শক্তিমান কলাশিল্পীগণ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন অযথা ও অকারণ উপেন্দ্রকিশোরের ঐসকল চিত্রকে 'আড়ষ্ট ছবি' 'বিদেশীর অনুকরণে অঙ্কিত মেকী' ইত্যাদি বলায় তাঁহার এই জাতীয় চিত্রের প্রকাশ ও সমাদর হইতে পারে নাই। সেই সময়ে প্রাচীনপন্থী ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থানের স্রোত বহিতেছে, এবং সেই প্রবাহেই উহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের উচ্ছ্বাস চলিতেছে। অন্যদিকে সমর্থকদিগের ছিল সুগভীর ললিতকলা বিষয়ক জ্ঞান ও পরিমার্জিত রুচিজ্ঞাপক ভাষার উপর দখল; ফলে নিন্দুকের দল ক্রমেই হটিয়া যাইতে থাকেন।

আমার পিতৃদেব ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার সমর্থক। তাঁহার দুই পত্রিকার[২] শক্তিশালী সমর্থন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থানে কিরূপ সবল ও সক্ষম সহায়তা করিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় চিত্রকলা ঐরূপে প্রবল বিতর্কের আবর্তে পড়িয়াছে। সেই কারণে

২ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'

তখন ঐ দুই পত্রিকার সকল শক্তি নিয়োজিত হয় তাহারই সমর্থনে। উপেন্দ্রকিশোরের বিশুদ্ধ চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রয়াস সেইজন্য সেখানেও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর নিজে ছিলেন সুরুচি ও শালীনত্বের আধার এবং আত্মবিজ্ঞপ্তির বিরোধী। তিনি তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও শিল্পকার্যের উপর আক্রমণ যথাযথ না হওয়ায় কোনো বাদানুবাদের মধ্যে যান নাই। শুনিয়াছি, এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলেন যে, ললিতকলার ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারিত এবং সীমানাবিহীন; আজ যাহাকে আমরা এই-দেশী বলিতেছি অতীতের বিদেশী কলাশিল্পের নিদর্শনের সহিত তাহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়— যদিও ইতিহাস অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজিয়া দেখা সম্ভব এখনও হয় নাই। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই দেশে বিচার ও বিতর্ক যথাযথভাবে চালিত হইতেছে না। তাহা হইলে এতটা উষ্মার, এইরূপ সাচ্চা-ঝুটা প্রকৃত-বিকৃত লইয়া তর্কের ও তীব্র বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইত না।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা ললিতকলার ক্ষেত্রে কিরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার শিল্পসৃষ্টি লইয়া যুক্তিতর্কের অবতারণা করা আমার অভিপ্রায় নয়। সুতরাং আমি উপেন্দ্রকিশোরের চিত্রকলা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, যদি শিল্পীর শিল্পচেতনার প্রকাশ এবং তাঁহার শিল্পীমানসে কল্পনার প্রসারের প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁহার চিত্রে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় তবে সেই শিল্পীর ললিতকলার ক্ষেত্রে অধিকার আছে। এই কথা আমি জানিয়াছি দীর্ঘ দিনের অধ্যয়ন ও বহু বিশেষজ্ঞের মতামত শুনিবার ফলে। উপেন্দ্রকিশোরের অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র যথা 'বলরামের দেহত্যাগ' তাঁহার ঐ অধিকারের যথার্থ পরিচয় দিয়াছে বলিয়া মনে করি।

যাঁহারা অজন্তা গুহা-চিত্রাবলীর মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার এক পর্যায়ের নয় শত বৎসরব্যাপী ইতিহাস যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের উপস্থাপন ভারতীয় চিত্রকলার ধর্ম বা রীতি-বিরোধী নহে। অজন্তার সপ্তদশ গুহায় সপ্তম শতকের ভারতীয় চিত্রশিল্পীর পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মুখাবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপের অনুপাত এবং তাহাদের সংস্থান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

তাহার পর আসে উপেন্দ্রকিশোরের ফলিত আলোকবিজ্ঞানের ফোটো-টেক্‌নিক শাখার ব্যবহার প্রয়াস বিষয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা। এই সাধনার আরম্ভ হয় ১৮৯১ সালে এবং উহা চলিতে থাকে ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত। তাহার পর রোগের প্রকোপে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় তিনি ঐ দিকে আর মনোনিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ সাধনার ফলে বহু বাঙালির তথা ভারতীয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান আজ হইতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ ইউ. রায়. অ্যাণ্ড সন্স সারা ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিত হয় এবং সেখানে তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়ের নিকটে যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের ফলে বহু সুনিপুণ ও দক্ষ প্রোসেস-শিল্পী পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্যবসায়ে নানা প্রকার বিপর্যয় ঘটার ফলে ইউ. রায়. কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের প্রসাদে শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবহারিক প্রয়োগজ্ঞান অর্জনের ফলে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা আজও এই বিষয়ে সারা ভারতে অগ্রণী হইয়া বর্তমান আছেন।

এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তা নিবদ্ধ হয় ছেলেদের জন্য লিখিত তাঁহার গল্পের ও প্রবন্ধের ছবি জঘন্যভাবে

পুস্তকে ও পত্রিকায় মুদ্রিত হয় দেখিয়া। তিনি যে কাজে মন দিতেন তাহাতে বাধা-বিঘ্ন কি আছে তাহা ভাবিয়া নিরুৎসাহ হওয়া তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অসীম ধৈর্য এবং অতি সূক্ষ্ম সমীক্ষণ-ক্ষমতা ছিল তাঁহার চরিত্রের ভূষণ এবং উপরন্তু ছিল দীর্ঘদিনের অধ্যয়নে অর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও উচ্চস্তরের গণিতে গভীর ব্যুৎপত্তি। সুতরাং ১৮৯৫ সালে হাফটোন ও লাইন ব্লক করিবার যন্ত্রপাতি আনিবার পর যখন তিনি দেখিলেন যে তাহার দ্বারা তাঁহার মনোমত উৎকৃষ্ট ছাপিবার ব্লক প্রস্তুত করা যাইতেছে না তখন তাহার উন্নয়নে তিনি লাগিয়া গেলেন অশেষ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত।

তখনকার দিনে হাফটোন প্রথায় ব্লক প্রস্তুত করা ছিল অতি প্রারম্ভিক পর্যায়ে। অতি অল্প লোকেই উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তবে পাশ্চাত্য দেশের রীতি অনুযায়ী ঐ বিষয়ে গবেষণা পরীক্ষা ও সমীক্ষা বিশেষজ্ঞেরা সমানে করিতেছিলেন। এবং ঐরূপ অবস্থায় যে রূপ হয়, সেইমত যে-যাহার মতবাদ (theory) চালাইয়া মহা বিভ্রান্তির সৃষ্টিই করিতেছিলেন। হাফটোন-প্রতিচ্ছবির রহস্য তাহাতে প্রায় প্রহেলিকায় দাঁড়ায়। কর্মশালায় হাফটোন-যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল স্থূল নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাহার ফলাফলের স্থিরতাও ছিল না কিছুমাত্রও। এই দেশে তখন সবেমাত্র ঐ পথে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষক বলিতে কেহ ছিল না। কারিগর কপাল ঠুকিয়া ছাপার অক্ষরে প্রদত্ত মামুলি নির্দেশ চালাইতে চেষ্টা করিত। ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য পরীক্ষাগারই ছিল না সারা এশিয়া ভূমিখণ্ডে, গবেষণাগার তো সবে মাত্র এতদিন পরে কয়েক বৎসর পূর্বে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার ধীশক্তি ইহাতে নিযুক্ত করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অসীম ধৈর্য ও অপ্রতিহত শক্তির সহিত তিনি তাঁহার গবেষণা ও সমীক্ষা চালাইতে থাকিলেন। সেই গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি উচ্চস্তরের ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি মন্তব্যে, যাহা বিভিন্ন জগৎবিখ্যাত পত্রিকায় সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার হাফটোন বিষয়ে গবেষণার প্রসঙ্গে ১৯০৪-৫ সালের Penrose Annual সম্পাদকীয় মন্তব্যে উপেন্দ্রকিশোরের "classical pen"— অর্থাৎ অতিউচ্চশ্রেণীর লেখা— উল্লেখ করিয়া বলেন—

"মি. রায় যে গণিতমুখী চিন্তাধারার অধিকারী তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আশ্চর্যভাবে সাফল্যের সহিত নিজের চিন্তাশক্তির প্রয়োগে হাফটোন-প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলির পূরণ করিয়া লইয়াছেন। যাঁহাদের কাছে PROCESS WORK পত্রিকার পূর্বেকার খণ্ডগুলি আছে তাঁহারা উহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পুনর্বার পাঠে লাভবান হইবেন। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো প্রোসেস কাজ আরো প্রণিধান যোগ্য হইয়াছে।"

বিখ্যাত ফোটো বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম গ্যাম্‌বল (William Gamble F. R. P. S.) তাঁহার Process Year Book বার্ষিকীতে মুদ্রিত 'A Wonderful Process' নামক প্রবন্ধে ঐ প্রোসেস কার্যপন্থা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে ইউ. রায়কে উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত করিয়া বলেন "investigators of the highest eminence, amongst whom I may mention··· U. Ray of Calcutta, whose admirable articles in the Year Book have shown not only a clear grasp of the subject but have suggested new methods of work."

Process-work and Electro-typing নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকা তাঁহার উদ্ভাবিত কার্যপন্থাগুলির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলেন, "Mr. U. Roy of Calcutta is far ahead of European and American workers in originality, which is all the more surprising when we consider how far he is from the hub-centres of process work."

তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ বিলাতের ফোটোটেক্‌নিক বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি সাগ্রহে ছাপিত এবং সেই প্রবন্ধগুলি তখনকার দিনে সারাজগতে তাঁহার খ্যাতি ছড়ায়। গ্যাম্‌বল লিখিয়াছেন যে তিনি জগতের সকল দেশ হইতে ইউ রায়ের কাজ সম্বন্ধে উৎসুক লোকের প্রশ্নপূর্ণ পত্র ক্রমাগতই পাইতেছেন। বিলাতের পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়াও ফ্রান্সের Le Procede (Paris) এবং মার্কিন দেশের The Inland Printer ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার কাজের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। হাফ্‌টোন জাতীয় কাজে বর্তমান উন্নতি বহুলাংশে তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী হইয়াছে এবং বর্তমান কার্যপ্রকরণে তাঁহার প্রস্তাবিত পন্থাগুলি হইতে অনেক কিছু পাওয়া হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন সুপণ্ডিত ও সাধকদিগের বংশে। তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত লোকনাথ রায় অল্পবয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনায় তিনি এইরূপ নিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কায় নর-কঙ্কাল ডামর গ্রন্থ মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণ ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জন দেন। এই শোকে লোকনাথ তিন দিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর মাত্র। লোকনাথের পুত্র কাশীনাথ রায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি উদার তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র সারদারঞ্জন পরে কলিকাতা মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ এবং ক্রিকেট খেলার গুরু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন এবং তাঁহার নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর।

উপেন্দ্রকিশোর বাল্যকাল হইতেই সংগীত ও কলাশিল্পে অনুরাগী ছিলেন। নিজে নিজেই বাঁশি ও বেহালা শিখিয়াছিলেন এবং স্বরস্বরের প্রভেদ সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার আঁকা নিজ প্রতিকৃতি দেখিয়া সার্ এশ্‌লি ইডেন কি ভাবে মোহিত হইয়াছিলেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্কুলে পড়িবার সময় একজন বেহালাবাদকের যন্ত্রে একটি সুন্দর গৎ শুনিয়া বাড়িতে আসিয়া তাঁহাদের একজন পুরাতন ভৃত্যকে বলেন, 'গুপীদা, তুমি এখনই একটা বেহালা আমার জন্য কিনিয়া আনো। দেরি করিলে ভুলিয়া যাইব'।

পরবর্তী জীবনে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় এই বিদেশী বাদ্যযন্ত্রকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করায় প্রযুক্ত হয়। তিনি যে কাজে মনোনিবেশ করিতেন তাহার অভিনবতম দেশীবিদেশী রীতিপদ্ধতি ও তথ্যাদি গভীরভাবে অনুশীলন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল এবং সংগীতে ও শিল্পেও সেই পথে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। ছাত্র-অবস্থায় এই কারণে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে প্রথম দিকে সেইরূপ মনোযোগ না দিয়া চিত্রাঙ্কন ও গীতবাদ্যের চর্চাই বেশি করিয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা থাকায় ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। স্কুলের একজন সহৃদয় শিক্ষক শরৎচন্দ্র রায় উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা চরিত্র ও কলাবিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া

তাঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। যখন উপেন্দ্রকিশোরের প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্ন তখনও পড়াশুনায় তাঁহার ঝোঁক নাই দেখিয়া শরৎবাবু প্রধানশিক্ষক রতনমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন। প্রধানশিক্ষক উপেন্দ্রকিশোরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিয়ো তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিয়ো না।" উপেন্দ্রকিশোর সেই দিনই সাধের বেহালা ভাঙিয়া ফেলিয়া পড়াশুনায় মন দিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পড়েন। মেট্রোপলিটন কলেজ হইতেই ১৮৮৪ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন।

তাঁহার স্কুলের শিক্ষক শরৎচন্দ্র রায় ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াই উপেন্দ্রকিশোর বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এ কারণে তাঁহাকে অনেক অত্যাচার ও শাসন-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রশান্তচিত্ত ও সহজ সুমিষ্ট ব্যবহারেরই জয় হইল। তাঁহার সহিত আত্মীয়-স্বজনদের বিচ্ছেদ হইল না। উপেন্দ্রকিশোরেরা পাঁচ ভাই। তাহার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন ও তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন ভিন্ন অন্য তিনজন এবং ভগ্নীপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু (বিখ্যাত এইচ্. বোস) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও মহিলাপ্রগতির কাজে খ্যাতনামা ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করেন— বোধ হয় ১৮৮৫ সালে। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সুখলতা ও মধ্যমা পুণ্যলতা লেখিকা রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুখলতা চিত্রকলায়ও কুশলী। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুকুমার রায় শিশুসাহিত্যে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র সুবিনয়ও শিশুসাহিত্যে সুলেখক বলিয়া পরিচিত, প্রোসেস-কাজেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদারঞ্জন অধ্যাপক পণ্ডিত ও ক্রিকেট খেলায় উৎসাহী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন সুরসিক ও সুলেখক ছিলেন এবং ক্রিকেট ও ফুটবলে (টাউন ক্লাব) নাম করিয়াছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা কুলদারঞ্জনের কৃত ইংরাজি কিশোর-সাহিত্যের ও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সার্ আর্থার কনান ডয়েলের পুস্তকগুলির অনুবাদ এককালে বাংলার ছেলেবুড়োদের সকলেরই প্রিয় ছিল। ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসাবে (নাটোর টিম) ইনিই ভাইদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফি ও সংগীতেও ইঁহার নৈপুণ্য ছিল। সর্বকনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জন লেখক ও ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসাবে কিছু নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্ভেয়ার (জরীপ-পরিচালক) হিসাবে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বর্তমান নেফা) ও আরাকান-ব্রহ্ম সীমান্তের জরীপে কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছিল। উপেন্দ্রকিশোরও ক্রিকেট খেলার ভক্ত ও দক্ষ ছিলেন। আমরা বাল্যে তাঁহার ক্রিকেট (ব্যাটম-বল) খেলার বিবরণ ও প্রশংসা শুনিয়াছি। সত্যসত্যই লোকনাথ রায় ও মুন্সী শ্যামসুন্দরের বংশধরেরা পিতৃকুল আলোকিত করিয়াছিলেন।

সবশেষে উপেন্দ্রকিশোরের সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া শেষ করি— যাহা আমার বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। মনে পড়ে, সেই দীর্ঘকায় কবাটবক্ষ দেহের ও গুম্ফশ্মশ্রুবহুল এবং আয়তনেত্রযুক্ত সুগঠিত মুখাবয়বের কথা। *মনে পড়ে, সেই চিন্তাশীল গাম্ভীর্যমণ্ডিত সুন্দর মুখের প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি কি

ভাবে স্নেহালোকে উচ্ছ্বসিত হইত আমাদের মত বালকবালিকা ও কিশোরদের সহিত কথাবার্তার সময়। পরবর্তী জীবনে বুঝিয়াছি যে, ঐ আশ্চর্য প্রশান্ত ও স্থির দৃষ্টি তাঁহাদেরই ভূষণ যাঁহাদের অন্তর শুচি, চরিত্র বিশুদ্ধ ও হৃদয় নির্মল। উপরন্তু উপেন্দ্রকিশোরের স্বভাব ছিল ধর্মবুদ্ধি ও ধৈর্য -সম্পন্ন। বড় হইবার পর তাঁহার সমসাময়িকদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অমায়িক ও শিষ্টাচার ভূষিত প্রকৃতির প্রশংসাবাদের মধ্যে।

তিনি সেই যুগে— যখন সভ্যজগৎ 'আমাদের অসভ্য বর্বর বলিয়া জানিত'— সারা জগতে খ্যাতি ও স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানী আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে, অথচ তিনি তাঁহার শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অহংকারশূন্য ও নিরভিমান। সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁহার চরিত্রের অলংকার, তাঁহার মন ছিল শিশুর মত সরল ও স্নিগ্ধ। জ্ঞান-অর্জনের জন্য তিনি একাগ্রচিত্তে কঠোর পরিশ্রম করিতেন, যাহার ফলে তিনি দুরারোগ্য ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ৪ঠা পৌষ ১৩২২ সালে গিরিডিতে ৫২ বৎসর বয়সেই সেই অমূল্য জীবনের শেষ হয়। যাত্রার আরম্ভ হইয়াছিল ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে ২৮শে বৈশাখ ১২৭০ সালে।
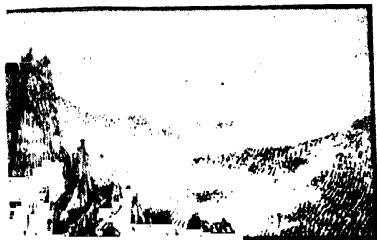
রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'নদী'

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -অঙ্কিত

চিত্রাবলী

১

২
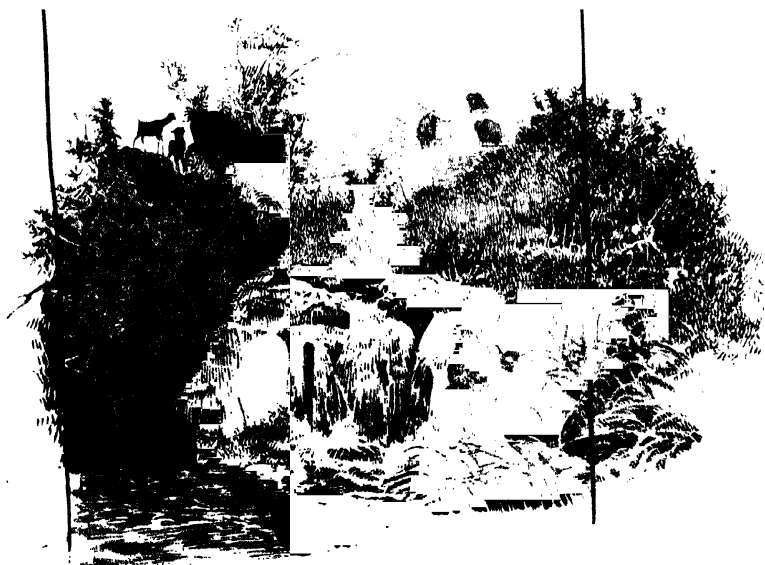
8
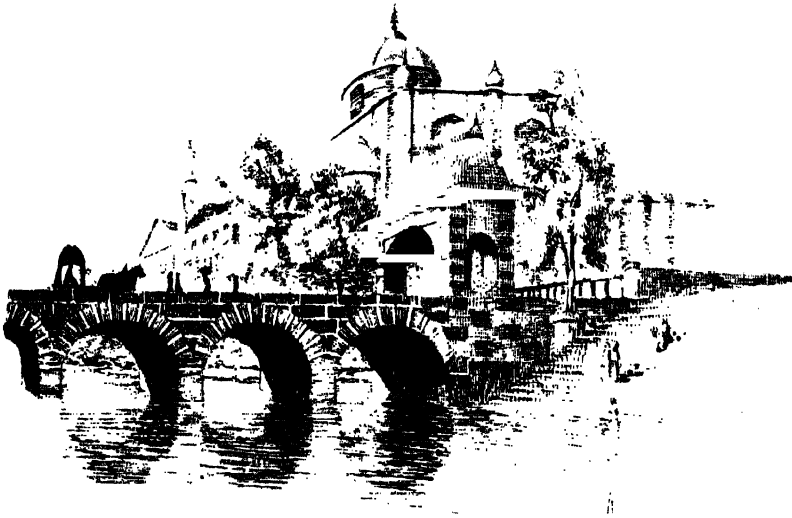
রবীন্দ্রনাথের 'নদী' : চিত্রপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল। কিছুকাল আগে আমরা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির চিত্রসংগ্রহে এই চিত্রাবলীর সন্ধান পাই। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের শতপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে; এবার উপেন্দ্রকিশোরের শতপূর্তি-উৎসব পালনে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্যে এই চিত্রাবলী মুদ্রণের সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত। চিত্রগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, তার পরিচয় দেওয়া হল—

১ তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধুধু।

২ তাই ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।

৩ সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।

৪ শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।

৫ সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা,
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।

৬ তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

৭ সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি—
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

পূর্ব প্রবন্ধে[১] আমরা যে সকল সংশোধনের কথা বলিয়াছি সে সবই ঘটিয়াছে পুঁথির ভিতরে। এখন যে সংশোধনের কথা বলিব সেগুলি ঘটিয়াছে মুদ্রিত পুস্তকের পাতায়।

পুঁথির মধ্যে যে ভুলচুক শব্দাদির পরিবর্জন-পরিবর্তন-সংযোজন সাহায্যে সংশোধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনো কোনো স্থলে একটু আধটু গণ্ডগোল ঘটিয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই।

এই ভুলগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাদের অধিকাংশই বর্ণঘটিত। দ্রুত লিখনের সময় পাঠের অনেক স্থলে লিপিকর এক শব্দ বা অক্ষরের স্থলে অন্য শব্দ বা অক্ষর লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও কিছু কিছু ছাড়ও পড়িয়াছিল, আবার কোথাও বা অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। পুঁথির অভ্যন্তরস্থ এই ভুলের যখন যেটি লিপিকরের নজরে পড়িয়াছে সেটি তিনি তখনই পুঁথির পাতায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শুধু লিপিকরগণের নয়, অন্য হাতেরও চিহ্ন আছে। পুঁথি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভুল নজরে পড়িলে সংশোধন করিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এত সংশোধন সত্ত্বেও পুঁথির মধ্যে আরও অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছিল, সম্পাদক মহাশয়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে। এবং তিনি স্বয়ং সেগুলি সংশোধন করিয়া দেন। এক এক করিয়া সেই সংশোধনগুলির কথা বলিতেছি।

"ল" স্থানে কয়েক জায়গায় "ন" লিখিত হইয়াছিল, বসন্তবাবু সেগুলিকে "ল" করিয়া দিয়াছেন।

দা-৩৪।১৬— ছিল "নানা উপভোগে নহে"। করা হইয়াছে "নানা উপভোগে লহে"।

দা-৫০।৩।১— ছিল "না কর সুন্দরী রাধা আন জঞ্জাল"। করা হইয়াছে "না কর সুন্দরী রাধা আল জঞ্জাল"।

দা-৭২।১।২— ছিল "নীলাএ আহ্মে মুরারী"। করা হইয়াছে "লীলাএ আহ্মে মুরারী"।

দা-৮৮।৪।১— ছিল "আহ্মে আতিশয় বালী নবনীলদল কোঁয়লী"। বসন্তবাবু "নবনীল" শব্দের বদলে "লবলী" করিয়াছেন। অনুরূপ স্থলে অর্থাৎ কোমলতার উপমান হিসাবে সর্বত্রই "লবলী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : লবলীদলকোঅলী বি-৩০, লবলীদল কোঁমল। তা-১৫।

নৌ-৫।৬।১— ছিল "ও কুলত গেলেঁ যদি নাগ পাএ কাহ্নে"। বসন্তবাবু "নাগ"কে "লাগ" করিয়াছেন।

ভা-২৩।২।২— ছিল "আজি লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী"। বসন্তবাবু "তিনাঞ্জলী" কে "তিলাঞ্জলী" করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তন আরও কয়েকস্থলে করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : "লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী" বৃ-২। সম্পাদক "তিলাঞ্জলী" করিয়াছেন। বৃ-২ পদে একটি "তিন" কে "তিল" করা হইয়াছে। পুঁথিতে ছিল "বড় মানে তিন উপকার", করা হইয়াছে "বড় মানে তিল উপকার"। বি-৬ পদেও একটি ছত্র ছিল,

১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০ সংখ্যায় মুদ্রিত

"তোর নেহে তিনাঞ্জলী দিঅাঁ"। এখানেও বসন্তবাবু "তিলাঞ্জলী" করিয়াছেন। বি-১৭ পদেও "তিনাঞ্জলী" ছিল, "তিলাঞ্জলী" করা হইয়াছে।

আরও অনেকগুলি ক্ষেত্রে "ন" কে "ল" করা হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

যহা-৫।১।৩— ছিল "তরাসিনী হঅাঁ"। করা হইয়াছে "তরাসিলী হঅাঁ"।

বি-২।৩।২— ছিল "নেহানিলোঁ তাহার বদনে"। করা হইয়াছে "নেহালিলোঁ তাহার বদনে"।

বি-৪০।১।১— ছিল "মৈনাক মারিলেঁ"। করা হইয়াছে "মৈলাক মারিলেঁ"।

বি-৪৯।ধ্রু।৩— ছিল "দগধিনী বৈলী"। করা হইয়াছে "দগধিলী বৈলী"।

বি-৪৯।৫।১— ছিল "বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে"। করা হইয়াছে "বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে"।

বি-৬৮।ধ্রু।১— ছিল "আসুখিনী চন্দ্রাবলী"। করা হইয়াছে "আসুখিলী চন্দ্রাবলী"।

লিপিকরের হাতে কোথাও কোথাও অক্ষর ছাড় পড়িয়াছিল, বসন্তবাবুর হাতে সেগুলি সংশোধিত হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

তা-১৯।১।১— ছিল "না ছুইল স্বামী"। করা হইয়াছে "না ছুইল স্বামী"।

দা-৯৯।২।১— ছিল "ছিণ্ডিআঁ মুকুতার"। করা হইয়াছে "ছিণ্ডিআঁ মুকুতা হার"।

নৌ-২০।১।৪— ছিল "কোমন পরাণে"। করা হইয়াছে "কোমন পুরাণে"।

বং-৫।৪।২— ছিল "না জাণ কেমন"। করা হইয়াছে "না জাণো কেমন"।

বং-১৭।২।১— ছিল "শীতল মনোহর বাশী"। করা হইয়াছে "শীতল মনোহর বাঁশী"।

বং-৪১।১২।২— ছিল "কালী নই তীরে হৈতে"। বসন্তবাবু করিয়াছেন "কালীনি নই তীরে হৈতে"। এই সংশোধনটির প্রয়োজন ছিল কি না সে সম্বন্ধে একটু সংশয় জাগে। আমাদের মনে হয় মূল কবি ইচ্ছা করিয়া সজ্ঞানেই কালিন্দী বুঝাইতে "কালী নই" লিখিয়াছিলেন। "কালী নই" ছন্দেও মিলে। বরং "কালিনী" করিলেই দোষ হয়।

অনবধানতাবশতঃ কোথাও কোথাও লিপিকর দুই একটি অক্ষর ভুল করিয়া বসাইয়া ফেলিয়াছিলেন, মিলাইবার সময়ও সেগুলি নজরে পড়ে নাই। বসন্তবাবু সম্পাদনার সময় সেগুলি বাদ দিয়াছেন।

কয়েক স্থলে শব্দের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ যেখানে যে বর্ণ বসা উচিত ছিল না সেখানে লিপিকর তাহা বসাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বসন্তবাবুর সতর্ক দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়িয়াছে। তিনি যেখানে যেমন প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন সেখানে সেইরূপ পরিবর্জন পরিবর্তন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও বাক্যবিন্যাসের ত্রুটি ছিল সে ত্রুটিও তাঁহার হাতে সংশোধিত হইয়াছে। মূল পুঁথিতে কি ছিল এবং বসন্তবাবুর হাতে সংশোধিত হইয়া তাহার কি রূপ হইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বোঝা হইবে :

খণ্ড পদ স্তবক ছত্র	পুঁথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
জ-৪।২।২	চিন্তির	চিন্তিল
দা-৪।৩।৪	আন চাচানে	আনচানে
দা-১৫।২।৪	যাব	যাবোঁ

দা-৩৫।২।৪	যাব	যাবোঁ
দা-১৮।১।২	কৌণোঁ	কৈলোঁ
দা-১৮।১।৪	মোথড়া গোবালী	গোবালী মোথড়া
দা-৩২।১০।১	হেম রূপ	হেন রূপ
দা-৩৫।২।১	আইহহন	আইহন
দা-৪৮।৫।১	হেন	দেহ
দা-৪৬।২।৪	বিবাচার	বিচার
দা-৪৯।২।২	বিকো	বিকে
দা-৬০।১।৩	কানড়ি খোঁপা	শ্রীফল যোড়
দা-৬১।৮।১	সে জন	যে জন
দা-৮৪।আরম্ভ	শৌরীরাগঃ	গৌরীরাগঃ
নৌ-৪।আরম্ভ	"	"
ভা-১১।আরম্ভ	"	"
যকা-২।আরম্ভ	সৌরীরাগঃ	"
দা-৮৬।ধ্রু।১	কাহ্নাঞি	কাহ্নু
দা-৯০।আরম্ভ	অঢুক্কঃ	কুড়ুক্কঃ
দা-৯০।১।৩	বড়ায়ি	কাহ্নাঞি
দা-৯২।২।৪	বুধ	শুধী
দা-৯৩।১২।২	কাহ্নাঞি	বড়ায়ি
দা-৯৪।২।১	হোতিত	হাথত
দা-৯৫।ধ্রু।১	বান্ধে	বিন্ধে
দা-১০২।৫।২	তোহ্মাতে	আহ্মাতে
দা-১০৫।৩।২	প্রাতে	ঘাতে
দা-১০৬।২।৩	দশন রসনে	দশনবসনে
নৌ-৯।৪।২	পরি কর	করপার
নৌ-১৩।৬।৩	দানঘাট	ঘাটদান
নৌ-১৪।আরম্ভ	একাতালী	একতালী
নৌ-১৯।৪।২	ত্রিভুবনের বাঅ	ত্রিভুবনের রাঅ
নৌ-২০। ।৪	পরাণে	পুরাণে
নৌ-২০।৩।২	সাথী	সাতি
নৌ-২৮।ধ্রু।১	তাক	তোক
ভা-৪।২।২	পন্থথ	পন্থত
ভা-৪।৩।৩	শরতে সমএ	শরত সমএ

ভা-৬।২।১	আহ্মে আহ্মে	আহ্মে
ভা-১৭।৩।২	চাড়ে	ছাড়ে
ভা-২৩।ক্র।১	যুগেঁ যুগেঁ	আগেঁ আগেঁ
ভা-২৩।৩।২	বাটে	হাটে
ভা-২৪।১।১	বুঝিলোঁ	বুঝিলে
বৃ-৩।১৩।১	মোর	তোর
বৃ-৮।৪।৩	ফেরুস	সফেরু
বৃ-৮।৪।৬	করঙ্গকরণে	করঙ্গক বণে
বৃ-৮।৮।৪	ঝঙ্কারে	হুঙ্কারে
বৃ-১০।২।৩	একা	এক
বৃ-১১।৪।১	তোর	মোর
বৃ-১৩।২।৪	হেনেন	হেন
বৃ-১৬।২।৩	পুষ্ট	অষ্ট
বৃ-১৬।৩।২	বদধী	বদরী
যকা ৭।২।১	কাশীর	কালীয়
যব ২।৫।১	তাম্বুলে	তাম্বুল
যব-৫।৪।০	তোর	তার
যব-৭।২।২	কেহো	কাহো
যব-৮।১।৩	একই	এক
যব-১২।১।৩	আগে	ভাগে
যব-১২।ক্র।২	কাল	কৈল
যব-১৪।১০।১	জলকেরি	জলকেলি
যব-১৮।৪।১	মনমথ সব	মনমথ সর
বা-৩।৪।১	শরীর	সমীর
বা-৮।১।৪	করে	করি
বা-৯।২।১	পাণ্ডু গণ্ড	পাণ্ডুগণ্ড
বা-৯।৩।২	জঘনে বসে মুপুরু	জঘনে বসে নূপুরু
বা-১০।২।২	রখেউ	রাখউ
বা-১২।২।২	পরাণে	পরাণ
বা-১৪।১।১	শোষিল	শোধিল
বা-১৬।৮।১	রাধা	কাহ্ন
বা-১৮।৩।৪	তোক	মোক
বা-১৮।৪।৩	দানঘাট	ঘাটদান

বা-২৭।২।৩	রাধা	রাখী
বা-২৭।২।৪	বড়ায়িক	বড়ায়ি
বা-২৭।৮।৩	বনমালী	চন্দ্রাবলী
বং-১।৫।১	তুলিলী	ভুলিলী
বং-১।৫।১	রাণী	দাসী
বং-৩।২।৮	বিরসিল	বিসরিল
বং-৫।৪।২	জাণ	জাণো
বং-৮।১।১	আহ্মার	তোহ্মার
বং-১২।১।১	যমুনীর	যমুনার
বং-১২।৩।১	তাহারা	তাহার
বং-১৭।২।১	বাশী	বাঁশী
বং-১৯।ধ্রু।১	শ্রীরঘুনন্দন	শ্রীনন্দনন্দন
বং-২০।৭।১	থাক	তাক
বং-২১।২।৭	ভিথর	ভিতর
বং-২২।৪।৩	সবে	সব
বং-২৫।৩।৪	খরল	গরল
বং-২৬।১।২	সঘনে	সয়নে
বং-২৯।৪।১	বাংশী	বাঁশী
বং-৩০।২।৩	মিঠ	মিছ
বং-৩০।২।৩	দেখে	লেখে
বং-৩৪।১।২	বিহ্মিল	বাহ্মিল
বং-৩৮।ধ্রু।২	বাঁশী দেহ বাঁশী আনী	তাক বাঁশী দেহ আনী
বং-৪২।১২।২	কালী	কালীনি
বি-২।৩।২	নেহানিলোঁ	নেহালিলোঁ
বি-২৭।২।৩	সঙ্কে	সমে
বি-২৯।২।১	ইহা	ইড়া
বি-২৯।৩।১	বুলিলোঁ	বুলিল
বি-৩৩।২।২	তোক না কৈলোঁ	মোকে না কৈলেঁ
বি-৩৩।৪।১	তেজ সঙ্গ মোর	তেজ মোর সঙ্গ
বি-৪০।১।৪	কাজ	ছার
বি-৪৭।৬।২	বাসলী	বসিলা
বি-৫১।৬।৩	আআর	আঅর
বি-৫২।২।৪	দশন রসনে	দশন বসনে

বি-৫২।৩।৩	মরণে	মণে
বি-৫৭।৪।৩	কেহ্নেমণে	কেহ্নমণে
বি-৬০।৪।১	বড়ায়ির	রাধিকার
বি-৬৩।৩।৪	গটিল	গঢ়িল
বি-৬৪।১।২	মদনে কদনে	মদন কদনে
বি-৬৫।৩।২	ডাল	জল
বি-৬৮।২।৪	আদবাহ	আদরাহ

প্রদর্শিত ভুলগুলির মধ্যে অধিকাংশই এত সুস্পষ্ট যে সংশোধনের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। "যমুনার" লিখিতে গিয়া লিপিকর "যমুনীর" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। আকারের স্থানে ঈকারটা লেখকের অনবধানতায় বসিয়া গিয়াছে তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। সম্পাদক মহাশয় এইরূপ ভুল অনেক সংশোধন করিয়াছেন। ভুলের তালিকাটি পড়িলে দেখা যাইবে যেখানে "তোহ্মার" বসিবার কথা সেখানে "আহ্মার" বসিয়া গিয়াছে। যেখানে বসা উচিত ছিল "দাসী"র, সেখানে "রাণী" বসিয়া গিয়াছে। যেখানে "মোক" লেখা উচিত লিপিকর সেখানে "তোক" লিখিয়া ফেলিয়াছেন। "বসিলা" লিখিতে গিয়া কোথাও বা "বাসলী" লেখা হইয়া গিয়াছে। "রাধিকা"র জায়গায় "বড়ায়ি", "চন্দ্রাবলী"র জায়গায় "বনমালী", "হাটে"র জায়গায় "বাটে" বসিয়াছে। প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া পাঠ করিলেই এসব ভুল অনায়াসেই ধরা পড়ে। বসন্তবাবু এইজাতীয় ভুলগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়াছেন এবং পাঠককে ভাবনার অবকাশ না দিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই সংশোধনগুলির মধ্যে দুই-চারিটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

দা-৬০।১।৩—"শ্রীফল যোড়" যেখানে লেখা উচিত ছিল লিপিকর সেখানে লিখিয়াছিলেন "কানড়ি খোঁপা"। কেন লিখিয়াছিলেন? কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করিলেই সেটা বোঝা যাইবে:

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞি করন্তি যতন॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় ছত্রে যে "কানড়ী খোঁপা" লেখা হইয়াছিল তাহারই স্মৃতিপ্রভাবে অস্থানে উহা দ্বিতীয় বার লিখিত হইয়াছে। লিপিকর পরেও তাহা সংশোধন করেন নাই। এখন কথা উঠিতে পারে "কানড়ী খোঁপা" না হয় তুলিয়া দিলাম কিন্তু "শ্রীফল যোড়" বসাইব কেন? পয়োধর বর্ণনায় কবি অনেক রকম উপমার আশ্রয় হইয়াছেন। যেমন,— শ্রীফল সদৃশ দা-৫৮।১।৩, উলট কটোরে দা-৬২।৩।২, কমল কোরক নৌ-২৭।১।৩, আমৃত কলস বৃ-৩০।১।৩, মুকুলিত থল কমল বৃ ২৬।৮।১, চক্রবাকযুগল ছ-৬।২।৮, যোড় শ্রীফলে দা-৩২।৬।২, শ্রীফলযুগল দা-২৪।১৫।১, তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার দা-১৬।৩।১, পাকিল শ্রীফল দা-২২।২।৪। দেখা যাইতেছে পয়োধরের উপমা হিসাবে শ্রীফলের উপরেই কবির পক্ষপাত বেশী। বসন্তবাবু সেটা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ "শ্রীফল" বসাইয়াছেন। ভালই হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু "যোড়" বসাইলেন কেন, "যোড়"এর স্থানে আর কিছু বসাইলেন না কেন? কবির কি অভিপ্রায়

ছিল তাহা যখন জানা নাই এবং অনুমান দিয়াই যখন অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে তখন কবির প্রযুক্ত শব্দাবলীর উপর নির্ভর করাই সর্বাধিক যুক্তিসংগত। কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মধ্যে "শ্রীফল" এবং "যোড়" এই দুই শব্দের এইরূপ পাশাপাশি অবস্থান আর নজরে পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ যে শব্দ বসাইতে হইবে তাহার মাত্রাসংখ্যা হওয়া উচিত ছয়। "শ্রীফল যোড়" পাঁচ মাত্রা, জোর করিয়া ছয় মাত্রা করিতে হইবে। অথচ কবির নিজের ব্যবহৃত ছয় মাত্রার শব্দ অনেক আছে, উপরে তাহা দেখাইয়াছি। "শ্রীফল" শব্দটি রাখিয়াও ছয় মাত্রা পাওয়া যায়। যেমন,—"শ্রীফল সদৃশ," "শ্রীফল যুগল," "পাকিল শ্রীফল"। ইহাদের মধ্য হইতেই একটিকে লই না কেন? "শ্রীফল যোড় বড়ায়ি মোর দুই তন" ইহার জায়গায় যদি করি "শ্রীফল যুগল বড়ায়ি মোর দুই তন," তাহা হইলে ছন্দ নির্দোষ হয় এবং আমরা কবির অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারি। তর্ক উঠিবে, "বড়ায়ি" শব্দে তো তিনটি অক্ষর আছেই তাহার সহিত "শ্রীফল যোড়" এই পাঁচটি যোগ করিলে আঠ অক্ষর পাই এবং তাহাতে আঠ মাত্রা হইয়া যায়। তাহা হয় বটে কিন্তু "বড়ায়ি"র "ব" কে বিচ্ছিন্ন করিয়া "যোড়" এর সঙ্গে মিলাইতে হয় এবং "ড়ায়ি" কে পৃথক করিয়া দুই মাত্রায় উচ্চারণ করিতে হয়। সেটা একটু অস্বাভাবিক হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এই রকম ক্ষেত্রে "বড়ায়ি", "কাহ্নাঞি" প্রভৃতি তিন অক্ষরের শব্দকে অধিকাংশ স্থলেই দুই মাত্রা করা হইয়াছে। নীচের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দা-৮৬।৪।১—মূল ছত্রটি ছিল "মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্ন পথে মাহাদানী"। বসন্তবাবু ছন্দের উৎকর্ষ সাধনের জন্য "কাহ্নাঞিঁ"কে "কাহ্ন" করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণকীর্তনে তিনি অক্ষরের শব্দকে ছন্দের জন্য দুই মাত্রা করিয়া পড়িবার প্রয়োজন বহুস্থলেই অনুভূত হয়। যেমন,—"এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ" দা-৯০।২।২, "এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সাহিতে না পারী" দা-৯১।৪।১, "কোমণ পুরাণে কাহ্নাঞিঁ আছে পরদার" নৌ-২০।১।৪। এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। তিন মাত্রাকে দুই মাত্রায় আনিতে হইলে উদ্ধৃত সব কয়টি "কাহ্নাঞিঁ"কে "কাহ্ন" করিতে হয়, কিন্তু তাহা তো করা হয় নাই।

নৌ-৯।৪।২-এর সংশোধন সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। নৌ-৯ এর ৪র্থ স্তবকটি এইরূপ:

দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর।
সাবধানে সব সখি ঝাঁট কর পার॥

পাদটীকায় বলা হইয়াছে পুঁথিতে "ঝাঁট পরিকর" ছিল। পুঁথি মিলাইয়া দেখিলাম "পরিকর" নয় "পার কর" আছে। া-কার এবং ি-কার এর মধ্যে পার্থক্য এত অল্প যে এককে আর মনে হওয়া অসম্ভব নয়। "পার-কর" ছিল, এবং "পার কর" হওয়াই সংগত। উপরে "মথুরানগর" আছে, "ঝাঁট পার কর" করিলেই উহার সঙ্গে মিল ভাল হয়। "পার কর" এর জায়গায় "কর পার" করিবার কোনো সার্থকতা দেখি না। "পার কর" এই ক্রিয়ার ব্যবহার বহুস্থলে দেখা যায় যেমন,—"সন্ধা পার কর যাইউ মথুরার হাটে" নৌ-৮।৪।৩, "বুইল পার কর আগু মোর সব সহী" নৌ-৯।২।২।

আরও একটি কথা আছে। আলোচ্য নৌ-৯ পদে একাধিক ছত্রের অন্ত্য শব্দ "পার"। এই "পার"-এর সহিত যতগুলি শব্দের মিল দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনোটিরই উপান্ত্য স্বর "অ" নয় প্রত্যেকটিই "আ"। যেমন,—"গঢ়ন আন্ধার" "করি তোর পার," "নাথানি আন্ধার" "রাধা হৈবেঁ পার," "মন কৈল সার" "বড়ায়ি কর পার"। নৌ-১১ পদে "আগু কৈলোঁ পার" "যৌবন ভার"। নৌ-১২ পদে "করিবোঁ মো পার" "সাতেসরী

হার"। নৌ-১৪ পদে "যমুনাত পার" "যৌবন আন্ধার," "ঝাঁট কর পার" "ঘোলের পসার," "ঝাঁট কর পার" "ননন্দ আন্ধার"। নৌ-১৬ পদে "মোক কর পার" "সংহতী আন্ধার"। নৌ-১৮ পদে "করসি পার" "নৈলোঁ আধিকার"। দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়ানো চলে কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। অন্য পক্ষে দেখিতেছি "কর" শব্দের সঙ্গে যাহার মিল তাহার উপান্ত্য স্বর "অ"। যেমন,—"শুন দামোদর" "ঝাঁট পার কর" নৌ-১১। সুতরাং আলোচ্য ছত্রটির শেষাংশ "ঝাঁট পার কর" হওয়াই উচিত।

নৌ-২০।৩।২—ছত্রটি এইরূপ ছিল, "দোষ পাইলে নাকে কানে করে সাথী"। বসন্তবাবু শেষের শব্দটির বানান বদলাইয়া "সাতি" করিয়াছেন। "সাথী"কে "সাতি" করা হইল কেন? "শাস্তি" হইতে উৎপন্ন বলিয়াই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় "সাতি" বানান পছন্দ করিয়াছেন। "সাতি"র সমর্থনে তিনি টীকায় প্রাচীন পদ হইতে এই দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন:

'রস নহি হোএল কএল যে সাতি'।—বিদ্যাপতি।
'গোবিন্দ দাস কহ সমুচিত শাতি'।—গোবিন্দ দাস।

সংস্কৃতে 'সাতি' শব্দ পাওয়া যায় বিনাশ অর্থে। কাটা বা ছিন্ন করা অর্থে 'শাতন'ও আছে। কিন্তু আলোচ্য শব্দটির মূল যে 'শাস্তি' বসন্তবাবুর এই অনুমানই গ্রহণযোগ্য। যদি তাহাই হয় তবে "সাথী" বানান বাতিল করিব কেন? হস্তী হইতে হাথী বা হাথি যদি হইতে পারে সেই নিদর্শনায় শাস্তি হইতে সাথী (অথবা সাথি, শাথী, শাথি) হইবে না কেন? বিদ্যাপতির যে ছত্র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার পরবর্তী ছত্র "মদনলতা জনু দংশল হাতী"। হস্তীর 'স্ত' হইতে 'থ' এবং 'ত' দুইই হইতে পারে, তবে 'থ' ই যে প্রাচীনতর রূপ তাহা ভাষাতত্ত্বের ছাত্রগণের অবিদিত নহে। উল্লিখিত ছত্রে যখন 'ত' দেখিতেছি তখন সহজেই বোঝা যায় এই রূপটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিদ্যাপতি 'হাতী' বানান করিয়াছিলেন কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে যদি "হাথী"র স্থলে "হাতি" লিখেন তবে "সাথীর স্থলে "সাতি" লেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। বিদ্যাপতিতে "হাতী" আছে এবং "হাথী"রও অভাব নাই। তাই বলিতেছি তাঁহার পদে কয়েক জায়গায় শাতি বা সাতি দেখিতেছি বলিয়া পূর্বতর রূপ "সাথী" "সাথি"র অনস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। আমাদের মনে হয় শাস্তি অর্থে "সাথী" শব্দের প্রয়োগ লেখক সজ্ঞানেই করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের পক্ষে সুবিধাই হইয়াছে। আমরা "শাস্তি" ও "শাতি"র মধ্যবর্তী প্রত্যাশিত রূপটি প্রত্যক্ষ করিলাম। "সাথী" অশুদ্ধ নয় অন্ততঃ সুস্পষ্টরূপে অশুদ্ধ নয়, সুতরাং ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না।

য-৮।১।৩ পুঁথির ছত্রটি এইরূপ ছিল "ভৈল একই পরাণ একই দেহা"। সংশোধনের পর হইয়াছে "ভৈল একই পরাণ এক দেহা"। পূর্বের ছত্র "তোর মোর সুদৃঢ় নেহা" র সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই সম্ভবতঃ সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় "একই"র "ই" কাটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের দোষ কোথায় নাই? যে ভুল অতিশয় সুস্পষ্ট তাহা ছাড়া আর কিছুতে হাত দেওয়ার প্রয়োজন কি? ছন্দ সংশোধনের দায়িত্ব লইতে হইলে তো ছত্রে ছত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

য-১০।১।৩ ছত্রটি এইরূপ ছিল "হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানড়ে কুণ্ডল"। এ ভুলটি সুস্পষ্ট। "কানতে" লিখিতে গিয়া লিপিকর যে "কানড়ে" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নিম্নোক্ত ধরনের ত্রুটির উপর সম্পাদক মহাশয়ের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় কি না সে সম্পর্কে দ্বিধা জাগে। য-১০।ধ্রু।১ ছত্রটি পুঁথিতে প্রথমে এইরূপ ছিল—"ধীরেঁ ধীরেঁ যা গোআলিনী সুণ মোর বোল"। পুঁথিতেই

"ধা"র পর তোলাপাঠে "হা" দেওয়া হইয়াছে। ছত্রটির পরিবর্তিত রূপ দাঁড়াইয়াছে—"ধীরেঁ ধীরেঁ যাহা গোআলিনী স্থণ মোর বোল"। মানিলাম ছন্দে দোষ আছে। কিন্তু সে দোষ সকলের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তোলাপাঠ যখন দেওয়া হইয়াছে তখনই বোঝা গেল যে ছত্রটির উপর লিপিকরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তোলাপাঠ যদি লিপিকরের হস্তকৃত না হয় তাহা হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আলোচ্য ছত্রটি কেহ না কেহ বিচারকের দৃষ্টি দিয়া পড়িয়াছেন, হয়তো আদর্শ পুঁথির পাঠের সঙ্গেও মিলাইয়া দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় কেবল মাত্র ছন্দের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সংশোধন অনাবশ্যক বোধ করি। ওই পদেরই দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম ছত্র এইরূপ ছিল, "আহ্মা লয়িআঁ রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি"। বসন্তবাবু প্রথম "লয়িআঁ"র স্থানে "লজ্ঘিআঁ" করিয়াছেন। পরবর্তী "লয়িআঁ"র প্রভাবে লিপিকর ভুল করিয়া "লয়িআঁ" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন পরে আর তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এই ভুলটি সুস্পষ্ট। অতএব এ সংশোধন সংগতই হইয়াছে। আবার তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্রে দেখুন একটি "কৈল"র স্থানে "লৈল" করা হইয়াছে। ছত্রটি ছিল "আধিকার কৈল আহ্মে যমুনার ঘাটে"। বসন্ত বাবু করিয়াছেন, "আধিকার লৈল আহ্মে যমুনার ঘাটে"। তুলনামূলক বিচারে "কৈল" অপেক্ষা "লৈল" ভাল, কিন্তু "কৈল"কে ঠিক ভুল বলা চলে না, সুতরাং সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে হয় না।

য-১৪।৬।২ পুঁথিতে "আহ্মে আগে লাম্বী তবে জলের ভিতরে" ছিল। বসন্তবাবু "লাম্বী" কাটিয়া "ণাম্বি করিয়াছেন। "ন" স্থানে "ল" হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং নামিয়া অর্থে লাম্বী"র প্রয়োগ অস্বাভাবিক নয়। এ কথা সত্য পুঁথিতে এই শব্দের বানানে সর্বত্র "ন" বা "ণ" আছে, "ল" নাই। বসন্ত বাবু সেই কারণেই এক জায়গায় "ল" দেখিয়া সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সেটিকেও "ণ" করিয়াছেন।

একটি উল্লেখযোগ্য অশুদ্ধিসংশোধন দেখিতেছি বংশীখণ্ডের ১৯ সংখ্যক পদের ধ্রুবপদের ১ম ছত্রে। পুঁথিতে আছে "শ্রীরঘুনন্দন গোবিন্দ হে"। বসন্ত বাবু "শ্রীরঘুনন্দন" কাটিয়া "শ্রীনন্দনন্দন" করিয়াছেন। গোবিন্দ যে নন্দের নন্দন রঘুর নহেন পুরাণ মতে তাহা সত্য। তথাপি আমরা এই সংশোধনের পক্ষপাতী নহি। যিনি "নন্দনন্দন" বলিতে গিয়া "রঘুনন্দন" বলিয়া ফেলেন তিনি যেই হোন—আদি কবিও হইতে পারেন লিপিকরও হইতে পারেন— তাঁহাকে একটু চেনা যায়, তাঁহার কাল এবং তাঁহার পরিবেশেরও একটু পরিচয় পাওয়া যায়। অশুদ্ধ পাঠের মধ্য দিয়া যদি একটি নূতন তথ্য পাই তো তাহারই মূল্য বেশী বলিয়া মনে করি। সেইজন্য এইরূপ স্থলে মূল পদের পাঠ না বদলাইয়া টীকায় বা পাদটীকায় সম্পাদক যদি স্বীয় মত ব্যক্ত করেন তো সকল দিক্ দিয়া সংগত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের আধুনিক সংস্করণে অবশ্য জানানো হইয়াছে যে পুঁথিতে "রঘুনন্দন" ছিল কিন্তু "নন্দনন্দন" পাঠ সংগত মনে হওয়ায় তিনি "রঘুনন্দনের" পরিবর্তে "নন্দনন্দন" বসাইয়াছেন। আমরা বলি মূল পদের পাঠ পুঁথির অনুরূপ রাখিয়া পাদটীকায় এই প্রস্তাবিত সংশোধনের কথা বলা হউক। মূল পদের পাঠটাই লোকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করে। লেখকগণ গবেষকগণ যখন পদ বা পদের কোন অংশ উদ্ধৃত করেন তখন মূলপদের পাঠটাই উদ্ধৃত করেন, পাদটীকা উদ্ধৃত করেন না। সুতরাং মূল পাঠটি অবিকৃত রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রথম সংস্করণ কৃষ্ণকীর্তনে পাদটীকাও ছিল না। সম্পাদক মহাশয় যাহা কিছু অশুদ্ধ দেখিয়াছেন অথবা অশুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন সবই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সংশোধিত আকারেই পদগুলি ছাপা হইয়াছে। এই

সংশোধিত পাঠকেই আমরা পুঁথির পাঠ মনে করিয়া পড়িয়াছি, এবং সেই পাঠকেই প্রামাণিক ধরিয়া ভাষাতত্ত্বের বিচার করিয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

রাধাবিরহের ৩২ সংখ্যক পদের ৩য় ছত্রের পাঠ প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল,—"কেহ্নে সর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী"। পাঠান্তর অথবা পাঠসংশোধনের কোনো উল্লেখ নাই। কোনো পাদটীকাও নাই। কেবল টীকায় আছে "সর—সরিয়া, অপসৃত হইয়া; তুল° 'কর' (পৃ° ৩৭৮)।" যে 'কর' শব্দের সহিত তুলনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অবস্থান এইরূপ,—

"ফুলে জড়ী বান্ধি কেশ পাশে।
পরিধান কর নেতবাসে ॥"

'-ই' বা '-ইআ'র স্থলে '-অ' দিয়া ক্রিয়াকে অসমাপিকা করা বাংলার রীতি নয়, যদি কোথাও হইয়া থাকে তো সেটা ব্যতিক্রম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে তিনটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটি কৃষ্ণকীর্তনের এই "কর" এবং "সর"। আর তৃতীয়টি হইল "পাখাল", এটি উল্লিখিত হইয়াছে বঙ্গসাহিত্য পরিচয় হইতে। দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন, "Cases like these do not demonstrate the presence of a form in 'a' in M. B., either a verbal noun, or due to the loss of 'i' for the conjunctive : these are simply due to scribe's mistakes for করি, সরি, পাখালি etc." সুনীতিবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ভাষাতাত্ত্বিক সংস্কারবশতঃই অনুমান করিয়াছেন শব্দগুলি লিপিকর-প্রমাদ। কৌতূহলের বিষয় অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সুনীতিবাবুর এই অনুমানের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত তিনটি শব্দের মধ্যে "সর"টি আসলে "সর" নয় এমন কি "সরি"ও নয়। শব্দটি হইল "ঘর"। এ ভুল কিন্তু লিপিকরের ভুল নয়। সম্পাদক মহাশয়ই "ঘ"কে "স" মনে করিয়াছিলেন। অথবা "ঘর" দেখিয়াও "সর" হওয়া উচিত বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ সংশোধন করিয়া "সর"র স্থলে "ঘর" করা হইয়াছে বটে কিন্তু O D B L এর মত প্রামাণিক গ্রন্থে "সর"ই রহিয়া গেল। যতদিন না উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে ততদিন ওই ভুলের আর সংশোধন হইবে না। সম্পাদক মহাশয় যদি মূলপাঠে মুদ্রিত করিতেন, "কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী" এবং পাদটীকায় নিজের সংশয়ের কথা লিখিয়া দিতেন তাহা হইলে পাঠকের পক্ষে চিন্তার অবকাশ থাকিত। কৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের পাঠককে সে বিবেচনার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে যাঁহারা ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের সকলের সৌভাগ্য, বসন্তবাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণকীর্তনের সুমার্জিত, আমূল সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদের পাঠ যেখানে অশুদ্ধ মনে করিয়াছেন সেখানে মূল পদেই সংশোধন করিয়াছেন। আমরা আবার বলি মূল পদে মূল পাঠ অর্থাৎ পুঁথির পাঠটি থাকিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। অশুদ্ধ মনে হইলেও পুঁথির পাঠ মূলপদে রক্ষণীয়। অনুমিত পাঠের জন্য টীকা ও পাদটীকা তো আছেই।

আর একটি সংশোধন উল্লেখযোগ্য। বি-৬৫ পদের ৩য় স্তবকের ১ম ২য় ছত্র দেখুন।

"সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল যেন তখনে পলাইল ॥"

কৃষ্ণকীর্তনের সর্বাধুনিক (১৩৬৮) সংস্করণে "ঝালিআর জল" মুদ্রিত হইয়াছে। পাদটীকায় লেখা— "পুথিতে ডাল"। প্রথম সংস্করণের পাঠ ছিল "ঝালিআর ডাল", এবং পাদটীকায় সম্পাদকের কোনো মন্তব্য ছিল না। টীকাতেও "ডাল" শব্দ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না। অনুমান হয়, "ডাল" শব্দ পুঁথিতে লিখিত থাকিলেও সম্পাদক মহাশয়ের মনে উহার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে গভীর সংশয় ছিল। প্রসঙ্গসূত্রে তিনি "ডাল" শব্দের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। পরে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ধারণা হয় "ডাল"-এর স্থলে "জল" করিলে একটা গ্রহণযোগ্য অর্থ হইতে পারে। তিনি এই অর্থ করিলেন,— "সূর্যকিরণে দৃষ্টি বিভ্রমজনিত জলের ন্যায় যেন দেখিতে দেখিতে সরিয়া গেল ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসমাগম মরীচিকাবৎ হইল। ঝালিআ— বীরভূমের প্রাদেশিক ; স° ঝল্লিকা। সূর্যকিরণের তেজ।"— কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা-সর্বস্ব টীকা, ৭ম সংস্করণ, পৃ ২৮১। এই মন্তব্য হইতে বোঝা যায় "ডাল" শব্দটি যে লিপিকরপ্রমাদ ইহাই সম্পাদক মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি বলিতেছেন "ঝালিআ" শব্দের অর্থ সূর্যকিরণের তেজ, সং ঝল্লিকা হইতে আগত। আলোক বা রৌদ্র অর্থে ঝল্লিকা শব্দ অভিধানে আছে সত্য কিন্তু এই শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতে অতিশয় বিরল। মনিঅর উইলিয়মস-এর অভিধানে বলা হইয়াছে, রৌদ্র অর্থে ঝল্লিকা শব্দের উল্লেখ অভিধানেই দেখা যায় সাহিত্যে ইহার ব্যবহার বিরল। "ঝল্লিকা"-জাত বলিয়া কথিত "ঝালিআ" শব্দের অবস্থাও একই রকম। রৌদ্র বা সূর্যের উত্তাপ অর্থে প্রাচীন বা আধুনিক বাংলায় ইহার প্রয়োগ তো নজরে পড়ে না।

"ঝালিআ" শব্দের আর কি অর্থ হইতে পারে এবং উহার অন্য কোনো ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় কি না একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। 'থলি' 'ঝুলি' 'পেটিকা' অর্থে "ঝালি" শব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইতে 'যাহার ঝালি বা থলি আছে' এই অর্থে "ঝালিআ" সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। ইহার সহিত "ঝল্ল" শব্দেরও যোগ হওয়া অসম্ভব নয়। "ঝল্ল" এবং "মল্ল" নামক সৈনিকবৃত্তি-অবলম্বনকারী দুইটি নিম্নজাতির নাম ইতিহাসে পরিচিত। মনুসংহিতায় ইহাদের নাম পাওয়া যায়, "ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ"। মনসামঙ্গলের যে "ঝালু মালু" মনসা পূজা করিয়াছিল তাহারাও আসলে ওই দুই জাতিরই প্রতীক। মল্লরা শৌর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল 'মালসাট' 'মালঝাঁপ' 'মালকোঁছা'র মধ্যে তাহার চিহ্ন আছে। মল্ল বা মালরা রাঢ়ের যে অংশে বাস করিত তাহার নাম 'মালভূম'। ইহারা ভূস্বামীদের অধীনে লাঠিয়ালের কাজ করিত। আর এক বৃত্তি ছিল ডাকাতি। সেটা হইত রাত্রিকালে। আর দিনের বেলা ডাকাতির খেলা দেখাইয়াও ইহারা দু-পয়সা উপার্জন করিত। রবীন্দ্রনাথের শৈশবেও এদেশে ডাকাতির খেলা দেখানোর রেওয়াজ ছিল। 'রণপা'য় চড়িয়া দ্রুতধাবন, ঢেঁকি ঘোরানো, বাঁশের উপর ভর দিয়া প্রাচীর টপকানো প্রভৃতি কৌশল প্রদর্শন উহাদের খেলার অঙ্গ ছিল। মনে হয় শারীরিক কসরতের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ইন্দ্রজালের খেলাও দেখাইত। বাংলাদেশে যে জাদুবিদ্যা বা ভোজবাজী প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল সম্ভবতঃ ইহারাই সে বিদ্যার বাহক ছিল। মাল নামক জাতি যে মন্ত্রবলে সর্প বশীভূত করিতে এবং সাপের খেলা দেখাইতে দক্ষ ছিল কবিকঙ্কণে তাহার উল্লেখ পাই। তুলনীয়,— "সাধুর আদেশে মাল সর্প আনে যেন কাল, দুই আঁখি করঞ্জা সমান।" নামে ঈষৎ ভিন্নতা থাকিলেও জাতি ও বৃত্তির দিক্ দিয়া মাল (< মল্ল) এবং ঝাল (< ঝল্ল) প্রায় অভিন্নই ছিল। বাজীকরদের মধ্যে যাহারা ঝোলা (ভোজবাজীর জিনিসপত্র বহনের জন্য) লইয়া ফিরিত তাহাদের প্রচলিত নাম হইল "ঝালিআ"।

কৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণে বসন্তবাবু "ডাল" শব্দের অর্থ দেন নাই বটে কিন্তু ঝালিআর অর্থ লিখিয়াছিলেন,— যে ঝালি বহন করে সে ঝালিআ, অর্থ কুহকী। পরবর্তী সংস্করণে এ অর্থ তিনি প্রত্যাহার করিয়াছেন। নিশ্চয় "ডাল" শব্দের সহিত অর্থসংগতি পান নাই বলিয়া প্রত্যাহার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় "ডাল" শব্দই কবির অভিপ্রেত ছিল। রঙ্গমঞ্চের ম্যাজিক আজকাল খুব জনপ্রিয় হইয়াছে, কিন্তু আমরা বাল্যকালে পথে ঘাটে জনতার মধ্যে যে বিচিত্র "ভানুমতীর খেল" দেখিয়াছি তাহার বিস্ময়করতার স্মৃতি মনের মধ্যে এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। একটি খেলা ছিল এইরূপ।— একটি শুকনো আমের আঁঠি একটি মাটির ভাঁড়ে বা টিনের কৌটায় রাখিয়া একটি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর কয়েক মিনিট ধারায় জাদুকরের ঢোল বাজিত, সময়োপযোগী বক্তৃতা তো ছিলই। কিছুক্ষণ পরে কাপড়টি সরাইয়া লইলেই দেখা যাইত হাত দেড়েক উঁচু একটি ছোট আমগাছ, তিন চারিটি ডাল, এবং প্রায় প্রত্যেক ডালেই দুটি একটি করিয়া আম ঝুলিতেছে। অসময়ের আম আস্বাদ করিবার সৌভাগ্যও কোনো কোনো দর্শকের ঘটিয়াছিল। সে কথাও এখন মনে পড়িতেছে। এই আমগাছ আবার ঢাকা দেওয়া হইল। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ঢাকা খুলিলে দেখা গেল সেই শুকনো আঁঠিটি ছাড়া আমগাছের আর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। আমাদের মনে হয় এই জাদুবিদ্যার কথা মনে রাখিয়াই চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন "ঝালিআর ডাল যেন তখনে পলাইল"। অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা অনুসরণের যোগ্য। আমরা যে কয়েকটি স্থলে একটু আধটু সংশয় বোধ করিতেছি জিজ্ঞাসু পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সেগুলির উল্লেখ করিলাম, সম্পাদনার সমালোচনার উদ্দেশ্যে নহে। আচার্য বসন্তরঞ্জনের পদতলে বসিয়া কৃষ্ণকীর্তনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি জীবিত থাকিলে আজিকার প্রশ্নগুলিও তাঁহারই পদপ্রান্তে প্রেরিত হইত।

ভারতীয় মূর্তি ও বিমূর্তবাদ

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় শিল্প তৈরী হয়েছিল জনসাধারণের জন্য। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও ভারতীয় শিল্প সমগ্র জাতিকে এক সূত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব উগ্র নয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করার উপায়-স্বরূপে ভারতীয় শিল্প তথা মন্দির মূর্তি বা চিত্রকলা রচিত হয়েছিল। সৌন্দর্য ভারতীয় শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য না হলেও, মানবীয় সৌন্দর্য-সৃষ্টির আদর্শ শিল্পী বা শিল্পাচার্যদের লক্ষগোচর ছিল না এমন নয়। আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। জনতা আজ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমার্গী। সেজন্যই আধুনিক শিল্পে তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের প্রকাশ উগ্র হয়ে উঠেছে। এই কারণে দেবদেবী-মূর্তিকে জীবন্ত বা সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করতে আধুনিক মানুষ রাজি নয়। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় শিল্প দেখবার ইচ্ছা নিয়ে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার দৃঢ় ধারণা আধুনিক বা ভাবী কালকে প্রেরণা দেবার উপাদান ভারতীয় শিল্পে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। তবে এই অনুসন্ধান করতে হলে বহু জিনিষ অতীতের ধ্বংসাবশেষ ব'লে আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে ভারতীয় শিল্পের রীতি-পদ্ধতির বিবর্তন প্রয়োজন। এই বিবর্তন আনতে হলে শাস্ত্রের বিধান কিছু কিছু ভাঙতে হবে। শাস্ত্রোক্তির নিহিত তাৎপর্যও বুঝতে হবে। এই আলোচনা অনেকের কাছে শাঁস ফেলে দিয়ে আঁঠির অনুসন্ধানের মতো নিরর্থক বলে মনে হতে পারে। নূতন আবাদ করতে হলে বীজের প্রয়োজন। শিল্পের নন্দনকানন যাঁরা তৈরী করেন সেই-সব শিল্পীদের কাছে এই আলোচনা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হবে না।

আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করা গেল অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতশিল্পে মূর্তি' পুস্তক থেকে। অবনীন্দ্রনাথের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হলেও, উপাদান যা তিনি উপস্থিত করেছেন তা আমার এই আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট।

তাল— যে কোনো জমাট বস্তুর অবস্থান এবং আয়তন ইত্যাদির মাপ পাওয়া যায়। যেমন প্রত্যেক বস্তুর নিজের নিজের মাপ আছে, তেমনি একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বস্তু থেকেও নির্দিষ্ট কোনো মাপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দুটি মানুষের আকার-প্রকার হুবহু এক রকম না হলেও, মানুষের একটি নির্দিষ্ট মাপ শিল্পের পরম্পরায় দেখা দিয়েছে। মাথার অনুপাতে সমস্ত শরীরের মাপ ৮ বা ৭½ গুণ। এই প্রচলিত মাপের সাহায্যে নরনারীর দৈহিক আকারের ধারণা শিল্পীরা করে থাকেন।

বস্তুর আকার-প্রকার যখন শিল্পের ভাষার মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয় তখন বাস্তব মাপ ছাড়া আরেকটি গুণের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে বলা যেতে পারে "তাল"। মূর্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থ আয়তন এবং নানা আনুষঙ্গিক মিলে মিশে তৈরী হয় তালযুক্ত মূর্তি। অপর দিকে চিত্রের পৃষ্ঠভূমির ও সম্মুখভূমির সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধস্থাপনের মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে তাল। ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর মূর্তি-গঠনের কালে শরীর শিরোভূষণ পাদপীঠ ইত্যাদির সমন্বয়ে যে মাপ তারই নাম দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা তাল। উত্তম নবতাল

উদয়স্থ । সমভঙ্গ মূর্তি
কোণার্ক : উড়িষ্যা । খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দ

যক্ষী । আভঙ্গ মূর্তি
মধ্যভারত । খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দ

অশোকদোহদ । ত্রিভঙ্গ মূর্তি
উড়িষ্যা

ত্রৈলোক্যবিজয় । অতিভঙ্গ মূর্তি
যোগাকর্তা : যবদ্বীপ । খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দ

বলতে এই বিশেষ সমন্বয়কেই বুঝতে হবে। ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও অন্যত্র আরো বহু রকমের তাল লক্ষ্য করা যেতে পারে। গুপ্তপূর্ব যুগে মূর্তির তালমান এবং গুপ্তযুগের তালমানের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। মধ্য যুগের প্রথম পর্বে ও তার অবসান-কালে মূর্তির তালমান হুবহু এক রকম থাকে নি। দক্ষিণ ভারতের ধাতুমূর্তির তালমানে ইতর-বিশেষ ঘটেছে। কাজেই কেবলমাত্র উত্তম নবতালের সংজ্ঞার্থ-দ্বারা ভারতীয় মূর্তির তালমান সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব নয়।

স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত মূর্তি এবং স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান মূর্তির আকার-প্রকারের তুলনা করলে সহজেই আমরা লক্ষ্য করতে পারব যে, সে ক্ষেত্রে তালমানের পার্থক্য কতটা ঘটেছে। স্থাপত্যের প্রভাবে যেমন তালমানের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, তেমনি বিভিন্ন শারীরিক গঠনের আদর্শও ভারতীয় শিল্পে তালমান-গত আদর্শকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

মৌর্যযুগের যক্ষ ও যক্ষীর দৈহিক আদর্শ ভারতীয় শিল্পে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। অপর দিকে মহেঞ্জোদারোর ধাতুনির্মিত নারীমূর্তির গঠনের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছে চোলযুগের ধাতুমূর্তিতে। মথুরার দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি ও মহীশূরের শ্রাবণ-বেলগোলায় দণ্ডায়মান তীর্থঙ্কর দুইয়ের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ পৃথক। তালমানের সংযোগে মূর্তি বা চিত্রে যে গুণ আত্মপ্রকাশ করে সেটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে কতকগুলি জ্যামিতিক আকার এবং বিভিন্ন আকারের দ্বারা সৃষ্ট টান (tension)। অর্থাৎ তালের দ্বারা মূর্তিতে বিমূর্ত ভাব দেখা দেয়। শিল্পী যেখানে বস্তুকে যথাযথ অনুকরণ করতে প্রয়াস করেন সে ক্ষেত্রে তাল গৌণ। তাই দেখা যায় ইউরোপে "বারোক" (Baroque) যুগের কাল থেকে ইউরোপের শিল্পে বাস্তব মাপের খুঁটিনাটির প্রয়োগ থাকলেও তাল-সম্বন্ধীয় গুণ সে ক্ষেত্রে গৌণ। আধুনিক যুগে শিল্পীরা নূতন করে অনুসন্ধান করেছেন মূর্তিগঠনের ক্ষেত্রে তালের প্রয়োগ। আধুনিক কালের বিমূর্ত শিল্পের তালমান, আর ভারতীয় শিল্পে বিচিত্র আকারের সমাবেশ ও সংযোগের মধ্য দিয়ে দেখা দিয়েছে—তাল। আধুনিক শিল্পে বস্তুর মাপ এবং স্বাভাবিক আকারের ইতর-বিশেষ করে তালের সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য কম। বিশেষভাবে স্থাপত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আধুনিক ইউরোপীয় মূর্তিতে আকারগত বৈচিত্র্য থাকলেও তালের মার্জিত প্রকাশ দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়। তালমানের সাহায্যে বিমূর্ত আকারের সন্ধান আমরা পাই। কিন্তু বস্তুজগতের মধ্যে যে জীবনের ক্রিয়া ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার সাক্ষাৎ আমরা পাই বিচিত্র ভঙ্গির সাহায্যে। প্রাণশক্তির প্রভাবে সমস্ত জগৎ বিচিত্র ভঙ্গিতে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। স্থির, চঞ্চল, উদ্দাম এই তিন ভাবের সমন্বয়ে ও সংঘাতে দৃশ্যময় জগৎ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে। ভারতীয় শিল্পে জগতের বিচিত্র আকার বিচিত্র ভঙ্গিকে একটি সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে মূর্তি ও পরিণত করা হয়েছে— এইবার সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

সমভঙ্গ—(সম্মুখবর্তিতা) প্রাচীন শিল্পে সমভঙ্গ মূর্তি সব চেয়ে অধিক। সমভঙ্গ মূর্তি স্তম্ভের ন্যায় ঋজু এবং স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল। হাত-পায়ের প্রক্ষেপ থাকলেও মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া রাখাই সমভঙ্গ মূর্তির লক্ষণ। সমভঙ্গ মূর্তির আবেদন সম্মুখবর্তিতায়। এজন্য দর্শক নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে সমভঙ্গ মূর্তির স্থির ঋজুতা অনুভব করে থাকেন। আত্মিক বা দৈহিক শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশিত করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে সমভঙ্গ মূর্তি। সমভঙ্গ মূর্তিতে চাঞ্চল্য নেই ব'লেই এই মূর্তিতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গৌণ। মিশরীয় মূর্তি, প্রাচীন (আর্কাইক) যুগের গ্রীক মূর্তি, পরবর্তী (ক্লাসিক) গ্রীক যুগের অ্যাপেলো মূর্তি,

মৌর্যযুগের যক্ষ ও যক্ষী, মথুরার বুদ্ধ মূর্তি, বেলগোলার তীর্থঙ্কর— অধিকাংশই সমভঙ্গ মূর্তির পর্যায়ভুক্ত। আধুনিক কালের শিল্পে আধ্যাত্মিক ভাব না থাকলেও, সমভঙ্গ মূর্তির অভাব নেই।

আভঙ্গ— আন্তর প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশের মুহূর্তে দেহের যে চাঞ্চল্য, তারই আদর্শে রূপায়িত আভঙ্গ মূর্তি। আভঙ্গ মূর্তিতে মেরুদণ্ড সক্রিয়। এই ক্রিয়ার প্রভাবে ঘাড় ও শ্রোণীচক্র এই দুই স্থানে আবর্তনের ভঙ্গি (rotation) দেখা দিয়েছে। মেরুদণ্ডের ক্রিয়ার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চালিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি যেমনি হোক, মেরুদণ্ডের গতিভঙ্গির সঙ্গে এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখনো বিচ্ছিন্ন নয়। আভঙ্গ মূর্তিতে মেরুদণ্ডের যে নমনীয়তা সেটি সমভঙ্গ মূর্তিতে লক্ষ্য করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রেই আভঙ্গ মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ধীর ও নমনীয় এবং সন্ধিস্থানগুলিকে কেন্দ্র করেই ভঙ্গিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতীয় শিল্পে আভঙ্গ মূর্তির সংখ্যা সম্ভবতঃ সব চেয়ে বেশী। পুরুষ ও নারী উভয়তই আভঙ্গের ভাব পাওয়া যাবে। সাঁচীর উৎকীর্ণ মূর্তি, মথুরার চামরধারিণী, মহাবলীপুরমের মহিষমর্দিনী মূর্তি, অনুরাধাপুরমের কপিলমুনি এইগুলি আভঙ্গ মূর্তির বিশেষ দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপে ক্লাসিক যুগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দ পর্যন্ত আদর্শ নারীদেহ বা মাতৃমূর্তি আভঙ্গ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। বিশেষ দৃষ্টান্ত— গ্রীক ও রেনেসাঁ যুগের ভিনাস, মিকেলাঞ্জেলোর 'দিবা-রাত্রি'।

ত্রিভঙ্গ— আভঙ্গ মূর্তির তুলনায় ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে মেরুদণ্ডের গতি অনেক পরিমাণে ক্ষিপ্র। ঘাড় মুখ ও শ্রোণীচক্রের বিপরীতমুখী আবর্তনের কারণে সমস্ত শরীরে একটি ক্ষিপ্রতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তির প্রকাশই ত্রিভঙ্গ মূর্তির বিশেষ ব্যঞ্জনা। বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিকে ত্রিভঙ্গ মূর্তির টাইপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। পৌরুষ অপেক্ষা নারীসুলভ কমনীয়তা বা লাস্যভাব প্রকাশের পক্ষে ত্রিভঙ্গ আদর্শের বেশি ব্যবহার হয়েছে ব'লেই, মধ্যযুগীয় নর্তকী মূর্তিতে প্রায়শই ত্রিভঙ্গভাব লক্ষ্য করা যায়। ত্রিভঙ্গের সঙ্গে নারীসুলভ লাস্যভঙ্গি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ব'লেই, ইউরোপে রেনেসাঁ-পরবর্তী শিল্পীদের রচনাতে, বিশেষ-ভাবে রুবেন্সের রচনাতে, ত্রিভঙ্গ নারীমূর্তি প্রচুর পাওয়া যাবে।

অতিভঙ্গ— ত্রিভঙ্গ মূর্তির সঙ্গে যখন শরীরের সামনের পিছনের "ঝোঁক" যুক্ত হয় তখন সেই মূর্তিকে অতিভঙ্গ মূর্তি বলা চলে। অতিভঙ্গ মূর্তির শ্রোণীচক্রের গতি যেমন সামনে ও পিছনের দিকে, তেমনি হাত পায়ের সন্ধিস্থানগুলিও সক্রিয়। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থান অতিভঙ্গ মূর্তিতে লক্ষ্য করা যাবে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উদ্দাম গতির সংঘাত সৃষ্টি করাই অতিভঙ্গ মূর্তির লক্ষণ। স্থাপত্যসুলভ গুণ অতিভঙ্গ মূর্তিতে প্রকাশ সহজ নয় ব'লেই, সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পে অতিভঙ্গ মূর্তির নিদর্শন অধিক লক্ষ্য করা যায় না। খজুরাও মন্দিরে উৎকীর্ণ যৌন মূর্তিতে অথবা নেপালে তান্ত্রিক মূর্তিতে অতিভঙ্গ ভাব আমরা লক্ষ্য করি। গ্রীক পরম্পরার অন্তর্গত ডিসকাস-থ্রোয়ার ও লাকুন অতিভঙ্গ মূর্তির উত্তম দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা চলে। মিকেলাঞ্জেলোর রোজ কিয়ামৎ বা লাস্ট্ জাজ্‌মেণ্টের ছবিতে অতিভঙ্গ মূর্তির সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সমভঙ্গ থেকে অতিভঙ্গ অবধি চার শ্রেণীর ভঙ্গির মিশ্রণে দেহের যে-কোনো ভঙ্গি সৃষ্টি করা যেতে পারে। উল্লিখিত কোনো-একটি শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত দেহভঙ্গি কোনো শিল্পীর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাল-মান ও ভঙ্গি, এই দুই বিমূর্ত গুণের প্রভাব সকল শিল্পবস্তুতেই পাওয়া যাবে। কুমোরের চাকে গড়া মৃৎপাত্র থেকে শুরু করে নরনারীর দেহ অবলম্বন করে উক্ত দুই বিমূর্ত গুণ আত্মপ্রকাশ করেছে পৃথিবীর সকল শিল্পপরম্পরাতে। বলা যেতে পারে উক্ত বিমূর্ত গুণ-দুটি সাদৃশ্যের

সংযোগে বৈচিত্র্যময় হয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই তাল-মান ও ভঙ্গ এই দুই গুণকে ভারতীয় মূর্তির বিশেষ লক্ষণ বলাই সঙ্গত। সেখানে বিশেষ সচেতন ও বিধিবদ্ধভাবেই এদের প্রয়োগ। (তা বলে কোনো দেশের কোনো শিল্পপরম্পরায় এ দুটি এড়িয়ে চলা হয়েছে বা চলা সম্ভব এমন নয়।) পূর্ণাঙ্গ মূর্তি -গঠন-কালে ভারতীয় শিল্পীরা কিভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন সে বিষয়ে এই বার আলোচনা করা যেতে পারে।

সাদৃশ্য— দুই বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণগত 'মিল'কে সাদৃশ্য বলা হয়। মুখের কথায়, লেখার ভাষায়, অথবা রূপায়ণ-কালে, সাদৃশ্যের সাহায্যেই মূর্তি বা চিত্র আকারনিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। আঙ্গিক আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত শিল্পী সার্থকভাবে সাদৃশ্যপ্রয়োগে সক্ষম হন না। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে যে সাদৃশ্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঙ্গিক বা শিল্পপ্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মূর্তিনির্মাণের কালে আঙ্গিকের বিবর্তন নানা স্তরে বিভক্ত হ'তে বাধ্য। অপর দিকে আঙ্গিকের এক-এক স্তরে এক-এক প্রকার আকারের আবির্ভাব হয়। এই বিশেষ-বিশেষ আকারগুলিকে নির্দিষ্ট করতে বা নাম দিতে গিয়েই মূর্তিশিল্পে সাদৃশ্যের পরম্পরা গড়ে উঠেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী -জগৎ থেকে নরনারীর দেহের আকার ও ভঙ্গি-গত তুলনা শিল্পে বা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। ধারণামূলক মনোময় জ্ঞান আর জীবনের অভিজ্ঞতা, উভয়ের পরিবর্তে যখন শিল্পীরা বস্তুজগৎকে যন্ত্রের মতো গঠনপ্রধান করে দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষ যখন বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখনই সাদৃশ্যের প্রাচীন পরম্পরা লোপ পেয়েছে। আধুনিক কালে সাদৃশ্য বলতে বিশেষ ভাবে জ্যামিতিক গড়নকেই শিল্পীরা স্বীকার করেন। অবশ্য উদ্ভিদ প্রাণী বা খনিজ পদার্থের গঠন আধুনিক বিমূর্ত শিল্পে সাদৃশ্যরূপে ব্যবহার করতে শিল্পীরা চেষ্টা করেন নি এমন নয়। ভারতীয় শিল্পে জীব ও উদ্ভিদের আকার-প্রকার এবং শিল্প-উপাদানের বৈশিষ্ট্য বা তন্নিষ্ঠ করণ-কৌশল উভয়ের সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে এবার তারই সবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতীয় শিল্পে তুলনাত্মক রূপ-নির্মাণের ক্ষেত্র দূরবিস্তৃত। অবনীন্দ্রনাথ যে-সব তুলনার উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখাতে, সেগুলি আমাদের যথেষ্ট পরিচিত। এ ক্ষেত্রে এইসব তুলনাগুলিকে আরো সংক্ষিপ্ত করে আনার চেষ্টা আমি করেছি। ফলতঃ মূর্তি বা চিত্রের ক্ষেত্রে যে-সব জীব বা উদ্ভিদের গড়ন লক্ষ্য করা যায়, কেবল সেইগুলি এ ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কালে ভারতীয় শিল্পীরা বিশেষ ভাবে পদ্ম, শঙ্খ, মাছ, হাতী, তিলফুল, আমপাতা, কলাগাছ এই কয়টি বস্তুকে তুলনাত্মক সৃষ্টির আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। উল্লিখিত তুলনাগুলি ভারতীয় প্রাচীন শিল্পনিদর্শনসমূহে পাওয়া যাবে। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তুলনাগুলি আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কতকগুলি তুলনা মূর্তিধর্মী, কতকগুলি চিত্রধর্মী বা রেখাত্মক। অর্থাৎ, কতকগুলি সাদৃশ্য স্থাপত্যোচিত নিশ্চিত স্থিতির ইঙ্গিত করে, আর অন্যগুলিতে গতিভঙ্গির ব্যঞ্জনা। সার্থক তুলনাতে পাওয়া যাবে একই কালে আকার ও ভঙ্গির সমন্বয়।

মুখমণ্ডল— আম, ডিম, পাতা (পান) এই আকারগুলির সঙ্গে মুখমণ্ডলের তুলনা করা হয়েছে। মুখমণ্ডল-গঠনের কালে উল্লিখিত আকারগুলির প্রভাব কোনো ক্রমেই এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এই তিনটি আকারের সঙ্গেই শাস্ত্রোক্ত মাপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই তিনটি সাদৃশ্যের দ্বারা যথাক্রমে ইঙ্গিত করা হয়েছে— কোনো মুখের দৈর্ঘ্যের অপেক্ষা প্রস্থ ছোটো, কোনো মুখে 'দৈর্ঘ্য' 'প্রস্থ' সমান, আর কোথাও বা 'দৈর্ঘ্য' অপেক্ষা 'প্রস্থ' বড়ো। ভারতীয় শিল্পের মুখের গড়নে ডিমের আকার গুপ্তযুগে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পানপাতা

আকারের মুখ কেবল ভারতীয় শিল্পেই নয়, বহু প্রাচীন শিল্পে এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। ঈজিপ্ট্ ও ক্রিটের চিত্রে এই আকারটি বারংবার লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শিল্পে বাংলা উড়িষ্যা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট অঞ্চলের মুখমণ্ডলে পাতার সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এবং এটি যে এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল তারই সাক্ষ্য দেয়। মানুষের সৃষ্টিতে পাতার গড়ন প্রথম আমরা পাই প্রস্তর যুগের হাতিয়ারে। প্রাচীন মৃৎপাত্রেও এই আকার লক্ষ্য করা যাবে। পূর্বোক্ত প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মুখমণ্ডলের এই সাদৃশ্য কারিগরের সৃষ্টি। মুখমণ্ডলের বাস্তব আকৃতিকে শিল্পের ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে এই বিশেষ আকারগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে।

চোখ— চোখের তুলনা করা হয়েছে পদ্মকলি, মাছ, চেরা পটলের সঙ্গে। এ ছাড়া আছে হরিণ-নয়ন, খঞ্জন-নয়ন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় কতক আদর্শ রয়েছে চিত্রধর্মী, কতক মূর্তিধর্মী। পদ্মকলিতুল্য চোখ ভারতীয় মূর্তিতে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। মাছের মতো চোখও ভারতের প্রাচীনতম মূর্তিতে পাওয়া যায়। ঈজিপ্টের মূর্তিতে চোখের গঠন মাছের আকার। কাঠ বা পাথর কাটার কৌশলের সঙ্গে এই দুইটি আকারের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই দুটি গড়ন যুগপৎ মূর্তিতে ও চিত্রে পাওয়া যাবে। পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ ধাতুমূর্তিতেই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। চেরা পটলের মতো চোখ অজন্তার চিত্রে কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও, ক্ল্যাসিক মূর্তিতে কোথাও এই তুলনার প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, সাধারণতঃ পানপাতা-গড়নের মুখ, চেরা পটলের মতো চোখ, একই আধারে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ থেকে প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মুখের বিশেষ আদর্শ থেকেই এই তুলনা শিল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভ্রূ— চোখের সঙ্গে ভ্রূর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। নিম্বপত্রাকৃতি ও ধনুষাকৃতি। উক্ত দুটি তুলনার প্রথমটিকে মূর্তিধর্মী, দ্বিতীয়টিকে চিত্রধর্মী বলাই সঙ্গত। নিম্বপত্রাকৃতি ভ্রূ ভারতীয় চিত্রে বা মূর্তিতে সব চেয়ে প্রচলিত। মৌর্যযুগ থেকে পুরুষ ও নারী উভয়বিধ মূর্তিতে নিমপাতার মতো ভ্রূ দেখা যায়। অজন্তা চিত্রে নিমপাতার মতো ভ্রূ ক্যালিগ্রাফি বা লেখাঙ্কনের রূপ নিয়েছে। জৈন চিত্রে পুরুষের ভ্রূ বহু ক্ষেত্রে নিম্বপত্রের ন্যায়। ধনুযাকৃতি ভ্রূ বিশেষভাবে বৌদ্ধ শিল্পের দান। মুখমণ্ডলের মার্জিত ভাব দেবার চেষ্টা থেকেই এই প্রথার উদ্ভব বলা চলে। ধনুকের ন্যায় সূক্ষ্ম রেখাধর্মী ভ্রূ চোখের হাড়ের কাঠামোকে আরও স্পষ্ট করেছে। দেবদেবীর মূর্তি-মাত্রেই এই ভাবের ভ্রূর গঠন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বাস্তব উদ্দীপনা অপেক্ষা প্রথানুগত মনোভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট।

তিলফুল— চোখ অথবা ভ্রূ'র ন্যায় নাসিকাও দুই দিক দিয়ে দেখা হয়েছে। যথা— তিলফুল ও শুকচঞ্চু। তিলফুলের ন্যায় নাক প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে এবং পরবর্তীকালের মূর্তিতে বা গুপ্তযুগের চিত্রে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। পুরুষ ও নারী উভয় প্রকার মূর্তিতেই তিলফুল-নাসা শিল্পীরা বেশি ক'রে প্রয়োগ করেছেন। কারণ, অ্যানাটমির দিক দিয়ে এই তুলনা যেমন সার্থক তেমনি কারিগরির সৌকর্যের দিক দিয়েও এই আকারটিকে উপেক্ষা করা চলে না।

শুকচঞ্চু-নাসা— এই সাদৃশ্য এসেছে হাড়ের কাঠামোকে লক্ষ্য ক'রে। পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিতে শুকচঞ্চু-নাসার প্রয়োগ দৈবাৎ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পে তিলফুল ও শুকচঞ্চু উভয়েরই মিশ্রণে নাসার গড়ন বিরল নয়।

ভিনাস । আভঙ্গ মূর্তি । খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দ

ডিসকাস্ থ্রোয়ার । অতিভঙ্গ মূর্তি । খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০-৪৪০ অব্দ

মিকেলাঞ্জেলো-কৃত আভঙ্গ মূর্তি
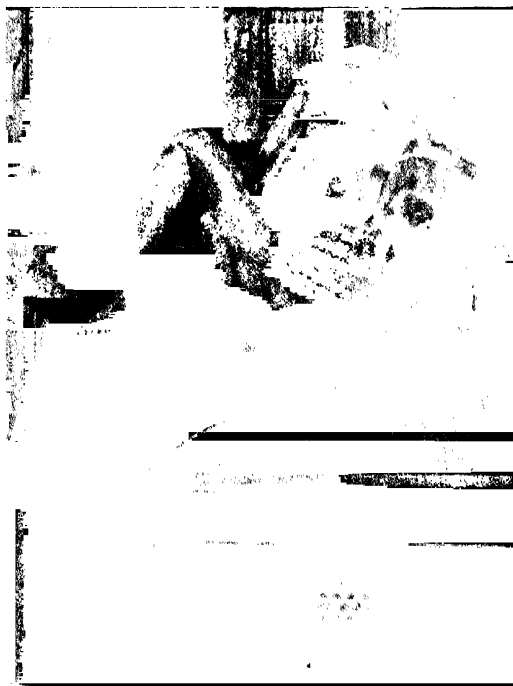
বিম্বফল ও বান্ধুলী ফুলের অনুরূপ ঠোঁটের গড়ন— ভারতীয় মূর্তিতে প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন বান্ধুলী ফুল মূর্তিতে পাওয়া গেলেও এটি চিত্রধর্মী। অজন্তার চিত্রে এই তুলনার প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। ইংরেজিতে mass বলতে যা বোঝায়, সেটি যতক্ষণ রক্ষিত হয়েছে ততক্ষণ মূর্তিতে সিমপাতার মতো ভ্রূ, তিলফুল-নাসা, পদ্মকলি ও মাছের ন্যায় চোখ বা বিম্বাধরের আদর্শ সজীব থেকেছে।

শঙ্খ এবং কণ্ঠের তুলনা— উল্লেখযোগ্য। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই তুলনাটিও সম্পূর্ণ মূর্তিধর্মী, কেননা গঠনদ্যোতক।

গোমুখের সাদৃশ্য— কণ্ঠের হাড় থেকে নিম্নে শ্রোণীচক্রের হাড়ের উপরের অংশ অবধি যে ত্রিকোণ আকার তার সঙ্গে গো-মুখের তুলনা করা হয়েছে। গোমুখাকৃতি শরীর প্রাচীন মূর্তিতে পাওয়া যায় না। এই তুলনাটিও গুপ্ত-পরবর্তী যুগের পৌরাণিক দেবমূর্তিতে পাওয়া যাবে। সাধারণ ভাবে ভারতীয় মূর্তিতে শরীরের যে আকার তার সঙ্গে গোমুখাকৃতি আকারের মিল অল্পই। বিশেষ ভাবে উপাস্য মূর্তিতেই গোমুখাকৃতি দেহ পাওয়া যায়।

কপাট-বক্ষ— এই তুলনা আইডিয়া বা ভাবদ্যোতনার দিক দিয়ে যেমন সার্থক, সাদৃশ্যের দিক দিয়েও তেমন সার্থক কিনা সন্দেহ। মূর্তিনির্মাণের কালে বুকের অংশে যে আকার ও plane সেটি জীব বা উদ্ভিদে পাওয়া যায় না, যতটা পাওয়া যায় যে-কোনো সমতল প্রস্তর বা কাষ্ঠ-খণ্ডে। সম্ভবতঃ কপাটের মতো সমান ভাবে বুকের মাঝখান কাটতে হয় ব'লেই জ্যামিতিক উদাহরণটি সাদৃশ্যের তালিকা-ভুক্ত হয়েছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে এই একটি অংশকে জীব বা উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করা হয় নি।

ডমরুর আকারে কোমর বিশেষভাবে মধ্যযুগের ধাতুমূর্তিতে পাওয়া যাবে। পুরুষের দেহে এই তুলনার প্রয়োগ কথনো জনপ্রিয় হয় নি। কিন্তু সিংহকটি ভারতীয় মূর্তিতে প্রায় সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। অপর দিকে পেট কোমর মিলিয়ে ঘটের আকারে গঠন বহু পুরুষ-মূর্তিতে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় মূর্তিতে উপরের অংশের দৃঢ়তা ও নিম্নাংশের নতোন্নত ভাব রূপায়িত করার কালে ভারতীয় শিল্পীরা পূর্বোক্ত তুলনাগুলিকে হুবহু অণনুসর করেন নি।

হাতের উপরার্ধ এবং উরুসন্ধি থেকে হাঁটু পর্যন্ত, উভয়ের ক্রিয়া একই প্রকার। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্কন্ধ থেকে কনুই পর্যন্ত এবং উরুর সন্ধিস্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। বাচ্ছা হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে উরুদেশের তুলনা অবনীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সার্থক বলে মনে করেন নি। কিন্তু পাশ থেকে যদি দেখা যায় তবে লক্ষ্য করা যাবে শ্রোণীচক্রের ভারী পেশী -সমেত সমস্ত উরুদেশের আকার হাতীর শুঁড়েরই মতো। বিশেষভাবে এই অংশের পাশাপাশি গতি (sideway movement) হস্তিশিশুর শুঁড়ের দোলার সঙ্গে সহজেই তুলনা-যোগ্য। কদলীকাণ্ড এবং উরুদেশের আকারগত সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ। উরুদেশের আকার ও গতিভঙ্গি উভয়কেই লক্ষ্য করলে উল্লিখিত দুটি সাদৃশ্যকেই সার্থক বলা সঙ্গত।

বাহু ও উরু উভয়ের সন্ধিস্থানে সন্নিবেশ, আকার ও গতিভঙ্গি, এসবের যেমন মিল আছে, তেমনি প্রকোষ্ঠ (কনুই থেকে হাত) ও জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গোড়ালি) উভয়ের আকারগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। যদিও উভয়ের সন্ধিস্থানগত গঠন ও ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। জঙ্ঘার সঙ্গে মাছের তুলনা সঙ্গত হলেও প্রকোষ্ঠের

সঙ্গে ছোটো কলাগাছের তুলনা মেনে নিতে বাধে। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশটির এমন একটি গতি আছে যা শরীরের অন্য অংশে পাওয়া যায় না। এই গতির সঙ্গে মাছের শরীরের গতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভারতীয় মূর্তিতে প্রকোষ্ঠের যে ভঙ্গী তা ছোটো কলাগাছ অপেক্ষা মাছের দেহভঙ্গীর কথা সহজে মনে করিয়ে দেবে। অবশ্য, ছোটো কলাগাছের মত প্রকোষ্ঠ ভারতীয় শিল্পে কোথাও পাওয়া যাবে না এমন নয়।

হাতের পাতা—"পাতার মত হাত" সাদৃশ্যটি কেবলমাত্র আকারগত নয়। হাতের. পাতা ভিতর দিকে যতটা ঘুরে যায় বাইরের দিকে ততটা নয়। হাতের পাতার এই ভঙ্গিটি গাছের পাতার মোচড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উল্লিখিত তুলনার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

পায়ের পাতা— হাতের পাতার সঙ্গে পায়ের পাতার মিল কিছুটা আছে, কিন্তু প্রভেদ অনেকখানি। পায়ের পাতার খিলানের মতো গড়নের সঙ্গে কূর্মপৃষ্ঠ তুলনা করা হয়েছে। এটিকে স্বভাবানুগত তুলনা বলা চলে না। করণকৌশলের দিক দিয়েই কারিগরেরা যে এই তুলনা ব্যবহার করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাদৃশ্যগুলি যে সকল সময় স্বভাবানুগত নয় তা পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। বস্তুর ধারণা এবং কারিগরির কায়দা দুইয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা থেকেই সাদৃশ্যের প্রবর্তন হয়েছে এ বিষয়ে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।

মেদ মাংস ও চামড়ার আবরণ ভেদ করে হাড়ের কঠিন অংশ লক্ষ্য করা যায়। নাক ও হাঁটু এই দুই অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশের সাদৃশ্যমূলক আকারের উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। যদিও কনুই, কব্জি, পায়ের গোছ নিপুণভাবে ভারতীয় মূর্তিতে রূপায়িত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ হাড়-বের-করা মূর্তি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল ব'লেই এ বিষয়ে শিল্পীদের জ্ঞান থাকলেও এর তেমন ব্যবহার হয় নি। মেদ আবৃত সুগঠিত শরীর ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শ ছিল বলেই হাড়ের কাঠামো রূপ-নির্মাণের আনুষঙ্গিক রূপেই তাঁরা দেখে ছিলেন। সাদৃশ্যের সাহায্যে বিমূর্ত ভঙ্গি মানবীয় আকারে পরিণত করা গেলেও ভারতীয় মূর্তির আকার-প্রকার বুঝতে হলে, আরো কয়েকটি বিষয়ের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মানুষের শরীর কঠিন ও কোমলের সমন্বয়। হাড়ের কঠিনতা, পেশীর কুঞ্চন ও প্রসার, মেদ ও চামড়ার নমনীয়তা— সম্মিলিতভাবে ভারতীয় মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। অপর দিকে গ্রীক মূর্তিতে পেশীর কুঞ্চন ও প্রসারের সংঘাত ও সংযোগের সাহায্যে সমস্ত শরীরে তরঙ্গের ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শিল্পে অনুরূপ পেশীর কুঞ্চন বা প্রসার কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। যদিও পেশীর সংস্থান নিখুঁতভাবে চিহ্নিত হয়েছে ভারতীয় মূর্তিতে।

পেশীর কুঞ্চন ও প্রসারের পরিবর্তে পেশীর দৃঢ়তা এবং আকারগত লক্ষণ ভারতীয় মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বর্তমান। লঘুগুরুর আশ্চর্য সমন্বয় বা সংঘাত ভারতীয় মূর্তিগঠনের বিশেষ লক্ষণ। বাহুর সঙ্গে উরুদেশ, প্রকোষ্ঠের সঙ্গে জঙ্ঘা, কটিদেশের সঙ্গে নিতম্ব, ভারতীয় মূর্তিতে এ-সব ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়— বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত গুরু ভাব বা লঘুতা আশ্চর্য তালমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দৈহিক গঠনের সঙ্গে বস্ত্র অলঙ্কার শিরোভূষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের সংযোগে পূর্ণাঙ্গ আকার সৃষ্টি করতে না পারা পর্যন্ত মূর্তি বা চিত্র শিল্পের পূর্ণতা লাভ করে না। যে ক্ষেত্রে উল্লিখিত বস্তুগুলির প্রয়োজন নেই সে ক্ষেত্রে দৈহিক গঠনের আকার-প্রকার যেমন হয়, আনুষঙ্গিক-যুক্ত আকার-প্রকার সে রূপ

হয় না। গ্রীক মূর্তিতে কাপড় ইত্যাদি শরীরের আচ্ছাদন মূর্তির সারফেস ও টেক্শ্চারের সমন্বয় ঘটায়। নারীদেহে অলঙ্কার গ্রীক শিল্পে দৈবাৎ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে আকার অপেক্ষা টেক্শ্চারের দিক দিয়েই অলঙ্কারে মূল্য। সংক্ষেপে বলা যায়— গ্রীক মূর্তিতে পেশীর কুঞ্চন ও প্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি।

অপর দিকে ভারতীয় মূর্তিতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি নির্মাণকৌশলের অনুগত ও গঠননিষ্ঠ। কাপড়ের প্রক্ষিপ্ত অংশ, নানা অলঙ্কার, শরীরের তাল এবং গঠনের নতোন্নত ভাব, শরীরের আকার-আয়তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঐসব আনুষঙ্গিকের সাহায্যে শরীরের ভঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করে তোলার সাক্ষ্য বহু মূর্তিতে পাওয়া যাবে। গতি ও গঠন এই দুটি গুণের প্রতি ভারতীয় শিল্পীদের লক্ষ থাকায় মেদ বা পেশীর যে-সব পরিবর্তন স্বভাবে লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় শিল্পীরা। নারীদেহের গঠন থেকে উক্ত লক্ষণগুলির বিচার করা চলে।

তাল, মান, ভঙ্গ ও নানা সাদৃশ্যের সমন্বয়ে যে আকার ভারতীয় শিল্পীরা সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে বিমূর্ত গুণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে কিভাবে মূর্তির গঠনকে পূর্ণতা দিয়েছে তা জানতে হলে আরেকটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হয়।

টেন্শন (tenson)— শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আকার-প্রকার উপেক্ষা করা কোনও শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। জ্যামিতিক আকার ও স্বাভাবিক আকারের সঙ্গে যুক্ত সাদৃশ্য ইত্যাদির অতিরিক্ত আরেকটি শক্তির ক্রিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এই শক্তিকে বলা চলে সংযমিত বেগ বা সংযত সংহত আবেগ (tension)। এই শক্তির অভাবে শিল্পের রূপায়িত আকার নির্জীব এবং বিশৃঙ্খল শিথিল হয়ে থাকে। অবশ্য, আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তি সকল বস্তুতে সমান নয়। আলোকরশ্মি যেমন তীব্র ও মৃদু হয়ে থাকে, তেমনি বস্তু ও তার চারি পাশের অবকাশের আনুপাতিক তারতম্যে টেন্শন কখনো দৃঢ় কখনো শিথিল হয়ে থাকে। স্থপতি মূর্তিকার শিল্পী প্রত্যেকেরই কাজে যেমন আকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনি সকল ক্ষেত্রেই এক আকারের সঙ্গে অন্য আকারের ব্যবধানগুলি কম বেশি টেন্শন-দ্বারা পূর্ণ থাকে। শিল্পীর জগতে শূন্য বলে কিছু নেই। দৃশ্য বা স্পর্শ মুহূর্তে মুহূর্তে শিল্পীর মনে এই সংহত আবেগের বা টেন্শনের ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে। এ দিক দিয়ে 'বিন্দু'ই রূপশিল্পমাত্রের মৌল উপাদান বলা সঙ্গত। কোনো শিল্পবস্তু বিশ্লেষণ করে শেষ সীমায় আমরা পাই কতকগুলি বিন্দু ও তাদের পারস্পরিক টানের দরুন বিশেষ বিশেষ টেন্শন। ভারতীয় মূর্তিতে অথবা চিত্রে এইপ্রকার টেন্শন সর্বত্র বিদ্যমান। এই বিমূর্ত লক্ষণের প্রভাবে ভারতীয় মূর্তি যুগপৎ স্থির ও গতিশীল। উক্ত গুণ-দুটি ভারতীয় মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কারণে সমগ্র মূর্তির আবেদনে যে অনিবার্যতা তার তুলনা বিরল। শ্রেষ্ঠ গ্রীক মূর্তিতে শরীরের উপরার্ধ ও নিম্নার্ধের মধ্যে আবেদনের তারতম্য প্রচুর। টেক্শ্চারের দিক দিয়ে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগ থাকলেও ত্রিমাত্রিক এই গঠনের আবেদন সর্বত্র সমান নয়। বহু ক্ষেত্রে টুকরো করে দিলে গ্রীক মূর্তির নিম্নার্ধ জড় বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে উপাদানবস্তুর সার্থক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় না। অপর দিকে ভারতীয় মূর্তির যে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলেও সে ক্ষেত্রে নির্মাণের শৈলী ও গঠনের আবেদন অবশ্যস্বীকার্য।

উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে আকারে-ভঙ্গিতে সম্মিলিত ও সমন্বিত -ভাবে যে সংযমিত বেগের প্রকাশ ভারতীয় মূর্তিতে পাওয়া যায়, তার মূলে আছে বিমূর্ত নির্মাণরীতির আদর্শ। বাস্তবতার আকর্ষণে এই টেন্‌শনের ভাবটি কখনো ম্লান হতে দেখা যায় না।

ভারতীয় মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গতিভঙ্গি গ্রীক শিল্পের মতো বাইরের দিকে কখনো বিস্তৃত নয়। দৃশ্য ও অদৃশ্য, লৌকিক ও অলৌকিক, দুই সীমার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের স্থান। এই কারণে প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকের অনুগত হয়েও ভারতীয় শিল্পী বিচিত্র প্রাণময় শিল্পসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ত্রুটিবিচ্যুতিরহিত শিল্পপরম্পরা কোথাও কখনো হয় না। ভারতীয় শিল্পপরম্পরাতেও ত্রুটি বিচ্যুতি কোথাও ঘটে নি এমন নয়। অতি বিস্তৃত পটভূমিতে জীবনের লীলা ভারতীয় শিল্পীরা রূপায়িত করেছেন। চলমান জীবনের প্রবাহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবজীবনের সুখ দুঃখ রূপায়িত হতে বড়ো দেখা যায় না। জীবনের উপলব্ধি আছে, কিন্তু সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে-প্রতিহত ব্যক্তি-মানুষের জীবন অবলম্বনে বিকশিত হয়েছে এমন শিল্পরূপ দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত অভিজ্ঞতাকে মৌল শক্তিতে রূপান্তরিত করতে ভারতীয় শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল ব'লেই, মানুষের যৌন জীবনকেও শিল্পের ভাষায় রূপান্তরিত করে বিরাট আকারে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে তাঁদের অসুবিধা হয় নি। বিমূর্ত ভাব প্রধান হওয়ার কারণে ভারতীয় শিল্পে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার অবকাশ অল্প। উল্লিখিত কারণে ভারতীয় মূর্তি স্বাভাবিক আলোছায়ার আশ্রিত নয়। গ্রীক রোমক বা ইউরোপীয় পরম্পরার শ্রেষ্ঠ মূর্তিতে যেমন প্রতিফলিত আলোর ক্রিয়া একটি বিশিষ্ট গুণ, অনুরূপ গুণ ভারতীয় মূর্তিতে কখনো প্রধান হয়ে ওঠে নি। মুক্ত আকাশের নীচে ভারতীয় মূর্তির ঋজু ও অব্যর্থ আবেদন; অপেক্ষাকৃত স্বভাবানুগত গ্রীক মূর্তি স্বাভাবিক অবস্থার প্রভাবে তেমন সহজ, তেমন স্বয়ম্ভু, সত্য, ব'লে মনে হওয়ার কথা নয়।

গ্রীক পরম্পরার কাল থেকে ইউরোপীয় শিল্পপরম্পরায় space, atmosphere ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য শিল্পরূপকে প্রভাবান্বিত করেছে। পরিণামে গ্রীক-পরবর্তী শিল্পপরম্পরার আবেদন স্পেস-ধর্মী। এই কারণে ইউরোপের শিল্পসৃষ্টিতে পিছিয়ে যাবার ভাব (distance) প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যাবে। ভারতীয় পরম্পরাতে অনুরূপ 'স্পেস' ইলোরার কৈলাশ মন্দিরের মূর্তিতে কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেলেও, ভারতীয় মূর্তির এটি সর্বসামান্য গুণ নয়।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় ও ক্ল্যাসিক গ্রীক মূর্তির মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আধুনিক মূর্তি ও চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় প্রথানুগত শিল্পের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা চলে। ইউরোপের আধুনিক মূর্তি বা চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিমূর্ত ভাব। বিমূর্ত গুণের অনুসন্ধান-চেষ্টার থেকেই আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে। অনুকরণধর্মী শিল্পপরম্পরার সঙ্গে সম্প্রতি কালের ইউরোপীয় বিমূর্তবাদী শিল্পের পার্থক্য অনুসন্ধান করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ভারতীয়-শিল্প-সুলভ তাল মান ভঙ্গি ও সাদৃশ্য নূতন মতে ও নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করেছে এ যুগের ইউরোপীয় শিল্প-ইতিহাসে।

রোদ্যাঁ-পরবর্তী বহু ইউরোপীয় শিল্পী মূর্তিতে বা চিত্রে, অ্যানাটমিক্যাল মান-প্রমাণ এড়িয়ে গিয়ে, তালযুক্ত স্থাপত্যধর্মী আকার সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক গঠনে তুলনাত্মক আকার-প্রবর্তনের সজাগ চেষ্টা বহু

আধুনিক মূর্তিতে বা চিত্রে পাওয়া যাবে। অপর দিকে শরীরের নাটকীয় ভাব অপেক্ষা টেন্‌শন-পূর্ণ ভঙ্গি সৃষ্টি করার আগ্রহও বিরল নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি নিয়ে জ্যামিতিক ছকে ফেলে আধুনিক 'বিমূর্ত' শিল্পধারায় যে রূপ সৃষ্টি করছেন আধুনিক শিল্পীরা, ক্ল্যাসিক যুগের ভারতীয় মূর্তির সঙ্গে আঙ্গিকগত পার্থক্য সে ক্ষেত্রে যৎসামান্য। ইউরোপে আধুনিক মূর্তিতে বা চিত্রে ফিরে এসেছে বিমূর্ত শিল্পাদর্শ। মূর্তি বা চিত্রে সম্মুখবর্তিতা গুণটি নূতন করে দেখা দিয়েছে। আজকের দিনে ইউরোপীয় শিল্প আলোছায়ার প্রভাবে দর্শকের সামনে থেকে ক্রমিকভাবে পিছিয়ে যায় না। তৎপরিবর্তে আধুনিক শিল্পের গতি ভারতীয় শিল্পের মতোই, অর্থাৎ পটভূমি বা পাদপীঠ থেকে এগিয়ে আসে দর্শকের অভিমুখে।

সবশেষে বলা দরকার— তাল মান ভঙ্গ ইত্যাদি বিমূর্ত উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা যে পরিমাণ সচেতন, সাদৃশ্য সম্বন্ধে তেমন নয়। সাদৃশ্যের যথার্থ প্রয়োগ আধুনিক শিল্পে দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়। সাদৃশ্য আজ জ্যামিতিক আকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। সাদৃশ্যের বৈচিত্র্য না থাকায় আধুনিক শিল্পের আবেদন সার্বজনীন হতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন শিল্পের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে সাদৃশ্যের উপযোগিতা আছে কি নেই এই সমস্যায় মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন ও নবীন শিল্পপরম্পরার মধ্যে যথার্থ সেতু-রচনা সম্ভব নয়।

বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫০

শিশিরকুমার দাশ

বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ধারণা যে বাংলায় ইংরেজি যতিচিহ্নের প্রথম ব্যবহার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ধারণার মূল কারণ দুটি। বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকেই দেখেন নি। কাজেই সেখানে তিনি আদৌ কোনো ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন কিনা সে সংবাদ অনেকেই জানেন না। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগরের জীবনীগুলিতেও এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে তিনিই বাংলায় ইংরেজি যতিচিহ্নের প্রবর্তক। বিদ্যাসাগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলায় কমা সেমিকোলন কোলন বিস্ময়সূচক-চিহ্ন ও জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহার করেন।[১] পরবর্তী জীবনীকারেরা এবং সাহিত্যসমালোচকেরা প্রায় সকলেই এই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।[২] বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে এই ধারণার সামান্য পরিবর্তন হয়। প্রিয়রঞ্জন সেন ১৯৩২এ প্রকাশিত গ্রন্থে[৩] লেখেন যে শ্রীরামপুর থেকে ১৮০৫ খৃ. অব্দে প্রকাশিত বাইবেলের বাংলা অনুবাদে জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন[৪]ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত বইতে যে ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা উল্লেখ করেন। এইরকম খণ্ড খণ্ড তথ্য আবিষ্কৃত হবার ফলে সমালোচকেরা এবং ঐতিহাসিকেরা তাঁদের মত আংশিকভাবে পরিবর্তন করেন ও বলতে থাকেন যে বিদ্যাসাগর যদিও বাংলায় যতিচিহ্ন-প্রবর্তক নন, তবুও তিনিই প্রথম এই যতিচিহ্নগুলি বাংলায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না যতিচিহ্ন ব্যবহারের ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পূর্ণ বিবৃত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত 'সার্থকতা' 'অসার্থকতা' ইত্যাদি মন্তব্যে সূচিত মূল্যবিচার নিরপেক্ষ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত যতিচিহ্নগুলি আমরা অন্য-এক ভাষা থেকে গ্রহণ করেছি। যতিচিহ্ন শুধুই শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়, তা বাক্যের গঠনের উপরও নির্ভরশীল। কাজেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যতিচিহ্নের গ্রহণ নিতান্ত যান্ত্রিক কাজ নয়। এই গ্রহণ, বলাই বাহুল্য, আকস্মিকভাবে হয় নি, সহজভাবে হয় নি এবং সবচেয়ে বড়কথা কোনো একক প্রচেষ্টায় হয় নি। বহু লেখকের দান, বহু লেখকের পরীক্ষা এই যতিচিহ্ন গ্রহণের পিছনে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের কোনো গ্রন্থে ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহারের আগে বাঙালী লেখকদের যতিচিহ্ন সংক্রান্ত নানা পরীক্ষার ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া হল।

---

১ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫), কলিকাতা, ৫ম সংস্করণ (১৯২৯), পৃ ১৮০। চণ্ডীচরণ লিখেছেন ইংরেজি যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম 'বেতালপঞ্চবিংশতি'তে (২য় সংস্করণ) ১৮৫০ খৃ. ব্যবহৃত হয়।

২ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (৩য় সংস্করণ ১৯৪৯) গ্রন্থে বলেছেন যে বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতির ১ম সংস্করণে 'কমা' ব্যবহার করেন। পৃ ৬০

৩ *Western Influence in Bengali Literature*, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২), পৃ ২৯৩

৪ বাঙ্গালাসাহিত্যে গদ্য, ১ম সং ১৯৩৭ পৃ ৩৩ [তারিণীচরণ মিত্র অনূদিত ঈশপ্স্ ফেবলে প্রথম ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।]

১

উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলায় কোনো সাহিত্যিক গদ্যরীতি ছিল না। চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজে গদ্যের অস্তিত্বসন্ধান করা চলে, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের হাতে জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনের বিষয় হিসেবে কখনও পৌঁছায় নি। কাজেই প্রাক্-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্য অর্থেই পদ্যসাহিত্য মনে করা যেতে পারে। এই পদ্যসাহিত্যে মাত্র দুটি চিহ্ন-ব্যবহার হয়েছে। যথা—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে যখন গদ্য লেখার নানা পরীক্ষা শুরু হল তখন সেই প্রথম গদ্যলেখকদের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেসব সমস্যার মধ্যে প্রধান হল গদ্যের শব্দ, সমাস ব্যবহার শব্দের অন্বয়, 'ক্লজ'এর অন্বয়, বাক্যের গঠন। এরই সঙ্গে যুক্ত ছিল যতিচিহ্নের ব্যবহারের সমস্যা। বাংলা পদ্যে যে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে তা গদ্যে ব্যবহার করা চলে কিনা এই সমস্যাই প্রথম গদ্যলেখকদের মনে হয়েছিল। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে পয়ার ছন্দে রচিত পদ্যে চরণ শেষ হলেই দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহার করা চলে। কিন্তু যেখানে চরণ শেষ হচ্ছে সেখানে যে বাক্য শেষ হবেই এমন কী কোনো নিয়ম আছে। অবশ্য সাধারণত মধ্যযুগের বাংলা পদ্যে চরণ আর বাক্য একই জায়গায় শেষ হয়েছে। তাই উপরে উদ্ধৃত পদ্যাংশে দুটি চরণ দুটি বাক্যই। যদি কেউ গদ্যে ঐ দুটি চরণকে একটি বাক্য হিসেবে ব্যবহার করেন ও চোদ্দ অক্ষর পরে দাঁড়ি বসিয়ে দেন তাহলে তা নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করে—

কাশীরামদাস মহাভারতের অমৃ। ত সমান কথা ভনে (ও) পুণ্যবান শোনে॥

এইরকম একটা সমস্যা প্রথম গদ্যলেখকদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে তাঁরা পদ্য ছাড়া অন্যকিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যতিচিহ্ন তাঁরা পদ্যে ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখেন নি। পদ্যের চরণ ও যতিচিহ্নের সম্পর্কের অনুরূপ গদ্যে বাক্য ও যতিচিহ্নের সম্পর্ক -সন্ধান তাঁদের করতে হয়েছিল। এই পরীক্ষা, দ্বিধাচিহ্নিত যতিব্যবহারও শেষ পর্যন্ত একটি সমাধানে আসার পরিচয় প্রথম বাংলা গদ্যে লিখিত মৌলিক গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র মধ্যে স্পষ্ট।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-রচয়িতা রামরাম বসু তাঁর গ্রন্থে প্রথম ৮ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। আর বাক্যের সঙ্গে বাক্যের ছেদ বোঝাবার জন্যই সম্ভবত একটু করে জায়গা ফাঁক রেখেছেন। যথা—

রামচন্দ্রও তাহারদের সমিভ্যারে দপ্তরখানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন   রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক   অতএব ঐ দপ্তরে তিনিও মুহুরিগিরি কার্য্যে প্রবত্ত (ভুল) হইলেন।[৫]

বাক্যগুলিকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য যে জায়গা ফাঁক দেওয়া তার থেকেই বোঝা যায় রামরাম বসু যতিচিহ্ন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কী ব্যবহার করবেন তা বুঝতে পারেন নি। পৃ ৯ থেকে দেখা যায় রামরাম বসুর মন এই নিয়ে আরো চিন্তিত। তিনি এখন মধ্যে মধ্যে অনুচ্ছেদের মধ্যের বাক্যগুলিতে দাঁড়ি ব্যবহার করছেন কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিশেষত ছোট ছোট বাক্যে) আগের মতই জায়গা ফাঁক দিচ্ছেন। যেমন

---

৫ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, পৃ. ৪-৫ .

এখন আমার সামন্ত প্রচুর (ভুল) দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ (ভুল) এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া শেনা (ভুল) রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবত্ত (ভুল) হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি।[৬]

গ্রন্থের প্রায় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এই রকম যতিচিহ্ন ব্যবহারে অসংলগ্নতা আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামরাম বসু স্থির করতে পারেন নি কোথায় দাঁড়ি ব্যবহার করবেন। যদি কবিতা হত তাহলে এই অসুবিধা হত না। তিনি চরণে চরণে যতিচিহ্ন দিয়ে যেতে পারতেন— কিন্তু রামরাম বসু লিখছেন এক নূতনরীতি। বাক্যগঠনের সঙ্গে দাঁড়ির সম্পর্ক স্থাপন করা হঠাৎ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' যতই পড়া যায় ততই দেখা যায় যে গ্রন্থের শেষ দিকে দাঁড়িচিহ্ন বেশি ব্যবহার হচ্ছে। যেমন

> লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা (ভুল)। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।[৭]

শেষ কয়েক পাতায় (বিশেষত ১৫১-১৫৪) প্রত্যেকটি বাক্য দাঁড়ি চিহ্নিত। রামরাম বসু বাংলা যতিচিহ্নের ক্রমবিকাশে এই বিশিষ্ট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি এক বাক্য-এক দাঁড়ি জাতীয় যতিচিহ্নের নিয়ম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তী আঠার বছর বাংলা গদ্যে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন যতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২

১৮১৮ খৃ. অব্দে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 'নীতিকথা' নামে একটি বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ছাপা হয়। এই বইতে সর্বপ্রথম ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।[৮] এই বছরেই 'দিগদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিগদর্শনেও ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। মিশনারী পত্রিকাগুলিতে দাঁড়ির পরিবর্তে ইংরেজি 'ফুলস্টপ' ব্যবহার করা হয়। যেমন

> তাতার দেশের এক বাদশাহ আপন অমাত্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে এক দরবেশ ফকীর অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে কহিল, যে আমাকে শতখণ্ড স্বর্ণ যে দিবেক তাহাকে আমি এক উপদেশ দিবা. বাদশাহ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তত সুবর্ণ দিলেন.[৯]

রামমোহন রায় ১৮১৯ খৃ. অব্দে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে ইংরেজি যতিচিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন। অতঃপর রামমোহন তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি অবশ্য মিশনারীদের মত 'ফুলস্টপ'কেও বাংলায় গ্রহণ করেন নি। পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত দাঁড়ি গ্রহণ করেন।

যতিচিহ্ন-ব্যবহার প্রধানত দুটি জিনিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক : গঠন গত, দুই : নিশ্বাস-প্রশ্বাস-গত।[১০]

---

৬ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, পৃ. ১৩

৭ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, পৃ. ১১১

৮ দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৬০

৯ দিগদর্শন, ১৮১৮, ফেব্রুয়ারী, পৃ ৫০৭

১০ Read, Herbert, *English Prose Style*, London, 1946, পৃ ৪৮ এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য Fowler and Fowler, *King's English*, London, 1958, পৃ ২৩০

গঠনগত যতিচিহ্নর মূল উদ্দেশ্য হল বাক্যের গঠনকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া এবং অর্থোদ্ধারে সাহায্য করা। আর নিঃশ্বাসগত যতিচিহ্নের মূল উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হল শারীরিক ক্রিয়ায় সাহায্য করা। মানুষের মুখের ভাষা শারীরিক কারণে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজনে যতি ও ছেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দাঁড়ি কিংবা কমা বা সেমিকোলন সেইসমস্ত যতি বা ছেদের প্রতীকচিহ্ন মাত্র। এই দু ধরণের যতিচিহ্নের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের সুবিধের জন্য আলাদা আলাদা করে দেখানো হল— কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তারা এক। সব ক্ষেত্রে এক অবশ্য নয়। প্রথম ধরণের চিহ্ন নিয়মিত হয় বাক্যগঠনের অন্তর্নিহিত যুক্তিতে। আর দ্বিতীয়টি নিয়মিত হয় যান্ত্রিকভাবে, শারীরিক প্রয়োজনে। প্রথম ধরণের যতি স্থাপনের কৌশল তাই ভাষা অনুসারে পৃথক। ইংরেজি থেকে বাংলায় যখন যতিচিহ্নের আমদানি করার চেষ্টা হল তখন লেখকেরা এই গঠনের প্রশ্ন ভালো করে বুঝতে পারেন নি। রামমোহনের লেখা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রামমোহন লিখছেন

স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?[১১]

এই 'কমা' ব্যবহার করার পিছনে ইংরেজি 'ক্লজ'এর গঠনের ছায়াপাত হয়েছে। এই রকম ক্ষেত্রে কমা ব্যবহার সঙ্গত, যেমন

When did you test the intelligence of women, that you can so easily label them less intelligent?

কিন্তু বাংলায় নয়। যদি রামমোহনের বাক্যটিকে স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করি তা হলে দেখি যে "লইয়াছেন"এর পর যতি পড়ে না, পড়ে "যে"র পর। 'যে' পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অক্ষরের (syllable) চেয়ে উচ্চতর pitchএ উচ্চারিত হয়। অতএব স্বাভাবিকভাবে যতিচিহ্নের ব্যবহার (এ ক্ষেত্রে 'কমা'র ব্যবহার) হওয়া উচিত ছিল 'যে'র পর। কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার শুধু এক ভাষা থেকে এক ভাষায় চিহ্ন আমদানি করা নয়— এক ভাষার থেকে আর-এক ভাষার গঠনপর্বের (syntactic group) আমদানি করার সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষা উভয় ভাষার গঠনগত পার্থক্য যতক্ষণ না স্পষ্ট হচ্ছিল এবং বাংলা বাক্যের গঠনপ্রণালীকে যতদিন না লেখকেরা সুষ্ঠুভাবে জেনেছেন ততদিনই যতিচিহ্ন-ব্যবহার যথার্থভাবে বাংলায় দানা বাঁধতে পারছিল না।

রামমোহন সেমিকোলন ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রায়ই ঠিক ব্যবহার করেন নি। তিনি কেন দাঁড়ি ব্যবহার না ক'রে সেমিকোলন ব্যবহার করলেন মধ্যে মধ্যে তা বোঝা কঠিন, যেমন

আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর তুই হয়েন; সে যাহাই হউক[১২]...

রামমোহন 'কমা' যথেষ্ট ব্যবহার করতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'কমা' দিয়ে তিনি 'ক্লজ'এর সীমারেখা চিহ্নিত করেছেন। কমা সেমিকোলন জিজ্ঞাসাচিহ্ন সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য কি ছিল তা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানতে পারি না। তাঁর ব্যাকরণে যদিও তিনি উক্ত চিহ্নগুলি ব্যবহার করেছেম তবুও তাদের ব্যবহারের কোনো নিয়ম দেন নি। রামমোহন তাঁর কথোপকথন আকারের রচনাবলীতে আর-একটি নূতন চিহ্ন ব্যবহার করেছেন 'ড্যাস' (—) তিনি তাঁর পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে 'ড্যাসে'র পরিবর্তে

---

১১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড): পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১২ রামমোহন গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড): পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪

'কহিল' 'বলিল' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা চলে। 'পাদরী-শিষ্য-সংবাদ' নামক রচনায় তিনি প্রথম দিকে লিখেছেন

প্রথম শিষ্য— উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।

পরে, প্রথম শিষ্য— এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরী— ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য— এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়।

রামমোহনের বাংলায় ইংরেজি যতিচিহ্ন গ্রহণের পর এই চিহ্নগুলি বাংলায় স্থায়ীভাবে বিরাজ করার সম্ভাবনা দৃঢ়তর হল। মিশনারীরা যতিচিহ্ন ব্যবহার করছিলেন কিন্তু বাঙালী পাঠকসাধারণ যতিচিহ্ন সঙ্গেসঙ্গে গ্রহণ করে নি। ১৮২৯ খৃ. অব্দের ১৮ই জুলাই 'সমাচার-দর্পণে' একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় চিঠি প্রকাশিত হয়।[১৩] এই চিঠিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা আছে। কোনো বিদেশীর চিঠির উত্তরে এই চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বাঙালী পত্রলেখক বাংলায় যতিচিহ্নের যে কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে যতিচিহ্নের প্রয়োজন অভ্যাসসাপেক্ষ। বাঙালীরা যতিচিহ্নহীন গদ্য পড়তে অভ্যস্থ। পরে অবশ্য লেখক বলেছেন যে চেষ্টা করা খারাপ নয়। হয়তো কালে ইংরেজি যতিচিহ্ন বাংলায় ব্যবহার হতে পারে। এ চিঠি থেকে মনে হয় ১৮২৯ পর্যন্ত ইংরেজি যতিচিহ্নের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর খুব বেশি পরিচয় ঘটে নি। এই পরিচয় করাতে পারত সংবাদপত্র। সংবাদপত্রগুলি অবশ্য এই কাজে খুব বেশি অগ্রসর হয় নি। কোনো কোনো মিশনারী পত্রিকা, যেমন 'গসপেল ম্যাগাজিন' (১৮১৯) কমা সেমিকোলন উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং ফুলস্টপ ব্যবহার করত। কিন্তু খুব বড় আকারে তখনও কোনো ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় নি। ধীরে ধীরে অবশ্য যতিচিহ্নের প্রসার ঘটছিল। এর জন্য মনে হয় ব্যাকরণকারদের প্রভাব বেশি ছিল। তাঁরা ব্যাকরণের মধ্যে যতিচিহ্ন-প্রয়োগের কোনো নিয়মের উল্লেখ করেন নি। রামমোহন তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু ব্যাকরণে উল্লেখ থাক না-থাক রচনায় ব্যবহার হয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রে সার্থক ব্যবহার হয়েছিল সন্দেহ নেই। নিম্নলিখিত অংশটি একটি উদাহরণ

কি বিপদ্ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশায় তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

প্রথম 'কমা' ব্যবহারের ত্রুটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় কমা ব্যবহার নির্ভুল।

৩

বাংলা যতিচিহ্নের ব্যবহার ক্রমশ দুটি দিক থেকে ত্বরান্বিত হচ্ছিল। মিশনারীরা ইংরেজি ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহারে অভ্যস্থ। তাঁরা সে কারণেই সম্ভবত নবগঠিত বাংলা গদ্যে যতিচিহ্ন প্রয়োগেও উৎসাহিত বোধ করছিলেন। অন্যদিকে বাঙালী লেখকেরা ক্রমশই বাংলা বাক্যের গঠন বুঝতে

---

১৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড), পৃ ৫৯

শিখছিলেন। বাক্যের গঠন ও উচ্চারণপদ্ধতির সংযোগ আবিষ্কার করতে তাঁদের সময় লেগেছিল— কিন্তু গঠন ও উচ্চারণ -প্রণালীর সম্পর্ক আবিষ্কারের মধ্যেই যতিচিহ্নের ব্যবহারের সার্থকতা নির্ভর করছিল। যখন তাঁদের কোনো স্বাভাবিকভাবে বাংলা বাক্যের মধ্যে বিশিষ্ট পদগুচ্ছগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারিত হতে চিনল, যখন স্বরের উত্থানপতন চিনতে শিখল তখনই যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্ভব হল। ইতিমধ্যে বাঙালীরা ইংরেজি শিখছেন। ইংরেজিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে হয়তো চিন্তাও করেছেন। কাজেই বাংলায় সার্থক যতিচিহ্ন ব্যবহারের সময় এগিয়ে এল।

১৮৪৩ খৃ. অব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) মুখপত্র হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখা এবং অক্ষয়কুমারের কয়েকটি লেখা— পূর্ববর্তী সমস্ত বাংলা গদ্যরচনা থেকে— বিশেষ একটি দিক থেকে স্বতন্ত্র। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার জন্য বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন এবং সেই বক্তৃতাগুলি পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথের লেখাগুলি লেখক কর্তৃক উচ্চারিত হত— কিন্তু ইতিপূর্বে কোনো লেখাই প্রথমত উচ্চ স্বরে পড়ার জন্য লেখা হয় নি, দ্বিতীয়ত কোনো বক্তা তাঁর বাংলা বক্তৃতা কাগজে ছাপেন নি। দেবেন্দ্রনাথের লেখায় তাই সম্পূর্ণ নূতন একটি ভাষণ-কলার (rhetoric) ধর্ম দেখা দিল। ভাষণ-কলার প্রধান নৈপুণ্য যতি-স্থাপনে। উৎকৃষ্ট বক্তৃতার কৌশল হল যথাস্থানে থামতে জানা। এতদিন বাঙালী লেখকেরা পাঠকের জন্য গ্রন্থ লিখেছেন, অদৃশ্য পাঠকের কথা ভেবে যথাস্থানে থামতে পারেন নি। এবার দেবেন্দ্রনাথ শ্রোতার জন্য ভাষণ লিখছেন, তাঁকে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সেই ভাষণ পড়তে হচ্ছে। কাজেই স্বভাবত তাঁর গদ্য থামতে জানার কুশলতা আয়ত্ত করবে। দেবেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৪৪ খৃ. অব্দে। দেবেন্দ্রনাথের 'কমা' ব্যবহার লক্ষণীয়

> যিনি ভূমিকে সর্ব্বকালে শ্যামবর্ণ তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্তকালে নবপল্লবযুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সুস্থতা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগকে মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি দিবারাত্রির পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে আনন্দপ্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।[১৪]

দেবেন্দ্রনাথের 'কমা' ব্যবহার তাঁর ভাষণকলা-বোধ থেকেই নিঃসারিত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। দেবেন্দ্রনাথের 'কমা'গুলি বাক্যের গঠনকেও বিশ্লেষণে সাহায্য করছে— তিনি 'কমা'গুলি 'ক্লজে'র সীমারেখা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করেছেন এ কথা সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেখানে যেখানে কণ্ঠস্বরের সুর নীচে নেবে আসছে সেখানেই দেবেন্দ্রনাথের 'কমা' ব্যবহার। এই দীর্ঘ বাক্যে 'যিনি' সর্বনামটির দ্বারা তিনটি দীর্ঘ 'ক্লজ' ব্যবহার করা হয়েছে— এবং সকলেই লক্ষ্য করবেন যে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতিতে আমরা যদি এই দীর্ঘ বাক্যটি পড়ি তাহলে প্রত্যেকটি -'ইয়া' ও -'ইতেছেন' অন্তক ক্রিয়া-রূপের কাছে আমাদের সুর নীচে নাববে ও 'যিনি'র উপর জোরে শ্বাসাঘাত পড়বে।

---

১৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক(অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃ. অব্দ) চৈত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিংশতি সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬০

এবার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে আর-একটি অংশ উদ্ধার করি। এটি সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা।

> যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়নজন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গ তুচ্ছ করত আপনারদিগের ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমারদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই।[১৫]

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ১৮৪৪ খৃ. অব্দের মধ্যে বাংলায় যতিচিহ্ন ব্যবহার ব্যাপকভাবেই শুরু হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারে সর্বপ্রথম সচেতনতা অবলম্বন করেন। এই পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যার প্রথম দু পৃষ্ঠার মধ্যেই দাঁড়ি জিজ্ঞাসাচিহ্ন উদ্ধৃতিচিহ্ন কমা এবং সেমিকোলন দেখা যাবে। যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই যতিচিহ্ন ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয় সেহেতু কি কি যতিচিহ্ন ব্যবহার এখানে হয়েছিল তা জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। পুরোনো যতিচিহ্নের মধ্যে '।' এবং '॥' তত্ত্ববোধিনীতে ব্যবহার হয়েছে। '॥'-চিহ্ন সাধারণত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদে বাক্যের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে, যথা

> জীবাত্মাকে রথিরূপে, শরীরকে রথরূপে এবং বুদ্ধিকে সারথিরূপে, আর মনকে প্রগ্রহরূপে জান॥[১৬]

'কমা' ব্যবহারে দক্ষতা উপরের বাক্য থেকেই পাওয়া যাবে। 'কমা' ও 'সেমিকোলন' উভয়ের ব্যবহার নীচের উদ্ধৃতিতে দেখা যাবে—

> ··তিনি তাবৎ জীবনশাস্ত্রের প্রতি একবার অবলোকন না করুন; বেদবিরুদ্ধ সমুদয় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকুন; ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, চৌর্য প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় জীবনের সংকল্পিত কার্য্য হউক, তথাপি তাঁহার ব্রহ্মণ্যমর্য্যাদার বিশেষ ত্রুটি হয় না।[১৭]

জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহারও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ব্যাপকভাবে হতে থাকে। যথা

> ··তাহাদের এ দুঃখ প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কাহাকে এ মর্ম্মবেদনা জ্ঞাত করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক? কে বা তাহারদের দীনদশা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্র দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবেক?[১৮]

'বিস্ময়বোধক-চিহ্ন' এবং 'উদ্ধৃতিচিহ্ন' ব্যবহার প্রচুর না হলেও কিছু কিছু আছে।[১৯] এইসমস্ত তথ্য প্রমাণ করে যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় যতিচিহ্নগুলিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ

---

১৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক (অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃ. অব্দ) জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বাবিংশতি সংখ্যা, পৃ. ১৭৬-৭৭

১৬ ঐ ১৭৬৮ শক (অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃ. অব্দ) বৈশাখ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ৩৩ সংখ্যা, পৃ ২৮৫

১৭ ঐ পৃ ২৮৪

১৮ ঐ ১৭৭২ শক (অর্থাৎ ১৮৫০ খৃ. অব্দ) কার্তিক ৪র্থ খণ্ড, ৮৭ সংখ্যা, পৃ ১১৯

১৯ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম পাদটীকায় ব্যবহৃত সংকেতগুলিও ব্যবহৃত হতে থাকে। *, * *, †, ‡, ||, ¶, §, ইত্যাদি সংকেতচিহ্নগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখা যায়।

করে। ১৮৪৬ এবং ১৮৪৭ খৃ. অব্দের মধ্যে বাংলায় যতিচিহ্ন যে সার্থকভাবেই নানা লেখক ব্যবহার করছিলেন তার আরো প্রমাণ আছে।

১৮৪৬ খৃ. অব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুবৃহৎ দ্বি-ভাষী গ্রন্থ *Encyclapoedia Bengalensis* প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের বাঁদিকে ইংরেজি ও ডানদিকে বাংলা। ওই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নাম রোমের ইতিহাস। এখানে দাঁড়ি কমা জিজ্ঞাসাচিহ্ন ড্যাস উদ্ধৃতিচিহ্ন সেমিকোলন ও বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য একটি খণ্ড থেকে ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক

> যদি আমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করি তবে কত গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য মেঘ আকাশ আমাদের নয়নগোচর হয়! —এ সমস্ত বস্তুর বিষয়ে মনোরঞ্জক বিদ্যা আছে। গ্রহাদির পরিমাণ গতি সংক্রমণ সমস্ত আমরা গননা দ্বারা নিরূপণ করিতে পারি; মেঘের উৎপত্তি স্থিতি ও বর্ষণ আমরা নির্ণয় করিতে পারি; বায়ুর বেগ ও বহন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় আমরা বিবেচনা দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি কে এই সকল গননার মূলসূত্র জানিতে চাহিবে না?

১৮৪৭ খৃ. অব্দে ইয়েটস্‌এর *Introduction to the Bengali Language* (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।[২০] এই গ্রন্থ থেকে কতকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এর থেকেই যতিচিহ্ন ব্যবহারের ব্যাপকতা বোঝা যাবে।

> · 'তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না, এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন।[২১]
>
> শৃগালের গর্জনে কেশরী নাহি রোষে।[২২]
>
> প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন, শুন, হে রাজা ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের মহত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম; যদি তোমার এ সকল থাকে, তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।[২৩]
>
> ব্যাঘ্র পুনর্বার রাজপুত্রকে কহিল, হে রাজকুমার, বানরজাতিকে বিশ্বাসে কি? তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ, তাহাতে আমার আহার হইলে আমা হইতে তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না।[২৪]

ইয়েটস্‌এর গ্রন্থে দাঁড়ি জিজ্ঞাসাচিহ্ন কমা সেমিকোলন উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্ময়চিহ্ন প্রভৃতির ব্যবহার খুব বেশি দেখি নি। কিন্তু যে কটি যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে সে কটি যে 'সার্থক' ব্যবহার নয় তা আশা করি কেউই বলবেন না।

---

২০ Rev. W. Yates, *Introduction to the Bengali Language*, (Vol. I & II), Calcutta, 1847 edited by J. Wanger. এই গ্রন্থ ইয়েটস্‌এর আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গ্রন্থটি ১৮৪৭এর আগেই লেখা হয়েছিল। অবশ্য গ্রন্থের যতিচিহ্নের জন্য ইয়েটস্ অথবা ওয়েঙ্গার কে দায়ী তা বলা কঠিন। কিন্তু যাই হোক ১৮৪৭ খৃ. অব্দেই এই গ্রন্থে যতিচিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে— এইটিই আপাতত বড় কথা। দ্বিতীয় খণ্ডটিই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

২১ ঐ [তোতাইতিহাস— চণ্ডীচরণ মুন্সী] পৃ ১

২২ ঐ [লিপিমালা— রামরাম বসু] পৃ ২৭

২৩ ঐ [বত্রিশ সিংহাসন— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার] পৃ ৬১

২৪ ঐ পৃ ৬০

৪

১৮৪৭ খৃ. অব্দে (১৯০৩ সংবং) বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় নি। শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন যে বিদ্যাসাগর বেতাল-পঞ্চবিংশতির ১ম সংস্করণে অতি অল্প 'কমা' ব্যবহার করেন, কিন্তু পরে বেশি ব্যবহার করতে থাকেন।[২৫] আমি 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ১ম ও ২য় সংস্করণে একটিও 'কমা'র ব্যবহার খুঁজে পাই নি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম সংস্করণের তিন বছর পরে (১৯০৬ সংবং)। কাজেই ধরে নিতে বাধ্য যে ১৮৪৭ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর 'কমা' ব্যবহার করেন নি। তাঁর পরবর্তী সংস্করণ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র সঙ্গে ১ম ও ২য় সংস্করণের তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

প্রথম সংস্করণ। ১৮৪৭। পৃষ্ঠা ২৬

তিনি· ·উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্২ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লবফলকুসুম সমূহে সুশোভিত আছে। তাহাদিগের ছায়া অতি স্নিগ্ধ ও সুশীতল বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চার দ্বারা পরমরমণীয় হইয়াছে। তথায় শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তি প্রবেশমাত্রেই গতক্লম হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮৫০। [কোনো পরিবর্তন করা হয়নি]

দশম সংস্করণ। ১৮৯০ (সংবত ১৯৩৩) পৃ ১৫

তিনি· ·উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংসবক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; মধুকরেরা, অন্ধ হইয়া, গুণ২ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুমসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; তাহাদিগের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়াছে; তথায় প্রবেশ মাত্র, শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তির ক্লান্তি দূর হয়।

আরো বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা চলে যে বিদ্যাসাগর ১ম ও ২য় সংস্করণে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন নি। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১ম সংস্করণ পৃ ১৫৬

অনন্তর এক সুশোভিত শয়নাগারে পরম রমণীয় অতিকোমল শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয্যা চত্তরকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া রাজার সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ আছে। তাহা আমার অতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল অতএব শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। এবং স্বয়ং শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া অন্বেষিয়া দেখিলেন শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক কেশ পতিত আছে।

---

২৫ শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৩য় সংস্করণ), ১৯৪৯, পৃ. ৬০, অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' 'সাহিত্য' খণ্ডের (১৯৩৭) ভূমিকায় (পৃ. ।/০) বলেছেন যে ১ম সংস্করণে দাঁড়ি ছাড়া অন্য চিহ্ন ছিল না।

২য় সংস্করণ পৃ ১৯০

অনন্তর এক সুশোভিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরমরমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ ঐ শয্যার সপ্তমতলে এক ক্ষুদ্র কেশ আছে তাহা আমার অতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল অতএব শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং স্বয়ং শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া অন্বেষিয়া দেখিলেন শয্যার সপ্তমতলে যথার্থই এক কেশ পতিত আছে।

১০ম পৃ ১৩৬

অনন্তর এক সুশোভিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরমরমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তমতলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার অতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, স্বয়ং প্রবেশ করিয়া, অন্বেষিয়া দেখিলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক কেশ পতিত আছে।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এইবার আমরা কতকগুলি সত্যে পৌঁছতে পারি। এই তথ্যগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছি এবং কোনো ভাবে তাদের সজ্ঞানে বিকৃত করি নি। এখন আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে কোনো বিচার করি তাহলে প্রথম কথা স্বীকার করতে হবে ১৮০১ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে বাংলা গদ্যে যতিস্থাপন নিয়ে বাঙালী লেখকরা চিন্তা করেছেন। যতিস্থাপন করায় মিশনারী এবং বাঙালী উভয় প্রচেষ্টাই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং শেষপর্যন্ত বাংলায় যতিচিহ্ন প্রাচীন বাংলা ও ইংরেজি যতির যুগলসম্মিলনে গড়ে ওঠে। যতিচিহ্ন-প্রবর্তন কোনো ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয় কথা হল বাংলা যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলীতে দাঁড়ি এবং অন্যান্য ইংরেজি যতিচিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যতিচিহ্ন ব্যবহার ভাষণকলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই তাঁর যতিচিহ্নগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। অপর পক্ষে তাঁর বাক্যগুলির শ্বাসপর্বগুলি অর্থপর্বের (semantic group) একীভূত— ফলে তাঁর যতিচিহ্ন বাক্যের অর্থ বুঝতেও সহায়ক। সম্ভবত তাঁর কাছ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্য লেখকরা, বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্ত, যতিচিহ্ন ব্যবহারের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি দেখে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় কথা হল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ শতকে আরো বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়— যেখানে যতিচিহ্নের বহুল ব্যবহার হয়েছে এবং সার্থক ব্যবহার হয়েছে। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা (১৮৪৬) এবং ইয়েটস্ ও ওয়েঙ্গার -প্রকাশিত বাংলা রচনাবলী (১৮৪৭) তার প্রমাণ। এই তিনটি বক্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য ভাবে ঐতিহাসিককে গ্রহণ করতে হয়, তা হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা যতিচিহ্ন প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আশা করি এখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের দেশে পণ্ডিত-মহলে যে ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগরই বাংলায় সর্বপ্রথম সার্থকভাবে যতিচিহ্নগুলি ব্যবহার করেন তা সত্য নয়। ১৮৫০ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কোনো

ইংরেজি যতিচিহ্ন গ্রহণই করেন নি। তার যথেষ্ট প্রমাণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় যে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেও কেন দেবেন্দ্রনাথের মত ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন নি।[২৬] যাই হোক, যে কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য নয় তা দিয়ে বিদ্যাসাগরের মত মানুষের মহিমা বাড়ানোর চেষ্টা সংগত নয়। পরিশেষে নিবেদন করি যে, এই বিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যাশ্রিত হয়ে করা হচ্ছে— কাজেই আমাদের বহুদিন-লালিত একটি বিশ্বাসের সংশোধন আবশ্যক বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সহকারেই বিষয়টি উপস্থাপিত করা হল।

---

২৬ অনেক সাহিত্যসমালোচক মনে করেন যে বিদ্যাসাগরের যতিব্যবহার তাঁর গদ্যের ছন্দবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই কারণেই তিনি বেশি কমা ব্যবহার করেছেন। এ মন্তব্য সত্য হতে পারে। কিন্তু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদের, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথের, গদ্যে যে ছন্দবোধ দেখা দিয়েছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের ছন্দবোধ যদি যতিচিহ্নকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে তাহলে কি বলব যে বিদ্যাসাগর ১৮৫০ পর্যন্ত বাংলাগদ্যের ছন্দকে বুঝতে পারেন নি? তিনি গদ্যছন্দ যথার্থই বুঝেছিলেন, কিন্তু যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে তিনি দীর্ঘকাল উদাসীন ছিলেন। যখন প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন তখন যে তিনি কমা ব্যবহারের আধিক্য করেছেন এতে কোনো দ্বিমত নেই। এই 'আধিক্য' নিশ্চয়ই সার্থক ব্যবহারের চিহ্ন নয়।
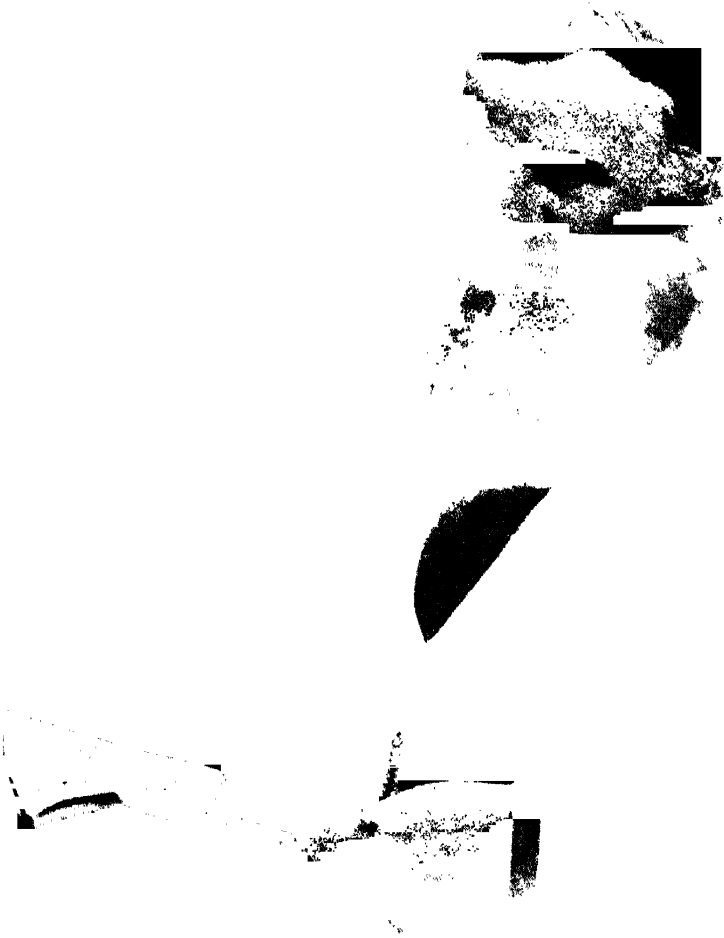
হেনরি মরলি
১৮২২-১৮৯৪

হেনরি মরলি ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

"আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত— আমাদের সেই মরমে পৌছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক—মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না।"

—ছেলেবেলা

'ছেলেবেলা' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনশেষের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আচার্য হেনরি মরলির (১৮২২ - ৯৪) একটি চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। যৌবনে সদ্য উপনীত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্থী মনকে তাঁর অধ্যাপনাশিল্প দ্বারা কী গভীরভাবে উদ্‌বোধিত করেছিলেন তার স্বচ্ছ স্বীকৃতি শীর্ষে উৎকলিত ছত্রগুলিতে লক্ষণীয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "বহুবার মরলির নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি।"[১] সাহিত্যরসকে শিক্ষার্থীর মরমে পৌছে দিতে পারা দুরূহ কাজ। মরলি সেই দুরূহ ব্রতে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। মরলির অধ্যাপনাগুণে যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের রসতীর্থে যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত।

মরলি সম্পর্কে আলোচনাকালে অন্যত্র তিনি বলেছেন :

"হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড়ো একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নতুন ধরণের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য বিষয় তিনি ক্লাসে এমন ভাবে আবৃত্তি করে যেতেন, যাতে ক'রে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তাঁর আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তার পরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোনো কষ্ট হত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি।"[২]

এর থেকে বোঝা যায় মরলির সাহিত্য-অধ্যাপনার নিজস্ব বিশিষ্ট রীতিটিকে। তিনি সাহিত্যের আলোচনায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, শ্রোতা শিক্ষার্থীর তরুণ চিত্তে সাহিত্য রসের উদ্‌বোধনই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক রূপেই নয়, ভারতবাসীর উপর গভীর সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরূপের পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে।

সাধারণ ইংরেজের মধ্যে আত্ম-অহঙ্কার এবং ভারতবাসী সম্পর্কে অশ্রদ্ধার যে ঔদ্ধত্য দেখা যেত সেকালে,

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৭।

২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রানী চন্দ, পৃ. ৮১-৮২। তাঁর সম্পর্কে ইংরেজ চরিতকার লিখেছেন : "His teaching power was unique, not only from the mastery of the facts but from his personal warmth and geniality"—*Dictionary of National Biography*

মরলি ছিলেন সেই সংকীর্ণতার বহু উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন সত্যিকারেরর 'বড়ো ইংরেজ'। মরলির চরিত্রের সেই মহৎ দিকটির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি ঘটনার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন :

"তিনি আর একটা করতেন— সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না, কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল। শুধু একদিন তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। একটি ভারতীয় ছাত্র ইংরেজদের স্তুতিবাদ করে ও সেই তুলনায় স্বজাতীয়দের নিকৃষ্টতা দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে রেখে আসে। হেনরি মর্লি সেই প্রবন্ধ প'ড়ে খুব রেগে যান। তিনি সেদিন ক্লাসে এসে সেই প্রবন্ধটির খুব নিন্দা করেন এবং তিনি বলেন, এতে যে ইংরেজদের স্তুতি করা হয়েছে, তাতে যেন কোন সত্যিকারের ইংরেজ খুশি না হয়। সেদিন তাঁর মন অপ্রসন্ন ছিল বলে সেই প্রবন্ধটির ভাষার ও রচনার সমালোচনা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল আমরাই না তাঁর লক্ষ্যগোচর হই। তারপর বাধ্য হয়ে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য। মেজদা একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষে ইংরেজ'[৩] সম্বন্ধে। তাতে ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে সব তথ্য। আমি অনেকটা তারই উপর লক্ষ্য রেখে ও কিছু রং চড়িয়ে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে চালান করে দিলুম। তার পরের দিনগুলি ভয়ে ভয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করতে লাগলুম। যেদিন সেই বিশেষ দিনটি এল, সেদিন আমি পলাতক। ভয়, কী জানি কী হয় আজ। সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। বিকেলে এক জায়গায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি পিঠে এক চাপড়। আমার বন্ধু লোকেন পালিত[৪] উল্লসিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ওহে তোমার আজ জয়-জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।' এবং তিনি ক্লাসে যে সব ইংরেজ ছাত্র ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন 'তোমরা হয়তো অনেকেই পরে ভারতবর্ষে যাবে কিন্তু আজকের দিনে এই যে ভারতীয় ছেলেটি ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বললে তা যেন কোনদিন ভুলো না। আর তাদের সম্বন্ধে যেন কোনো অসম্মান না থাকে।' সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি।"[৫]

এই প্রশংসার কারণ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ভারতবর্ষে গিয়ে অধিকাংশ ইংরেজ শাসক ও কর্মচারী ভারতবাসীদের প্রতি যে অনুদার ব্যবহার করতেন, তার জন্য মরলি মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। সেই পোষিত লজ্জাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির উদ্দেশে ঘোষিত প্রশংসার মূল।

---

৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধটির ঠিক নাম হল "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ"। ১২৮৪ সালের "ভারতী" পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চার সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখকের নামের স্থলে "শ্রী সঃ" দেখা যায়। পরে সত্যেন্দ্রনাথ এই রচনাটিকে "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থের "পরিশিষ্ট" রূপে গ্রন্থভুক্ত করেন।

৪ জীবনস্মৃতি, 'লোকেন পালিত', পৃ. ৯৭-৯৮

৫ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রানী চন্দ, পৃ. ৮৩-৮৪

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পকাল পড়েছিলেন লণ্ডনে য়ুনিভার্সিটি কলেজে। তিনি তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেতে যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া বেশি কিছু করেছিলেন বলে মনে হয় না।

তবে পাশ্চাত্য নৃত্য ও গীতে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু তারকনাথ পালিতের (১৮৩১ - ১৯১৪) আগ্রহে ও চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করা হয়। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৭৯ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখে। শুধু ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসই তিনি করেছিলেন স্বল্পকালের জন্য, কেননা দেখা যায় তিনি একবারই মাত্র ফি জমা দিয়েছিলেন ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। তিনি ঠিক কতদিন ওখানে পড়েছিলেন বলা যায় না।[৬] লণ্ডনে থাকবার সময় তার বাসস্থান ছিল ১০ ট্যাভিস্টক স্কোয়ার। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন, রবীন্দ্রনাথও সেই সঙ্গে ফেরেন। কাজেই তিন মাসেরও কম সময় তিনি ছাত্র ছিলেন হেনরি মরলির।

মরলি (১৮২২ - ৯৪) য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৯ কাল পর্বে। তাঁর বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। বিহারীলাল গুপ্ত এবং লোকেন পালিতও তাঁর ছাত্র ছিলেন কিন্তু মরলি সম্পর্কে তাঁদের লেখা কিছু পাই নি।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ - ১৯০৯) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলেতে যান। প্রাথমিক পরীক্ষা হয় ১৮৬৯ সালে এবং শেষ পরীক্ষা হয় ১৮৭১ সালে। ইংলণ্ড থেকে তাঁর অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্তকে লেখা পত্রগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে "Three years in Europe" নামে। রমেশচন্দ্র তাঁর একখানি চিঠিতে হেনরি মরলি সম্পর্কে লিখেছেন :

> "আমরা লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ক্লাশ করতাম এবং কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে পড়াশুনার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য নিতাম। তাঁদের সেই সহৃদয় ব্যবহার আমরা কখনো বিস্মৃত হতে পারি না। তাঁরা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে দুজনের নাম উল্লেখ করতেই হবে, কেননা তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি মরলির মত সদয়, বড়ো-মনের খাঁটি মানুষ আর আমি দেখিনি। আমরা তাঁর ক্লাশ করেছি, ব্যক্তিগত সাহায্য নিয়েছি, তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং নানা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান বন্ধুজনোচিত উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তাঁর গৃহ আমাদের জন্য অবারিতদ্বার ছিল— সেই ঘরের দেয়ালে চারিদিকে থরে থরে বই সাজানো। সেই পড়ার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে আমরা আনন্দে কত সময় কাটিয়েছি।"

রমেশচন্দ্র যে দ্বিতীয় অধ্যাপকের কথা লিখেছেন তিনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ আচার্য গোল্‌ড্‌স্টুকর।[৭] অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে এখানে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হল না।

---

৬ য়ুনিভার্সিটি কলেজের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন—'I regret there are no records now existing which give the length of time he actually studied here.' —প্রবন্ধ লেখককে লিখিত পত্র

৭ থিয়োডোর গোল্‌ড্‌স্টুকর (১৮২১-৭২) লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৫০ সাল থেকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন এই মনীষীর উদ্দেশে চতুর্দশপদী কবিতাবলী কাব্যে।

রমেশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে পুনরায় লণ্ডনে যান। তাঁর হৃদয়ে অতীত ছাত্রজীবনের মধুর স্মৃতি জেগে ওঠে। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"লণ্ডনের কোনো স্থানই আমার মনে ঠাঁই জুড়ে নেই, যেমন আছে য়ুনিভার্সিটি কলেজ, যেখানে আমি পড়েছি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের কাছে, পরিচিত হয়েছি কয়েকজন মহৎ মানুষের সঙ্গে।··কতো শরতের আঁধার করা বৃষ্টিমুখর দিন, অথবা শীতের তুষার-ঝরা প্রহর এই বাড়িগুলির ছায়ায় আমার কেটেছে। কতো বছর পরে আমি আবার তাদের দেখলাম। সবার উপরে মনে পড়ল আমার সেই ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস আর সেই সৌম্য উদারমনা মহৎপ্রাণ অধ্যাপক মহাশয়কে, যিনি এখনো এই বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন।

"তিনি ছিলেন আমাদের সত্যিকারের বন্ধু বলতে যা বোঝায় তাই, তখন বিদেশে আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল ঐ রকম একজন মানুষের সাহচর্য ও উপদেশ। তাঁর চেয়ে ভালো লোক জীবনে আমি আর দেখিনি।

"বলা বাহুল্য তাই এবার লণ্ডনে এসে প্রথমেই আচার্য হেনরি মরলির সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়-পোষিত গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁকে নিবেদন করবার সুযোগ নিলাম। আমার এক সহপাঠী বন্ধু[৮] ফার্লো নিয়ে তখন লণ্ডনে এসেছিলেন, আমরা দুজনে মিলে অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ি গেলাম এবং যার-পর-নাই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম ঠিক আগেকার মতই তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন।

"মাথার চুল অবশ্য তুষারশুভ্র হয়ে উঠছে মুখেও বার্ধক্যের বয়োরেখা দেখা দিয়েছে কিন্তু আননের পবিত্র সরলতা ও সৌম্যশ্রী সেই পূর্বেকার মত দীপ্যমান। তিনি আমাদের সেই আগের দিনের মতোই অভ্যর্থনা করলেন, আমাদের ছাত্রজীবনের কতো কথার আলোচনা হল। আঠারো বছর আগে আমি তাঁর কাছে পড়েছিলাম এবং এখনো তাঁর সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। কাজেই খুব মজার ব্যাপার হল, যখন ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বোকার মত একটা ভুল করে বসলাম।

"তিনি সহজ কৌতুকের হাসি হেসে আমার ভুলের জন্য বকলেন এবং বললেন যে দেখা যাচ্ছে তাঁর পড়ানো আমি সব ভুলে মেরে দিয়েছি। এই সস্নেহ তিরস্কার আমি কখনও ভুলতে পারব না।

"তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যায় আসতে বললেন এবং মিসেস্ মরলি আমাদের ঠিক আগেকার মতো আপ্যায়ন করলেন। আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের গ্রন্থ-পরিপূর্ণ পাঠাগারে গেলাম। এই সেই ঘর যেখানে কত শীতের রাত্রি আমরা কাটিয়েছি। সেদিনকার সন্ধ্যাটি চমৎকার কেটেছিল।"

হেনরি মরলির ব্যক্তিরূপটি রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রবর্ণিত ছত্রগুলিতে অনবদ্যরূপে ধরা পড়েছে। আঠারো বছর পূর্বেকার একজন ভারতীয় ছাত্রকে চিনতে তাঁর বিলম্ব হয়নি; তাঁর হৃদয়ের দরজা তিনি পরম স্নেহে খুলে ধরেছেন সেই ছাত্রকে স্বাগত জানাতে।

মরলির সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সহপাঠী ও বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) যে বিবরণী রেখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে[৯] তার মূল্যও কম নয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল

---

৮ বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৯-১৯১৬)

৯ *A Nation in Making*: Oxford University Press (1927).

No. 552

Name	R. Tagore
Age	18
Usual Residence	Bengal
Residence in London.	10 Tavistock Square, W. C.

No.	Classes.	Amount.		
	Latin			
	Greek			
153	English	8	8	
	French			
	German			
	Italian			
	Spanish			
	History			
	Political Economy			
	Philosophy of Mind and Logic			
	Mathematics, Pure			
	Mathematics and Mechanics, Applied			
	Physics			
	Physical Laboratory			
	Chemistry			
	" Practical			
	" Analytical			
	Zoology and Comparative Anatomy			
	Botany			
	Geology: Mineralogy			
	Hygiène			
	Architecture			
	Engineering and Mechanical Technology			
	Mechanical Drawing			
	Work Room			
	Chemical Technology			
	Hebrew			
	Sanskrit			
	Telugu			
	Arabic: Persian			
	Roman Law			
	Jurisprudence			
	Constitutional Law and History			
	Fine Art			
	Perspective			
	Anatomy			
	Blulna £	8	8	

No. 416

Name	L Kalit
Age	14yrs 8/9/80
Usual Residence . .	Calcutta
Residence in London.	

No.	Classes.	Amount.		
49	Latin	1	1	—
	Greek			
106	English	2	2	—
45	French	1	1	—
	German			
	Italian			
	Spanish			
	History			
	Political Economy			
	Philosophy of Mind and Logic			
68	Mathematics, Pure	10	10	—
	Mathematics and Mechanics, Applied . . .			
90	Physics	5	5	—
	Physical Laboratory			
	Chemistry			
	" Practical			
	" Analytical			
	Zoology and Comparative Anatomy . . .			
	Botany			
	Geology : Mineralogy			
	Hygiène			
	Architecture			
	Engineering and Mechanical Technology .			
	Mechanical Drawing			
	Work Room			
	Chemical Technology			
	Hebrew			
	Sanskrit			
	Telugu			
	Arabic : Persian			
	Roman Law			
	Jurisprudence			
	Constitutional Law and History			
	Fine Art			
	Perspective			
	Anatomy			
	[illegible] £	39	18	—

গুপ্তের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনিও লণ্ডনে য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন। তিনি লিখেছেন :

"লণ্ডনে পৌঁছে শীঘ্রই আমরা য়ুনিভার্সিটি কলেজের কয়েকটি ক্লাশে যোগ দিই এবং কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে বাড়িতে পড়তে থাকি। তাঁরা আমাদের সঙ্গে সুন্দর সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর ও অধ্যাপক হেনরি মরলির স্নেহপূর্ণ ব্যবহার বিশেষ করে স্মরণীয়। তাঁরা বোধহয় পিতামাতা ও আত্মীয়বিচ্ছিন্ন এই প্রবাসী ছেলেদের মনের অবস্থা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। হেনরি মরলি আমাদের তাঁর নিজের পরিবারের লোকের মতই দেখতেন। গোল্‌ডষ্টুকর খঞ্জ ও অকৃতদার ছিলেন, ঠিক ভারতীয় 'গুরু'র মত যুগপৎ স্নেহ ও কঠোরতা তাঁর মধ্যে ছিল।"

এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, গোল্‌ডস্টুকর ম্যাক্‌সমূলারের খ্যাতিতে ঈর্ষা বোধ করতেন। তাঁর মেজাজ বেশ গোলমেলে ছিল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"একদিন আমরা সবাই চেয়ারিং ক্রসের পাশ দিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ কী একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে গোল্‌ডস্টুকর একেবারে রেগে ফেটে পড়লেন। অধ্যাপক মরলিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যানার্জী, তুমি মনে কিছু কোরো না। ওঁর একখানা বুটের তলা খুলে গেছে, সেজন্যই মেজাজ বিগড়ে গেছে'। তাই শুনে আমরা হেসে ফেললাম।"

মরলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন :

"হেনরি মরলির সকল কর্মের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম জীবনের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা। জীবন তাঁর কাছে ছিল সূর্যালোকের মত; নিজের বাড়ির খুশির হাওয়া তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলত। তিনি সর্বদাই কাজ নিয়ে থাকতেন অথচ সবসময় হাসিখুশী।

"আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ে যখন গোলমাল চলছিল[১০] তখন তিনি আমার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন এবং বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেনস্‌কে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলেন। ডিকেনস্ আমার পক্ষ নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'Good Words'[১১] পত্রিকায় কড়া প্রবন্ধ লেখেন। আমার

---

১০ ১৮৬৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের 'Open Competitive Examination' হয়। রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ তিনজনই সে পরীক্ষায় পাস করেন। তখন নিয়ম ছিল ঐ পরীক্ষার প্রার্থীকে উনিশ বছরের বেশি ও একুশ বছরের কম বয়সী হতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় (১৮৬৩) বয়স লিখেছিলেন ষোলো বছর। কাজেই ১৮৬৯ সালে একুশ বছরের বেশি হয়। সেজন্য তাঁর সম্পর্কে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। বিহারীলাল গুপ্ত এবং মহারাষ্ট্রের শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুরও একই সমস্যায় পড়েছিলেন বয়সের ব্যাপারে। বিহারীলাল গুপ্তের বাধা সহজেই কেটে গেল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদের নাম সরিয়ে নেওয়া হল সফল প্রতিযোগীদের নামের তালিকা থেকে। বাংলা দেশে এই নিয়ে জোর আন্দোলন হয় এবং মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল সকলেই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বয়স গণনার রীতির পার্থক্য দেখিয়ে সুরেন্দ্রনাথের দাবী সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কুইন্‌স বেঞ্চের কাছে আবেদনে সুফল পান।

১১ মরলি ১৮৪৯ সালে কয়েকটি কটাক্ষগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন, তার একটি হল "How to make home unhealthy" রচনাটি ডিকেন্‌সের (১৮১২-৭০) নজরে পড়ে। তিনি মরলিকে তাঁর সম্পাদিত 'Household Words' পত্রিকায় লিখতে বলেন। মরলি লেখেন 'Adventures in Skitzland' এবং নিজের লিভারপুলের স্কুলের পাট গুটিয়ে 'Household Words'

সেই দুর্যোগের দিনে সর্বদাই তাঁর কাছ থেকে পেতাম উৎসাহ ও আনন্দ। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'ব্যানার্জী, তুমি যে লড়াই চালাচ্ছ, তার জন্য ওরা একদিন তোমার প্রতিমূর্তি গড়বে'।"[১২]

এই 'বড়ো ইংরেজ' মরলি, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রে সমুজ্জ্বল একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তারকনাথ পালিতের ছেলে লোকেন পালিত য়ুনিভার্সিটি কলেজে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লোকেন সম্পর্কে লিখেছেন :

"বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছর-চারেকের ছোটো· ·। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে-বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

"য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে-কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাহারও আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না— কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত।···

"এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম।"

কিন্তু লোকেন পালিতের হেনরি মরলি সম্পর্কে কি ধারণা ছিল জানবার আজ কোনো উপায় নেই। তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে পুরা তিন সেসন পড়েছিলেন।[১৩] কিন্তু তাঁর সেদিনকার স্মৃতি কোথাও লিপিবদ্ধ হয়ে নেই। থাকলে হেনরি মরলি সম্পর্কে হয়তো নতুন অনেক কথা জানা যেত।

পত্রিকা ও 'Examiner' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ডিকেন্সের সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'Household Words', সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে লিখেছেন বলে পত্রিকার নাম ভুল হয়েছে। তারপর ১৮৫৭ সালে তিনি কিংস কলেজে, সান্ধ্যবিভাগে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ থেকে তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে যোগ দেন।

১২ *A Nation in Making* : My first visit to England, p. 21.

১৩ য়ুনিভার্সিটি কলেজের রেজিস্ট্রার লিখেছেন :

Loken Palit was registered as a student for three sessions 1879-80, 1880-81, 1881-82. According to a list of fees for that period, it would seem that he was at College for the whole of the three sessions Oct. to June in each case. —প্রবন্ধ লেখককে লিখিত পত্র, ১৩ই মাঘ ১৩৬৯

মরিস মেটেরলিঙ্ক

১৮৬২ - ১৯৪৯

মেটেরলিঙ্ক

নলিনীকান্ত গুপ্ত

এককালে রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্স্ এবং মেটেরলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯), এই তিনটি নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হত— বলা হত আধুনিক যুগের মিস্টিক-ত্রয়ী। তিনজনই মিস্টিক, তবে তিন ধরণের। মিস্টিকের সাধারণ মোটা অর্থ অতীন্দ্রিয় বা উত্তরেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যাঁদের।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরিচিত প্রখ্যাত প্রাচ্য বা ভারতীয় মিস্টিক। তিনি দেখছেন চিরন্তন স্থির ধ্রুব সত্যকে জ্যোতিকে এই চঞ্চল জগত্যাম্ জগতের মধ্যে। তাঁর বাণী

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর

কিম্বা

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি

ইয়েট্স্ হলেন পাশ্চাত্য মিস্টিক, তার প্রাচীনতর ধারায় কেলটিক মিস্টিক। তাঁর ভাব-কথা-কাহিনী রূপ দিতে চায়, এঁকে তুলতে চায় অদৃশ্য এক অন্তরিক্ষ-জগতের ছবি— বিশ্বের নিভৃতে, পর্দার আড়ালে যেসব শক্তি, যে সত্তা, যে নিয়তি ও কর্মধারা সক্রিয় তাদের পরিচয়— এ হল নেপথ্যের, অন্তর্বর্তী বা মধ্যবর্তী লোকের রহস্যবার্তা, তার মন্ত্র

In all poor foolish things that live a day
Eternal Beauty wandering in her way.

মেটেরলিঙ্ক দিয়েছেন আর-একটা গুপ্ত নিকেতনের ছবি— সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু পৃথিবীর কাছে-কাছে, পৃথিবীর ছায়ার মত যেন। তাঁর ভঙ্গি হেঁয়ালীর, যাদুকরের মন্ত্র— 'সিদ্ধাই'এর মত। রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতীয় মিস্টিক আর ইয়েটস্ যদি কেলটিক মিস্টিক তবে মেটেরলিঙ্ককে বলতে চাই গ্যালিক (Gallic) মিস্টিক— প্রাচীন ফরাসীদের বা ঐ অঞ্চলে একটা যাদুবিদ্যা, একটা যাদুবিদ্যার কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল— সর্বসাধারণ গ্রাম্যলোকদের মধ্যে— যাদুকর মেরলিন (Merlin) তার প্রতিনিধি ছিল— এ একটা পরীদের, ক্ষুদ্রতর বালখিল্য দেবতাদের লীলাখেলা। মেটেরলিঙ্ক নিজেই তাঁর ভাব-ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— একটা সুদীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, করুণ কণ্ঠেই—

Des lys au fond des eaux lointaines
El les mains closes sans retour . . . .[১]

রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য স্থির সত্য ধ্রুব স্থিতি, সহস্র চাঞ্চল্যের মধ্যে বিপর্যয়ের মধ্যে যে অটুট স্তম্ভ—

---

১ সুদূর জলরাশির শেষপ্রান্তে কটি কুমুদ
আর হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ চিরকালের জন্য।

পরং আলম্বনং। ইয়েটস্ বলছেন সেই স্থিতি কি রকমে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে— যে পরম সৌন্দর্য নেচে চলেছে অবিরল প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথে গতি আছে কিন্তু তার সার্থকতা শান্তির মধ্যে, সম বা শমের মধ্যে পৌছে গিয়ে। পাশ্চাত্যের কবি সেই স্থিতিকে পিছনে রেখে গতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছেন। আর মেটেরলিঙ্ক এই দুয়ের মধ্যে এক ছায়াবাজির রহস্য দেখেছেন। আরও উপমার আশ্রয়ে বলতে পারি এই ভাবে— মিস্টিক যদি হয় আলো-আঁধারি কথা, তবে রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ ভারতীয় দৃষ্টি বলব আঁধারের মধ্যে, আঁধারের পারে দেখেছেন আলো'ই, সর্বদা আলোই ফুটে উঠেছে তাঁর চক্ষে। পক্ষান্তরে ইয়েটস্ বা কেলটিক দৃষ্টি আঁধার পার হতে পারে নি— আঁধারের মধ্যে গ্রস্তপ্রায় যে আলো, যে আলো আঁধারের অঙ্গ জড়িয়ে সর্পিল হয়ে রয়েছে কষ্টকৃত গতি নিয়ে। আর মেটেরলিঙ্ক বা আমি যাকে বলছি গ্যালিক দৃষ্টি তাতে যেন আলো নেই, গ্রস্তসূর্য রয়েছে তার আভাস, ছায়া penumbra— তা অনুমানের জিনিস।

মেটেরলিঙ্কের চেতনা দিয়ে জিনিসকে সাক্ষাৎ দেখি না, মাত্র অনুমান করি। অর্ধানুভূতির মেলা— তিনি নিজে বলছেন তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে

Analogues aux songes des morts . . .
J'apporte mon ouvrage

মৃতেরা স্বপ্ন দেখছে যেন। তাই নয়, তিনি দেখেন স্বপ্নেরও স্বপ্ন; কায়া তো নয়, তিনি দেখেন ছায়ারও ছায়া।

মেটেরলিঙ্ক সুতরাং হলেন হাওয়ার কবি। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্রের রাশিগুলি বিভক্ত তিনটি বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম অনুসারে— ক্ষিতি অপ তেজ। কোনো কোনো রাশিতে মাটির, কোনো কোনোটিতে জলের, আর কোনো কোনোটিতে আগুনের ধর্ম। জাতকেরও জন্মরাশি অনুসারে হয় মাটির জলের বা আগুনের ধর্ম। আমার মনে হয় মেটেরলিঙ্ক এই রকমে পেয়েছেন বায়বীয় গুণ— তাঁর কবি-প্রতিভার জন্ম বায়বীয় রাশিতে। উপমাটি আশ্রয় করে তুলনায় বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ হলেন অপোধর্মী, তাঁর কবিত্বে জলের গুণ বা প্রকৃতি— জলের স্বাদুতা, আর জলের তরল স্বচ্ছল গতি।[২] আর আগুনের গুণ শেক্‌সপীয়রে— তেজস্বান তপ্তপ্রাণ।[৩] মেটেরলিঙ্কের ভাব ও ভাষা চলে উড়ে উড়ে,

---

২ স্মরণ করা যেতে পারে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"—

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

অথবা "পরশ-পাথর"—

জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।

৩ স্মরণে আসে পাগল-লীয়রের চীৎকার

You sulph'rous and thought-executing fires
Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbotts,
Singe my white head . . ,

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা চলে স্রোতের মত বয়ে বয়ে, আর শেক্‌সপীয়রের ভাব ও ভাষা চলে জ্বলতে জ্বলতে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়— ক্ষিতির গুণ পেয়েছে কোনো কবি, তবে বলব, কালিদাস। কালিদাসে ক্ষিতির সৌরভ লাভ করেছে স্থিরমূর্তি। যা হোক, এ উপমার অধিকন্তু দোষায় হবে।

বলছিলাম মেটেরলিঙ্কের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা। তাঁর বায়বীয় গুণ— অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে কঠিনতা কাঠিন্য স্থির রূপ নাই; বস্তু আছে, অর্থ আছে পিছনে; কিন্তু তা কেবল একটা আবহাওয়ায় পরিণত হয়েছে, কোন্‌দিক দিয়ে কোথা দিয়ে চলে যায়, জিনিসের এ-পাশ দিয়ে ও-পাশ দিয়ে, ভিতর দিয়ে নির্বিবাদে চলে গিয়েছে— বুদ্ধিগ্রাহ্য সুস্পষ্ট নিরেট নিথর আকার না গড়ে। কথায় যাকে বলা হয় ধরা-ছোঁয়া যায় না কিছু এখানে; অথবা ধরা যায় না, শুধু ছোঁয়া যায়, কারণ বায়ুর স্পর্শগুণ তোমাকে দিয়ে যায়, জানিয়ে যায় তার উপস্থিতি, কিন্তু কি সে, কে সে, কি রূপ, কি আকার তা জানায় না। এক মোনা ভানা (Monna Vanna) নামের নাটকে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন কি চেয়েছিলেন একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য আকার, স্থিররূপ দান করতে।

কিন্তু এ শুধু একটা অনিশ্চিতের জগৎ নয়, একটা অন্ধকার, অন্ধকার না হোক, অন্ততঃ কুয়াশার জগৎ— এবং বিপদের ভয়ের জগৎ। অস্পষ্ট আলো-আঁধারি ছায়ালোকে ছায়ামূর্তি বিচরণ করে এখানে; সহজ মানুষ তার সহজ রূপটি খোলসের মত ফেলে দিয়েছে, চলেছে তার অশরীরী ভাবরূপে; চলেছি আমরা যেন হাতড়ে হাতড়ে অন্ধের মত, চলেছি সংকীর্ণ পথ বেয়ে; উঠে যাই সিঁড়ি বেয়ে— কোথায়? পথ বন্ধ! দরজা বন্ধ! অন্ধকূপ! বন্ধ কুঠুরি! একটা কারুণ্যের ছায়া ঘিরে চার দিক।

মানুষের একটা আকৃতি আছে। এই আকৃতিময় অন্তর্দেহকেই মেটেরলিঙ্ক হয়তো কেবল লক্ষ্য করেছেন। মানুষের অন্তরে আছে আলোক-স্পৃহা, একটা ঊর্ধ্বাশী মিলনবেগ, একটা লোকোত্তর অভীপ্সা। কিন্তু চারি দিকে বাঁধা আট-ঘাট, প্রহরীরা ঘুরে বেড়ায়, ছায়ামূর্তি প্রেতমূর্তি। কিন্তু এরা যে বিপুল শক্তিমান মহাসত্তা বা অতিকায় অসুর দৈত্য দানব, তা নয়। এসব ছোট ছোট জীবেরা খণ্ড সত্তা, কিন্তু মানুষের চেতনায় জীবনের ছায়া ছড়াতে পারে যথেষ্ট, অশুভ অমঙ্গল ঘটাবার পক্ষে বেশ সুনিপুণ। ট্রাজেডির, নিবিড় কারুণ্যের, সৃষ্টি এই রকমেই হয়েছে এখানে।

মেটেরলিঙ্কের দুটি কবিতা

কবিতা বলছি, কিন্তু আসলে গান,— দুটিই। তবে এই গানের ভিতর দিয়েই কবির প্রতিভাবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মনে হয়। যদিও মেটেরলিঙ্ক নাট্যকার বলে প্রখ্যাত, তবু নাটকেও রসসঞ্চার করেছে, পরিবেশ দিয়েছে গানের, অর্থাৎ গীতিকাব্যে স্পন্দ-অন্তরের, অন্তরাত্মার একটা নিভৃত আকৃতি তাঁর সৃষ্টির উৎস।

প্রথমটি এই:

তিনটি বোন তারা, অন্ধ—
আশা রাখি তবু—

কিম্বা ওথেলোর অনুরূপ কণ্ঠ

Blow me about in winds, roast me in sulphur,
Wash me in steep-down gulfs of liquid fire . . .

তিনটি বোন তারা, অন্ধ,
সোনার দীপ নিয়ে চলে তারা।

ওঠে প্রাসাদের চূড়ায়—
তারা, তোমরা, আমরা—
ওঠে প্রাসাদের চূড়ায়,
অপেক্ষা করে থাকে সাতদিন।

ঐ! প্রথমটি বলে—
আশা রাখি তবু—
ঐ! বলে প্রথমটি,
আলোরা কথা বলে যেন শুনছি।

ঐ! বলে দ্বিতীয়টি—
তারা, তোমরা, আমরা—
ঐ! বলে দ্বিতীয়টি,
রাজা উঠছেন সিঁড়ি বেয়ে।

না! সবচেয়ে পুণ্যবতী যে সে বলল—
আশা রাখি তবু—
না! সবচেয়ে পুণ্যবতী যে সে বলল—
নিবে গেল সব দীপ…[৪]

---

৪ Les trois soeurs aveugles,
(Espérons encore).
Les trois soeurs aveugles,
Ont leurs lampes d'or.

Montent à la tour,
(Elles, vous et nous).
Moment à la tour,
Attendent sept jours.

Ah! dit la première,
(Espérons encore).
Ah! dit la première,
J'entends nos lumières.

প্রাসাদের চূড়ায় উঠছে, এক কোণের এক সিঁড়ি বেয়ে—অন্ধকারে অন্ধ তিনটি মেয়ে, তিনটি বোন। অন্ধকার? অন্ধ? কিন্তু আশা যে নেই তা বোলো না। তাদের হাতে রয়েছে সোনার দীপ। কারা তারা? তোমরা, আমরা, তারা! চলেছে রাজার সাক্ষাতে। সাত দিন ধরে অপেক্ষা করলে অন্ধকারে অন্ধেরা। শোনা গেল, ঐ বুঝি এলেন রাজা। না, না, ভুল—আর কে হবে, মিথ্যা রাজা। প্রমাণ? আলো গেল নিবে। আলো নিবে গেল? আশা নেই, না, আশা রেখো—

চিরদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে।

রূপকটি, কাহিনীটি ভাঙতে চাই না—রসভঙ্গ হবে, মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তবুও একটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির উল্লেখ না করে পারছি না। তিনটি অন্ধ আমরাই সকলে, মানুষের তিনটি অঙ্গ, তিনটি চেতনার ধারা—দেহ-প্রাণ-মন, পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-দ্যুলোক। সোনার দীপ কথা বলে, অন্তশ্চেতনার জ্যোতির্ময় বাণী—রাজা তো আমাদের দয়িত, শ্রীভগবান।

দ্বিতীয় কবিতাটি ভাবে-ভঙ্গিমায় অনুরূপ যেন যমজ-ভগ্নী।

একদিন যদি ফিরে আসে
কি বলতে হবে তাকে?
—বল, তার জন্যে অপেক্ষায় ছিল একজন
মরণ-পণ করে…

যদি আবার জিজ্ঞাসা করে,
আমাকে চিনতে না পেরে?
—বোনটির মত তার সঙ্গে কথা বোলো,
বেদনা-কাতর বোধ হয় সে…

যদি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তুমি!
কি বলব তাকে?
—এই সোনার আংটি দিয়ো তাকে;
কিছু বোলো না…

Ah! dit la seconde,
(Elles, vous et nous).
Ah! dit la seconde,
C'est le roi qui monte.

Non, dit la plus sainte,
(Espérons encore).
Non, dit la plus sainte,
Elles se sont éteintes . . .

যদি জানতে চায়
ঘর শূন্য কেন ?
— দেখাবে তাকে দীপ নিবে গিয়েছে
আর দুয়ার খোলা রয়েছে।

তখন যদি আরো প্রশ্ন করে
শেষ মুহূর্তে ?
— বলবে আমি হেসেছিলাম,
তাকে যাতে চোখের জল না ফেলতে হয়।[৫]

এখানেও দয়িতের অপেক্ষায় দয়িতা অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। দয়িত যে আসে না। কিন্তু যদি আসে তবে কি হয় ? আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রীরাধার বাসকসজ্জা, কথা শ্রীরাধা আর ললিতা-সখীতে। ভক্ত ভগবানের জন্য কাঁদেন, ভগবানও কি ভক্তের জন্য কাঁদেন না ? খ্রীষ্টীয় আখ্যানে বলা হয় রাজা-ভগবান আসেন রাত্রিতে— গভীর রাত্রিতে, অন্ধকারে অন্ধকারে চোরের মতন; মানুষ,

---

Et s'il revenait un jour
Que faut-il lui dire ?
— Dites-lui qu'on l'attendit
Jusqu'a s'en mourir . . .

Et s'il m'interroge encore
Sans me réconnaître ?
— Parlez-lui come une soeur
Il souffre peut-être . . .

Et s'il demande où vous êtes
Que faut-il répondre ?
— Donnez-lui mon anneau d'or
Sans rien lui répondre . . .

Et s'il veut savoir pourquoi
La salle est déserte ?
— Montrez-lui la lampe éteinte
Et la porte ouverte . . .

Et s'il m'interroge alors
Sur la dernière heure ?
— Dites-lui que j'ai souri
De peur qu'il ne pleure . . .

মানুষের অন্তরাত্মা যদি সজাগ-সতর্ক না থাকে তবে তিনি ফিরে যান দুঃখভরে। মানুষের অন্তরাত্মার অভিসারে দূত যে, সহায় যে, তাকে খ্রীষ্টীয়েরা নাম দেন এঞ্জেল, পারাক্লীট (Paraclete)। মেটেরলিঙ্ক মানুষের হাতে একটি কবিতায় দিয়েছেন সোনার দীপ, আর-একটিতে দিয়েছেন সোনার আংটি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মার যে গাঢ় অবিচ্ছেদ্য মধুর বন্ধন, তাকে অনেক ক্ষেত্রে সোনার শৃঙ্খল— গাঁটছড়া— নাম দেওয়া হয়েছে।

অন্তরাত্মার অভিসারের কথা ও কাহিনীই মেটেরলিঙ্ক চিত্রিত করেছেন তাঁর সুকোমল যাদুকর হস্তস্পর্শ দিয়ে। তাঁর মোটের উপর কথাটা এই— মানুষের অন্তর্জীবনের অভিসার চলে একটা অজ্ঞাত অনিশ্চিত বিপদাকীর্ণ আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে; বাহিরে অন্ধকার, প্রায় অন্ধকার হাতড়ে চলতে হয়। পথ সংকীর্ণ, বদ্ধ কক্ষ, রুদ্ধ দ্বার— বিভীষিকার হাতছানি। মানুষের অন্তরের আলো জ্বলে কি না-জ্বলে— শিশুর চেতনা, দৃঢ়স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। মেটেরলিঙ্ক বলছেন এই আদি উন্মেষপ্রয়াসী আস্পৃহার কথা।

ট্রাজেডির, পরম কারুণ্যের, ভিয়ানে সিক্তিত তাঁর বাক্য, তাঁর ভাব, তাঁর আখ্যান। তবে কারুণ্য হলেও তা ট্রাজেডি ঠিক নয়— নিভৃতে কোথাও একটা আশার রেশ রয়েছে। অন্তরাত্মা করুণ প্রৈতিই রেখে যায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রোজ্জ্বল রেখা, একটা সার্থকতার আস্বাদ।

চেখভের নাটক

শুভময় ঘোষ

চেখভের "চাইকা" (গাং-চিল), "ভানিয়া মামা" আর "তিন বোন" নিজেরাও যেন তিনটি বোন। ক্ষীণাঙ্গী তারা। স্বল্প তাদের পরিসর—একটি বাড়ি, একটি বাগান, কোথাও বা ছোট্ট একটি হ্রদ আর আকাশভরা একটি চাঁদ। সবটাই তার অনুচ্চ দীর্ঘশ্বাস। সেই দীর্ঘনিশ্বাস স্বতঃ-উৎসারিত—তাঁর নাটকের অল্প কয়টি পাতায় এমন একটি পরিবেশ গড়েছেন চেখভ। এই পরিবেশে কেউ গলা ছেড়ে কাঁদে না, কেউ পাগল হয় না। যে আত্মহত্যা করল তাকে আগের মুহূর্তে দেখে বোঝার উপায় থাকে না সে এতদূর ভগ্নহৃদয়।

এই তিনটি নাটকই হল যত অপ্রয়োজনীয় মানুষের ইতিহাস। যে পরিবেশে তাদের জীবনযাত্রা সেই পরিবেশটিই ঘুণে-ধরা। বিরাট রাশিয়ার এক কোণের এই সংকীর্ণ জীবনে মানুষের সব শক্তির ঘটে অপচয়। যে গুণী সেও সেখানে হয় নিরর্থক। যেমন "চাইকা"র ত্রেপ্লভ বা "ভানিয়া মামা"র ভইনিৎস্কি—যার পরিচয়ে নাটকটির নামকরণ। গর্কি লিখেছেন "আমাদের এই দীন আলোহীন জীবন আর তার মানুষগুলোর জন্য ভয়" জাগিয়ে তোলে এই নাটকটি।

চেখভের এই তিনটি নাটক সেই সঙ্গে তাঁর "চেরীবাগানে"ও—যদিও তার মর্ম অন্য তিনটি থেকে স্বতন্ত্র—রয়েছে ব্যর্থতা আর স্বপ্নের স্বাক্ষর।

ব্যর্থতা নানা রকমের। প্রেম, বিবাহিত জীবন, বিগতকে মেনে নিতে না পারা, ভুল মানুষ বা আদর্শকে পূজো করা, এক ধরণের মূঢ়তা—যেখানে মানুষ নিজের জীবনের ব্যর্থতাটাও বুঝতে পারে না। আর এ সবেরই কারণ সেই ব্যাপক জীবনধারা যা চোরাবালির মতো ধীরে ধীরে গ্রাস করে মানুষকে। ভানিয়া মামা বা ভইনিৎস্কির অনেক গুণ নষ্ট হয় মূর্খ সেরিব্রিয়াকভকে প্রতিভাধর মনে করে তার জন্য খেটে। য়েলেনা আন্দ্রিয়েভনা সেই প্রতিভার ছলনায় ভুলে তার যৌবন ও সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটায়। সরল সহজ সোনিয়া তার অসফল প্রেম নিয়ে অসুখী রয়ে যায়, তার জীবন বিকশিত হতে পায় না। ডাক্তার আস্ত্রোভ বোঝে এই জীবনযাত্রা অন্যায়। তার আছে স্বপ্ন দেখার শক্তি, সামগ্রিক জীবনের উন্নতির কাজে সাময়িক উৎসাহ। কিন্তু তবু তার পরিণতি হল—পরিবেশের সঙ্গে খাপছাড়া এক বিরক্ত চরিত্র। য়েলেনা আন্দ্রিয়েভনার সৌন্দর্য এই পরিবেশে কাউকে আনন্দ দেয় না, নিজেকেও না। বরং ভইনিৎস্কি, আস্ত্রভ আর তার নিজের মনে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে সবার দুঃখই বাড়ায়। "চাইকা"র ত্রেপ্লভের ছিল সাহিত্য ক্ষমতা। সে চেয়েছে স্বাধীন হতে, নতুন কিছু করতে। কিন্তু সে তার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মায়ের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় না। সাহিত্যেও সে চলে নতুনত্বের বদলে বাঁধা পথে। তার মা আর্কাদিনা অভিনেত্রী-জীবন শেষ করে এসেও মেনে নিতে পারে না সে বিগতা। আর তার ছেলে এখন স্বতন্ত্র সুপরিণত। তার ঈর্ষা, পুত্র প্রেম কারণ হয় বহুজনের বিনষ্টির। "তিন বোন" নাটকে নেই "চাইকা" বা "ভানিয়া মামা"র তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্ব। নাতাশা, মাশা আর ইরিনার সেখানে বাস ব্যর্থতা আর রিক্ততার গোধূলি ছায়ায়। তাদের জীবনের যেন না আছে কোনো সূচনা, না কোনো

পরিণতি। এক জায়গায় বসে থেকে তাদের যেন কী অন্তহীন প্রতীক্ষা—প্রেম, নতুন জীবন, সুখের প্রতীক্ষা। তারা জীবনের মাঝখানে এসে থেমে আছে, আর তাই থাকবে। যেমন থাকবে "ভানিয়া মামা"র ভইনিৎস্কি, সোনিয়া, তেলেগিনরা। নাটকটির শেষে সেরিব্রিয়াকভরা চলে যাবার পর একাধিকবার উচ্চারিত "ওরা চলে গেল" কথাটির প্রকৃত অর্থ হল—ওরা তাও গেল কোথাও, ভালো হোক মন্দ হোক ওদের জীবনে একটা গতি আছে, আমরা নিশ্চল জড়, এই সংকীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ। "চেরীবাগান" নাটকের শেষে ভুল-বশত অন্ধকার ঘরে আটক হয়ে রইল রাভেনস্কায়ার পঙ্গু বৃদ্ধ ভৃত্যটি। সেখানেই তার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটল। "তিন বোন" "ভানিয়া মামা" নাটকের পরিত্যক্তরা আর "চেরীবাগানে"র ঐ বৃদ্ধ ভৃত্যের ভাগ্য আসলে একই।

চেখভের এই ছায়ামানুষগুলো (অবশ্য লেখকের চিত্রণগুণে তারা অত্যন্ত বাস্তব) সবাই খুবই সাধারণ। তারা একই সঙ্গে ভালো ও মন্দ। তাদের ইতিহাস যেমন তাৎপর্যময় তেমনি অর্থহীন। প্রত্যেকে তারা একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু এক সামগ্রিক নিরর্থকতার অংশ। তাদের সবার একান্ত কামনা "হেথা নয়, অন্য কোনখানে"। এক অন্য জীবন। কিন্তু তাদের ভাগ্য হল এক আলোছাড়া শূন্যতায় ডুবে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব ছন্নছাড়া লোকগুলোর পরিণতির কথা তাঁর নাটকে চেখভ বলেন নি। কারণ তাঁর মতে—নাটকের জীবন শেষ হয় না। শেষ যবনিকাপাতের পরও তা অনুসৃত হয় দর্শকদের চিন্তায়, জিজ্ঞাসায়।

ঘটনা আর সংলাপের আপাত-উদ্দেশ্যহীনতা চেখভের নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। বড় বড় ঘটনা তাঁর নাটকেও আছে—গুলি করা, ডুয়েল লড়া, অগ্নিকাণ্ড, আত্মহত্যা। কিন্তু সেসব প্রায়ই ঘটছে আড়ালে। যেন ওসবের প্রতি দর্শকদের বেশি মন দেবার প্রয়োজন নেই—এটাই নাট্যকারের বক্তব্য। তিনি বরং চান আমরা বেশি নজর দিই যত আপাত-তুচ্ছ জিনিসে। যেমন "তিন বোনে"র প্রথম অঙ্কে খাবার আসরে লোহার লাটু বা "চাইকা"র সেই মরা গাং-চিলটার দিকে। একমাত্র "ভানিয়া মামা" নাটকে ভইনিৎস্কি স্টেজের উপর সেরিব্রিয়াকভের দিকে গুলি করে। কিন্তু সেখানেও ঘটনাটা যেন একটা তুচ্ছ বোকামি মাত্র যা ভইনিৎস্কির করা উচিত ছিল না। এর চেয়ে বেশি কিছু না।

চেখভের নাটকের সংলাপেও ঠিক এইটেই ঘটেছে। সেখানে অত্যন্ত ঘরোয়া আলাপ। আর তাতে "অপ্রয়োজনীয়টাই" হল প্রধান। যত "ফাঁকা" "অর্থহীন" আলাপেই ফুটে ওঠে কুশীলবদের জীবনের পরিচয়। তুচ্ছ কথার আড়ালেই তারা লুকিয়ে রাখে মনের আসল কথাটা। সোনিয়া তার বাবা সেরিব্রিয়াকভকে বলছে যে তাঁর মনে রাখা উচিত সে আর তার ভানিয়া মামা তাঁর জন্য "সারা রাত, সারা রাত" ধরে খেটেছে। এই সাধারণ কথাটার পরেই সে যখন বলে "কী বলছি জানিনা, ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু বাবা তোমার আমাদের বোঝা উচিত।" তখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সেরিব্রিয়াকভের জন্য নষ্ট হওয়া সোনিয়ার জীবনের গভীর দুঃখ। চেখভের এই অনুক্ত কথাগুলো বোঝা চাই যেমন দর্শকদের তেমনি কুশীলবদেরও। ছোটখাট কয়েকটা কথা, তার মধ্যবর্তী নিস্তব্ধতা আর পরিবেশ যে কী সুন্দর নাটকীয়তা গড়ে তুলতে পারে তা দেখিয়েছেন স্তানিস্লাভস্কি "চাইকা"র দৃশ্যবর্ণনার সাহায্যে।

সন্ধ্যা, চাঁদ উঠেছে, দুটি মানুষ—পুরুষ ও নারী—উদ্দেশ্যহীন কয়েকটি কথা তাদের মুখে, বেশ বোঝা

যায় নিজেদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করছে না (চেখভের লোকেরা এমন কাণ্ড প্রায়ই করে)। দূরে পিয়ানোয় খেলো ওঅল্‌জের সুর যা মনে পড়িয়ে দেয় আত্মিক নিঃস্বতার কথা, চার পাশের হীনতা ও সংকীর্ণতার কথা। হঠাৎ— আকস্মিক চীৎকার, কাউকে ভালোবেসেছে যে এমন একটি মেয়ের উৎপীড়িত হৃদয়ের গভীর তল থেকে তা উৎসারিত। তারপর— একটি মাত্র ছোট্ট কথা, আর্তি···'পারিনা—পারিনা—আর পারিনা।'

এই দৃশ্যে কোথাও কিছুই রীতি অনুযায়ী বলা হয়নি কিন্তু তাতেই ফুটে উঠেছে নানা স্মৃতি, দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

একটি তরুণ, সে প্রেমে পড়েছে কিন্তু সাফল্যের কোনো আশা নেই—কিছু করার না পেয়েই, না ভেবে চিন্তে হঠাৎ তার প্রিয়ার পায়ের কাছে সে রেখে দিল মরা একটা সুন্দর সাদা গাং-চিল। জীবনের এক অত্যাশ্চর্য প্রতীক। কিম্বা এক নীরস শিক্ষকের সেই একঘেয়ে কাজ, বউয়ের কাছে এসে সেই একই কথা, যা ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়—

'বাড়ি চল···বাচ্চাটা কাঁদছে'।

এ হল রিয়ালিজম।

তারপর হঠাৎ ঝগড়াটে মায়ের সঙ্গে আদর্শবাদী পুত্রের বাজারী ঝগড়ার বিরক্তিকর দৃশ্য।

প্রায় ন্যাচারালিজম।

শেষে: হেমন্তের সন্ধ্যা, জানলায় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ, নিস্তব্ধতা, তাস খেলা আর দূরে—শোপাঁর করুণ ওঅল্‌জ্; তারপর তার মিলিয়ে যাওয়া। এর পর গুলি করা···জীবন শেষ।

এ তো হল ইম্‌প্রেশিনিজ্‌ম্।

এই কারণেই চেখভের নাটক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের অভিনয়কলা। তাকে রূপ দিয়েছিলেন স্তানিস্লাভস্কি আর নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কো। চেখভের নাটক অভিনয়ের উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত না হলে কী ঘটে তা জানা যাবে "চাইকা"র প্রথম অভিনয়ের ইতিহাস স্মরণ করলে।

পিটারবুর্গের একটি থিয়েটারে বহু প্রতিভাবান অভিনেতার সমাবেশে "চাইকা" প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৯৬ সালে।

"পর্দা উঠল। একেবারে গোড়াতেই মাশা মেদ্‌ভেদেঙ্কোকে নস্যিটা শুঁকে দেখার প্রস্তাব জানিয়ে 'কৃতজ্ঞ থাকবেন' বলা মাত্রই প্রেক্ষাঘরে হাসির শব্দ। সোরিনের ভূমিকায় দাভিদভকে যখন ঠেলাগাড়ি করে স্টেজে আনা হল দর্শকরা তখন হেসে অস্থির। কেউ কেউ অবশ্য বেজায়গায় হাসি থামাতে বলেছিল। কিন্তু দর্শকদের 'খুশ মেজাজ'কে স্তব্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা সব কিছুতেই হাসে। সোরিনের অত্যন্ত সাধারণ কথা 'তোমার গলাটা ক্ষীণ কিন্তু বিশ্রী', তাতেও হাসি। ভার্লামোভা প্রস্থানের সময় বলে গেল '১৮৭৩ সালে' তবুও হাসি।

নীনার ভূমিকায় ভেরা কমিসারঝেভস্কায়া যখন শুরু করলেন: 'লোকেরা, সিংহেরা, ঈগলপাখিরা আর তিমিরা, সশৃঙ্গ হরিণেরা' দর্শকদের তখন কী হাসির ঘটা।"

সামান্য আর অসামান্য চেখভের নাটকে মিলেমিশে আছে। তার একটি থেকে আর-একটিতে স্বচ্ছন্দ ও আকস্মিক পদক্ষেপ দর্শকদের ধাঁধায় ফেলে। ছোটখাট জিনিস চেখভের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্তানিস্লাভস্কি "চাইকা" মঞ্চস্থ করার পর চেখভ তাঁর মত জানান এইভাবে, "অপূর্ব, শুনছেন, অপূর্ব! কেবল ছেঁড়া চটি আর চেককাটা ট্রাউজার্সের প্রয়োজন।" স্তানিস্লাভস্কি প্রথমে বুঝতে পারেন নি কথাটা ঠাট্টা করে বলা কিনা। তিনি ত্রিগোরিনের ভূমিকায় পরেছেন অত্যন্ত কেতাদুরস্ত সাজ। কারণ ত্রিগোরিন জনপ্রিয় লেখক, মেয়েদের প্রিয়। বছর-খানেকেরও পরে স্তানিস্লাভস্কি হঠাৎ বুঝতে পারেন চেখভের কথার মর্ম। তরুণী নীনা তার প্রতি আকৃষ্ট ত্রিগোরিন লেখক বলে। সে মানুষটা কেমন, সুন্দর কি অসুন্দর এসবের কোনো দামই নীনার কাছে নেই।

"ভানিয়া মামা" নাটকে পরের উপর নির্ভরশীল তেলেগিন বলছে "কতদিন হল আমাদের এখানে মুড্‌ল্‌হুপ হয়না।" এখন একটা সাধারণ কথার পরেই সে বলে, "জানেন মোরিনা ত্রিমোফিয়েভনা, আজ সকালবেলা গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। দোকানদারটা হঠাৎ বলে উঠল 'আরে ওহে, দিব্যি যে গেঁড়ে বসেছ।' এত খারাপ লাগল আমার।" নিঃস্ব নিরুপায় তেলেগিন তার জীবনের দুঃখ প্রকাশ করে এত সহজ ভাবে।

চেখভের নাটকে কুশীলবরা প্রায়ই একে অন্যের কথায় সাড়া দেয়না। যেন অন্যের কথা তারা শোনেই না। একের কথার উত্তরে অন্যে যা বলে তা সম্পূর্ণ আর-এক কথা। কিন্তু তবু তারা পরস্পরকে ঠিকই বোঝে। তাই সংলাপের সংগতির কোনো দরকার হয়না চেখভের। আর সেটা তাঁর নাটকের মর্মস্পর্শিতার অন্যতম কারণ। এই "অসংগতি" এক-এক সময় যে কী সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ "তিন বোন" নাটকের সেই অংশটি যেখানে তিন বোন তারা নিজের নিজের মনের ব্যথা জানাচ্ছে। কেউ তারা অপরের কথায় মন দিচ্ছেনা। অথচ তাদের প্রত্যেকের কথা সহানুভূতির এক সূক্ষ্ম সুতোয় সংযুক্ত।

মানুষের মনের নানা ভাবের আলোছায়া বয়ে যায় চেখভের নাটকে। ভাবের সূক্ষ্ম বদল ঘটিয়ে চেখভ নাটকের গতিকে টেনে নিয়ে চলেন, সেইসঙ্গে দর্শকমনকেও। "এই প্রতিটি ভাবের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মনে হয় যেন অত্যন্ত পরিচিত এক হীনতার জগতে বেঁচে আছি। মানুষের প্রাণ সেখানে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে অবস্থা থেকে বেরতে চায়। আর ঠিক সেই সময়েই, আমাদের অলক্ষ্যে, চেখভ তাঁর স্বপ্নটি প্রকাশ করেন।" "ভানিয়া মামা" নাটকে য়েলেনা আন্দ্রেয়েভনা আস্ত্রভের প্রতি তার আকর্ষণ প্রকাশ করার মুহূর্তেই যেন নিজের জীবনের সংকীর্ণতায় হাঁপিয়ে উঠে বলে "উত্তেজিত পাখির মতো যদি উড়ে যেতে পারতাম তোমাদের সবার কাছ থেকে। তোমাদের ঘুমছায়া চেহারা কথাবার্তা সব ছেড়ে। তোমরাও যে পৃথিবীতে আছ সে কথাটা যদি ভুলতে পারতাম।"

য়েলেনা আন্দ্রিয়েভনার ঐ ওড়ার নেশায় মাতাল পাখি আসলে এক নতুন জগৎ, উদার সুন্দর জীবনের স্বপ্নের প্রতীক। যেখানে অবাধে ডানা মেলে উড়তে পারে চেখভের চাইকা। স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন, "ভাবী জীবন নিয়ে চেখভের স্বপ্ন, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নয়। তা মহৎ, উদার, বিরাট। তাতে রয়েছে বিশ্বজনীনতা, মানবজাতির কথা, তাই তার জন্য প্রয়োজন সারা পৃথিবীটা, 'তিন আর্শিন জমি নয়'।" তাঁর স্বপ্নকে কী ভাবে রূপ দেওয়া যায় সে বিষয়ে চেখভ প্রায় নীরব। তবে আস্ত্রভের কথায়, আর "চেরীবাগানে"র লোপাখিনের কর্মদক্ষ চরিত্রে বোঝা যায় কাজ আর যন্ত্রশিল্প এ দুটির দ্বারা চেখভ নতুন জগৎ গড়ার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

চেখভের মৃত্যুর একবছর পর রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব ঘটে (১৯০৫)। কিন্তু তার মেঘ চেখভ আগেই দেখেছিলেন। "তিন বোন" নাটকে আছে "আসন্ন এক প্রবল ঝঞ্ঝা"র কথা। চেখভের নাটকের লোকেরা দেশকে ভালোবাসে। মানুষকে ভালোবাসে। তারা যখন নিজের সুখের কথা বলে তখন তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে সব মানুষের সুখের আশা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা চায়না সেই "প্রবল ঝঞ্ঝা"কে এগিয়ে আনতে যার ফলে তাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। তারা ধরে নিয়েছে "সুখ আমাদের ভাগ্যে নেই, থাকতে পারে না। আমাদের কেবল কাজ করতে হবে, কাজ করে যেতে হবে। সুখ রয়েছে আমাদের দূর বংশধরদের ভাগ্যে।" —ভের্শেনিন, তিন বোন

রাশিয়ার এক-এক কোণে বিচ্ছিন্ন আবদ্ধ এই মানুষগুলোর চরম অসাড়তা চেখভকে ব্যথিত করেছিল। সেইসঙ্গে তাদের অসহায়তাও তিনি বুঝেছিলেন। কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে কখনো গভীর সমবেদনায় চেখভ ঐ মানুষগুলোকে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর গল্পে, নাটকে। যাতে তারা দেখতে পায় নিজেদের। আর তার ফলে ঘৃনায় লজ্জায় সক্রিয় সচেতন হয়ে ওঠে।

চেখভের নাটকে প্রকৃতির বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রকৃতি সেখানে নাটকের ঘটনায় অংশ নেয়। কুশীলবদের মনে যে আবেগের ছায়াপাত ঘটে তার সঙ্গে মিল রেখে চলে। য়েলেনা আন্দ্রিয়েভনার জন্য আনা ভানিয়া মামার সেই "হেমন্তের সুন্দর বিষন্ন গোলাপ" আর সোনিয়ার কণ্ঠে সেই কথা-ক'টির প্রসঙ্গহীন পুনরাবৃত্তি অনেক কিছু প্রকাশ করে যা শুধু কথায় অসম্ভব। সে কথার রেশ মনের গভীরে ছড়িয়ে যায় তন্দ্রার মতো। ভইনিৎস্কি, সোনিয়া আর য়েলেনা আন্দ্রিয়েভনার ব্যর্থ জীবনের দুঃখে ভরে তোলে এই দৃশ্যটি। "চাইকা"র প্রারম্ভের শান্ত নীল হ্রদ আর সন্ধ্যার চাঁদ হল নীনার সুন্দর স্বপ্নের প্রতীক। শেষ দৃশ্যে সেই শান্ত হ্রদের বুকে নামে বৃষ্টির কালো অন্ধকার। নীনা তখন নিঃশেষ, ত্রেপ্‌লভ আত্মঘাতী। আর্কাদিনার বাড়ির ভিতরে কী ঘটছে তা যেন সারাক্ষণ লক্ষ্য করে গেছে ঐ শান্ত হ্রদ আর আকাশ। প্রকৃতির এই অলক্ষ্য প্রভাব আছে "তিন বোনের" ঋজু দীর্ঘ বার্চগাছে। শেষ দৃশ্যে তিন বোন তারা পড়ে আছে পরিত্যক্তা, শূন্য হৃদয়— তাদের মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে পিছনে-দাঁড়ানো বাকল-ওঠা সাদা বার্চগাছগুলো। "চেরীবাগানে" জানলার কাছে ফুলে-ভরা চেরীগাছ আর চেরীবাগান তো নাটকের কুশীলবদেরই অন্তর্গত। বাগানটিকে নিলামের হাত থেকে বাঁচাতে না পেরে রাভেনস্কায়া যখন চলে যাচ্ছে তখনকার সেই করুণ মুহূর্তটি করুণতর হয়ে ওঠে কুড়ুলের শব্দে চেরীবাগানের উপস্থিতি আর তার ভাগ্যের ইশারায়।

চেখভের নাটকের বেলায় কমেডি বা ট্রাজেডির বাঁধাধরা বিশেষণ অপ্রযোজ্য। তাঁর নাটকে ব্যর্থতার কাহিনী থাকলেও চেখভ তাতে সূক্ষ্মহাতে কিন্তু জোর দিয়েই প্রকাশ করেছেন উদার সুন্দর জীবনের আশা। নানা তুচ্ছতা ও হীনতায় ঢেকে রেখে সেই স্বপ্ন আর আশাকে চেখভ এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে তার প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

চেখভের নতুন জগতের স্বপ্নটি ধরতে না পারলে তাঁকে ভুল বোঝা সম্ভব। রাশিয়ার বাইরে "চেরীবাগানে"র প্রযোজনায় জোর দেওয়া হয় রাভেনস্কায়ার ভগ্নকাননের দুঃখের প্রতি। কিন্তু চেখভকে ভালো করে চিনলে বোঝা যায় চেরীবাগানের দুঃখটা মোটেই আসল কথা নয়। আর তখন বেশি করে নজরে পড়ে লোপাখিন, আন্না আর ত্রফিমভ। সেইসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট হয় যে

লোপাখিনের কাজ হল পুরনো জীর্ণ জীবনকে ভেঙে ফেলা। আন্না আর ত্রফিমভের কণ্ঠে "নতুন জীবন"কে আহ্বান রাভেনস্কায়ার দীর্ঘশ্বাসকে ছাপিয়ে ওঠে। স্তানিস্লাভ্স্কির মত হল চেখভের নাটক অভিনয়ের সময় জোর দিতে হবে তার 'লেইটমোটিফ্'এর উপর। আর সেই 'লেইটমোটিফ্' হল "চেরীবাগানে" আন্নার মুখের এই কথাটি—"সুস্বাগতম্ নতুন জীবন"।

শান্তিনিকেতন

ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন

পরবর্তী আখ্যানটি[১] বোলপুর শান্তিনিকেতনে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য লেখা। ছাত্রেরা চাঁদের আলোতে গাছের তলায় বসে এই আখ্যানটি শুনত। যিনি আখ্যানটি সংকলন করেছিলেন তিনিও বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং আখ্যানটির তাৎপর্য বুঝতে হলে মুখবন্ধ হিসেবে বিদ্যালয়টির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপযুক্ত হবে বলেই মনে করি।

প্রথমদর্শনে কোনো স্থান সম্বন্ধে যে ধারণা হয় সেটাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তাই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বোলপুরে আমার প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আরম্ভ করি।

বোলপুর কলকাতা থেকে প্রায় এক শো মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং শহরের বিক্ষিপ্ত জীবনধারা বিদ্যালয়টিকে যেমন স্পর্শ করতে পারে নি, তেমনি অন্যদিকে আবার বিদগ্ধসমাজের কেন্দ্রস্থলের অনতিদূরে ব'লে তার বিচিত্র কর্মের প্রবর্তনাও বিদ্যালয়ের আয়ত্তের মধ্যে।

যখন স্টেশনে পৌঁছলাম ঠিক তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বাংলাদেশে এ সময়টির নাম 'গোধূলি'। এই নামের মধ্যে সময়টির চিত্ররূপ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে ; এই সময়টিতে ধুলোভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গোরুগুলি মন্থরগতিতে ঘরে ফিরে আসতে থাকে, তাদের পা থেকে ওঠা ধুলোর সোনালি কুয়াশার আড়ালে সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যায়। একজন অধ্যাপক ও চারজন আদ্যবিভাগের ছাত্র আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন থেকে নামিয়ে আমার জিনিসপত্র তাঁরা একটি গোরুর গাড়িতে নিয়ে তুললেন। গোরুর গাড়িটি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তাঁরা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন। আমি সবেমাত্র ইংলণ্ড থেকে এসেছি। সেখানে তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। গোরুর গাড়িতে বসে বসে তাঁরই সম্বন্ধে আমাদের কথাবার্তা হতে লাগল। বিদ্যালয়টি একখণ্ড উঁচু জমির উপরে অবস্থিত। তাই চারদিকে বহুদূর থেকে তার আলোগুলো দেখা যায়। এগিয়ে আসতে আসতে ওঁরা আমাকে চিনিয়ে দিলেন : এই পথ দিয়ে হাঁটতে গুরুদেব ভালোবাসেন, চাঁদনি রাতে ওই গাছগুলির নীচে উনি পায়চারি করে বেড়ান। ওঁদের মুখের এই টুকরো-টুকরো কথাগুলি শুনে আমার মনে হতে লাগল, আমি এই বিদ্যালয়ে সাধারণ দর্শনার্থী হিসেবে আসি নি, আমি যেন কোনো সাধকের পুণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রায় এসেছি। আমাদের কথা আপনা থেকেই থেমে গিয়েছিল, অতিথিভবনের বারান্দায় এসে উপস্থিত হবার আগে পর্যন্ত আর কেউ কথা বলি নি। শুনলাম, ওই বারান্দায় বসেই কবি অনেকগুলো গান রচনা করেছেন। সন্ধ্যাতারা সবেমাত্র আকাশে উঠেছে। বিদ্যালয়ের চারদিকে সারি সারি গাছ, তাদের পাতায় একফালি চাঁদের মৃদু আলো ঝরে পড়ছিল। দু জন ছাত্র আমাকে নিয়ে ছাদে গেল। সেখানে বসে কবির রচিত একটি গান গেয়ে যখন তারা চলে গেল তখন শুধু আমি আর যে অধ্যাপকটি[২]

---

১ সতীশচন্দ্র রায় রচিত 'গুরুদক্ষিণা'

২ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

আমাকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন তিনি ছাড়া আর কেউ রইল না। তাঁর সঙ্গেই আমার সেই শান্ত সন্ধ্যাটি কাটল। যে পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়টির সূচনা হয় তিনি তাঁদেরই অন্যতম। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে এই স্থানের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নেবার সহায়তা হল। এই বিদ্যালয়ের কাছে এঁর ঋণ অপরিসীম। তাই আমেরিকার কলেজে পাঠ সমাপ্ত করে এসে ইনি এই বিদ্যালয়ের সেবায়ই জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে কবির আদর্শ নিয়ে আমাদের আলোচনা হল। ছাত্রেরা সান্ধ্য আহার শেষ ক'রে ছাত্রবাসে ফিরে আসার পর তাদের কলরব থেমে গেল। সেই শান্ত নির্জনতা হঠাৎ গানের সুরে বেজে উঠল। ছেলের দল গান গাইছিল। প্রত্যেক রাত্রিতে শুতে যাবার আগে তারা কবির রচিত একটি গান গায়। আমরা যে বাড়িতে বসে ছিলাম গানের দল ধীরে ধীরে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। তার পর আবার তারা ফিরে গেল। গানের সুর ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। তারার আলোতে পাহাড়ের উপর যেমন করে ছায়া নামে তেমন করে চারি দিকে নীরবতা নেমে এল। আর সেই নিস্তব্ধতায় আমি যেন উপলব্ধি করলাম, এ জায়গাটির নাম 'শান্তিনিকেতন' রাখা হয়েছে কেন। এ যেন প্রকৃতই শান্তির নীড় বলে বোধ হল।

সকালে সূর্য ওঠার আগেই একটি গানের দল তরুণ কণ্ঠে আর একটি গান গেয়ে ছাত্রদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে তাদের প্রাত্যহিক কর্মে আহ্বান জানিয়ে গেল।

সাঁওতাল আদিবাসীরা শান্তিনিকেতনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। তাদেরই একটি গ্রামে আদ্যবিভাগের ছাত্রেরা একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেছে। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে আমরা সে গ্রাম পর্যন্ত ঘুরে এলাম[৩]। তার পর মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিলাম। মন্দিরটি এমনভাবে তৈরি যে চারদিক থেকে আলো-হাওয়া প্রবেশের কোনো বাধা নেই। মন্দিরে প্রবেশ করতেই দেখি ছেলেরা নানা রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে, কেউ-বা মন্দিরের সিঁড়ির উপর, কেউ-বা ভিতরে শ্বেতপাথরের মেঝের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। প্রথমে বাংলায় একটি প্রার্থনাসংগীত হল। তার পর ছেলেরা সমবেত কণ্ঠে একটি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করল। মন্ত্রটি শেষ হল

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

উচ্চারণ করে।

বোলপুরের ছাত্রদের কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি প্রথমবার শোনার স্মৃতি সহজে ভোলবার নয়। প্রথম শোনার সেই সজীবতাকে যদি ধরে রাখা যেত তবে সে মন্ত্রের ধ্বনিই জীবনকে নিয়ত সিদ্ধির দিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারত। মন্ত্রোচ্চারণের উদাত্ত সুরে যেন তরুণ জীবনের আকাঙ্ক্ষার গভীরতা ধ্বনিত হয়ে প্রভাতের বায়ুকে পরিপূর্ণ করে তুলছিল। শুনতে শুনতে মনে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করলাম।

মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, বেদীও নেই। কারণ, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কথা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে কোনো বিগ্রহের পূজো হতে পারবেনা এবং কোনো ধর্মবিশ্বাসের নিন্দে করা চলবে না। এখানে "এইরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা-

---

৩ সম্ভবত এ-গ্রামটিরই নাম পরে পিয়ারসন পল্লী হয়েছে

বন্দনাদি ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়।"

কেবলমাত্র প্রার্থনা এবং একজন অধ্যাপকের ভাষণ দিয়ে মন্দিরের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ উপাসনা শেষ হল, তাতে নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। মন্দিরের আশেপাশে অনেক গাছ। গাছের আবরণ ভেদ করে স্বচ্ছ সূর্যালোক মন্দিরে এসে প্রবেশ করছিল। বাইরে পাখির কূজন শোনা যাচ্ছিল, দূর থেকে ভেসে আসছিল ঘুঘুর ডাক।

সারাদিনে বিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হল, কয়েকটি ছেলের গানও শুনলাম। কবির রচিত সংগীত এখানকার বিদ্যালয়-জীবনের একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। নূতন সংগীত রচিত হলেই কবির ভ্রাতার পৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেগুলো ছাত্রদের শিখিয়ে দেন। ছাত্রদের উপর তার অপরিমিত প্রভাব। বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী না হলে সংগীতের মর্মার্থ অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় না। কিন্তু তার সঙ্গেসঙ্গে যদি কেউ অধ্যাত্মগুরুর আদর্শও প্রচার করতে সক্ষম হন, তবে তাঁর সেই ক্ষমতার মূল্য কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব না।

তখন শুক্লপক্ষ। সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে আমরা ছাত্র ও অধ্যাপকরা মিলে বিদ্যালয় থেকে মাইল-খানেক দূরে একটি জায়গায় চলে গেলাম, জায়গাটি গাছের ছায়ায় ঢাকা। সকলে গোল হয়ে গাছের তলায় বসা গেল। ছেলেরা গান গাইল। একজন অধ্যাপক একটি গল্প বললেন। আর, আমি বললাম লণ্ডনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। ভারতবর্ষের চাঁদের আলোর মন্ত্রে সমস্ত পল্লীপ্রকৃতি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিল, সেই অবারিত প্রান্তরের উপর দিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

আমি যেদিন সকালে আশ্রম ছেড়ে চলে এলাম সেদিন প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে আমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানানো হল। আশ্রম ছেড়ে যাঁরা বাইরের জগতে চলে যান তাঁদের এ পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানোই এখানকার রীতি। আমাকে মালা পরিয়ে দেওয়া হল, ধান আর দূর্বার সঙ্গে একমুঠো গোলাপের পাপড়িও আমাকে উৎসর্গ করা হল। ধান আর দূর্বা জীবনের অজস্রতা এবং সফলতার প্রতীক। একজন অধ্যাপক আমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করলেন। মন্ত্রটি 'শকুন্তলা' নাটকের অংশ, কবি তার অনুবাদও করেছেন[৪]।—

রম্যান্তরঃ কমলিনী হরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতাংর্ক-ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়-রজো-মৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূল-পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

মনে হল, যেন এই অনুষ্ঠানটির ভিতর দিয়ে আশ্রমের কাজে আমার জীবন উৎসর্গ করা হয়ে গেল। স্টেশনে যাবার পথে এ কথাই উপলব্ধি করলাম যে আশ্রমের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টাই এখন

৪ মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পথধূলি অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ,
হোক বায়ু অনুকূল শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

থেকে আমার জীবনের ব্রত। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে এই আশ্রমেই আমার আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে এবং এই আশ্রমেই আমি বাংলাদেশের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারব। আর বাংলাদেশ কবিকৃতি এবং কবিকল্পনারই দেশ।

তার পর থেকে বহুবার আমি আশ্রমে বাস করেছি। ছাত্র এবং অধ্যাপকদের জেনেছি চির জন্মের বন্ধুরূপে। এমন কি যখন মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে, ছাত্রদের সকাল-সন্ধ্যার মন্ত্রপাঠ ও গান যখন মনকে তেমন করে নাড়া দিতে পারে নি, তখনও এ কথা ভুলতে পারি নি যে শান্তিনিকেতন যথার্থই শান্তির নীড়।

অনুবাদ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

সংশোধন

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যা। 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা' প্রবন্ধ, পৃ ২৮৫, বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ স্থলে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। পাদটীকার বাংলা তারিখ ঠিক আছে।

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০ সংখ্যা। 'স্বরলিপি,' পৃ ৯৯, কথাংশ : 'খেয়া-পারাবার' স্থলে 'খেয়া-পারাপার'। পৃ ১০৪, 'স্বীকৃতি'তে উল্লিখিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নি।

পত্রাবলী সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় পর্ব

শান্তিনিকেতন, ৩০শে জুন ১৯১৫

এখন আমি শান্তিনিকেতনে আছি। এখানে এখনও ছুটির আবহাওয়া লেগে রয়েছে। কারণ খুব কম ছেলেই ছুটির পরে ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আর ফিরবেই না। তাই আমাদের অর্থসচিবের সময় খুব কঠিন যাবে মনে হচ্ছে। কারণ এখনও কতকগুলো বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে, আর কিছু বাকি বকেয়াও শুধতে হবে। শরীর যত শক্তই বোধ করুন, এখনই কিন্তু আপনি ফিরবেন না। কারণ আর্থিক কষ্ট আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যাধিবীজের চেয়েও ক্ষতিকর। যাই হোক, স্থির জানবেন, এই কঠিন সময়টা নিরর্থক যাবে না। এই অবস্থা থেকে যখন মুক্তি পাব, তখন ছাত্রসংখ্যা কিছু কমলেও আমরা আরও স্বাধীনভাবে চলতে পারব।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি মুক্তপথের আহ্বান পেয়ে গেছি, যদিও আমার সামনে সব পথই এখন বন্ধ। আমার মনোভাব এখন চঞ্চল ভবঘুরের মত, কিন্তু মুক্তির অভাবে সেটা আমার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক হয়েছে। তাঁবুতে বাস না ক'রে, সেই তাঁবু আমি যেন পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছি—এ রকমই মনে হচ্ছে। আমার জীবনের বীজাধারটি ভেঙে নতুন বীজ ছড়াবার সময় আবার এসেছে। রক্তে তারই দোলা অনুভব করছি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই— কোনো বিশেষ কাজে নিজেকে আবদ্ধ করা কবির ধর্ম নয়। কেননা, তারা হচ্ছে বিশ্বের বিচিত্র অনুভূতির বাহক। কয়েক বছর ধরে অনেক রকম জনহিতকর পরিকল্পনার পর এখন আমার জীবন আবার দায়িত্বহীনতার উন্মুক্ত অবাধ ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চায়— সেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত আছে, সেখানে বনফুল আছে, কিন্তু সেখানে কোনো কমিটি মিটিং নেই।

কলকাতা, ৭ই জুলাই ১৯১৫

আমি কি কোনো এক জায়গায় বলি নি যে, বৈরাগ্য আমার জন্য নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই আমি মুক্তির স্বাদ পাই? আমার মন যেন এ কথাটা আবার নতুন করে বোধ করে। একটা চিন্তার রূপ দেওয়া হয়ে গেলে তার থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিই। নতুন চিন্তার নতুন রূপ দেবার জন্য তখনকার মত আমার অখণ্ড স্বাধীনতা চাই। আমাদের মধ্যে যে সৃজনের প্রেরণা আছে তা নব নব রূপে নিজেকে সার্থক করতে চায়— শারীরিক মৃত্যুর অর্থও তাই। সমাধিমন্দির এক জায়গায় চিরস্থির হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু জীবনকে কে কবে বেঁধে রাখতে পেরেছে? তাকে যে নিত্য তার বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো রূপের কারাগারে তাকে বন্দী হতে হবে। মানুষ অমর, তাই তাকে বারে বারে মরতে হবে। কারণ জীবন ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে— প্রতি পদক্ষেপেই তার চাই নতুন নতুন রূপ।

পিয়রসনের কাছ থেকে আমার সব প্ল্যানের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। নতুন আবেষ্টনীতে সরে গিয়ে আমি আমার এখানকার আইডিয়াগুলির পাশমুক্ত হতে চাই। শান্তিনিকেতনে আমার কতকগুলি চিন্তাধারা

জড়বস্তুস্তূপে পর্যবসিত হয়েছে। বক্তৃতায়ও আমার বিশ্বাস নেই, আমার সহকর্মীদের কিছু করতে বাধ্য করাও আমার পছন্দ নয়। কারণ সত্যিকারের আদর্শ যা— তা তো স্বাধীনভাবেই কাজ করবে। জোর-জবরদস্তি করে নিজের চিন্তাধারাকে স্থায়ী করার ভয়ংকর ক্ষমতা তার আছে, এ কথা চিন্তা করতে পারে কেবল দুর্দান্ত অত্যাচারীই। আপনার আইডিয়াগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আপনি কতকগুলি ক্রীতদাস সৃষ্টি করবেন— এ ধারণাই হাস্যকর। আমি মনে করি, আমার আইডিয়াগুলি সেভাবে টিকে থাকার চেয়ে তাদের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়। এমন কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের ভাবগুলিকে মূর্ত করে রাখতে চান— আর সেই মূর্তির বেদীতলে মনুষ্যত্বকেই বলি দেন। কিন্তু আমি যে ভাবের আরাধনা করি, তাতে আমি কালীর উপাসক মোটেই নই।

আমার সহকর্মীরা যখন বাইরের রূপটার মোহে এতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা তাঁদের লোপ পায়— তখন আমার পক্ষে একটি পথই কেবল খোলা থাকে। সেটি হল, এখান থেকে সরে গিয়ে আমার আইডিয়াকে নতুন আকার দেওয়া আর তার জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করা। যদিও এটি বাস্তব পথ নয়, তবু এটিই হল একমাত্র খাঁটি পথ।

কলকাতা, ১১ই জুলাই ১৯১৫

বিচক্ষণ লোকেরাই সংসারে আরামে থাকে। তারা তাদের কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যেই বাস করে, তাই তাদের বিশ্রামের অংশটুকুও ভোগ করতে পায়। কিন্তু আমি কর্তব্যে অবহেলা করে এমন-সব কাজের সৃষ্টি করি যা আমার সব সময়টুকু নিয়ে নেয়। তার পর হঠাৎ আমি সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আলস্যের বিলাসে মগ্ন হই।

সামনের সপ্তাহে যখন পদ্মায় ভেসে বেড়াব, তখন এই চিন্তাটাই ভুলে যাব যে, মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্য সৃষ্টির বিরাট সভাতলে আমার উপস্থিতি একান্তই দরকার।

আমি আর আপনি— আমরা দু জনেই— জন্ম-ভবঘুরে। তাই আমার যেটা সত্যিকারের কাজ, সেটা কোথাও দানা বাঁধবে না। সব কাজের প্রারম্ভেই কেবল এই দানা-না-বাঁধার ভাবটি বজায় থাকতে পারে। তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে, কেবল কাজগুলি শুরু করে দিয়েই সরে পড়া। আমি নিজে একটু দূরে সরে না দাঁড়ালে তাদের আদর্শ বজায় রাখতে পারব না। এইবারে অবশ্য আমার শারীরিক এবং মানসিক অবসাদই আমাকে নির্জনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যে ধরণের কাজ করতে পারি তাতে অধ্যবসায়ের চেয়ে মনের সজীবতাই বেশি দরকার। তাই আমার নিজ কর্তব্যে যোগ দেবার আগে কিছুদিনের বিরতি আবশ্যক।

একটি দুর্বল জাতি যখন সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আপনি পৃথিবীতে অন্যায়ের গ্লানি দেখে যে কিভাবে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, সে আমি অনায়াসেই বুঝতে পারছি। মানুষের ভুলভ্রান্তিগুলি করুণার বিষয় নয়, সেগুলি অতি ভয়ংকর। ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে প্রতি মুহূর্তেই সে ভুলে যায় যে, এই ক্ষমতা আছে বলেই তার পক্ষে ন্যায়াচরণ করা আরও বেশি কর্তব্য। ভগবান যখন দরিদ্র এবং দুর্বলের মধ্য দিয়েই তাঁর আবেদন জানান, তখন তা ক্ষমতাবানের পক্ষে আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। সে হয়তো তখন ভাবে যে সে সহজেই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। ভগবানের বিধানের চেয়ে তার নিজের ব্যবস্থার উপরই তার ভরসা বেশি।

ভারতবর্ষে উচ্চজাতি যখন নীচজাতির উপর প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসেছে, তখন সে নিজের শেকলে নিজেকেই জড়িয়েছে। ইউরোপও এখন সেই ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতকেই অনুসরণ করছে। কারণ এশিয়া আর আফ্রিকাকে সে তার শোষণের ন্যায্য ক্ষেত্র মনে করছে। ইউরোপের সমস্যা আরও সহজ হয়ে যেত যদি সে অন্যান্য মহাদেশগুলিকে একেবারে জনহীন করে ফেলতে পারত। কিন্তু পরজাতি যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ তাদের সম্বন্ধে তার নৈতিক দায়িত্ব রক্ষা করা ইউরোপের পক্ষে কঠিন। কিন্তু সেই সময়টাই বড় দুঃসময় যখন সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক'রে মনে করে যে, মনুষ্যজাতিরই কিছু উপকার করা হল বুঝি। যখন সে মানুষের মধ্যে তফাত করে আর ভাবে যে, তার নিজের দেশের লোকের পক্ষে যা ভালো, অন্য দেশের লোকের পক্ষে তা ভালো নয়— কারণ তারা তার চোখে হেয়। এভাবে সে ক্রমে ক্রমে তার নিজ আদর্শের প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। তাতে যে তার নৈতিক শক্তি খর্ব হচ্ছে, তা সে বুঝতেও পারছে না।

যাক গে, আমি আর এ বিষয়ে বেশি বাক্যব্যয় করব না। নিজেদের কথা বলতে গিয়ে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, দুর্বলতা জিনিসটা অত্যন্ত হেয়। যে দুর্বল সে নিজে তো ডোবেই, সবলের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিয়ে তারও পতনের কারণ হয়। প্রত্যেক জাতিরই শক্তির চর্চা করা উচিত। তবেই সে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে সহায়তা করতে পারে। ইংলণ্ডের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে, তারা আমাদের ঘৃণা করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের শাসনের অধিকার তাদের হাতে দিয়েছি। আমাদের প্রতি তাদের মনে কোনো রকম দরদ নেই জেনেও আমাদের বিচারের ভার তাদেরই উপর ছেড়ে দিয়েছি।

বর্তমান সংগ্রামের উদ্‌ভব কিসে থেকে, তা কি ইউরোপ কোনো দিন টের পাবে না? তার নিজ আদর্শই এতকাল পৃথিবীর মধ্যে তাকে একটি মহৎ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই আদর্শের প্রতিই তার মনে একটি সন্দেহ জেগেছে। এই সন্দেহটাই যে সংগ্রামের মূল কারণ, তা কি সে বোঝে নি? যে তেল দিয়ে সে নিজের প্রদীপটি জেলেছিল, মনে হচ্ছে, তা ফুরিয়ে গেছে। এখন সেই তেলের প্রতিও বোধ হয় তার মনে একটা অবিশ্বাস জেগেছে। সে ভাবছে, তার আলো জ্বালবার জন্য কোনোদিনই এই তেলের প্রয়োজন ছিল না।

শিলাইদা, ১৬ই জুলাই ১৯১৫

রেলের কামরায় বসে লেখা আগের চিঠিতে আপনাকে আমার জাপান যাবার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম, সে চিঠি কি আপনি পেয়েছেন?

ছোট ছেলেরা যেমন করে তাদের কাগজের নৌকো ভাসায়, আমি ঠিক তেমনি করে আমার স্বপ্নগুলিকে ভাসিয়ে দিচ্ছি আমার চোখের সামনেকার এই সবুজে-সোনালিতে মেশানো নীল দিগন্তে। এই পৃথিবীটা আশ্চর্যরকমের সুন্দর, কিন্তু এর মধ্যে যে একটি বেদনা রয়েছে, সেটি না অনুভব করে কি পারি? সে বেদনারও আবার একটি নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে— সে সৌন্দর্য মৃত্যুহীন। বিচিত্র বর্ণ ও গড়নের চমৎকার একটি শুক্তি যেন তার বুকের কাছে লুকিয়ে রেখেছে একটি ফোঁটা চোখের জল, আর তাই তাকে অমূল্য করে তুলেছে। দুঃখের মধ্য দিয়েই সব ঋণ শোধ করতে হবে, তা না হলে এই পৃথিবী আর এই জীবন যে ধূলোর চেয়েও মূল্যহীন হয়ে যায়।

শিলাইদা, ২৩শে জুলাই ১৯১৫

অনেক বছর পরে আমি আবার আমার প্রজাদের মধ্যে এসে পড়েছি। আমার আসাটা যে একান্ত দরকার ছিল, তা আমিও বুঝতে পারছি, ওরাও বুঝতে পারছে। এদের মধ্যে আমি যখন প্রথমজীবনে এসেছিলাম সে ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। সেই সময়েই প্রথম আমি জীবনের বাস্তব সংস্পর্শে এলাম। এসব সরল গ্রামবাসীদের মধ্যেই আমি মানুষের নিকট-স্পর্শ অনুভব করি। এদের কাছে এলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, তাই মানুষ যে মানুষের কতখানি আপনার, তা বুঝতে পারি। যে মাটির উপর সর্বদা চলাফেরা করি তার কথাও তো আমরা মনে রাখি না, ঠিক সেই ভাবেই এদের আমরা অনেক সময় ভুলেই থাকি।

কিন্তু এই মানুষগুলিই তো জগতের বড় অংশ জুড়ে আছে, এরাই তো সব সভ্যতাকে ধারণ করে রয়েছে। এরা নিজেরা কোনো মতে বেঁচে থেকেই খুশি। এরা এরকম স্বল্পে সন্তুষ্ট বলেই অন্যরা প্রমাণ করতে পারে যে, কোনো মতে বেঁচে থাকার চেয়ে মানুষের জীবন অনেকখানি বড়। নীচের স্তরের লোক এরা, এবং সংখ্যায় এরা অগণ্য। এরা জীবনের মান নীচু করে ধরে রেখেছে বলেই উপরতলার অল্পসংখ্যক লোকের জীবনের অগ্রগতি অবাধে চলেছে। তারা হাজার বিঘা জমি চাষ করে দিচ্ছে বলেই এক বিঘার উপর একটি বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াতে পারছে। অথচ তারা শুধু এই কারণেই অপমানিত হচ্ছে যে, বাঁচার তাগিদেই তারা এই অবস্থায় এসে পৌছেছে। তাদের আর কোনো উপায় নেই, তাই তারা এভাবে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের খুব আশা, এইখানটাতে বিজ্ঞান মানুষকে সাহায্য করবে। বিজ্ঞান নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছে দেবে। বাস্তবজীবনের রূঢ় আঘাত তাকে আর পেতে হবে না। কঠোর জীবনসংগ্রামে রত এই জনসমূহ অসীম শক্তির আধার, তাদের দেখলে অপার করুণায় হৃদয় দ্রব হয়। যেখানে তারা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, সেখানে তারা সুন্দর। যেখানে তারা বিরাট গভীর ও সহনশীল— সেখানে তারা মহৎ। আমাকে স্বীকার করতে হবে, এদের ফেলে শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমি এদের প্রতি অবহেলাই প্রকাশ করেছি। এখন এদের মধ্যে ফিরে এসেছি, এবার এদের জন্য আরও সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার অবকাশ পাব— ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আশ্রমের জীবন আমাকে কেবল একটি শিক্ষকে পরিণত করে তুলছিল। এতে আমি খুশি হই নি। কারণ সে জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে জনকল্যাণের সহায়ক হতে হবে। শুধু ভাবের আদানপ্রদান করলে চলবে না, জনগণের সঙ্গে বাস করতে হবে।

কলকাতা, ২৯শে জুলাই ১৯১৫

অসীম যিনি তিনি যদি শুধু অসীমই থাকতেন, তবে তিনি অপূর্ণ হতেন। সীমার মধ্য দিয়েই তিনি পূর্ণ— তাই তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন। আনন্দের পূর্ণতা থেকেই উপলব্ধির ইচ্ছা জাগে, কিন্তু সেই ইচ্ছা সফল হয় দুঃখভোগের মধ্য দিয়েই। প্রশ্ন উঠতে পারে, অসীম কেন সীমার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন? আনন্দে পৌছতে গেলেই বা কেন দুঃখের মধ্য দিয়ে যেতে হবে? কিন্তু তার কোনো উত্তর নেই। তবে মন যখন জাগে তখন বোধ করতে পারি যে, এই পথই যথার্থ পথ।

অসীমের মধ্যে যখন কেবল দুঃখ ও মৃত্যুকেই দেখি, যখন পূর্ণতার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন আমরা তার ঠিক রূপটি দেখতে পাই না। যখন তার আসল রূপটি দেখব, তখন বুঝব, অপূর্ণতার আড়ালে পূর্ণই

বিরাজ করছেন। তা না হলে দুঃখীর প্রতি আমাদের মনে দয়ার ভাব জাগত কি? অসম্পূর্ণতার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হত কি?

আমি যা বলতে চাই, তা হল এই— ধরুন, টেলিগ্রাফের তারে জড়ানো মৃত বানরটি যখন আপনি দেখলেন তখন তার চার পাশের সৌন্দর্য অক্ষতভাবে বিরাজ করছে। সেই অসামঞ্জস্য আপনার চোখে ভারি নিষ্ঠুর ঠেকেছিল। এটাই হল বড় কথা। অসুন্দরই যদি চরম সত্য হত, তবে এই নিষ্ঠুর দৃশ্য আপনাকে পীড়া দিত না। পূর্ণতার আদর্শ আপনার মনে রয়েছে বলে আপনি বেদনা বোধ করলেন। এই আদর্শের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা ও সব সন্দেহের নিরসন রয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে দুঃখের চেয়ে আনন্দই বেশি সত্য— তা না হলে সমবেদনার কোনো অর্থ থাকত কি?

তবে আর নৈরাশ্য কিসের জন্য? অস্তিত্বের রহস্য এখনও আমরা উদ্‌ঘাটিত করতে পারি নি। কিন্তু এটুকু জানি যে, দুঃখ ও মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি সত্য হল প্রেম। এটা জানাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

শান্তিনিকেতন, ৭ই অগস্ট ১৯১৫

আপনার চিঠি পেয়ে আমার খুব ভালো লাগল। সব গভীর বিষয়েই আমার চিন্তাধারাগুলিকে চালিয়ে নেয় একটি মাত্র অনুভূতি। তা হল এই— সৃষ্টির মূলে যে সংখ্যাটি রয়েছে, তা এক নয়, দুই। দুটি বিপরীত শক্তির মিলনেই সব ব্যাপার ঘটে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র যখন 'দুই'কে সংক্ষেপ করে 'একে' নাবিয়ে আনে, তখন ভুল করে। কোনো কোনো দর্শন বলে— গতিটাই মায়া, সত্য যা তা স্থির। অন্যরা আবার বলে— আসলে সত্য গতিশীল; সত্যকে স্থির রূপে প্রতিভাত করে মায়া।

সত্য কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অতীত। এ এক অনন্ত রহস্য। একাধারে স্থাবর এবং জঙ্গম, আদর্শ এবং বাস্তব, পূর্ণ ও অপূর্ণ— উভয়ই।

যুদ্ধ ও শান্তি দুয়ের মিলনেই সত্য। অথচ এই উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ-ভাব আছে। উভয়ে উভয়কে আঘাত করে— যেমন পরস্পরকে আঘাত করে বীণার তার ও হাতের আঙুল। অথচ এই সংঘাত না হলে তো সংগীতের সৃষ্টি হয় না। এই সংঘাতটির অভাব ঘটলেই আসে শব্দহীন নিষ্ফলতা। আমরা শান্তি চাই, কি যুদ্ধ চাই— সেটা আসল কথা নয়। দুয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আনতে পারি কেমন করে— তাই দেখতে হবে।

শক্তি বলে একটা জিনিস যতদিন রয়েছে ততদিন আমরা বলতে পারি না যে তার প্রয়োগ উচিত নয়। বরং বলতে পারি, এর অপপ্রয়োগ অনুচিত। প্রেমকে অস্বীকার করে শক্তিকেই যখন একমাত্র বলে জানি তখন এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। প্রেম ও শক্তি মিলিত না হলে উভয়েই ব্যর্থ হয়, তখন প্রেম হয় দুর্বলতারই নামান্তর, এবং শক্তি নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়। শুধু শান্তি জড়ত্বের প্রতীক, আর শান্তিকে বিনষ্ট করে যে যুদ্ধ, তাকে আসুরিক বলা চলতে পারে।

পরস্পর হানাহানি করাই যে যুদ্ধের একমাত্র রূপ তা যেন আমরা একবারও মনে না করি। মানুষ মুখ্যতঃ নৈতিক জীব— তার অস্ত্রশস্ত্রও হবে নৈতিক।

শান্তিনিকেতন, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫

শরতের সূর্য নিঃশব্দে তার সোনার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল, পাখিদেরও আকাশভ্রমণের সময় হয়ে এল। সমুদ্রপারে যাবার জন্য যে দুটি পাখি আমাদের নীড় ছেড়ে গেলেন— সে দুটি হলেন পিয়রসন ও আপনি।

তা দেখে আমিও পাখা সংযত করতে পারছি না। আমাদের চার পাশে সব জিনিসের ভার আছে। তা আমাদের আত্মায় প্রবেশ করে, আমরা জানতেও পারি না। শেষে একদিন আমরা তার ভারে চাপা পড়ি। জীবন যখন বস্তুস্তূপে ভারাক্রান্ত হয় তখন সচলতাই তার একমাত্র প্রতিষেধক।

আমার মন এখন একটি সছিদ্র নৌকার মত, তাতে জল ভরে রয়েছে। কোনোমতে চলছে মাত্র। এতটুকু দায়িত্বভার সে বইতে পারে না। আমি এবার বনে গিয়ে স্বাধীনতার কঠিন যোগ অভ্যেস করব। সব রকম পার্থিব ব্যাপারে, সব রকম সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বে জোর দিয়ে 'না' বলতে চাই। দেখছি, শেষপর্যন্ত আমাকে তপস্বীর জীবনই যাপন করতে হবে— তার বিরুদ্ধে এখন আমি যত প্রতিবাদই করি না কেন। তবে পুরো তপস্বী কোনো কালেই হব না।

রিহার্সেল চালিয়ে যাচ্ছি। ওটা আমার ভালো লাগে। কারণ ছোটছেলেদের সঙ্গ চিরকালই আমাকে আনন্দ দেয়।

—

সি. এফ. এণ্ডরুজ -লিখিত ভূমিকা

সেই সময়টা ছিল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি কাল। তার আগে পর পর কয়েক বার রোগে ভুগে সবে সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ি। সেই সময়ে কবির সযত্ন সেবায় ও স্নেহময় সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়েছিলাম। সে বছর খুব গরম পড়া সত্ত্বেও তিনি ছুটিতে কোথাও যান নি। কলকাতায় আমি যখন নার্সিং হোমে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম তখন তিনি আমার কাছাকাছি ছিলেন। পরে যখন আমি সিমলা যাবার মত সুস্থ হয়ে উঠলাম —তখন আমাদের মধ্যে আবার পত্রচলাচল শুরু হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আমরা যুদ্ধের সীমা ও পরিধি থেকে অনেকটা দূরে ছিলাম। তাই তার ভয়াবহতা আমাদের স্মৃতি থেকেও সরে যাচ্ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের জন্যই কতকগুলি বৃহৎ সমস্যা কঠোরভাবে আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে এই সময়ে সেই বিষয়গুলির আলোচনাই বেশি করে চলছিল। সে সমস্যাগুলি হল মানুষের বেদনা, মনুষ্যসমাজে একটি সৌভ্রাত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা, আর পরস্পর-সখ্যের ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন। আমি যখন কলকাতায় নার্সিং হোমে ছিলাম, তখন আমাদের বেশির ভাগ কথাবার্তা এসব বিষয়েই হত। কবির মগ্নচেতনার গভীরে এই বিষয়গুলি সারা বছর ধরেই সক্রিয় ছিল। সঙ্গেসঙ্গে কিন্তু স্কুলের কাজের সমস্ত দায়িত্বভারও তাঁর উপরেই ছিল। আর তিনিও তাঁর স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সঙ্গে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

১৯১৫'র গ্রীষ্মকালে সুদূরপ্রাচ্যে যাবার একটি দৃঢ়সংকল্প তাঁর মনের গভীরে জেগে উঠেছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করে এসেছিলেন। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অন্তর্লীন গভীর ভ্রাতৃভাবের অনুভূতি তখনই তাঁর মনে জেগেছিল। কবির চিন্তাধারা সর্বদা বিশ্বমানবের প্রতিই সজাগ ছিল, অন্য কোনো ক্ষুদ্র অংশে তিনি দৃষ্টিপাতই করতে পারতেন না। তাই পাশ্চাত্যের এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম দেখে তিনি বুঝতে পারলেন মানবসমাজের অবস্থা

কি গভীর অসাম্যে ভরা। গত বছর যুদ্ধারম্ভের আগে এবং পরে তিনি যে মনোবেদনা পেয়েছেন তার থেকেই এই সংকল্প তাঁর মনে জাগল যে, তাঁর পিতা মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রম— যা তিনি কেবল ধর্মচর্চার স্থান হিসেবেই স্থাপিত করেছিলেন— তার সীমানা আরও প্রশস্ত করতে হবে। তাঁর আশ্রম তখন কেবল স্কুলের পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল, তাকে বিশ্বমৈত্রীর ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সব জায়গা থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমান শ্রদ্ধা ও সমাদর দিয়ে এখানে নিয়ে আসার চিন্তা কবির কল্পনাকে উত্তরোত্তর উজ্জীবিত করেছিল।

১৯১৫তে এইসব চিন্তা তাঁর মনে জেগেছিল। তিনি বুঝলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মযজ্ঞ সমাপনের জন্য চীন-জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন। সেই কারণেই তাঁকে দূরপ্রাচ্যে যাত্রা করতে হবে। অগস্টেই যাত্রা শুরু করবেন, এবিষয়ে প্রায় মনঃস্থির করেই একটি জাপানী স্টিমারে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলেন। এই সময়ে কয়েকটি কারণে যাওয়ায় বাধা ঘটল।

দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার সংকল্প তিনি যখন সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষে একটি আকস্মিক দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের প্রচলন ছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। বন্ধুবর পিয়রসন এবং আমি নাতালে এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেছিলাম। তাই অন্য যে-কোনো লোকের চেয়ে আমরা দুজনেই এ বিষয়ে বেশি জানতাম। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি যে নীতিবিগর্হিত আচরণ করা হত তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা দরকার ছিল। তাই দূরপ্রাচ্যে যাত্রা স্থগিত হওয়ায়, আমরা যখন ফিজি গিয়ে এবিষয়ে তদন্ত করতে চাইলাম, তখন তিনি তাতে তাঁর আন্তরিক স্বীকৃতি দিলেন। আমাদের এই যাত্রা আর তাঁর বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ— উভয়ের উদ্দেশ্য যে এক তা তিনি গভীরভাবেই বোধ করেছিলেন। যাবার আগে তাই তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি আমাকে উপনিষদের দুটি শ্লোক উপহার দেন। সে দুটি হল—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উৎসাহ ও সহানুভূতি দিয়ে আমাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করলেন তাতেই আমরা সেই কঠিন যাত্রা উদ্‌যাপিত করে আসতে পেরেছিলাম। আমাদের সেই তদন্তের ফল ভালোই হল। আমরা এই প্রতিশ্রুতি পেলাম যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে ভারতীয়দের যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি দেওয়া হবে।

অনুবাদ শ্রীমলিনা রায়

শুভময় ঘোষ

জন্ম : ১০ মার্চ ১৯২৯ মৃত্যু : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

শুভময় ঘোষ ১৯২৯-১৯৬৩

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গত দু সপ্তাহ ধরে যখনই দুজন মানুষ কোথাও একত্র হয়েছি তখনই ঘুরে-ফিরে একই কথা হয়েছে— ভুলু[১]’র কথা। অনেক কথা আমিও বলেছি, অন্যরাও বলেছেন। কিন্তু কেবলই মনে হয়েছে— কিছুই বলা হয় নি। ঠিক যে কথাটি বললে মনের কথাটি বলা হত সে কথাটি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নি। আজও যে পারব এমন মনে হয় না।

অনেক করেও নিজে যে কথাটার ভাষা খুঁজে পাই নি বিদেশী কবির ভাষায় খানিকটা তার আভাস পেয়েছি। সেই কথাটি বলছি। ইংরেজ কবি ডান্ তাঁর একটি ভাষণে (কবিতায় নয়) বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষ সমগ্র মানবসমাজের একটি অচ্ছেদ্য অংশ, সুতরাং একজন মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন সকল মানুষেরই আংশিকভাবে মৃত্যু ঘটে। বলেছেন "Any mans death diminishes me because I am involved in mankind" এবং সেই কারণেই বলছেন "And therefore never send to know for whom the bell tolls ; it tolls for thee" অর্থাৎ কারো মৃত্যু ঘোষণা করে গির্জার ঘণ্টা যখন বাজে তখন জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না কার মৃত্যু হল, জেনে রেখো তোমারই মৃত্যু হয়েছে। ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি সম্প্রতি আমাদের হয়েছে। মাতা পত্নী সহোদর সহোদরা একান্ত আপন জনের পক্ষে তো বটেই, এ ছাড়া ভুলুর যারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু, যারা তার নিত্যসঙ্গী ছিল এবং আমরা যারা বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তাকে বন্ধুর মতোই অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছিলাম— আমাদের সকলের পক্ষে এই আঘাত মৃত্যুতুল্য হয়েছে অর্থাৎ ভুলুর মৃত্যু আংশিকভাবে আমাদেরও মৃত্যু। যে মানুষ আমাদের অনেক-কিছু দিয়েছিল সে মানুষ যখন চলে যায় তখন আমাদের জীবনে অনেকখানি শূন্যতার সৃষ্টি করে যায়। এই শূন্যতাবোধের মধ্যেই আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরও মূল্য কম নয়।

কোনো মানুষকে আমরা যখন ভালোবাসি তখন এই কারণেই ভালোবাসি যে সে আমাদের জীবনের স্বাদ গন্ধ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, জীবনকে উপভোগ্য করেছে। আবার সে মানুষ যখন হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায় তখন আমাদের জীবন ঠিক সেই পরিমাণে বিরস বিস্বাদ শুষ্ক এবং শূন্য মনে হয়। ভুলুর অভাব আমাদের মনে কতখানি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে সে কেবল তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা তাকে নিত্যদিনের সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন।

অপরের কথা অপরে বলবেন, আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি। অখ্যাত অজ্ঞাত দরিদ্র শিক্ষকের জীবন— সেই আমার অকিঞ্চন জীবনকে বর্ণে গন্ধে সুরে রসে ভরাট করে দিয়েছিল যে ছাত্রের দল তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করব ভুলুর। পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার কথা মনে পড়ে। অভাবে অনটনে দুঃখে দারিদ্র্যে জর্জরিত ; তথাপি সর্বজয়া বলেছে— তার জীবনের পাত্র পূর্ণ করে অপু তাকে অমৃত পরিবেশন

---

১ শুভময় ঘোষ অন্তরঙ্গ মহলে এই নামে পরিচিত ছিলেন। ‘সম্পাদকের নিবেদন’ দ্রষ্টব্য।

করেছে। আমারও জীবনের পাত্র পূর্ণ করে অমৃত পরিবেশন করেছিল ভুলুর মতো ছাত্রেরা। সুসন্তানকে কোলে পেয়ে জননী যেমন কৃতার্থ (শাস্ত্রে বলেছে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা) তেমনি ছাত্রের মতো ছাত্র পেলে শিক্ষক কৃতার্থ। আমি যে ভুলুর মতো ছাত্র পেয়েছিলাম তাতেই আমার শিক্ষক-জন্ম সার্থক হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে আমার শিক্ষক-জীবনের প্রথম দশ বৎসরের স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। ছাত্রদের যদি কিছু দিয়ে থাকি তখনই দিয়েছি— আর তারাও দিয়েছে উজাড় করে। কোথাও ভালো কথাটি শুনেছে, ভালো খবরটি পেয়েছে ছুটে এসে আমাকে বলেছে, নতুন বইএর বার্তা। কখনো আমি তাদের দিয়েছি, কখনো তারা আমাকে দিয়েছে, নতুন কিছু শিখেছে তো আমাকে তার ভাগ দিয়েছে। ওরা আমার কাছে কতটুকু শিখেছে জানি না, আমি ওদের কাছে অনেক শিখেছি। মাস্টারমশায় (আচার্য নন্দলাল বসু) বলেছেন, ছাত্র মাস্টার পাশাপাশি বসে ছবি এঁকেছি। আমারটা দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি। কে মাস্টার কে ছাত্র সে কথা মনেই হয় নি।

সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও হয়েছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষারীতির এইটিই মর্মকথা।

আমার সেই আনন্দময় দিনগুলির সঙ্গে ভুলু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। অধ্যাপক কর্মীদের মধ্যে এখনও অনেকে আছেন যাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। কারণ তাঁরাও ছিলেন সেই আনন্দের অংশীদার। এ ছাড়া নীরব সাক্ষী রয়েছে এখানকার মাঠ ঘাট শালবীথি আম্রকুঞ্জ চায়ের দোকান— যেখানে সেখানে পা ছড়িয়ে বসে গল্প শুরু হত, সাহিত্যালোচনা কিম্বা দেশোদ্ধারের কথা একবার শুরু হলে আর থামতে চাইত না। গ্রীষ্মের দিনে কত রাত অবধি খেলার মাঠে গল্প করে কাটিয়েছি। গানের পর গান চলেছে— ভুলু আর বিশ্বজিৎ ছিল প্রধান কাণ্ডারী। এমন অফুরন্ত গান আর কারো মুখে শুনি নি। পথ চলতে অকারণে গান গেয়ে চলা, জ্যোছনা রাতে মাঠে মাঠে গান গেয়ে বেড়ানো— এসব ছিল নিত্যকর্মপদ্ধতি। তাতে বিদ্যাচর্চার কোনো বাধা হয় নি। কারণ এদের মধ্যে অনেকেই মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য ছিল।

শান্তিনিকেতনের ছেলে বলতে আমরা যা বুঝি ভুলু তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেহের সৌষ্ঠবের সঙ্গে মনের সৌষ্ঠব, বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির, রুচির সঙ্গে স্বভাবের আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল। রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে মানুষের খবর আমরা পেয়েছি সে মানুষ যেন স্বল্পকালের জন্য মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাদের মধ্যে এসে দেখা দিয়েছিল—

নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি—

—এই মানুষটিরই নাম ভুলু।

মাত্র চৌত্রিশ বৎসরের জীবন। বয়সের হিসাবে অত্যন্ত স্বল্পায়ু বলতেই হবে। কিন্তু কেবল মাত্র বৎসর গুনে আয়ুর হিসাব হয় না। এই জীবনে কতখানি সে দিয়েছে, কতখানি সে পেয়েছে— সেই হিসাবে যদি আয়ুর পরিমাপ হয় তবে বলব, ভুলু শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করেছে। কারণ শতবর্ষ বেঁচে থাকলেও কোনো মানুষ এতখানি স্নেহ-ভালোবাসা পায় না, আপন-পর সকলকে এতখানি আনন্দ দিতে পারে না। দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে—এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। ভুলু চিরনবীন, সে যৌবনের প্রতিমূর্তি— সে বৃদ্ধ হবে, আমাদের মতো তার চুল পাকবে, জরাজীর্ণ হবে এ কথা ভাবাই যায় না। সে আমাদের

ফাল্গুনীর চন্দ্রহাস (এই তো সেদিন চন্দ্রহাসের ভূমিকায় নেমেছিল, তার সহাস্যমূর্তিটি চোখের উপর ভাসছে)। সেই অন্ধকার গুহাবাসী বৃদ্ধটাকে ধরবে ব'লে সে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, আমাদের মনে যে অজানার ভয় সে ভয়কে ভেঙে দেবে বলে। সে বলেছে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

ওর সহচরদের ব্যাকুল কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি— চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলায় রস থাকে না। ও কাছে থাকলে মনে হয়, কিছু হোক বা না হোক, তবু মজা আছে···কিন্তু গেল কোথায় ?

সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।
সে কি কথা ! সে যে ঘোর অন্ধকার।
কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—
সে নিজেই খবর নিতে গেছে।
ফিরবে কখন ?
তুইও যেমন ! সে কি আর ফিরবে !
চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনে আর রইল কী ?

এ প্রশ্নর জবাব কে দেবে ?

THE LIFE AND LETTERS OF RAJA RAMMOHUN ROY: Sophia Dobson Collet: Edited by Dilip Kumar Biswas and Probhat Chandra Ganguli. Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta. Rs. 18/-

নবযুগের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে বিদ্বজ্জন মহলে আজও বিলক্ষণ মতভেদ দেখা যায়। বিশেষ করে এই ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারায় রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবৃন্দের স্বতন্ত্র দান ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্ময়কর পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে। রামমোহনের কথাই ধরা যাক। কেউ কেউ মনে করেন যে রামমোহন রায় মনে-প্রাণে বিদেশী খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মাদর্শ খ্রীষ্টধর্মেরই প্রেরণাসম্ভূত এবং ইসলামের প্রভাবপুষ্ট, পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও ইংরেজী শিক্ষাতে রামমোহন তেমন পারদর্শী ছিলেন না, আদৌ তিনি ইংরেজী জানতেন কিনা এমন সন্দেহও কেউ কেউ পোষণ করে থাকেন, তাঁর সতীদাহ-নিবারণ প্রচেষ্টা ব্রিটিশ শাসকদের ইচ্ছা-প্রণোদিত প্রভৃতি বহু বিচিত্র ধারণা আজও এ দেশের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীমহলে প্রচলিত আছে। এইসব ধারণার সমর্থনে ছিন্নমূল তথ্য সংগ্রহের কাজেও তাঁরা কম দক্ষ নন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অনুসন্ধিৎসা এমনই বিকৃতিপ্রবণ যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের তথাকথিত 'কলঙ্ক' উদ্‌ঘাটনে ও ব্যাখ্যানেও তাঁরা তৃপ্তিলাভ করে থাকেন।

সাধারণ সামাজিক জীবনেও দেখা যায়, এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত হল অপর ব্যক্তির চরিত্রের ছিদ্রান্বেষণ করে পরমানন্দে কালাতিপাত করা। তেমনি গবেষণাক্ষেত্রেও একশ্রেণীর গবেষক দেখা যায় যাঁরা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধের দোহাই দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রের ও ঘটনার ছিদ্রান্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। রামমোহন সম্বন্ধে একশ্রেণীর গবেষকদের মধ্যে এই ধরণের বিকৃতপ্রবৃত্তির প্রাবল্য দেখা যায়। এই কারণে তাঁদের গবেষণার অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও, তার মর্যাদাহানি হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। আলোচ্য গ্রন্থ সোফিয়া ডবসন কোলেট-এর বিখ্যাত ইংরেজী রামমোহন-চরিত। বর্তমান পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি। সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য হল সম্পাদকদের অভিনিবেশ সহকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সংযোজন, পুরাতন ভুল তথ্য সংশোধন এবং রামমোহন ও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার অপনোদন। ফলে বর্তমান সংস্করণে জীবনচরিতখানি মূলগ্রন্থের প্রায় দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে এবং একখানি প্রামাণিক রামমোহন-চরিত উপহার পেয়ে পাঠকরা উপকৃত হয়েছেন।

লেখিকা সোফিয়া ডবসন কোলেট প্রায় সারাজীবন অসুস্থ ছিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় তিনি এই চরিতগ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেন। বইখানির কিছুটা অংশ লেখার পর তিনি একরকম অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তাঁর বন্ধু রেভারেণ্ড হারবার্ট স্টেড'কে অনুরোধ করেন পাণ্ডুলিপি শেষ করতে। স্টেড-লিখিত পাণ্ডুলিপির খানিকটা অংশ তিনি নিজে দেখে সংশোধন করতে পেরেছিলেন, বাকি অংশ পারেন নি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রেভারেণ্ড স্টেড অবশ্য যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে কোলেট'এর ইচ্ছানুযায়ী পাণ্ডুলিপি শেষ করে বইখানি প্রকাশ করেছিলেন। তা হলেও যে অবস্থায় বইখানি লেখা হয়েছিল তাতে নানা দিক

থেকে রচনাতে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে এবং স্বভাবতই তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে। তখন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি উন্নত ও বিস্তৃত ছিল না, তাই রামমোহন সম্বন্ধে অনেক তথ্য লেখিকার অগোচরে থেকে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত কোলেট'এর এই ইংরেজী রামমোহন-চরিত অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অতঃপর ১৯১৩ সালে কলকাতার 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বইখানির একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং তাতে রামমোহনের একটি আত্মজীবনী-পত্র ও কোলেট'এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন করা হয়। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট-বিভাগে এই দুটি ছাড়াও আরও ন'টি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। বিষয়গুলি এই :

প্রেস-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের আবেদন; পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সমর্থনে আমহার্স্ট'কে লিখিত রামমোহনের বিখ্যাত পত্র; সতীদাহ-নিবারণের জন্য উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে প্রদত্ত রামমোহন ও তাঁর সহযোগীদের অভিনন্দনপত্র (বাংলা ও ইংরেজী) এবং বেন্টিঙ্কের উত্তর; ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট-ডীড; রামমোহন-রচিত ইংলণ্ডের সম্রাট চতুর্থ-জর্জের কাছে মোগল বাদশাহ দ্বিতীয়-আকবরের আবেদনপত্র; জেরিমি বেন্থাম ও রামমোহন রায়ের পত্রাবলী (একটি পত্রের প্রতিলিপিসহ); রবার্ট ডেল ওয়েন'কে লিখিত রামমোহনের পত্র (প্রতিলিপি সহ); ফ্রান্স-যাত্রার পূর্বে রামমোহনের চিঠিপত্র, বোর্ড অফ কমিশনার্স-এর সেক্রেটারি ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত; রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে গঞ্জাম-বহরমপুর অঞ্চলের (উড়িষ্যা) অধিবাসীদের মনোভাব (মাদ্রাজ রেকর্ড আফিস থেকে সংগৃহীত)।

বিষয়গুলি সবই যে নতুন তা নয়, অধিকাংশই পুরাতন। পরিশিষ্টে সংযোজিত করার উদ্দেশ্য, মূল উপাদান সহযোগে জীবনচরিতখানি যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। নতুন তথ্যের মধ্যে মাদ্রাজ মহাফেজ-খানার দলিলখানি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে তৎকালে সাধারণ মানুষের মনোভাব কি রকম ছিল তার খানিকটা আভাস এর মধ্যে পাওয়া যায়। 'ইউটিলিটেরিয়ান'-চিন্তাধারার প্রবর্তক জেরিমি বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের যোগসূত্রের কথা পূর্বজ্ঞাত ছিল, কিন্তু Utilitarianism সমাজদর্শনের কতদূর প্রভাব ছিল ভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষাক্ষেত্রে এবং রামমোহনের চিন্তাধারাকেই বা কতখানি তা রূপায়িত করেছিল, বর্তমান গ্রন্থে সে-বিষয়ে আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নি। মনে হয় অষ্টম অধ্যায়ের (Embassy to Europe) 'Supplementary Notes'এ এ বিষয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হত (দ্রষ্টব্য : Eric Stokes : *The English Utilitarians and India*, Oxford. 1959)। ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার প্রবর্তক রবার্ট ওয়েন'এর সঙ্গে রামমোহনের সংযোগও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ওয়েন'এর পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পত্র থেকে উভয়ের আদর্শগত ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে নতুন চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। সম্পাদকরা বিষয়টির প্রতি তাঁদের টীকার মধ্যে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং করা খুবই সঙ্গত হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে হয়, ওয়েন-প্রবর্তিত 'সোশ্যালিজম্' ও বেন্থাম-প্রবর্তিত 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম্'— এই দুই সমাজদর্শনের প্রভাব ও ঘাতপ্রতিঘাত রামমোহনের চিন্তাধারাকে কিভাবে ও কতদূর পরিচালিত করেছিল, তা নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করার সুযোগ আছে।

কোলেট'এর মূল রামমোহন চরিত সম্পাদনকালে সম্পাদকরা প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের যথার্থতা অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছেন এবং যা বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য তা বর্জন করেছেন। রামমোহনের পারিবারিক জীবন, পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত, তিব্বত-যাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন, তেজারতি ব্যবসায়ের বিবরণ, 'তুহফত্' রচনার গভীরতা বিচার, রামগড় (বিহার) যশোহর ভাগলপুর রংপুর প্রভৃতি স্থানে রামমোহনের কর্মজীবনের বর্ণনা, রামমোহনের মামলা-মকদ্দমার যথার্থ পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থের 'অতিরিক্ত টীকা'তে সযত্নে সন্নিবেশিত করেছেন। শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত *Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy* (Calcutta 1938) এবং শ্রীমজুমদার সম্পাদিত *Raja Rammohun Roy and the last Moghuls* গ্রন্থ থেকে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করে সম্পাদকরা বর্তমান রামমোহন-চরিতে সংযোজন করেছেন। এইসব নতুন উপাদান পরিবেশনের ফলে রামমোহন সম্বন্ধে পূর্ব-প্রচারিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হবে বলে মনে হয়। অবশ্য যাঁরা যুক্তিবাদী নন এবং আসল ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন যে কোনো লাগসই তথ্যকে যাঁরা নিজেদের বদ্ধমূল চিন্তাধারার সমর্থনে কাজে লাগান, তাঁদের মতামত পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। এমন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিও এ দেশে আছেন, এবং একাধিক আছেন, যাঁরা রামমোহন ও তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ বা চিন্তাধারা সম্বন্ধে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে অকাট্য সত্যের মতো আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। সহস্র তথ্যের সাক্ষীর কাছেও তাঁদের নিজেদের সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং তাকে অগ্রাহ্য করতে চায়। আলোচ্য গ্রন্থের পর্যাপ্ত সংশোধিত তথ্য তাঁদের কাছে উপাদেয় না মনে হলেও, বাংলাদেশের ও বাইরের শিক্ষিত সাধারণ পাঠকরা এ বই পাঠ করলে অন্তত তাঁদের অপপ্রচারের প্রভাব থেকে যে মুক্তি পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

এইসব খুঁটিনাটি তথ্য ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পাদকরা তথ্যনির্ভর যুক্তির সাহায্যে নতুন আলোকপাত করেছেন। কুলাবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ, তন্ত্রধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের অনুসন্ধানী অনুরাগ তাঁর জীবনের দিক থেকে চিন্তা করলে খুব সামান্য ঘটনা বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত বলছি, হরিহরানন্দ যে-পালপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তা হুগলি জেলায় নয় (পৃ ১০১), নদীয়া জেলায়। পালপাড়া বিখ্যাত প্রাচীন গ্রাম, এবং তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন। তান্ত্রিক আচার-অনুশীলনের একটি প্রধান বৃত্তের মধ্যে নদীয়া জেলায় এই গ্রামটি অবস্থিত। রামমোহন কেন তন্ত্রানুরাগী হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সম্পাদক দিলীপকুমার বিশ্বাস স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করলেও, আলোচ্য গ্রন্থে আরও বিস্তৃত আলোচনা থাকলে বোধ হয় ভাল হত। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠায় রামমোহন কেন প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকতে পারেন নি তা নিয়ে বিচক্ষণ ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্পাদকীয় আলোচনা (পৃ ১০২-৪) আরও দীর্ঘতর হওয়া উচিত ছিল মনে হয়। 'ব্রহ্মসভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজ', 'ব্রহ্ম ও ব্রাহ্ম' ইত্যাদি কথা নিয়ে, অর্থাৎ রামমোহন ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন নি, ব্রহ্মসভা করেছিলেন—এই বিষয় নিয়ে কিছুদিন হল একটা বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। তথ্য ও দলিলপত্র সহযোগে সম্পাদকরা তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন, এর পর এই বিষয়ে আর কোনো বিতর্ক হতে পারে বলে মনে হয় না।

সতীদাহ-নিবারণ, শিক্ষা ও সাংবাদিকতা, সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের চিন্তা ও দান সম্বন্ধে

কোলেট'এর আলোচনা পর্যাপ্ত নয় বলে সম্পাদকরা নতুন তথ্য দিয়ে সেই অভাব অনেকটা পূরণ করে দিয়েছেন। ভারতে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাস এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের বিখ্যাত কয়েকটি উক্তির নানারকমের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিকৃত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। অপব্যাখ্যার ঔদ্ধত্যে কেউ কেউ এমনও মনে করেছেন যে রামমোহন এ দেশে ইংরেজ-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, কেউ কেউ ভেবেছেন তাঁর খ্রীষ্টধর্মপ্রিয়তা স্বধর্মানুরাগের চেয়ে প্রবলতর ছিল। এই দুটি ধারণাই একেবারে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। ঐতিহাসিক সমগ্রতাবোধ না থাকলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্য যে কি ভয়ানক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করতে পারে, রামমোহন সম্বন্ধে এইসব 'ধারণা' তার প্রমাণ। অতীতের গোরস্থান থেকে কেবল কতকগুলি মৃত তথ্য-ঘটনার কঙ্কাল খুঁড়ে বার করলেই 'ঐতিহাসিক' হওয়া যায় না। তা হতে হলে ঐতিহাসিক ধারার 'সমগ্রতা' সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের ইতিহাসধারা সম্বন্ধে এই সমগ্রতাবোধ থাকলে রামমোহনের পূর্বোল্লেখিত উক্তির অপব্যাখ্যা কোনোমতেই সম্ভব নয়। ইউরোপীয়দের বসবাসের বিষয়টি বিদেশীর রাজ্যশাসনের দিক থেকে রামমোহন আদৌ বিচার করেন নি। বিদেশী পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের সংবাদ পেয়ে (যেমন দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তিসংবাদে) যিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং দাসত্ববন্ধনের সংবাদে (যেমন নেপল্‌সবাসীদের) যিনি মর্মাহত হতেন, এ দেশে ইংরেজ শাসনের গোড়াতেই যিনি সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষে নির্ভয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন, পদে পদে যিনি উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিদের কাছে মাথা উঁচু করে চলেছেন, আত্মমর্যাদা এতটুকু ক্ষুন্ন হতে দেন নি, তিনি এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী ইংরেজশাসন কামনা করবেন এরকম বিসদৃশ ধারণার বশবর্তী হওয়া কেবল বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভব। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে উন্নতিশীল ছিল, এবং প্রাচ্যসভ্যতা, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজ-সভ্যতা, মোগলযুগের প্রথম সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পর ধীরে ধীরে স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া ও কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ভারতীয় সমাজের জড়তা ও স্থবিরতাকে আঘাত করে ভাঙবার জন্য, জঙ্গম ও জীবনধর্মী করবার জন্য তখন পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার সংস্পর্শের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের কথা মনে করেই রামমোহন এ দেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের প্রসঙ্গ একদা উত্থাপন করেছিলেন। মানবসমাজের ইতিহাসে পৃথিবীর বহু সভ্যতার উত্থানপতন ও পুনরুজ্জীবন হয়েছে এই 'culture-contact' 'acculturation'এর ফলে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে তার বৃত্তান্তও অনেক প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং রামমোহন বিভ্রান্তবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে যে এরকম কোনো চিন্তা করেছিলেন তা ভাববার কোনো অবকাশই নেই।

স্বধর্মানুরাগের চেয়ে রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মপ্রীতি প্রবলতর ছিল, এমন উক্তি বা চিন্তা তাঁদের পক্ষেই করা সম্ভব যাঁরা তাঁর ধর্মাদর্শ ও ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ দেশে বিদেশী খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা এবং স্বধর্মকে (হিন্দুধর্ম) ব্যভিচার-বিকৃতির পঙ্ককুণ্ড থেকে পুনরুদ্ধার করাই ছিল রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শংকর ও শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগে ইসলামধর্মের সংঘাতকালে স্বধর্মরক্ষার্থে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আধুনিকযুগে খ্রীষ্টধর্মের সংঘাতকালে রামমোহনও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁকে স্বধর্মবিরাগী ও পরধর্মানুরাগী বলে অভিযুক্ত করলে অসত্যের অবতারণা করা হয়।

রামমোহন সম্বন্ধে কোলেট'এর আলোচ্য জীবনচরিতে এই ধরণের নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এবং মূল জীবনচরিতে কোলেট বা রেভারেণ্ড স্টেড যা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান নি, বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় সেগুলি যথাসম্ভব তথ্যাশ্রিত যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। রামমোহন সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা ও অসত্য উক্তি তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে দূর হবে আশা করা যায়। ছোট বড় প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদকদের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ঐতিহাসিক সত্যটিকে ভ্রান্তি ও মিথ্যার ভিতর থেকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের আন্তরিকতার ও সততার অভাব হয় নি। এ বই প্রত্যেক সত্যসন্ধানী পাঠকের কাছে যে সমাদৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিনয় ঘোষ

THE OLD BENGALI LANGUAGE AND TEXT by Tarapada Mukherji. University of Calcutta, 1963, I-XII, 1-203, 3 plates. Rs. 12·00

হাজার বছর আগে বাংলা নামক একটা ভাষার অস্তিত্ব ছিল, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও অনেকে তাহা ধারণা করিতে পারিতেন না।[১]

সেদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীচৈতন্যকে অতিক্রম করিবার ভরসা পায় নাই। রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে (১৮৭২-৭৩) কাশীদাস কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাংলা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী পাঠকের ধারণা হইল তিন চার শ' বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় কয়েকটি কাব্য লেখা হইয়াছিল। তাহার পরেও ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা কিছু কিছু চলিতে থাকে বটে কিন্তু তাহা আমাদের বর্তমানমুখী জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে যতই সহায়ক হউক না কেন অতীতের উপর তেমন কিছু অতিরিক্ত আলোকপাত করিতে পারে নাই। ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পুঁথি আবিষ্কৃত হয় ১৯০৭ সালে। ধরা যাইতে পারে এই ১৯০৭ সালেই— অর্থাৎ আজ হইতে ঠিক ছাপ্পান্ন বছর আগে— আমরা প্রথম সুনিশ্চিত ভাবে জানিতে পারি যে বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের কম নয়। শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষার ইতিহাসের যে পূর্বসীমান্ত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন আজ পর্যন্ত আমরা তাহাই মানিয়া আসিতেছি।

'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামক গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাপ্ত চারিটি পুঁথি একত্র মুদ্রিত হইয়াছে,— (১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ও তাহার সংস্কৃত টীকা, (২) সরোজবজ্রের দোহাকোষ

১ এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত নামসংক্ষেপগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে :

হ. শা.=হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩।

ODBL=সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, 1926.

চ. প.=সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী', প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৬।

OBLT=তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থ।

ও তাহার সংস্কৃত টীকা, (৩) কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষ ও তাহার সংস্কৃত টীকা এবং (৪) ডাকার্ণব।

এই চারিটি পুস্তকের ভাষার মধ্যেই বঙ্গীয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষাকেই খাঁটি বাংলা বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার Origin and Development of the Bengali Language নামক প্রামাণিক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"the dialect of 'Caryas' alone is Old Bengali, as its peculiar Bengali forms show." ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ওই গ্রন্থেরই ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "The language of the Caryas is the general vernacular of Bengal at its basis".

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি সংগ্রহের তারিখ ১৯০৭, মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ১৯১৬ এবং ODBL প্রকাশের তারিখ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০৭ হইতে ১৯২৬এর মধ্যে অর্থাৎ বর্তমান শতকের প্রথম পাদের শেষভাগেই বাংলা ভাষার জন্মকাল প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই নির্ধারিত হইয়া গেল। সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব—এই তিনটি বই কতটা বাংলা বা বাংলা নয় তাহা বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত কিন্তু চর্যাপদগুলির ভাষা যে বাংলা ছাড়া আর কিছু নয় সে সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সুনীতিবাবুর দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় নিরাকৃতসংশয়ে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তারাপদ মুখোপাধ্যায় The Old Bengali Language and Text গ্রন্থে এই প্রাচীন বাংলা ভাষারই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন। চর্যাপদগুলি অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রাচীন বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহা আয়তনে বৃহৎ নয়, কিন্তু সুপরিকল্পিত এবং সুবিন্যস্ত। প্রাচীন বাংলার ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইলে আমাদের নির্ভর করিতে হয় প্রধানতঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ODBL এবং সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্তের উপরে। মণীন্দ্রমোহন বসু স্বসম্পাদিত 'চর্যাপদ' গ্রন্থে চর্যার ব্যাকরণ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতিপদাবলী গ্রন্থে ভূমিকার ৯ম পরিচ্ছেদে চর্যার ভাষা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান্ আলোচনা আছে। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে এইসকল উপকরণ তো ছিলই, আরও একটি দুর্লভ উপকরণ তিনি পাইয়াছিলেন, এতজ্জাতীয় গ্রন্থপ্রণয়নের পক্ষে যাহার মূল্য অপরিমেয়। সে হইল প্রাচীন ভাষার অধ্যয়ন ও বিচারের জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন সেই পদ্ধতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। লণ্ডনের School of Oriental and African Studies-এর সহিত তাঁহার যোগাযোগের ইহা একটি সুফল বলিয়া মনে করি।

বইটি ইংরাজিতে লিখিত হওয়ায় একটা সুবিধা হইয়াছে বিদেশী পাঠকেরাও ইহার সাহায্যে প্রাচীন বাংলা ভাষা সম্পর্কে কৌতূহল অনেকটা মিটাইতে পারিবেন। সঙ্গে রোমান হরফে চর্যাপদগুলি মুদ্রিত হওয়ায় দৃষ্টান্তসহ প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ পাঠ করিবার অভূতপূর্ব সুযোগ হইল। একালে শুধু ভারতের নয় ইউরোপ-আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও ভারতবিদ্যার পঠন-পাঠন হইতেছে। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা (N. I. A.) সমূহের তুলনামূলক অধ্যয়নের পক্ষে এই বইটি একটি চিরানুভূত অভাব পূরণ করিবে।

গ্রন্থকার বইটির নাম দিয়াছেন The Old Bengali Language and Text, এই নামটির সংগতি সম্পর্কে একটু সংশয় জাগে। আসলে তিনি যেটিকে Text বলিতে চান সেটাই—অর্থাৎ চর্যাগীতিই—তো

মূল বই। তাহার প্রসঙ্গে যে আলোচনা করিয়াছেন বা তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহা চর্যাগীতিরই আলোচনা, চর্যাগীতিরই ব্যাকরণ।

তাঁহার মুখবন্ধেও চর্যাগীতি সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাব দেখা যায়। মুখবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি এই— This book aims at presentation, as far as the materials permit, a description of the old Bengali language and suggesting probable readings that are linguistically valid। গ্রন্থকার সম্ভাব্য পাঠান্তরের কথা বলিয়াছেন। কিসের পাঠান্তর সে কথা আরম্ভে বলা হয় নাই। পাঠান্তরের কথা যে চর্যাগীতির পাঠ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ওই ছত্রগুলি পড়িলে মনে হয় গ্রন্থকার "old Bengali language" এই শব্দগুলিকে যেন "চর্যাগীতি"র সমার্থক রূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। কয়েক ছত্র অগ্রসর হইলেই অবশ্য সকল অস্পষ্টতা দূর হইয়া যায়, বোঝা যায় গ্রন্থটি চর্যাগীতিরই বৈয়াকরণিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত এক সটীক সংস্করণ।

চর্যাগীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, The old Bengali texts are studied in our universities mainly as religious documents, which indeed they are, although one admits that they are far more important linguistically। গ্রন্থকারের এই মন্তব্যের সহিত আমি একমত। আমরা যখন এই-সকল পদ প্রচীন ভাষা অধ্যয়নের জন্য অথবা ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করি তখন ধর্মতত্ত্বের কথা ভাবি না, পুরাতন ভাষার নিদর্শন পুরাতন সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবেই এগুলির বিচার করি। কিন্তু পড়াইবার সময় এবং প্রশ্ন রচনার সময় সেকথা ভুলিয়া যাই। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্লাস যে পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্রের ক্লাস নয় ইহা সব সময় স্মরণ করি না। ভাষাতত্ত্বের কাঁধে ধর্মতত্ত্বের ভারী বোঝা চাপাইলে দুইয়েরই অগ্রগতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কাহ্নুপাদের একটি চর্যাগীত এইরূপ :

জো মণ গোএর আলাজালা
আগম পোথী ইষ্টামালা ॥ধ্রু॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমায় ॥ধ্রু॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ॥ধ্রু॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল ॥ধ্রু॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ বিকসই সা
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ধ্রু॥

[চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ৪০ সংখ্যক পদ]

বিকল্পজাল যে মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা যে মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া

সহজকে বুঝাইয়া দিবে ? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিস বাক্‌পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইবে ? যে সে বিষয়ে কিছু বলে সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন, কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়। [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ]

সহজ সাধনমার্গের পথিক জিনরত্ন বুঝিবার চেষ্টা করুন কিন্তু আমাদের সে সৎসাহস নাই ; কায় বাক্ চিত্ত যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশের স্পর্ধা করিব কেমন করিয়া ? আমরা শব্দগুলির বহিরঙ্গ পরীক্ষা করিব মাত্র। অবশ্য বহিরঙ্গ-পরীক্ষা যতটা সূক্ষ্ম যতটা নীরন্ধ্র হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। যেমন ধরা যাক্, পদটির অষ্টম ছত্রে 'গুরু বোধসে' ইহার আর এক পাঠ পাওয়া যাইতেছে বৃত্তি হইতে। বৃত্তিতে বলা হইয়াছে "যোঽপি বজ্রগুরুঃ সোঽপি অস্মিন্ ধর্মে বচন-দরিদ্রত্বেন যুক্তঃ"। গুরুর "বচনদরিদ্রত্ব" হইতে বোঝা যায়, বৃত্তিকার যে পাঠ দেখিয়া টীকা লেখেন তাহাতে ছিল "গুরু বোব সে সীসা কাল"। অথবা নবম ছত্রে "ভণই কাহ্নু জিনরঅণ বিকসই সা" ইহার স্থলে বৃত্তি অনুসারে পাঠ হয় "ভণই কাহ্নু জিনরঅণবি কইসা"। ভাষাতত্ত্বের অধ্যেতা বিচার করিবেন, "বিকসই সা" এবং "বি কইসা" এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা শুদ্ধ কোন্‌টা সংগত। তিনি কালাবোবার কথোপকথনের তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। বস্তুতঃ ভাষার ক্লাসে পালি প্রাকৃত অপভ্রংশ যে ভাবে পড়া হয় চর্যাপদ সেই ভাবে পড়িতে হইবে। প্রাচীন বাংলার লক্ষণ কি, ইহার পদে-পদে সে লক্ষণ কোথায় ব্যক্ত হইতেছে, ইহা যে অপভ্রংশের ঠিক পরবর্তী রূপ কিন্তু অপভ্রংশ নয় তাহা কেমন করিয়া বুঝিতেছি, ইহার কতগুলি লক্ষণ এবং কোন্ কোন্ লক্ষণ মধ্যযুগীয় অর্থাৎ তৎপরবর্তী কাল পর্যন্ত অবিকৃত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, কোন্ কোন্ শব্দে পরিবর্তন ঘটিয়াছে— এই সবই ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের পক্ষে বিচার্য। অবশ্য ইহার মধ্যে যে সাহিত্যরসটুকু আছে তাহাও উপভোগ্য। জিনরত্ন যে কি জিনিস তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই দুর্বোধ্যতার প্রকৃতিটি বুঝাইবার জন্য কবি যে উপমা দিয়াছেন তাহার ব্যঞ্জনাটি চিত্তাকর্ষক। সেটাও আমরা উপেক্ষা করিব না।

আর একটি পদ উদ্ধৃত করি :

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতি এঁ সো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ধ্রু॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ধ্রু॥
মরুমরীচিগন্ধনইরীদাপতিবিম্ব জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ধ্রু॥
বাঁদ্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ॥ধ্রু॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব ॥ধ্রু॥

[চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ৪১ সংখ্যক পদ]

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা একথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্যসত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্বনগর, দর্পণপ্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন— কি আশ্চর্য, ভুসুকু বলেন— কি আশ্চর্য! সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সৎগুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ]

এই পদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে— জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, যাহা আছে বলিয়া ভাবিতেছ আদৌ তাহার অস্তিত্ব নাই। যদি বল, যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অবিশ্বাস করিব কি করিয়া? তাহার উত্তর, একগাছা দড়ি দেখিয়া যখন সাপ বলিয়া মনে কর, তখন তুমি সাপ ভাবিয়াছ বলিয়াই দড়িটা তো সাপ হইতে পারে না।

ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু এই পদ পাঠ করিবার সময় জগৎ মিথ্যা কি মিথ্যা নয় এ সমস্যা লইয়া মোটেই বিচলিত হইবে না। সে দেখিবে জগৎ মিথ্যা প্রমাণ করিতে পদকর্তা যে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উপমা দিয়াছেন তাহা কতখনি সার্থক হইয়াছে। সে দেখিবে— বন্ধ্যার পুত্র যেমন মিথ্যা, বালুকার তৈল যেমন মিথ্যা, শশকের শৃঙ্গ যেমন মিথ্যা, আকাশের কুসুম যেমন মিথ্যা, মরুর মরীচিকা যেমন মিথ্যা, দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন মিথ্যা জগতের অস্তিত্বও তেমনি মিথ্যা— কবির এই রূপকগুলি আলংকারিতার দিক দিয়া কতখানি সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। যে পাঠক নিতান্তই ভাষাতত্ত্বের অনুরাগী সে 'পড়িহাই' দেখিয়া উৎফুল্ল হইবে। 'প্রতিভাতি' কেমন করিয়া 'পড়িহাই'তে পরিণত হইল এবং সেই 'পড়িহাই' আরও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কি ভাবে ওই রূপ এবং ওই অর্থ বহন করিয়া মধ্যবাংলা পর্যন্ত চলিতে থাকিল, তাহার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিবে। সে বিচার করিয়া দেখিবে 'ষাবে' এবং উহার পাঠান্তর 'সাঁচে' এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। সে চিন্তা করিবে বন্ধ্যা শব্দের রূপান্তর একস্থলে যখন 'বাঁঝ' (৩৩ সংখ্যক পদ) পাইতেছি তখন অন্যত্র 'বান্ধি' (৪১ সংখ্যক পদ) পাই কেন।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় পুরাপুরি শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলা ভাষার এই প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি তৎকালীন বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সামগ্রিক ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ইহার কোনো মূল্য নাই। একদল উৎকেন্দ্রিক মানুষ সব দেশেই আছে যাহারা কাব্যও পড়ে না শাস্ত্রও পড়ে না, অনর্থক ব্যাকরণ পড়িয়া দ্বাদশ এমনকি ততোধিক বৎসর কাটাইয়া দেয়। এ বই তাহাদের কাছে সমাদর পাইবে। সৌভাগ্যক্রমে দিনে দিনে তাহাদের দলও বৃদ্ধি পাইতেছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থকার চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি হইতে কয়েকটি অক্ষরের পরিবর্ধিত আলোকচিত্র

দিয়াছেন। ফলে, এই অক্ষরগুলির সহিত আধুনিক বাংলা অক্ষরের সাদৃশ্য যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা তুলনা দ্বারা বুঝিবার সুবিধা হইল।

"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" প্রকাশিত হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া চর্যাকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষার আদিপর্বের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে পাঠের পাঠান্তর প্রস্তাবিত হইয়াছে। পদের অর্থ সম্বন্ধে মত ও মতান্তর ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নূতন কোনো উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বাকের সংগ্রহ হইতে কয়েকটি নূতন পদ নকল করিয়া আনিয়া চর্যাপদ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নূতন করিয়া উদ্রিক্ত করিয়াছেন। আমাদের পরিচিত চর্যাপদগুলির সহিত এইসকল পদের কোনো-কোনোটির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। একটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাই :

এ মহিমণ্ডল মেরুসমুদ্রা।
জনধন জউবন উদবিন্দুচন্দ্রা।
পেখুরে অণুদিন লোঅন গঅনে।
ফুল্ল পরিহাসই জিণ গুণ রঅণে।
স্কন্ধে ধারী ইন্দি বিষয় সর্ব একা।
সমুদ্রতরঙ্গ জিমু একু অনেকা।
পবন দুই ভেদিআ।
ডিঢ় থিরে চিআ।
জলই বজ্রানল দহ দিহ ডাহিআ।
সুগত! ভেদ ভাবইআ নহোইরে শোধা।
সুগত ভণই অচিন্তালঅ বোধা।

যে নকল পুঁথি হইতে পদগুলি নকল করা হইয়াছিল সেগুলি বেশি পুরাতন নয়, কোনোটিরই বয়স দুই-শ বছরের অধিক হইবে না। তবু পদগুলির ভাষায় পুরাতনত্ব আছে। উদ্ধৃত পদটির অন্তর্ভুক্ত অনেক শব্দ চর্যাপদের কোনো-না-কোনো পদে অবিকৃত অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়। যেমন—

জউবন— জোবণ চর্যা ২০। ছত্র ৭
পেখু— পেখ ৩০।৪, ৪৬।৬
অণুদিন— অণুদিন ৫০।১০, অনুদিন ৪২।৪
গঅনে— গঅণ ৮।৩, ১৪।৬, ১৬।৪, ৩০।৩, ৪৩।৪, ৪৫।২, ৪৭।৬ ; গঅণে ২১।৮, ৩৮।১০ ইত্যাদি।
ফুল্ল— ফুলিলা ৪১।৮
জিণ গুণ রঅণ— জিণরঅণ ৪০।২
ইন্দি— ইন্দি ৪৫।১

পবন— পবণা ২১।৩, ৩১।১
ডিঢ়— দিঢ় ১।৩, ৩।৪, ৫।৬, ১১।১
থিরে— থির ৩।৩, ৫।৬, ৩৮।৩ ; থিরা ২০।২
চিআ— চিঅ ১৩।২, ৩১।৬, ; ৩৪।১, চীঅ ৩৮।৩
দহদিহ— দহদিহ ৩৫।৫ ; দহদিহে ৫০।১৩
ডাহিআ— ডাহ ৪৭।৭, ৫০।১২
হোই— হোই ৩।৪, ১৭।১০
শোধা— সুধ ২৭।৭ ; সুধ ৯।৭

ইন্দিবিষয়— ইংদিবিসঅা ৪৯।৫
জিমূ— জিম ১৩।৩, ২৯।৮
একু— একু ৩৪।৭, ১৫।৪, ২।১০
ভণই— ভণই ১।৯, ৪।৯, ৭।৬, ৭।১০ ইত্যাদি
অচিন্তালঅ— অচিন্ত ২২।৩

চর্যায় যেসকল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ইহার মধ্যেও সেরূপ আছে। যেমন— গঅন, পবন ও জিণ ·রঅন। রচনাভঙ্গী প্রায় একরকম। পদকর্তার নাম স্বগত। ড. দাশগুপ্তের সংগৃহীত পদে আরও কয়েকজন নূতন পদকর্তার নাম পাওয়া যাইতেছে। সেগুলি প্রকাশিত হইলে অনেক নূতনতর তথ্য পাওয়া যাইবে।

এতাবৎ প্রাচীন বাংলা ভাষা আলোচনার জন্য সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের উপরেই পণ্ডিতদের নির্ভর করিতে হইয়াছে। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণে উপকরণের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইবে এবং সেজন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীনন্দলাল বসু। লেখক: কানাই সামন্ত। প্রকাশক: কথাশিল্প-প্রকাশ, কলিকাতা-১২। সচিত্র সংকলন। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

কবি ও সমালোচক কানাই সামন্ত আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু সম্বন্ধে এই বইখানিতে নন্দলালের ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিল্পপ্রতিভা এবং শিল্পপ্রেরণার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করেছেন অনুরূপ ভাবে নন্দলাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বোধ হয় কেউ আলোচনা করেন নি। কবির অন্তর্দৃষ্টি, সমালোচকের উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ, উভয় দিক দিয়েই তাঁর আলোচনা সার্থকতা লাভ করেছে।

আচার্য নন্দলালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ তার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাবে যথাক্রমে 'রূপরাগের কবি চিত্রকর' এই প্রবেশক গদ্য কবিতায় ও 'জীবনকথা' প্রবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই প্রতিভাকে সাক্ষ্য রেখে যে ভাবে নন্দলালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটেছিল তারই প্রকাশ নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের প্রায় সমস্ত লেখাতে। নন্দলালের শিল্পসৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন গতিকে মূর্ত করে তুলেছেন লেখক তাঁর 'প্রতিভা ও রূপশৈলী' প্রবন্ধটিতে। নন্দলালের শিল্পপ্রেরণার উন্মেষ থেকে শুরু করে 'ভাবে ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ' শিল্পসৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে।

আচার্য নন্দলালের সম্প্রতি কালের রচনার সঙ্গে অতি অল্প লোকই পরিচিত। সাম্প্রতিক কালের রচনা সম্বন্ধে লেখকের তথ্যপূর্ণ আলোচনা রসিক মাত্রেরই মনে কৌতূহল জাগাবে। নন্দলাল তাঁর পরিণত বয়সে রচনার মাধ্যমে কী উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা শিল্পীর মুখের কথা থেকেই লেখক জেনেছেন এবং সাধারণকে জানিয়েছেন। 'অভ্যস্ত কোনো রীতিতে নয়, এখন আঁকতে চাই সম্পূর্ণ নূতন ক'রে নূতন ছবি। আমার কাছেও সেটি হোক নূতন আবিষ্কার।' 'নূতন তাৎপর্য' প্রবন্ধটিতে লেখক শিল্পের আধুনিকতা ও বিমূর্ত শিল্প-আদর্শ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনাটি আধুনিক মনোভাবাপন্ন

শিল্পী মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। বিমূর্ত-শিল্প-সৃষ্টির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুরূপ প্রামাণিক আলোচনা বাংলা ভাষায় দৈবাৎ পাওয়া যাবে। পুস্তকের শেষে নন্দলালের ৫৬৬ খানি ছবির তালিকা ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীনন্দলালের নানা সময়ের আঁকা ১৯ খানি সুনির্বাচিত ছবি ও স্কেচের প্রতিলিপি থাকায় এ বইয়ের শোভা সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা বেড়েছে।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২। মূল্য বারো টাকা।

"১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঁচটি নূতন অধ্যাপকপদের সৃষ্টি হয় ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ তার মধ্যে একটি।" শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও যোগ্যতম শিল্পব্যাখ্যাতা হিসাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবনীন্দ্রনাথকেই প্রথম অধ্যাপক -রূপে বরণ করেন। ফলে "১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে" অবনীন্দ্রনাথ "প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে ছত্রে আর্ট-এর ব্যাখ্যা করে চলেছে' সে কথা তাঁর আগে কোনো পণ্ডিতই বলেন নি। তাঁর সেই সকল বক্তৃতা তখনকার 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।· ·প্রায় এক যুগ পরে··· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।··· তার পর প্রায় বিশ বাৎসরাধিক কাল অতীত হয়ে গেছে।" মধ্যে বহু বৎসর এ বই কেউ সংগ্রহ করতে পারেন নি। এতদিন পরে এই মহামূল্য ভাষণগুলির পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ায় এবং বিশেষ সুরুচি ও সৌষ্ঠব -সহকারে 'রূপা' সে কার্য সমাধা করায় এ দেশের শিল্প ও সাহিত্য -রসিক মাত্রেই খুশী হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় সাড়ে তিন শো পৃষ্ঠার বই, ছাপা বাঁধাই সব দিক দিয়েই উৎকৃষ্ট, এ জন্য বইয়ের দাম সংগ্রহেচ্ছুক সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু বেশি হলেও, বিশেষ অনুযোগ করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতি, আচার্য নন্দলালের প্রাগুক্তি এবং গ্রন্থশেষে প্রায় এক শত উদ্‌ধৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটি আধারগ্রন্থপঞ্জী, এ ছাড়া এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ বলতে পারি। যে উনত্রিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তার সূচনায় রয়েছে— শিল্পে অনধিকার, শিল্পের অধিকার, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, সৌন্দর্যের সন্ধান, অন্তর বাহির প্রভৃতি; মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ হল— শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভাল মন্দ, শিল্পবৃত্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম; আর সব শেষে সন্নিবেশিত ভারতীয় শিল্প-ষড়ঙ্গের আলোচনা— রূপ, রূপের মান ও পরিমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ। অর্থাৎ, শিল্পের ভাবময় রসময় মর্মের কথা, প্রকরণের রহস্য, তত্ত্ববিজ্ঞান, সব কিছুই নিজস্ব অনুপম অননুকরণীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, একাধারে যিনি গুণী, আচার্য এবং রসিক। ভাবসিদ্ধ রসোত্তীর্ণ শিল্পী বা কবির সম্বন্ধে বলা হয়েছে— এঁদের মনটি যেন পরিপূর্ণ কলস, কোনো দিক থেকে একটু নাড়া পেলেই উছলে পড়ে পুণ্যবারি, অবস্থাভেদে তাকেই বলা হয় ছবি কবিতা গান বা আলাপ আলোচনা। পূর্ণঘট হলেও সাধারণ মৃণ্ময়

ঘট নয় সে তো বলাই বাহুল্য, বলতে হয় অক্ষয় ঘট। কেননা যত দিকে যত ধারা বয়ে যাক্, শেষ হতে দেখি নে। অনিঃশেষ উৎসারই বলা চলে। এমনি রসের উৎস, ভাব ও কল্পনার অফুরান সঞ্চয় ছিল অবনীন্দ্রনাথের কবিমানসে, এ কথা এক-দিন এক-বেলা তাঁর সঙ্গ যে পেয়েছে সেও হয়তো জানে, আর স্বতই জানবেন এই শিল্পপ্রবন্ধাবলীর পাঠক। ফলতঃ নিত্যরসোদ্‌বেল চিত্তের থেকে স্বতঃপ্রসৃত ভাবনা কল্পনা ও অনুভূতির ধারা, এই হল এ বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি ভাষণের প্রকৃতি। যেন জোয়ারের জলরাশি। একেবারেই সবটা যে ধারণা করা যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ খেয়ে অভিভূত হতে হয় না, ঘাটে এসেই ঘট ভরে ফিরে যাওয়া যায় ঘরে, এ কথা বলতে পারি নে। এই বক্তৃতাবলীর একটি মাত্র, সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল বর্তমান লেখকের। স্পষ্ট মনে আছে কী অপূর্ব সুন্দর বলবার ভঙ্গী— অথবা সেটা কোনো ভঙ্গীই নয়, নিজের কথা নিজের মনে ব'লে যাওয়া, যারা শুনছে তারা উপলক্ষ্য মাত্র, বিমোহিতচিত্তে অন্তরাল থেকেই শুনতে পাচ্ছে এই সুদীর্ঘ স্বগত উক্তি। হাস্যজনক কোনো কোনো ভূমিকায় নামতেন অবনীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চে; এখানে ভূমিকা তাঁর একেবারেই আরেক প্রকার, ভাষণের রসাবিষ্ট ভাব ও ভঙ্গী তুলনাহীন স্বতন্ত্র এক জাতের। হয়তো এ কথা মনে হতে পারে— বহুভাষিতা ও বহু পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে এই রচনাবলীতে।[১] আমরা তা মনে করি নে। যেখানে একমুখী একাঙ্গী এরূপ আলাপের 'আদাবন্তে মধ্যে চ' রসের প্রেরণা বর্তমান, নিছক তথ্য বা তত্ত্বরাজি যুক্তিশাস্ত্রের জ্যামিতিক ছাঁদে পর পর সাজিয়ে দিয়ে মোক্ষম একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বক্তা বা শ্রোতা কারোই উদ্দেশ্য নয়, বক্তার কবি ও রসিক -প্রকৃতিতে সেটা একেবারেই পরধর্ম, সেখানে এরূপ আপত্তি করা চলে না। এবং অবনীন্দ্রনাথের লেখার অপরূপ সাহিত্যিক গুণে, নিজস্ব আবেদনে, ওরূপ আপত্তির কথা হয়তো অনেকেরই মনেও উঠবে না। জোড়াসাঁকোর এক দক্ষিণের বারান্দায় এসে যেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে গেছে বহু শিষ্য সুহৃৎ একদিন অবনীন্দ্রনাথের সরস বাক্যালাপ, সময়ের হিসাব ভুলেছে, নানা কর্তব্যের তাগাদাও সহসা মনে পড়ে নি, তেমনি তো এই প্রবন্ধাবলীর পাঠকও সরস সুন্দর সাহিত্য বলেই এ লেখাগুলি পড়বেন; বারবার পড়বার সময় সুযোগ যদি হয়, বক্তার বক্তব্যটি অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে মনে ব'সে যাবে। তারই যে সূক্ষ্ম সুদূর-প্রসারী প্রভাব, স্থায়ী উপকার, তেমন কখনো হবে কি অভ্রান্ত অকাট্য পাণ্ডিত্যের নথিপত্র ঘেঁটে— খাতার পাতায় পাতায় মূল্যবান 'নোট' সংগ্রহ ক'রে— অথবা স্বাধ্যায়োচিত অন্য কোনো প্রচলিত পরিচিত পন্থায়? ফলতঃ শিল্পীগুরু বা শিল্পপ্রবক্তা যে-কোনো ভূমিকাতেই দেখি, অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রকৃতি একই— তিনি ব্যাখ্যা করেন না, নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে শিক্ষাও দেন না, তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, অন্তর উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখান ও প্রভাবিত করেন। এমন আচার্য বা ব্যাখ্যাতা লাখের মধ্যে এক জনই পাওয়া যায় বহু ভাগ্যে— এঁরাই যুগান্তর আনয়ন করেন শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, মানুষের মানসসৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে।

বস্তুতঃ এ কথা বলা যায়— আর্ট্ কী বস্তু এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তারই ভাবময় সত্তা ও রসময় আত্মার দিকেই সর্বান্তঃকরণ আকৃষ্ট করেছেন রসিকের, অথবা উপযুক্ত শিক্ষা ও সঙ্গের অভাবে অদ্যাবধি রসিক না হলেও স্বভাবেই নিহিত রয়েছে যাঁদের রূপের স্বরূপ-বোধ ও রসাস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা। দৃশ্যপট চিত্রপট মন্দির মূর্তি

---

১ বহুজনের এরূপ মনে হওয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলেই হয়তো স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও তাই ভেবেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। ফলে বাগেশ্বরী-বক্তৃতাবলীর সার সংগ্রহ ক'রে ('নির্যাস' বলা যায়) 'শিল্পায়ন' রচনা ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই কি সংগত হয়েছিল? রামায়ণ মহাভারত বড়ো ব'লে, 'ছোট্টোদের রামায়ণ মহাভারত'ই যথেষ্ট হবে কি?

ও কবিতার রূপগুণের ব্যাখ্যা তাঁর বলার গুণে অভিনব সাহিত্য বা কবিতা হয়ে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি বুঝি পুনরুজ্জীবন করেছেন মাত্র প্রাচীন ভারতচিত্রকলার— যে রূপরীতি ছিল অজন্তায় রাজস্থানে কাংড়ায় ও দিল্লি-আগ্রায়। নিজের ও শিষ্যপ্রশিষ্যগণের চিত্রকৃতি দিয়ে প্রাচীনের স্বরূপ-পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি, এ কথা মিথ্যা নয়। আসলে অবনীন্দ্রনাথের রূপরচনা, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, কোনো দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, অতীতমুখী নয়। এ কালের ও সে কালের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, তাবৎ রূপকলা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ ক'রে— প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে ও মানুষকে ভালোবেসে— নিজস্ব সৃষ্টি তাঁর ভবিষ্যোন্মুখী। অর্থাৎ, কেবল আহরণ নয় কিম্বা বিশ্লেষণ নয়, আপন লোকোত্তর প্রতিভায় গ্রহণ করেছেন তিনি অতীত ও বর্তমান, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ, ছবি এবং কবিতা— পরিণামে সে-সবই সংশ্লিষ্ট সমন্বিত হয়ে উঠে এক অভূতপূর্ব সজীব সত্তা লাভ করেছে, নতুনকালের নতুন 'আর্ট্' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং নূতন ব'লেই যেমন আদৃত হয়েছে তেমনি নিন্দাও কম সহ্য করে নি— নিন্দা করেছেন এক দিকে যাঁরা সত্যই প্রাচীনপন্থী, প্রত্নবিদ্, পণ্ডিত, অন্য দিকে যাঁরা রূপ সম্পর্কে বা রূপকলা সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত বা স্বভাবান্ধ। সুরেশ সমাজপতি যে কারণে 'সাহিত্য' মাসিকপত্রে মাসের পর মাস গাল পেড়েছেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে, পণ্ডিত পুরাবিদ্ অক্ষয় মৈত্রেয় সে কারণেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন নি। অজ্ঞ অশিক্ষিতের সমালোচনা বরং অগ্রাহ্য করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, পণ্ডিতের শিল্পশাস্ত্র-ব্যাখ্যা— তাঁর মতে অপব্যাখ্যাই[2]— মারাত্মক না ভেবে পারেন নি। বাগেশ্বরী ভাষণের কোথাও কোথাও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকে দেখেছেন তিনি অনুরাগ-উদ্দীপিত ভিন্ন দৃষ্টিতে; অথচ যুগযুগবাহী সেই রূপরচনার ধারায়, বিশেষতঃ মূর্তিকলায় দেবদেবীর রূপায়ণে, যেখানে শুধুই শিল্পশাস্ত্রানুসরণের প্রয়াস দেখা গিয়েছে, সেখানেই শিল্পীর প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ব'লে উঠেছে— 'এ নয়, এ নয়! যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ, সেই হল বরণীয়। নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা নব[3]রসরুচিরা যে কলালক্ষ্মী এমন অচল অনড় বিগ্রহ তাঁর নয়, যেখানে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, প্রতিটি হাস্য কটাক্ষ ভাব ভঙ্গীর মান পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বেঁধে দিয়ে গেছেন শাস্ত্রকার। এ মূর্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থেকে পূজা গ্রহণ করুন, ভক্তকে প্রার্থিত চতুর্বর্গ ফল দান করুন— শিল্পী বা রসিকের মনোমত যে রসরূপ সে হল ভিন্ন। শত শত বর্ষের রূপরচনার ধারায় হঠাৎ এক-একটি বুদ্ধ বা নটরাজমূর্তি বা কপিলমুনি যে অ-পূর্বতা নিয়ে সাকার হয়ে উঠেছেন রসাবিষ্ট শিল্পীর ধ্যানে জ্ঞানে ও কর্মে, সেই হল আমাদের আদরণীয় ও বরণীয়।' তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অতীতের প্রতি সংস্কারবদ্ধ অন্ধ আনুগত্য অবনীন্দ্রনাথের নেই।

এ দিকে 'নেচার' বা স্বভাবের অনুকরণই যে তাঁর বাঞ্ছিত তাও নয়। এই বিশ্ব- চিত্রশালা মূর্তিশালা যেখানে অনাদি অনন্তকাল ধ'রে নিত্য প্রহরে প্রহরে রূপরসসৃষ্টির নিরন্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে, তাতে অবগাহন করা চাই কেবলই— 'পানীমে মীন পিয়াসী' এমন হাস্যকর অথচ করুণ ভাবভঙ্গী যেন না হয়— অথচ অনুকরণ ক'রে কোনো ফল নেই, আদৌ অনুকরণ করা সম্ভব নয়, এটিই অবনীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে বুঝিয়েছেন দেশ বিদেশের বহু শাস্ত্র থেকে, বহু মনীষী ও বহু গুণীর উক্তি থেকে, বিশেষতঃ নিজেরই গভীর উপলব্ধি ও

২ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় অজন্তা-বাগের চিত্রকলাকে ভারতীয় রূপরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন বা শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ মনে করেন নি— অশিক্ষিত অপটু প্রতিভার দৈন্য অপরিণতি বা অপকর্ষের দ্যোতক ব'লেই জেনেছেন।

৩ নূতন বা অ-পূর্ব অর্থ ই শিল্পীর মনোমত মনে হয়।

স্বস্থির প্রতীতি থেকে। শিল্প যে অনুকৃতি নয়, অনুক্রিয়া— অবশ্যই এ সত্যটি জানতে বা বুঝতে কোনো দুর্লভ প্রাচীনপুঁথির কীটদষ্ট পাতা ওন্টাতে হয় নি তাঁকে। জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকেই এ প্রত্যয় জেগে উঠেছে যে, দেবশিল্পী বা বিশ্বস্রষ্টা আদিশিল্পী আদিকবি যা করেন তার অনুকরণ নয়, যে শক্তিতে যে প্রেরণায় কাজ করেন— যে আনন্দে ও চেতনায়— আপন অন্তরে তারই আবাহন, আপন কর্মে তারই প্রয়োগ, এইটিই কবি বা শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, বিশ্বশিল্পী ও মানুষ শিল্পী দুজনের যথার্থ মিল হবে কৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। সুতরাং শিল্প তো অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি হবার নয়, সে হল নবরসরুচিরা নূতনা কৃতি।

অবনীন্দ্রনাথের ভাবোদ্‌বেল ভাষার প্রবাহে ভেসে যেতে হয়— অপরিমিত স্নান পান সন্তরণ চলে, কিন্তু নিমেষে অঞ্জলি বেঁধে বা পাত্র পূর্ণ ক'রে পরিমিত গ্রহণের অসুবিধা আছে বৈকি। অথচ থেকে থেকে এক-একটি বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেছে সে কথাও সত্য। উদ্‌ধৃতি দিতে গেলে বিপদ আছে, কেননা সু-দৃষ্টান্তের শেষ নেই। সে চেষ্টা না করাই ভালো। অবনীন্দ্রনাথের রচনার ভাবগ্রহণ বা রসগ্রহণ করতে হবে তাঁরই রচনা থেকে।[৪] মুদ্রণ-সম্পাদন-সংক্রান্ত আবশ্যকীয় কয়েকটি কথা ব'লে আমাদের এই অপ্রচুর আলোচনায় ছেদ টানব। যে নিষ্ঠা ও নিপুণতা -সহকারে দুর্লভ মূল্যবান গ্রন্থের পুনর্‌মুদ্রণ করেছেন প্রকাশক, সে তো প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। (নূতনও কিছু দিয়েছেন, যেমন— 'গ্রন্থসূচী' বা আধারগ্রন্থ-নির্দেশ-পূর্বক বিস্তারিত উল্লেখপঞ্জী।) দুঃখের বিষয় লক্ষ্য করেন নি প্রকাশক সম্পাদক কেউই— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বই ছেপেছিলেন, যে বই বর্তমান মুদ্রণের বিশেষ নির্ভরস্থল— মুদ্রণপ্রমাদের সীমা সংখ্যা নেই সেই গ্রন্থে। সেগুলির অধিকাংশই এ বইয়েও নব কলেবর পেয়েছে আশঙ্কা করি। যদি অধিকাংশ প্রবন্ধ সমকালীন মাসিক পত্রাদিতে মুদ্রিত হয়ে থাকে, তা হলে তার একটি বিশদ তালিকা দেওয়া যেমন আবশ্যকীয় ছিল, তেমনি মাসিক পত্রের পাঠের সঙ্গে তুলনা করলেই হয়তো অনেক প্রমাদ সংশোধিত হতে পারত এ আমাদের অনুমান মাত্র নয়। প্রথম দিকের ভাষণগুলির পাঠ যতদূর মিলিয়ে দেখেছি, তাতেই এ প্রকার ধারণা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য পাণ্ডুলিপিরাজির (বিশেষতঃ এই ভাষণগুলির) সে সৌভাগ্য যদি হয়ে থাকে, তা হলেই প্রায় নির্‌ভুল পাঠ নির্ধারণের আশা করা যায় এবং অবনীন্দ্রনাথের মতো কবি রসিক শিল্পী ও আচার্যের যা দান সেটি দেশ ও জাতিকে আদর ক'রে ধ'রে দিতে হলে এতখানি যত্ন এবং পরিশ্রমই বাঞ্ছনীয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। দু-একটি মাত্র মুদ্রণ প্রমাদের দৃষ্টান্ত দিই (দায়ী বিশেষ ক'রে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ই) যাতে প্রমাদের আকার প্রকার কিছুটা ধরা যাবে এবং প্রকাশক ভবিষ্যতের জন্য অবহিত হতে পারবেন অথবা এখনই একটি শুদ্ধিপত্র-প্রণয়নে যত্নবান হবেন।— পৃ ১৪, 'কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন' অর্থহীন মনে হয়; পূর্বপাঠ: কবির এর চেয়ে কমে চলে গেল। এই পৃষ্ঠারই সপ্তম ছত্রে 'অন্যপর-' নয়, 'অনন্যপর-' হওয়া উচিত। পৃ ১৬, ছ ১৭, 'আমার কাছে' হবে: আমার কাজে। পৃ ১৯, ছ, ১১, 'আমি-রসের', এটির পূর্বপাঠ: অমি-রসের। 'অমিয়-রসের' হবে কিনা পাণ্ডুলিপি দেখলে বলা যেত। পৃ ২০, 'আমরা না জানতে মাতৃস্নেহে

---

৪ অবনীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে একজন অদ্বিতীয় স্রষ্টা। অর্থাৎ তাঁর একটি নিজস্ব স্টাইল আছে, যা তাঁর স্বভাব ও সত্তার শীলমোহর করা, যা অনুকরণ করা যায় না, যা চমৎকারজনক। বাংলা সাহিত্যে তিনি অভিনব ভাব ভাষা ও রূপের স্রষ্টা। এ বিষয়ে আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে তা নয়— আমাদেরও সময় সুযোগ হল না, যোগ্যতাও কতদূর আছে জানি না। বাহুল্য হোক বা না হোক, উল্লেখ মাত্র করা গেল।

ভরে গেলো আসবাব-পত্র— সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের', এ ক্ষেত্রে প্রমাদরচনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে স্বীকার করতেই হয়; পূর্বপাঠ ছিল: আমরা না জানতে মাতৃস্নেহে ভরে গেলো আসবা-মাত্র সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের ইত্যাদি। পূর্বেই বলেছি দোষ-প্রদর্শনই আমাদের লক্ষ্য নয়; ভবিষ্যতে যাতে মুদ্রণ-প্রমাদ-শূন্য গ্রন্থ-প্রকাশের চেষ্টা হয়, সে দিকে প্রকাশক সম্পাদক ও গ্রন্থস্বত্বাধিকারী-গণের দৃষ্টি আকর্ষণই বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। কর্তব্যবোধেই এই ত্রুটি নির্দেশ করতে হল, এজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত আমরা।

উনত্রিশটি ভাষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলন করেছিলেন আর এখানেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে— মনে হয় তদতিরিক্ত একটি রচনা (ভাষণ) আমাদের চোখে পড়ে ১৩৩০ ফাল্গুনের 'বঙ্গবাণী'তে: রস ও রচনার ধারা (পৃ ৭৪-৮৬)। এটি কি সংকলনযোগ্য নয়? আরও ভাষণ সাময়িক পত্রাদিতে আত্মগোপন ক'রে নেই তো?

কানাই সামন্ত

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। অনুবাদ কান্তিচন্দ্র ঘোষ। কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

১৮৫৯এ এডওয়ার্ড ফিট্‌জজেরাল্ড্ (১৮০৯-৮৩) ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে সারা য়ুরোপেই নাকি এ কাব্যের সৌন্দর্যবোধ ও মরমীয়া ভাবের প্রবল একটি ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ফিট্‌জজেরাল্ডের অনুবাদে মূল ফার্সির ধ্বনিপ্রকৃতি যথাযথ বজায় ছিল কি না, সে আলোচনা এই দুই ভাষায় অধিকারী কাব্য-সমালোচকের সাধ্য। এখানে সে কথার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে 'রোবাইয়াৎ' সম্বন্ধে এই কথাটি জানবার প্রয়োজন যে, মূলে এই 'রোবাইয়াৎ' মানে পৃথক এক-একটি চৌপদী, স্বাধীন এক-একটি স্তবক; এবং ফিট্‌জজেরাল্ডের অনুবাদে এই রূপগত এবং স্বভাবগত বিশেষত্বটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু পৃথক স্তবকগুলিকে যোগ করে, ভাবের বা মননের নির্দিষ্ট একটি ধারার ধারণার উপরে জোর দিয়ে গেছেন ফিট্‌জজেরাল্ড। কবি তাঁর জীবনানুভূতির পরিচয় রেখে গেছেন এ কাব্যে। সেইসঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের প্রধান কথাটিও উচ্চারিত হয়েছে। কান্তিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদে সে কথা এই দাঁড়ায়—

> এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর—
> ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর।
> আয়ুর তারা পড়ছে খসে মরণ-উষার চরণ 'পর—
> যাত্রা যে কাল করতে হবে, ফুরিয়ে নে সব ত্বরিৎ কর।

এ জীবন ক্ষণিকের। বহু শ্রমসাধ্য পাণ্ডিত্যের সাহায্যেও জীবনের এই নশ্বরতা দূর করা অসম্ভব। অতএব, দ্রাক্ষারসই চূড়ান্ত প্রাপ্তি! এই ছিল ওমরের মর্মকথা—

> অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
> বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।

বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে স্থির
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রস-জ্ঞানে নই গভীর।

রবীন্দ্রনাথ এ-অনুবাদ পড়ে খুশি হয়েছিলেন।

কান্তিচন্দ্র নিজে কবি ছিলেন। আজ থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে বাংলায় কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনূদিত এই 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রথম বেরোয়। তার পর, বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬এ এই অনুবাদ-কাব্যের এক সচিত্র সংস্করণ ছাপা হয়। অতঃপর ১৩৬৮সালে— তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে— বইখানির এই দ্বিতীয় শোভন-সংস্করণ ছাপা হয়েছে। প্রথম-প্রকাশের পরে কান্তিচন্দ্র নিজেই তাঁর অনুবাদের কিছু-কিছু পরিবর্তন করেন। শেষ সংস্করণে আদি সচিত্র সংস্করণের চিত্র ও পাঠ দুয়েরই 'কিছু অদল-বদল' করা হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা এই অনুবাদ-কাব্যের 'ভূমিকা'য় প্রায় হাজার বছর আগেকার পারস্য দেশের নৈশাপুর গ্রামের মূল কবি ওমরের কথা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। ওমার খৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত।··অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞানচর্চার অবসরে গুটিকয়েক চতুষ্পদী রচনা করেন, এবং সেই চতুষ্পদী-কটিই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্তৃহরি ছাড়া আর কেউ কখনো হন নি। ভর্তৃহরির সঙ্গে ওমারের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।' কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। ফিট্‌জজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে ওমরের কাব্যের সঙ্গে একালে সারা য়ুরোপের— তথা তামাম শিক্ষিত জগতের— নতুন পরিচয় ঘটে। প্রমথ চৌধুরী ওমরের কাব্যের প্রতি আধুনিক রুচির বিশেষ উৎসাহের কারণ দেখিয়ে কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ থেকে এই লাইনটি স্মরণ করে গেছেন— 'সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্য মিথ্যা কিছুই নাই।' বিষয়টি আরও বিস্তৃত ক'রে তুলনামূলকভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভর্তৃহরির কাব্যেও যেমন খ্রীষ্টীয় পুরাণ বাইবেলেও তেমনি— Vanity of vanities— all is vanity বাক্যের অর্থ 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য!' অর্থাৎ, ওমর-দর্শনের মূল কথা হল জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নৈরাশ্য-চিহ্নিত বিদ্রোহের বাণী! কিন্তু এও চূড়ান্ত মন্তব্য নয়। আসল কথা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ— এ সত্য ওমার সন্তুষ্ট মনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তাঁর সকল মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিরুদ্ধে মানবাত্মার এই বিদ্রোহ উপহাস ও বিদ্রূপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাট্টার অন্তরে একটা প্রচ্ছন্ন কাতরতা আছে, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব।'

কান্তিচন্দ্রের এই অনুবাদ তাঁর মতন বিদগ্ধ রসিকেরও সমাদর অর্জন করে। তিনি বলে গেছেন— 'ওমার খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ আমি বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি।'

এ-বইয়ে প্রমথবাবুর ভূমিকা এবং ২৯এ শ্রাবণ ১৩২৬ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপা আছে। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে লিখেছিলেন: 'এ-রকম কবিতা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। ফিট্‌জজেরাল্ডও তাই ঠিকমত তর্জমা করেন নি— মূলের ভাবটা দিয়ে সেটাকে নূতন করে সৃষ্টি করা দরকার।'

এই অনুবাদের আগেই 'কবি-প্রশাস্তি' নামে কান্তিচন্দ্রের নিজের লেখা যে ওমর-বন্দনা সংকলিত হয়েছে, তার শেষ চার ছত্রে তিনি লিখে গেছেন—

হাজার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি
নিজের মাঝে দেখছে তোমার দুঃখ-সুখের ছবি,
বেহেস্তে কি জাহান্নামে, শূন্যে, যেথায় থাকো—
অর্ঘ্য রচা তাহার আজি ব্যর্থ হবে নাকো!

সে কথা সন্দেহাতীত সত্য। অনুবাদে আন্তরিকতার অভাব নেই। বইখানির বিভিন্ন চিত্ররচয়িতাদের মধ্যে আছেন বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মনীষী দে, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীম মুখোপাধ্যায়।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বরলিপি

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি।
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার   এই ভাঙা ঘাট কবে হল পার
দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি।
মুগ্ধ আলসে গণি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু-পানে আর কেউ।
মনে জানি, কারো নাগাল পাব না—   তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানার বাণী॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II মা [গ]মা র্রা সা । মা -গা গা -পা I ধা না র্সা না । ধনা -র্সনা ধপা -হ্মা I
উ দা সি নী   বে ০ শে ০   বি দে শি নী   কে০ ০০ সে০ ০

I পা -র্সা [ন]র্সা -হ্মা । -পা -হ্মা -পা -হ্মা I পা -র্সা র্সা না । ধপা -হ্মা পা -হ্মধা I
না ই বা ০   ০ ০ ০ ০   না ই বা তা   হা০ ০ রে ০০

I [ধ]পা -মা মা -া । -া -া -া -া I র্গা র্গা র্গা র্গর্রা । র্রা র্রর্সা র্সা না I
জা ০ নি ০   ০ ০ ০ ০   র ঙে র ঙে০   লি খা০ আঁ কি

I ধা -না র্সা -না । ধা পা হ্মা পা I ধা -ণা ধপা -া । -া -া -া -সা I
ম ০ রী ০   চি কা ম নে   ম ০ নে০ ০   ০ ০ ০ ০

I সা -া সা -মা । মা -গা গা -পা I পা -র্সা [ন]র্সা -হ্মা । -পা -হ্মা -পা -হ্মা I
ছ ০ বি ০   খা ০ নি ০   না ই বা ০   ০ ০ ০ ০

I পা -র্সা র্সা না । ধপা -হ্মা পা -হ্মধা I [ধ]পা -মা মা -া । -া -া -া -া I
না ই বা তা   হা০ ০ রে ০০   জা ০ নি ০   ০ ০ ০ ০

I { সা সা সা সা । গা -রা -গা -রা I -মা -গা -মা -গা । -পা -া -া -া I
পু বে র হাও য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I ধা না র্সা র্সনা । ধপা -হ্মা -পা -া I র্গা -া র্গা র্গর্রা । র্রর্সা -া র্সা র্সনা I
ত রী খা নি তা০ ০ ০ র্ এ ই ভা ঙা০ ঘা ট্ ক বে০

I ধা -না র্সা -র্সনা । ধপা -া -া -া } I র্গা -া র্গা র্গা । র্গা -র্পা -া -র্গা I
হ ০ ল ০ পা০ ০ ০ র্ দূ র্ নী লি মা ০ ০ র্

I র্গা -া র্গা র্গর্রা । র্রর্সা -া -া -া I র্গা -া র্গা র্গা । র্রা -া সা গা I
বো ক্ খে তা হা০ ০ ০ র্ উ দ্ ধ ত বে ০ গ হা

I মা -া -া -গা । -মা -গা -মা -গা I পা -র্সা নর্সা -হ্মা । -পা -হ্মা -পা -হ্মা I
নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ই বা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -র্সা র্সা না । ধপা -হ্মা পা -হ্মধা I ধপা -মা মা -া । -া -া -া -া I
না ই বা তা হা০ ০ রে ০০ জা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০

I { না -া র্সা র্সা । না -া র্সা -না I ধা না র্সা না । ধনা -া ধপা -া I
মু গ্ ধ আ ল ০ সে ০ গ নি এ কা ব ০ সে০ ০

I পা ধা না র্সা । না -া নর্সা র্স-না I ধপা -া -া -া । -া -া -া -া } I
প লা ত কা য ০ ত ০ ঢে০ ০ ০ উ ০ ০ ০ ০

I র্গা র্গা র্গা র্গা । র্রর্গা -র্রা -র্গা -র্রা I -র্মা -া -া -া । র্রর্গা র্গা র্গা র্গা I
যা রা চ লে যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ফে রে না তো

I র্রা -র্সা -র্সা -ধা । -র্সা -া -া -া I র্সা র্সর্গা র্গর্রা -া । র্সা -া নধর্সা র্স-না I
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ পি ছু পা ০ নে ০ আ০ র্

I ধপা -া -া -া । -া -া -া -া I পা ধা পা পা । না -ধা না -া I
কে॰ ॰ ॰ উ ॰ ॰ ॰ ॰ ম নে জা নি কা ॰ রো ॰

I র্সা র্সা -র্গা র্রা । র্সা -না র্সা -া I র্সা র্সর্গা র্গা র্গা । র্গা -মা -া মা I
না গা ল্ পা ব ॰ না ॰ ত বু॰ য দি মো ॰ র্ উ

I মা -া মা মা । মগা -পা পা -া I পা পা ধা না । ধা -র্সা -পা -া I
দা ॰ সী ভা ব॰ ॰ না ॰ কো নো বা সা পা ॰ ॰ য়্

I পা -া ধা না । ধা -র্সা -পা -া I পা না [ন]ধা [ধ]পা । পা -হ্মা পা -ধা I
সে ই দু রা শা ॰ ॰ য়্ গাঁ থি সা হা না ॰ র ॰

I [ধ]পা -মা মা -গা । -মা -গা -মা -গা I পা -র্সা [ন]র্সা -হ্মা । -পা -হ্মা -পা -হ্মা I
বা ॰ ণী ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ না ই বা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -র্সা র্সা না । ধপা -হ্মা পা -হ্মধা I [ধ]পা -মা মা -া । -া -া -া -া II II
না ই বা তা হা॰ ॰ রে ॰॰ জা ॰ নি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

সম্পাদকের নিবেদন

ঊনবিংশ শতক বাংলাদেশের সুবর্ণ শতক ব'লে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। সেই শতকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের কর্মের ও কৃতিত্বের জন্যে স্মরণীয় হয়েছেন—এমন অনেকে আছেন। আমরা এই বিংশ শতকে তাঁদের নূতন করে স্মরণ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করছি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পে ও সাহিত্যে তিনি যে নূতন চেতনার সঞ্চার করে গিয়েছেন সেজন্যে তিনি আমাদের স্মরণীয়। তাঁর জন্মশতপূর্তি উপলক্ষে আমরা এই সংখ্যা তাঁর সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত করার সুযোগ গ্রহণ করেছি।

উপেন্দ্রকিশোর-অঙ্কিত 'বলরামের দেহত্যাগ' চিত্রটির প্রসিদ্ধি আছে; চিত্রটি বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়—১৩১৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী'তে। এই সংখ্যায় চিত্রটি পুনর্মুদ্রণ করা হল। সেইসঙ্গে আরও কয়েকটি চিত্র আমরা প্রকাশ করলাম—রবীন্দ্রনাথের 'নদী' অবলম্বনে উপেন্দ্রকিশোর-অঙ্কিত চিত্রাবলী। এগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা অবগত নই।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মরিস মেটেরলিঙ্ক, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁর সম্বন্ধে রচনা মুদ্রিত হল।

বালক-বয়সে বিলাতে রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং পরবর্তী জীবনে যাঁর কথা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করেন, তিনি আচার্য হেনরি মরলি। তাঁর সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করা হল।

গত বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা থেকে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হচ্ছে। বর্তমান সংখ্যায় পিয়রসন-লিখিত 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রিত হল, এই অনুবাদ আরও কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত হবে।

পরিশেষে এই সংখ্যায় মুদ্রিত 'চেখভের নাটক' রচনাটির বিষয়ে উল্লেখ করি। আমাদের অনুরোধে কিছুকাল আগে শুভময় ঘোষ মস্কো থেকে রচনাটি আমাদের নিকট পাঠান। ইতিমধ্যে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং রচনাটির প্রুফও সংশোধন করে দেন। কিন্তু রচনাটি মুদ্রণের পূর্বেই, গত ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে, তিনি মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। শুভময় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সংগঠন-পর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শিশুকাল থেকে শুভময় রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করেন। ইনি বিশ্বভারতীর প্রথম স্নাতকোত্তর ছাত্র, এবং বিশ্বভারতীর শিশুভবন থেকে পাঠ আরম্ভ ক'রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইনিই প্রথম ছাত্র। সাহিত্য সংগীত ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পের প্রতি শুভময়ের অনুরাগ ছিল গভীর। ছাত্রজীবনে ইনি শান্তিনিকেতনের সাহিত্যচক্র 'সাহিত্যিকা'র সাহিত্য-সম্পাদক এবং 'ঋতুপত্র' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন।

শুভময়ের মৃত্যুর পক্ষকাল পরে, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে, শান্তিনিকেতনে বিচিত্রা'য় অনুষ্ঠিত উপাসনা-সভায় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রটি সম্বন্ধে যে আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ কথা বলেন আমরা তা পত্রস্থ করে শুভময়কে স্মরণ করলাম।

স্বীকৃতি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -অঙ্কিত বলরামের দেহত্যাগ চিত্রের ব্লক প্রবাসী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'নদী' অবলম্বনে উপেন্দ্রকিশোর-অঙ্কিত চিত্রাবলী রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির চিত্রসংগ্রহে রক্ষিত ও তাঁদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

উপেন্দ্রকিশোর চিত্র শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হেনরি মরলি চিত্রটি পাঠিয়েছেন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লোকেন পালিতের লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তির নিদর্শনপত্র উক্ত কলেজের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মরিস মেটেরলিঙ্ক চিত্র বেলজিয়ামের কলকাতাস্থ দূতাবাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

যাত্রা
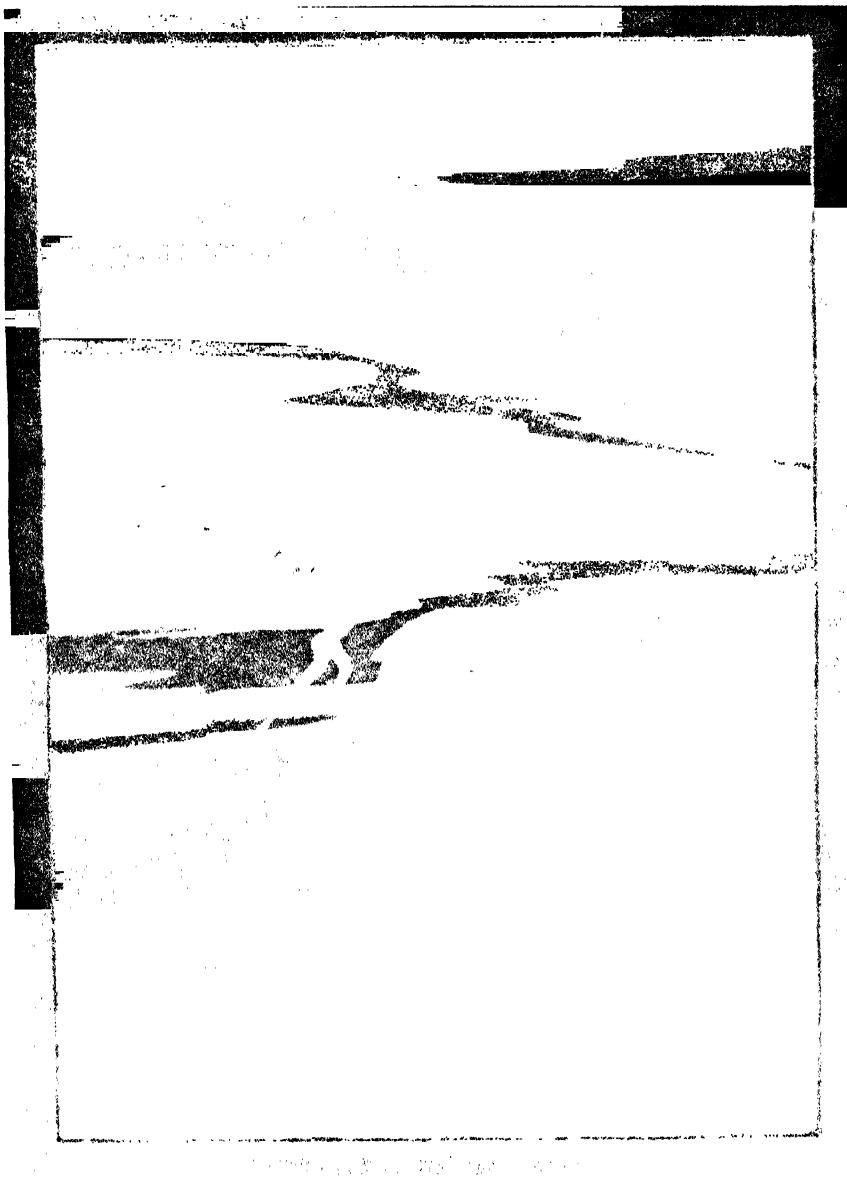
শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ · ১৮৮৫-৬ শক

চিঠিপত্র

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

ওঁ

য়োকোহামা
C/o. T. Hara Esq.
Yokohama
[১৯১৬]

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে তোমাদের চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে যতই দেখচি ততই ভাল লাগচে। য়ুরোপ আমার এত ভাল লাগেনি এত আন্তরিক আদরযত্নও কোনোদিন কোথাও পাইনি এমন সুন্দর দেশও কোথাও দেখা যায় না। এখান থেকে এত শেখবার ও নেবার আছে সে বলা যায় না। যে সব ছবি দেখেচি এরকম কোথাও নেই। অবন গগনের খুব উচিত ছিল এখানে আসা। আমার সঙ্গে এলে অনেক জিনিস দেখতে পেত। এখানে আসবার পূর্ব্বে এখানকার ভিতরকার পরিচয় আমি কল্পনা করতে পারি নি, গগনরাও পারেন নি। অন্তত নন্দলালের এখানে আসা নিতান্ত আবশ্যক। এদের বড় জিনিস কেবলমাত্র ভাল করে দেখে গেলেই নিজের ভিতরকার শক্তি উদ্ঘাটিত হয়। তোমরা আমার সঙ্গে এলে কত দেখতে পেতে সেই কথা মনে করে আমার বড় দুঃখ বোধ হয়। যদি সুবিধা পাও তাহলে এখনো আসতে পার কেননা আমি ১৫ই সেপ্টেম্বর এখান থেকে ছাড়ব। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই আমাদের একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জাপানযাত্রা করেন—তাঁর সঙ্গী ছিলেন উইলিয়ম পিয়রসন, সি. এফ. এণ্ডরুজ ও শ্রীমুকুলচন্দ্র দে। তাঁর এই ভ্রমণের বিবরণ "জাপানযাত্রী" গ্রন্থে সংকলিত আছে।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত অন্য কয়েকটি পত্র "চিঠিপত্র" তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

অবন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নন্দলাল—শ্রীনন্দলাল বসু

হিন্দু-সংস্কৃতি ও তাহার সক্রিয় রূপ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিন্দু-সংস্কৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি হিন্দুগণের মধ্যে হয়তো অনেক লোক এ কথা অতি সরলভাবে এবং সৎভাবেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সহিত যুক্ত নই। আবার, অন্য কোনো সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি এরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদের সঙ্গেও আমরা যুক্ত নই। আসলে জগতে যত রকমের সংস্কৃতি মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘ দিনের আবর্তনে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কোনো একটি সংস্কৃতি অপর সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এমনতর একটি মনোবৃত্তির এবং সেই মনোবৃত্তিজাত প্রচেষ্টারই আমরা মূলে বিরোধী। মানুষের বাস্তবজীবনযাত্রাকে অবলম্বন করিয়া মানুষের চেতনা যুগে যুগে কত ভাবে একটি শ্রেয়োবিন্দুতে ঘনীভূত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে জীবনযাত্রা সত্য— সেই জীবনযাত্রার অবলম্বনে উদ্ভূত মানুষের বিচিত্র চেতনা সত্য; সেই বিচিত্র চেতনার যে বিচিত্রভাবে শ্রেয়োবিন্দুতে ঘনীভবনের চেষ্টা তাহাও সত্য। সেই সত্যকে মহামানবের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত বিচিত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোনো বিশেষ সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনায় অপর একটি সংস্কৃতির আলোচনায় তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে, মুসলিম-সংস্কৃতির তুলনায় হিন্দু-সংস্কৃতিকে বুঝিতে গেলে আমরা কি করিতে পারি? আমরা সেখানে মুখ্যভাবে জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া চেতনার বিকাশে কোথায় কোথায় বড় পার্থক্য ঘটিয়াছে, মনের কাঠামোর মধ্যেই বা কোথায় বড় পার্থক্য দেখা দিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারি। সে পার্থক্য জীবনকে অবলম্বন করিয়া— ব্যাপক ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে— সুতরাং নিখিল মানবজীবনে তাহা সত্য।

এই সত্যকে যদি আমরা জানিতে পারি বুঝিতে পারি তাহা হইলে আপনা হইতেই আমাদের মধ্যে পরস্পরকে বুঝিবার আগ্রহ জন্মিবে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সহানুভূতি জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে আমাদের বিশ্বাস-মতবাদ-প্রবণতার মধ্যে যে পরস্পরকে আঁচড় কাটিবার শাণিত কোণগুলি রহিয়াছে সেগুলি আপনা হইতে মসৃণ হইয়া উঠিবে। এই দৃষ্টি লইয়াই এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, হিন্দু-সংস্কৃতির একতরফা জয়গানের জন্য নহে।

বিংশ শতকের মানুষ আমরা, বুকে হাত দিয়া কথা বলিলে আধ্যাত্মিক সত্য আমরা তেমন কেহ মানিই না; বহুদিনের প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার হয়তো পরোক্ষে ব্যবহারিক জীবনযাত্রার উপরে কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আমাদের ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধ তবে কি লইয়া? আসলে তাহা সংস্কৃতিগত ভেদ লইয়া। সংস্কৃতি কথাটার তাৎপর্যকে এইখানে একটু পরিচ্ছন্নরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃতি শব্দটি এবং তাহার ইউরোপীয় প্রতিশব্দ 'কালচার' কথাটি বর্তমান যুগে বহু আলোচিত, এবং বহু প্রসঙ্গে প্রযুক্ত। আলোচনা-জাল এবং বহুধা প্রয়োগ অনেক সময় শব্দটির মূল অর্থ হইতে আমাদিগকে সরাইয়া দেয়। আমরা এখানে আর আলোচনা-জালে জড়াইয়া পড়িতে চাহি না, সংক্ষেপে শব্দটির মূল দ্যোতনার দিকে নির্দেশ করিতেছি।

সংস্কৃতির এই মূল দ্যোতনা মানুষের আন্তর ঐশ্বর্যের দিকে, আর মানুষের আন্তর ঐশ্বর্য মানুষের চেতনার

নিরন্তর বিকাশে। চেতনার এই বিকাশ স্তরে স্তরে মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রূপ ধরে কতকগুলি কল্যাণবোধের, সেই কল্যাণবোধের পরিণতি মানুষের শ্রেয়োবোধে। সংস্কৃতির মধ্যে একদিকে রহিয়াছে কর্মচর্যার ভিতর দিয়া চেতনা-সংস্কার, সেই চেতনা-সংস্কারের সঙ্গেই জড়িত চেতনার ঊর্ধ্বায়ন, সেই ঊর্ধ্বায়নের ভিতর দিয়াই জাগে শ্রেয়োবোধ। ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে মানুষের সংস্কৃতি তাহার ব্যবহারিক জীবনযাত্রার সহিত জড়িত হইয়া কতকগুলি মানবীয় মূল্যবোধ জাগায়। সেই মূল্যবোধের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত মানুষের আন্তর পরিচয়।

প্রথমে মনে হইতে পারে, মানুষের মনে যে মূল্যবোধ তাহা তো সার্বজনীন এবং সার্বকালিক, ইহার ভিতরে কোনো 'বিশেষে'র সম্ভাবনা কোথায়? ইতিহাস-চেতনা আমাদের যত গভীর হইয়া উঠিতেছে ততই মানুষের মনোধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চল সনাতন সার্বকালিকতার ধারণায় নড়চড় দেখা দিতেছে। সমাজতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও আমাদিগকে মানবীয় সার্বজনীনতার ভিতরে বহুবর্ণে উজ্জ্বল বৈচিত্র্যের আকর্ষণকে বড় করিয়া তুলিতেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের যে সার্বজনীনতা তাহা কোনো স্বাদহীন বর্ণহীন গন্ধহীন একটা বস্তুবিয়োজিত অমূর্ত সার্বজনীনতা নহে; সংস্কৃতির যেখানে একটি সুপরিস্ফুট মূর্ত রূপ রহিয়াছে সেখানে তাহা বিশিষ্ট বর্ণে স্বাদে গন্ধে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। সংস্কৃতি এই বিশিষ্ট স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ কোথা হইতে লাভ করে? লাভ করে বিশেষ বিশেষ দেশ কাল পরিবেশের বৈচিত্র্যের ভিতরে জাত জীবনযাত্রা-পদ্ধতির বিচিত্র ধরণ হইতে। মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে এই বৈচিত্র্য যতখানি সত্য, তাহার সংস্কৃতির ভিতরকার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের বৈচিত্র্যও ততখানি সত্য। মানুষের সংস্কৃতিগত এই বৈচিত্র্য মানুষের গভীর মূল্যবোধকে পরিবর্তিত না করিয়াও ঈষৎ অনুকূল বেদনীয়ভাবে রঞ্জিত করিয়া তোলে। এই জন্যই দেখিতে পাই, যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরের মনীষী বা যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন লোক তাঁহারা মানবীয় মূল্যবোধের সার্বজনীনতা সত্ত্বেও মনের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি একটি গোপন অথচ অত্যন্ত প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ লোকের পার্থক্য এইখানে, সাধারণ লোক এই আকর্ষণকে এড়াইয়া উঠিতে না পারিয়া এই আকর্ষণের উত্তেজনায় কল্যাণবিরোধী কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে; যাঁহারা ঊর্ধ্বস্তন, তাঁহারা কল্যাণের আহ্বানে এই আকর্ষণের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ধীরত্বের পরিচয় দিতে পারেন। আমরা ভারতবর্ষে এতদিন ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানে যত বিরোধ করিয়া আসিয়াছি—এখনও ভিতরে ভিতরে যেটুকু বিরোধের মনোভাব পোষণ করিতেছি তাহার পিছনে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যে-সকল স্থূল কারণ রহিয়াছে তাহাকে একেবারে অস্বীকার না করিয়াও বলিতে পারি, এ-বিরোধের একটি সূক্ষ্ম কারণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিশেষ বিশেষ স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের প্রতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রবল আকর্ষণ।

পারমার্থিকতা এবং মোক্ষ বিষয়ে আমরা যেমন করিয়া সহজে সার্বজনীন হইয়া উঠিতে পারি জীবন বিষয়ে আমরা তেমন করিয়া তত সহজে সার্বজনীন হইয়া উঠিতে পারি না। কারণ, মোক্ষের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে জোর করিয়া অভিমুখী করাইয়া তুলিতে হয়, আর জীবন বিনা জোরেই আমাদের সবখানি ভালোবাসাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লয়। জীবনকে যেখানে ভালোবাসি সেখানে তাহার সার্বজনীন এবং সার্বকালিক তত্ত্বরূপটিকেই ভালোবাসি না, ভালোবাসি তাহার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধময় সমগ্ররূপটাকে। সেখানে সংস্কৃতির আবেদন অমোঘ।

ভারতবর্ষস্থিত গোঁড়া মুসলমানগণ সজাতীয়গণকে হিন্দু-সংস্কৃতিকে বিজাতীয় সংস্কৃতি বলিয়া ব্যবহার এবং

আচরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। গোঁড়া হিন্দুগণও পাল্টা মনোভাব সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাল্টা-পাল্টি মনোভাবের ভিতরে কতকগুলি উপাদান আছে একেবারে মনের উপরতলাকার, কতকগুলি আছে গভীরে। যেগুলি উপরতলার সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া গভীরে নিহিত উপাদানগুলি সম্বন্ধেই কথা বলা যাক। হিন্দু-সংস্কৃতিকে অত্যন্তভাবে বিজাতীয় এবং পরিত্যাজ্য বলিয়া যে মুসলিম মনোবৃত্তিটি দেখা দেয় তাহা অনেকদিনের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জের টানিয়া। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই ইতিহাস-ঐতিহ্যের জেরটুকু সম্বন্ধেই একটু বিশদ আলোচনা করিতে চাই।

অন্যান্য সংস্কৃতির সহিত হিন্দু-সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই একটা কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, ইহুদি-সংস্কৃতি, খ্রীস্টান-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি— এমন কি বৌদ্ধ-সংস্কৃতি যেভাবে ঐতিহাসিক, হিন্দু-সংস্কৃতি সে-ভাবে ঐতিহাসিক নহে। মোজেজকে আমরা মোটামুটিভাবে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই ধরিয়া লই। অন্য ঐতিহাসিক পটভূমির কথা অস্বীকার না করিয়াও বলিতে পারি যে, মোজেজ্-এর কর্ম, বাণী ও ব্যক্তিত্বকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াই ইহুদি সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য আজকার দিনে আমাদের নূতন ঐতিহাসিক চেতনা লইয়া আমরা বলিতে শিখিয়াছি যে, মোজেজ্-এর বাণী বা ব্যক্তিত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষের বাণী ও ব্যক্তিত্ব নহে, আসলে মোজেজ্-এর ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছিল ঐ যুগের ইহুদি সমাজসত্তা ও তাহার বাণী। এ-কথা লইয়া কোনো বিতর্কে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এ-কথা স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে যে, ঐতিহাসিক পুরুষ মোজেজ্-এর কণ্ঠের ভিতর দিয়াই তৎকালীন একটি গাঢ়বদ্ধ সমাজের বাণী প্রকাশ লাভ করিয়াছিল— এবং সেই প্রকাশ ইহুদিজাতিকে কালে কালে একটি স্বাদ-বর্ণ-গন্ধময় বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল। বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি এইরূপ শাক্যসিংহ বুদ্ধকে লইয়া, খ্রীস্টান সভ্যতা-সংস্কৃতি যিশু খ্রীস্টকে লইয়া এবং মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি হজরৎ মহম্মদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি এইভাবে বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে লইয়া গড়িয়া উঠে নাই। মোজেজ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ প্রভৃতির সমশ্রেণীর রূপে হয়তো হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু হিন্দুধর্মের উপরে শ্রীকৃষ্ণ-ভাষিত ভগবদ্‌গীতার একটি ব্যাপক প্রভাব স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ মোজেজ্-বুদ্ধ-খ্রীস্ট-মহম্মদ প্রভৃতির অনুরূপ নহেন। হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব হইতে।

অর্ধশতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত আমরা মনে করিতাম, ভারতবর্ষে আগত আর্যগণের প্রথম দান বৈদিক শাস্ত্রকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়াই হিন্দু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির যাত্রারম্ভ; কিন্তু মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার আবিষ্কার আমাদের সেই দৃঢ়মূল সংস্কারে প্রবল নাড়া দিয়াছে। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পায় আমরা অবৈদিক এবং সম্ভবতঃ প্রাগ্‌বৈদিক এমন অনেক উপাদান লাভ করিয়াছি যাহা পরবর্তী হিন্দু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির বহু সমৃদ্ধধারার আকর স্বরূপ। আদিতেই তাই দেখিতেছি, মিশ্রণ ও সমন্বয় লইয়া হিন্দু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির যাত্রা আরম্ভ। এই প্রসঙ্গে মিশ্রণ কথাটার ব্যবহারও খুব সুষ্ঠু নয়, মিশ্রণের পরিবর্তে মিলন কথাটাই এক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। মিশ্রণ কথাটার মধ্যে কোনো পারস্পারিক যোগ এবং দেওয়া-নেওয়ার ইঙ্গিত নাই, ইতিহাসের আকস্মিকতা দ্বারা কতকগুলি উপাদনের একত্রীভবনই সেখানে মুখ্য কথা। মিলনের মধ্যে আছে প্রথম হইতে পরস্পরকে বুঝিবার এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য পরস্পরকে গ্রহণের প্রবৃত্তি-প্রবণতা।

এই মিলন ও সমন্বয় কথা দুইটি হিন্দু-সংস্কৃতির একেবারে গোড়ার কথা। ভারতবর্ষে যে বিরাট সংখ্যক লোকসমূহ আজ হিন্দু নামে পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে নৃজাতি হিসাবে কোনো সমত্ব নাই; যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই বৃহৎ লোকসংখ্যার জীবনযাত্রা সেই পরিবেশের মধ্যেও লক্ষণীয় পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য; জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যেও বৈচিত্র্য সহজবোধ্য। এই সমত্বের অভাব যে আজই ঘটিয়াছে তাহা নহে, এ অভাব গোড়া হইতেই। গোড়া হইতেই পরস্পর বিলক্ষণ অনেক জাতির সান্নিধ্য, সংঘাত, সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই সান্নিধ্য সংঘাত সংমিশ্রণ সমন্বয়ের প্রবাহ আজও রুদ্ধ হয় নাই—সমভাবেই চলিতেছে। হিন্দু-সংস্কৃতি তাই কোনোযুগেই একটি 'জাত' বস্তু নয়; 'জাত'-রূপ অপেক্ষা তাহার 'জায়মান' রূপটিই আমাদের কাছে বড় হইয়া ধরা দেয়। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই যে অত্যন্তভাবে স্পষ্টলক্ষণযুক্ত 'জাত' রূপের অভাব, এবং এই যে বহু উপাদানের স্বীকরণ এবং একীকরণের ভিতর দিয়া সর্বকালে তাহার 'জায়মান' রূপের প্রাধান্য ইহাই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অপরের চোখে বিরূপ সমালোচনার বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। এই হিন্দু মনোবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বিরূপ সমালোচক হইল 'সেমিটিক' মনোবৃত্তি—অর্থাৎ 'সেম' নরগোষ্ঠীর জাতীয় মনোবৃত্তি। ভারতীয় মুসলমানগণও যখন কোনো স্বার্থের বশবর্তী না হইয়া সরল মনেই হিন্দু-ধর্মের এবং হিন্দু-সংস্কৃতির বিরূপ সমালোচনা করেন তখন বুঝিতে হইবে, ঐতিহ্যসূত্রে তিনি ঐ 'সেমিটিক' মনেরই উত্তরাধিকারী। ইউরোপ এবং এশিয়ায় সেমিটিক মনের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিধা প্রকাশ ঘটিয়াছে; প্রথমে ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতি, পরে খ্রীস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং তাহার পরে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সেমিটিক মন একটি সুপরিস্ফুট প্রচ্ছন্নতার দাবী করে। এই দাবীর পিছনে সেম জাতিসমূহের একটি মৌলিক বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সে বিশ্বাস হইল এই যে, যিনি আদিস্বরূপ এবং পরমকারণ স্বরূপ তিনি সত্য-স্বরূপ; এই সত্য-স্বরূপের আপন সত্য সৃষ্টি প্রপঞ্চের ভিতরে প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিটিই হইল মর্ত্যে সত্য প্রকাশের একমাত্র পদ্ধতি। সেই বিশেষ বা একমাত্র পদ্ধতি হইল এই যে, সত্যস্বরূপ ঈশ্বর নিজেকে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে প্রকাশ করিবার বাসনা লইয়া প্রথমে একজন আজ্ঞাবহ দূত বা পয়গম্বরকে সেই বিশেষ জাতির মধ্যে প্রেরণ করেন; কেবল সেই নির্বাচিত পুরুষের নিকটেই ঈশ্বর জ্যোতির্ময়রূপে এবং বাঙ্ময়রূপে নিজের সকল সত্য প্রকাশ করেন। ইহুদী জাতির ভিতরে এই প্রকারে ভগবৎ-সত্যের প্রকাশ ঘটিল 'মোজেজ্'-এর ভিতর দিয়া; খ্রীস্টানগণের মধ্যে যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া এবং ঐস্লামিক বিশ্বাসে দিব্যসত্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে হজরৎ মহম্মদের ভিতর দিয়া। ইহাকেই বলে 'রেভেলেশন' বা মানুষের নিকটে ঈশ্বরের সত্যস্বরূপতার উদ্‌ঘাটন। 'রেভেলেশন' ব্যতীত মানুষের পক্ষে দিব্য সত্যলাভের অপর কোনো সম্ভাবনা সেমিটিক মন স্বীকার করিতে রাজি হইবে না; মানুষের পক্ষে দিব্য সত্যলাভের ইহাই একমাত্র সম্ভাবনা ও শেষ সীমা। মোজেজ্-এর ভিতর দিয়া ঈশ্বর মানুষের নিকটে যে সত্য প্রকাশ করেন নাই সে সত্য জানিবার মানুষের কোনো অধিকার এবং সম্ভাবনা নাই, ইহাই হইল ইহুদি জাতির মৌল বিশ্বাস। পরবর্তী কালে খ্রীস্টানগণের মধ্যে বিশ্বাস এবং তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, মানুষের নিকটে দিব্য সত্য প্রকাশের জন্য নিখিলপিতা ঈশ্বর নিজেকে তাঁহার একমাত্র সন্তানরূপে মানবদেহে প্রকাশ করিলেন, তিনিই যিশুখ্রীস্ট; যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর নিজের সঙ্গে অভিন্ন এই 'সন্তানে'র ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। যিশুখ্রীস্টের নিকটে ঈশ্বরের যে আত্মোদ্‌ঘাটন, সেই আত্মোদ্‌ঘাটন বা 'রেভেলেশনে'র ভিতর দিয়া মানুষের নিকটে ঈশ্বর যে সত্য

উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহা ব্যতীত মানুষের জ্ঞাতব্য বা অনুভবনীয় উপলব্ধব্য আর কিছুই নাই। মুসলমানগণের অনুরূপভাবে বিশ্বাস, মহম্মদ হইলেন মানুষের নিকটে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে শেষ পুরুষ, তিনিই ঈশ্বরের শেষ পয়গম্বর। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের মানুষের নিকটে যাহা কিছু প্রকাশনীয় ছিল হজরৎ মহম্মদের দিব্যানুভূতি সমূহের ভিতর দিয়া তিনি তাহা সবটুকু নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। হজরৎ মহম্মদের বাণীর অনুধ্যান এবং আচরণ ব্যতীত সত্যোপলব্ধির দ্বিতীয় পন্থা নাই।

এই সেমিটিক মনোবৃত্তির সহিত ভারতীয় হিন্দু মনোবৃত্তির একটা মৌল বিরোধ অতি সহজলক্ষ্য। হিন্দুগণ এই-জাতীয় 'রেভেলেশনে' বিশ্বাসী নন। সত্য কোনো একজনের নিকটে কোনো এক বিশেষকালে প্রকাশিত হয় নাই: ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের বিবর্তনের ভিতর দিয়া সত্য সর্বমানবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। সত্যের কোনো সীমা বা শেষ নাই— যেমন সীমা ও শেষ আমরা স্বীকার করিতে পারি না ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের। কোনো কালে কোনো মানুষের সত্যকে নূতন করিয়া— অর্থাৎ তাহার নিজের মতন করিয়া— লাভ করিতে কোনো বাধা নাই। সকল মনুষ্য-হৃদয়ের মধ্যেই সত্যসূর্য প্রতিবিম্বিত হইবার সম্ভাবনা আছে, শুধু মৌল শর্ত হইল হৃদয় কোনো মলিন আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকে। কিন্তু এই মৌল শর্তটি বড় কঠিন শর্ত, কারণ বিবিধ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকাই জীবসাম্যে প্রায় আমাদের সহজধর্ম। আবারণ ভঙ্গ করিয়া যাঁহারা নিজেদের দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ করিতে পারেন তাঁহারা মানুষের মধ্যে কোটিতে গোটিক। সত্যের অবাধিত প্রকাশও তাই এই কোটিতে গোটিকের কাছে। ইঁহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ— ইঁহারাই অস্তিত্বে বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী। সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত যাঁহারা তাঁহাদের নিকটে সত্যের অবাধিত প্রকাশ, অন্যের বেলাতে অবাধিত না হইলেও সত্যের আংশিক প্রকাশ থাকিতে পারে। যাঁহাদের নির্মলচিত্তে সত্যের প্রতিবিম্বন বা অবতরণ বা প্রতিফলন তাঁহাদিগকে আমরা ঋষি বলিয়া থাকি। দর্শন করেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি; সত্যদর্শনেই তাঁহাদের ঋষি নামের সার্থকতা। এই ঋষিগণের উদ্ভব শুধু ভারতবর্ষেই হইবে, শুধু হিন্দুগণের মধ্য হইতেই হইবে— এমন কোনো কথা নাই।

ধর্মীয় সত্য সম্বন্ধে সেমিটিক মনের একমাত্র নির্ভর 'রেভেলেশন' বা ব্যক্তিবিশেষের দিব্যদর্শনের উপরে। আমাদের এ-ক্ষেত্রে কোনো একমাত্র নির্ভর নাই, আমাদের মুখ্য নির্ভর এই ঋষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতির উপরে। ধর্মের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে তাই বেদ-প্রমাণ। বেদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, উহা কেহ বুদ্ধিদ্বারা কল্পনাদ্বারা রচনা করেন নাই; আমাদের বহুপূর্ববর্তিগণ সত্যকে যেমন করিয়া দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন বেদ তাহারই প্রেরণাময় বিবরণ। বেদের সকল সূক্তের মধ্যেই অপরোক্ষ দিব্যানুভূতির প্রমাণ রহিয়াছে তাহা হয়তো সত্য নয়; যে স্বল্পসংখ্যক মন্ত্রের মধ্যে তাহার সন্ধান আছে পরবর্তী কালে স্বাভাবিক ভাবে সেগুলিকেই আমরা শ্রুতি বলিয়া বাছিয়া লইয়াছি। আরণ্যক উপনিষদ্‌গুলির ভিতরকার অনেক বচনকে আমরা শ্রুতি-প্রমাণরূপে আরো নিবিড় করিয়া পাইয়াছি।

এই প্রসঙ্গে এই প্রমাণ শব্দের অর্থ কি? প্রমাণ শব্দের অর্থ এখানে সাক্ষ্য। আমাদের বহুপূর্ববর্তী কাল হইতে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কতভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন হৃদয়ের আবরণ উন্মোচন করিয়া অরণ্যে পর্বতে কান্তারে জনপদে এই নিখিল সত্যকে দেখিবার শুনিবার; যাহা দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন তাহারই সাক্ষ্য আমাদের জন্য তাঁহারা ছন্দোময় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পাইয়াছি

বেদের মেধাবী কবিগণের সাক্ষ্য, আমরা পাইয়াছি আরণ্যক উপনিষদের ঋষি-রাজর্ষিগণের সাক্ষ্য, আমরা পাইয়াছি মহাভারতের বিপুল জীবন কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষ্য। ইহার মধ্যে এমন কথা কেহ বলেন নাই, সত্যকে এই যাহা জানিলাম বা বলিলাম— ইহা ছাড়া আর জানিবার বলিবার নাই— বা যে পথে জানিলাম বা বলিলাম সে পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে জানিবার বা বলিবার কিছু নাই; তাঁহারা শুধু বলিয়াছেন তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে সত্য রহিয়াছে সেই সত্যকে জান— সেই সত্যকে জানা ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর অন্য কোনো পন্থা নাই।

এই জন্য দেখিতে পাই, মহাভারতে ভগবান্‌কে শ্রীকৃষ্ণরূপে একেবারে সশরীরে মানুষের কাছে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল, তিনি মানুষকে তাঁহার পরমবিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষে দেখাইয়া মানুষকে তাঁহার পরমঐশ্বর্যে ভীত স্তব্ধ করিয়া বলিলেন, আমিই ক্ষর এবং অক্ষর এই উভয়ের অতীত পুরুষোত্তম— আমিই হর্তা কর্তা বিধাতা— তুমি মানুষ কিছুই নও— তুমি আমার হাতে নিমিত্তমাত্র ক্রীড়নকমাত্র; কিন্তু ইহারও পরে পরম দুঃসাহসিক শংকরাচার্য আসিয়া গীতাখানি হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, হঁ্যা কৃষ্ণ এইসব বলিয়াছেন বটে, তবে কৃষ্ণ কে? অখণ্ড অদ্বয় নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম— তাঁহার আবার কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব কি? মানুষের সাধারণ কবিকল্পনা ভগবৎ-সত্য ধারণা করিবার জন্য এবং তাহাকে কিঞ্চিৎ রসাল করিয়া তুলিবার জন্য কৃষ্ণরূপে একটি ব্যক্তি-ভগবানের কল্পনা করিয়া লইয়াছে। গীতার অনেক পরবর্তী কালের শংকরাচার্যের এই যে অনমনীয় এবং সর্বপ্রকারের আপোসবিরোধী দুঃসাহসিক সাক্ষ্য— তাহাকেও আমরা একান্তভাবে অগ্রাহ্য করি নাই। তাঁহার সেই আপোস-বিরোধী দৃঢ় মনোভাব লইয়াও তিনি ভারতবর্ষের একটি বিশাল জনসমাজের নিকটে এখনও ভগবান্ শংকর বলিয়া স্বীকৃত এবং পূজিত। আবার শংকরাচার্যের পরে দ্বৈতবাদী সাক্ষ্য লইয়া রামানুজ আসিয়াছেন, মধ্ব আসিয়াছেন, নিম্বার্ক আসিয়াছেন, বল্লভাচার্য আসিয়াছেন; শাস্ত্রপ্রমাণ এবং তর্কজালকে এড়াইয়া চৈতন্য আসিয়াছেন, রামানন্দ, কবীর, তুলসীদাস, নানক প্রভৃতি আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের ধর্মের ক্ষেত্রে ইঁহাদের কাহারও সাক্ষ্যই অগ্রাহ্য হয় নাই, বিরাট জনসমাজের কাছে কেহই অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া গণ্য হন নাই— আমরা অবতাররূপে (অর্থাৎ যাঁহার ভিতর দিয়া দিব্যসত্যের মর্ত্যে অবতরণ বা অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে) হোক, বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসাবে হোক, বা দিব্যবাণীবাহক হিসাবে হোক— ইঁহাদের প্রত্যেককেই আমাদের বৃহৎ সমাজ মানসে একটি সশ্রদ্ধ আসন দান করিয়াছি। সত্যদ্রষ্টা ঋষির আমাদের মধ্যে আবির্ভাব সম্ভাবনাকে বর্তমান যুগেও আমরা লঘু করিয়া দেখি নাই; শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি প্রভৃতিকে এযুগেও আমরা দিব্যবাণীবাহকরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আবার ভারতবর্ষের বাহিরের ঈসা-মুসা-মহম্মদকেও সত্যের দীপবর্তিকাবাহী বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা দ্বিধা প্রকাশ করি নাই।

অনুষ্ঠানযুক্ত দৈনন্দিন বা পালপার্বণিক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমাদের আপ্তবিশ্বাস কি ব্যবহারিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের অনুসৃত একটি সাধারণ প্রথায়। বিবাহ হোক, শ্রাদ্ধ হোক— বা অন্য কোনো নিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান হোক— সাধারণ প্রথা হইল বিষ্ণুস্মরণ করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করা। এই বিষ্ণুস্মরণের একটি বৈদিক মন্ত্র রহিয়াছে, মন্ত্রটি হইল এই—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

'সেই বিষ্ণুর— অর্থাৎ সর্বব্যাপীর পরমপদ সূরগণ (সংযত তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ) সর্বদা দেখেন— যেমন চক্ষু আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে।'

এই মন্ত্রোচ্চারণের তাৎপর্য কি? কোনো ধর্মানুষ্ঠানের পূর্বে ন্যূনতম এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা চাই যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারের পশ্চাতে কোনো একটি সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে। এ-রকম সত্য যে কিছু রহিয়াছে তাহা সাধারণ মানুষ আমি কি করিয়া জানিব? নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে তো এমন সত্য লাভ হয় নাই। সেখানে তবে এই সত্যের প্রমাণ কি? প্রমাণ যুগযুগের ঋষিগণের অনুভূতি, যে অনুভূতির আভাস ভাষার মাধ্যমে আকারে ইঙ্গিতে তাঁহারা রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সত্যলাভের ক্ষেত্রে ভারতীয় মানসে প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত আরও একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল এই, বিশ্ববিধাতা তাঁহার সত্য যে শুধু মানুষের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করেন তাহা নয়, বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়াও প্রকাশ করেন। উন্মুক্ত মন লইয়া যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া যে আসিয়া প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইতে পারে সে প্রকৃতির নিকট হইতেই অধ্যাত্ম শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকামের উপাখ্যানের মধ্যে। ঋষি গৌতম সত্যভাষণের জন্য জাবাল সত্যকামকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া নিজে কোনো দীক্ষা উপদেশ দিলেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। একদিন উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বৃষগুলিই ডাকিয়া সত্যকামকে বলিয়াছিল, চতুর্দিকের প্রত্যেকটি দিক্‌ই ব্রহ্মের একটি কলা, চতুর্দিকের চতুষ্কলা লইয়া ব্রহ্মের 'প্রকাশবান্' এক পাদ। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রজ্বলিত যজ্ঞের অগ্নি সত্যকামকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, এই ভূলোক-দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ সমুদ্র জুড়িয়া ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' আর এক পাদ বিরাজিত। পর দিবস দিবাবসানে আকাশ হইতে উড়িয়া-আসা হংস সত্যকামকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ— এই প্রত্যেকটিতে ব্রহ্মের এক কলা, এই চতুষ্কলা লইয়া ব্রহ্মের 'জ্যোতিষ্মান্' অপর পাদ। অপর দিবস জলচর মদ্‌গুপাখী উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে বলিয়াছিল, প্রাণে চক্ষুতে শ্রোত্রে ও মনে ব্রহ্মের আর চতুষ্কলা, এই চতুষ্কলা লইয়া ব্রহ্মের 'আয়তবান্' চতুর্থ পাদ।

ইহার পরে সত্যকাম একদিন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইল। সত্যকামকে দেখিয়া বিস্মিত আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, হে সৌম্য, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?' বিনয়কণ্ঠে সত্যকাম উত্তর করিয়াছিল, 'অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ'—'মানুষের নিকট হইতে উপদেশ পাই নাই— উপদেশ পাইয়াছি মনুষ্য ছাড়া অন্যের নিকট হইতে!'[১]

ভারতীয় মন সত্যলাভের সম্ভাবনাকে কত দিক্ হইতে দেখিয়াছে এবং দেখিতেছে উপরে তাহারই একটা আভাস দিলাম। আমি নিছক ধর্মের ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি সত্যলাভের কথা, যে সত্যলাভের প্রভাব বিস্তৃত ভারতীয় ব্যাপক সাংস্কৃতিক জীবনেও। এইখানেই 'সেমিটিক্' মন আগাইয়া আসিয়া বলিবে, তোমাদের ধর্ম বল আর সংস্কৃতি বল, সবই হইল 'হযবরল'। তোমাদের সব ক্ষেত্রেই এ-ও হয়, ও-ও হয়— আর যাহা কিছু আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহারও সবই হয়। তোমাদের চিন্তার মধ্যে কোনো পরিচ্ছন্নতা নাই, গ্রহণের মধ্যে কোনো সুনির্বাচন নাই, শ্রেয়োবোধের মধ্যে কোনো একাগ্রতা নাই;

মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তোমাদের তাই দেখা দেয় শিথিলতা। একই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমরা ইন্দ্র বরুণ অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে স্তুতি করিয়া বৈদিক মন্ত্র গান কর, আবার যে এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা অগ্নিতে জলে বিশ্বভুবনে— যিনি তৃণে যিনি বনস্পতিতে তাঁহাকে প্রণাম কর; আবার শস্যের প্রতীকরূপে কলাগাছ রোপন কর, সঙ্গে সঙ্গে আবার মাটির ঘটে সিন্দুরের পুত্তল আঁক। যাহাকে তোমরা তোমাদের সার্বজনীনতা এবং উদারতা বলিয়া গর্ব কর তাহা তোমাদের ধ্যান-মননের অপরিচ্ছন্নতাজনিত একটা 'জগাখিচুড়ি'। জিনিসটি ধর্মের ক্ষেত্রে অতিশয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। খ্রীষ্টান-ধর্ম, ইস্‌লাম-ধর্ম, ইহুদি-ধর্ম প্রভৃতির মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত লক্ষণ অতি সহজেই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের কোনো সহজ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলা চলে না। এতো উৎস হইতে এতো উপাদান গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এমন মিশ্র এবং জটিলরূপ ধারণ করিয়া আছে যে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা না বলিয়া কোনো পরিচয় দেওয়া যায় না।

অভিযোগগুলি শুনিতে আপাততঃ তথ্যসমর্থিত এবং যুক্তিসমন্বিত বলিয়াই মনে হয়;— এবং তাই মনে হয় বলিয়াই হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই কথাগুলি চালু হইয়া গিয়াছেও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। অভিযোগগুলির মধ্যে অত্যন্ত মোটা অভিযোগ যেটি তাহা হইল হিন্দু-সংস্কৃতির ঐ 'হযবরল'রূপ বা 'জগাখিচুড়ি' রূপ। এই প্রধান এবং ব্যাপক অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, বহুউপাদানের সংমিশ্রণে যাহা গড়িয়া উঠে তাহাকে 'হযবরল' না হইয়া আর কোনো উপায়ই নাই— এই ধারণাটাই মূলতঃ অত্যন্ত একটা ভুল ধারণা। কোনো একটি সংমিশ্রণ 'হযবরল' হইয়া উঠে তখনই যখন তাহার ভিতরকার সকল উপাদানকে গাঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার কোনো চেষ্টা বা দৃষ্টি থাকে না। ঔপনিষদ-দৃষ্টিকে আমরা ব্যাপক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কেন্দ্রগত দৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। উপনিষদের দৃষ্টি হইল জীবনের যতপ্রকারের বহু সেই বহুর পিছনে পরমশান্তসমাহিত পরমমঙ্গলময় একটি অদ্বয় সত্যের উপলব্ধি। সেই মঙ্গলময় এক পরমসত্যস্বরূপের সহিত যুক্ত করিয়াই জীবনের যাহা কিছু সমস্তের মূল্যায়ন। হিন্দু-সংস্কৃতি তাই কাহাকেও বর্জন করে নাই, অবজ্ঞা করে নাই, সাগ্রহে সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং সেইটুকুই মাত্র গ্রহণ করিয়াছে যেটুকু এই মৌলিক মঙ্গলময় অদ্বয়বোধের পরিপন্থী নয়। যাহাকেই সে গ্রহণ করিয়াছে 'জগাখিচুড়ি'ভাবেও গ্রহণ করে নাই, নির্বিচারেও গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিয়াছে সেই এক মঙ্গলময় অদ্বয়বোধের অনুকূলভাবে। তাহা যদি হিন্দু-সংস্কৃতি যুগযুগ ধরিয়া না করিতে পারিত তবে হিন্দু-সংস্কৃতি বাহিরের সকল অভিযোগের দায়েই অভিযুক্ত হইত; তাহা করিতে পারিয়াছে বলিয়া হিন্দু-সংস্কৃতি এই অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত নয়।

যাহাকে আবার বহুউপকরণের মিশ্রণে 'হযবরল' বলিয়া অভিযুক্ত বা অবজ্ঞা করা হয় তাহার যে অপর একটি মহান্ দিক রহিয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। হিন্দু-সংস্কৃতির ইতিহাস যুগযুগ ধরিয়া একটি শান্তিপূর্ণসহাবস্থিতির ইতিহাস। আমরা যাহাকে সপ্রশংসভাবে সংস্কৃতির দৃঢ়বদ্ধতা একাগ্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বলি অন্যদিক্ হইতে তাহাকে যে আবার বলা যায় সংস্কৃতির উদগ্রতম একাধিকারত্ব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে— অর্থাৎ ইতিহাসের আবর্তনে তাহা বারবার দেখা দেয় একটা চরম অসহিষ্ণুতায়। এ অসহিষ্ণুতার কর্মপ্রেরণা জোর-জবরদস্তি দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায়— সর্বপ্রকারের পরমতকে হয় সহজে মতান্তরিত করিয়া একান্তভাবে নিজের বশে আনিবার— অথবা রূঢ়তম আঘাতের দ্বারা তাহাকে পিষ্ট করিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টায়।

হিন্দু-সংস্কৃতির ব্যবহারিক রূপের মধ্যে প্রথমাবধি যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি স্বীকৃত তাহাতে পরমত সম্বন্ধে তাহাকে অত্যন্তভাবে উদগ্র হইয়া উঠিতে প্রেরিত করিবার কিছুই ছিল না। জগতের ইতিহাসের বহুসময়ে বহুদেশে দেখা গিয়াছে, কোনো উন্নততর জাতি অন্য নিম্নমান জাতির উপরে যখন সভ্যভাবে সাংস্কৃতিক অভিযান চালাইয়াছে তখন তাহার যাহা কিছু পূর্বসম্পদ তাহাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে এবং নিজেদের রাষ্ট্রপদ্ধতি ধর্মবিশ্বাস শিল্প ও সাহিত্য সবটাই তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগ হইতেই এই আক্রমণাত্মক আত্মপ্রতিষ্ঠাস্পৃহার অনুপস্থিতি দেখিতে পাই। হিন্দু-সমাজের বর্ণাধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ভিতরে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির চমৎকার পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি। বর্ণ এখন একটা জন্মগত শ্রেণীতে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাকালে ইহা বিভিন্ন নৃজাতির পার্থক্যচিহ্নরূপেই দেখা দিয়াছিল। চতুর্বর্ণ যখন একই হিন্দু-সমাজের চারিটি স্তরভাগরূপে দেখা দিল— প্রত্যেক স্তরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিলক্ষণ— আবার তৎসত্ত্বেও সবস্তর অঙ্গাঙ্গিভাবে এক সমাজদেহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অনুপূরকরূপে দেখা দিল— তখনই সংস্কৃতির ব্যবহারিক কার্যকারিতায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থাননীতি যে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হইল তাহা আমরা শ্রদ্ধান্বিতভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি। কৃষ্ণবর্ণের শূদ্রগণ সমাজের 'দাস' হইয়া রহিল বটে, তথাপি বিচিত্র হিন্দু-সংস্কৃতি ভাণ্ডারে সেও তাহার নিজস্ব দানের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইল না। তাহার বিশিষ্ট অনেক কিছু লইয়াই সে আসিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে স্থান পাইল; শুধু তাহাকে সমগ্র সমাজসত্তার সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতে হইল চরমে সর্বব্যাপী এক মঙ্গলময় পরম সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া,— সেই অস্তিত্বের নিরিখে বাস্তব জীবনের মূল্যায়নে রাজি হইয়া।

মূল মঙ্গলময় অদ্বয়সত্যের বিশ্বাসে অটল থাকিয়া বৃহৎ সমাজজীবনে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি-গ্রহণ আধুনিককালের হিন্দু-সংস্কৃতির সক্রিয়রূপের মধ্যেও ইহা স্পষ্টলক্ষণীয়। এই জন্য পূর্ব হইতেই হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'মিশ্রণ' কথাটার ব্যবহারে আমরা আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছি, বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছি মিলন কথাটিকে। সমাজজীবনে এই যে একটা সহজাত মিলনস্পৃহা ইহার পশ্চাতে অনবরত শক্তিসঞ্চার করিতেছে একটি বাধামুক্ত মানবীয় মনোবৃত্তি। সে মনোবৃত্তিটির একটি স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে গীতার মধ্যে, যেখানে ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত শ্রীযুক্ত— অথবা অন্য কোনো প্রকারে মহৎ— তাহার সকলই আমার অংশ বলিয়া জানিবে। হিন্দু-সংস্কৃতি এই কথাটাকে একটা জীবন্ত সত্যরূপে সমাজজীবনের সামনে রাখিতে চাহিয়াছে যে সত্যে বা শ্রেয়ে কোনো মানবগোষ্ঠীর বা বিশেষ কোনো দেশকালের কোনো বিশেষ-অধিকার নাই, সত্য এবং শ্রেয় সর্বলোকসামান্য। স্থানভেদে কালভেদে পাত্রভেদে সেই সত্যপ্রকাশের তারতম্য ঘটিতে পারে, কিন্তু সকল তরতমের ভিতর দিয়া একই মঙ্গলময় সত্যপ্রকাশ পাইতে চাহিতেছে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। এই কথাটি স্মরণ রাখিলে যে-কোনো কালে যে-কোনো নরগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনের যে অংশটি মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে কোনোই বাধা থাকে না। হিন্দু-সমাজ এই গ্রহণে কোনোদিন কোনো কার্পণ্যও করে নাই।

পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ এই দেখা দেয় যে, স্পষ্ট কোনো একটি 'রেভেলেশন্'-এ বিশ্বাস না থাকিবার জন্যে ইহা যথেষ্টরূপে পরিচ্ছন্ন এবং সুনির্দিষ্ট নয়। কোনো

সর্বাতিশয়ী অবশ্যগ্রাহ্য 'রেভেলেশন্'-এর পরিবর্তে হিন্দু-মন নির্ভর করে ধীরগণের বা ঋষিগণের অভিজ্ঞতার উপরে। কিন্তু ধীর কে? ঋষি কে? ইঁহাদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ কি? কাঁহার অভিজ্ঞতা এবং বাণী গ্রাহ্য— এবং কাহার নয়, কতখানি গ্রাহ্য কতটা নয়— এ-বিষয়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে কাহার নিকট হইতে? এ বিষয়ে কোনো সুদির্দিষ্টতার সম্ভাবনা না থাকায় অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেয় কতকগুলি আতিশয্য; ব্যক্তিবিশেষের মতামত লইয়া আতিশয্য— অনিয়ন্ত্রিত ভাবোন্মাদনার আতিশয্য। হিন্দুসংস্কৃতির এই এক পরম দুর্বলতা।

কিন্তু এই অভিযোগ যখন করা হয় তখন অপরদিকের আর একটি বৃহত্তর আতিশয্যের বিপৎ-সম্ভাবনাকে একেবারেই ভুলিয়া যাওয়া হয়, অথবা সেই বিপৎ-সম্ভাবনাকে লঘুবোধে উপেক্ষা করা হয়। সুনির্দিষ্ট একটি বিশেষ 'দিব্যাভিব্যক্তি'কে (রেভেলেশন্) কেন্দ্র করিয়াই অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিখিলমানবের চৈতন্যকে একেবারে অটুটভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবার বিধি কি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের নিকটে একটা অনভিপ্রেত আতিশয্য বলিয়া দেখা দিতে পারে না? সেই বিধিকে মানিয়া লইলে শ্রেয়োলাভের জন্য নিখিলমানবকে মনুষ্যচেতনাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে? দিব্যাভিব্যক্তি-সুনির্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে যেমন করিয়া হোক মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং চৈতন্যস্পন্দনকে ঠাসিয়া পূরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বলা যাইতে পারে, একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেয়-আদর্শের দিকে চেতনা-স্পন্দনকে একমুখী করিয়া তুলিবার চেষ্টাই তো মানুষের যথার্থ 'বিনয়' বা 'ডিসিপ্লিন্'; এই 'বিনয়' ব্যতীত তো চিত্তের ঊর্ধ্বায়নের বা শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় কোনো পন্থা নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মানুষের 'বিনয়ে'র আদর্শকে মানুষের চিত্তমুক্তির নিত্য-বিরোধী বস্তু করিয়া তুলিলে চলিবে না।

হিন্দু-মন এমন শ্রেয়কে শ্রদ্ধা করিতে উন্মুখ নয় যাহা চিত্তমুক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সে চায় সেই শ্রেয়কে যাহা নিখিলমানবের উপরে কোনো বিধাতা কর্তৃক অতিশয় সুনির্দিষ্টরূপে চাপাইয়া দেওয়া নয়, যে শ্রেয়কে নিখিলমানব তাহার অসংখ্য মানব-অভিজ্ঞতার সুপরিস্রুত নির্যাসরূপে লাভ করে। চেতনাকে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো বিধির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া নহে, চেতনার অনন্তপ্রসার ও ঊর্ধ্বায়নের দ্বারা যে শ্রেয়কে লাভ করা যায় তাহাই নিখিলমানবের কাম্য হোক— হিন্দু-সংস্কৃতির সক্রিয়রূপের ইহাই একটি স্পর্শযোগ্য স্পন্দন। একটি বিশেষকালের দিব্য-ব্যবস্থা-পত্রের মোড়কের মধ্যে অনন্ত মানবচেতনাকে পুঁটলি বাঁধিয়া তুলিবার মধ্যে মানবচিত্তের সহজ আনন্দময় স্ফুরণ নাই, জীবনের শ্রেয়ের সঙ্গে চেতনার এই সহজ আনন্দময় স্ফুরণের নিত্যযোগ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

হিন্দু-সংস্কৃতির সক্রিয়রূপ সম্বন্ধে আবার সমালোচনা দেখা দেয় অন্যদিক হইতে। বলা হইয়া থাকে, হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে বড় বড় আদর্শ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু একটি মৌলিক কারণে সেগুলি হিন্দু-সংস্কৃতিকে কোনা সক্রিয়রূপ দান করিতে পারিতেছে না। সেই মৌল কারণটি হইল এই যে, স্বভাবতঃই হিন্দু-সংস্কৃতি নেতিমার্গী। এই নেতিমার্গের প্রবণতা হিন্দু-সংস্কৃতিতে দেখা দিয়াছে হিন্দুজাতির সর্বাতিশায়ী অদ্বৈত বেদান্ত-প্রবণতা হইতে। বেদান্তের মায়াবাদ হিন্দু-মানসের একটি স্থিরবিন্দু; হিন্দু-মন তাই জীবনের ক্ষেত্রে এখানে সেখানে কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ করিয়াই ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়ায় ঐ বেদান্তের মায়াবাদে। একদিক্ হইতে বিচার করিলে একটি সর্বাতিশয়ী মায়াবাদের মনোবৃত্তি সর্বপ্রকারের মানব-সংস্কৃতিরই বিরোধী, কারণ মায়াবাদ জীবনের সত্যমূল্য অস্বীকার করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণরূপে শশশৃঙ্গ বা আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা

অলীক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া জীবনের মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছে। জীবনেরই যখন কোনো মূল্য নাই তখন জীবন হইতে কোনো মূল্যবোধ বা শ্রেয়োবোধ জাগিয়া উঠিবে কি করিয়া ?

অহিন্দুগণ— বিশেষতঃ 'সেমিটিক' দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যখনই হিন্দু-জীবনযাত্রা এবং হিন্দু-সংস্কৃতিকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন তখন সকল সম-অনুভূতি ও সহৃদয়তা লওয়াও তাঁহারা হিন্দু-জীবন ও চিন্তার এই নঙর্থক দিকটাকেই হয় একমাত্র করিয়া দেখিয়াছেন, নতুবা প্রধান করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, হিন্দুগণের যে জীবনবোধ তাহার মধ্যে আশা-উৎসাহময় প্রেরণা-স্পন্দনময় কোনো বাস্তব জীবন নাই, প্রেমপ্রীতিপূর্ণ জীবনরসের গভীর মাদকতা নাই, জীবনচেতনার মধ্যে বিচিত্রবর্ণের ভাবসংবেগের চঞ্চলতা নাই, এমন কি তাহাদের ধর্মচেতনার মধ্যেও একটা ব্যক্তি-ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্বন্ধের নিবিড়তা এবং মধুরতা নাই ; সর্বত্রই আছে একটা বিবর্ণ অমূর্ত তত্ত্বচিন্তার বিরসতা, একটা সর্বব্যাপী 'কিছু-না'র মধ্যে আত্মনিমজ্জন, অনেকখানি একটা শুষ্ক নৈয়ায়িকপন্থায় লব্ধ শূন্যতার অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া মরা। শেষ অবধি সমস্ত বাস্তব জীবনকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া কোনো এক অনির্দেশ্য একের সঙ্গে এক হইয়া যাইবার চিন্তা। যে একের কথা বলা হয় তাহাকে মর্ত্যের এই জীবন লইয়া ধরিবার ছুঁইবার কোনো উপায় নাই, জীবনকে তিলে তিলে অবজ্ঞা করিয়া অস্বীকার করিয়া তবে সেই একের দিকে আগাইতে হইবে ; সে এক নিজেও কোনো সদর্থক উপকরণ বা উপাদানযুক্ত সত্য নয়— একটি কথার জালে বেষ্টিত নঙর্থক লক্ষণের সমষ্টিমাত্র। যেদিকেই চাহিবে সেদিকেই দেখিবে, সীমা-অসীমের কতকগুল অমূর্ত ধারণা লইয়া কেবল যাদু খেলিবার চেষ্টা ; সেই অসীমই যে কেবল অনির্দেশ্যতার বাষ্পে উবিয়া যায় তাহা নহে, সীমাও তাহার চরম মূল্যহীনতায় বাষ্পায়িত হইয়া উঠে।

হিন্দু জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যখন এই কথাগুলি বলা হয় তখন বেশ বোঝা যায় যে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্র হইতেই কথাগুলিকে ব্যাপকভাবে জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত করিয়া লওয়া হয়। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও বাছিয়া বেদান্তমতটি— এবং বেদান্তমতের মধ্যেও আবার শংকরবেদান্তের মতটিকে প্রধান করিয়া তুলিয়া সাধারণ জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধেই এগুলিকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

এখানকার অভিযোগটিকে মোটামুটিভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে দাঁড়ায় এই, হিন্দুগণের জীবনে কোনো এথিক্স্ বা নীতিবোধ নাই। এথিক্স্ গড়িয়া উঠে জীবনসত্য লইয়া, মূলে জীবনই যদি সত্যহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল তবে আর এথিক্স্ দাঁড়াইবে কাহার উপরে? এই-জাতীয় তথ্য-বিশ্লেষণ এবং যুক্তিগ্রন্থন আমাদিগকে দুইটি সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিতে পারে। একটি হইল এই যে, ভারতবাসী হিন্দুগণ সাধারণতঃ অত্যন্তভাবে পরমার্থ বিশ্বাসী ; ফলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেই জীবননীতি সম্বন্ধে অত্যন্তভাবে উদাসীন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে, ভারতীয় হিন্দুগণের তত্ত্বচিন্তাজনিত পারমার্থিক শ্রেয়োবোধ সত্ত্বেও তাহারা জীবননীতিনিষ্ঠ ; এ সিদ্ধান্ত তাহা হইলে আমাদিগকে আবার অপর সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দেয় যে, হিন্দুগণের তথাকথিত বড় বড় সব তত্ত্বাদর্শের হিন্দুগণের বাস্তব জীবনের উপরে আসলে কোনো প্রভাবই নাই ; দুইটিই দুইটি সমান্তরাল রেখায় নির্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু আমাদের দিক্ হইতে দেখিতেছি, আমরা এই দুই সিদ্ধান্তের কোনোটির সঙ্গেই নিজেদের মিলাইয়া লইতে পারিতেছি না। আমরা দেখিতেছি, গড়পড়তা একজন হিন্দুর জীবননীতিবোধ যথেষ্ট রহিয়াছে,

আবার সেই জীবননীতিবোধ বা এথিক্স্-এর সহিত তাহার ধর্মবোধ বা পরম শ্রেয়োবোধের কোনো অপরিহার্য বিরোধ নাই।

হিন্দুর জীবনযাত্রায় এবং সক্রিয় শ্রেয়োবোধের মধ্যে যে একটা অপরিহার্য বিরোধ বা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই সে সত্যটি একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রণিধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। এই কথাটিকে প্রথমেই অতিস্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে অহিন্দুগণের মধ্যে জীবননীতি ও ধর্মনীতি বুঝাইতে 'এথিক্স্' এবং 'রিলিজন্' বলিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শব্দ রহিয়াছে; হিন্দু চিন্তাধারায় এই দুইটি বিষয় বুঝাইতে স্পষ্টভাবে পৃথক্ কোনো দুইটি শব্দ নাই; আছে উভয় বিষয়কেই বুঝাইতে একটিমাত্র শব্দ, তাহা হইল 'ধর্ম'। দুইটি বিষয় বুঝাইতে হিন্দুগণ যে শিথিলভাবে ঐ একটি শব্দ 'ধর্ম' ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা নহে; আমরা যতদুর জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাতে বিষয়ও মূলতঃ ঠিক দুইটি নয়; বিষয়ও একটি, সেই জন্যই শব্দও একটি।

ভারতীয়গণের নিকটে ধর্ম শব্দের অর্থ কি? ধর্ম বলিলেই কোনো অপ্রাকৃত সর্বনিয়ন্ত্রক দৈব-শক্তিতে বিশ্বাস বা সেই দৈবশক্তির আরাধনা বুঝায় না,— বিশেষ করিয়া আবার কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা আনুগত্য বা ভক্তিপ্রেমের কথাও বুঝায় না। ধর্মের ভিতরে ইহার সব কিছুই বাদ পড়িবে এমন কথা নয়, বাদ পড়িলেও যে ধর্ম আর ধর্ম হইয়া উঠিতে পারে না এমনও নয়। ধর্ম কথাটিকে যুগে যুগে সাহিত্যে শাস্ত্রে ও দর্শনে ভারতীয়গণ নানা প্রসঙ্গে নানা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; সেই সকল অর্থের মধ্যে যে অর্থটি ক্রমে অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে ধর্ম শব্দের অর্থ হইল অবশ্য কর্তব্য কার্য। এই কর্তব্য হইল নিজের সম্বন্ধে, পরিবার সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে—ব্যাপকভাবে সমগ্র মানব সম্বন্ধে— এবং আরোও ব্যাপকভাবে হইল সর্বভূত সম্বন্ধে। একটি অবশ্যকর্তব্যবোধরূপে এই ধর্মের মধ্যে একটা প্রবল প্রেরণাশক্তি নিহিত আছে— যে প্রেরণাশক্তি মানুষকে প্রেয়ের পথেও আগাইয়া দেয়— শ্রেয়ের পথেও আগাইয়া দেয়। ধর্ম মানুষকে যে শ্রেয়ের পথে আগাইয়া দেয় সেই পরম শ্রেয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সর্বত্রই যে একটা অবশ্যযোগ থাকে একথা বলা যায় না। এই জন্য কোনো কর্ম যদি মানুষকে মঙ্গলের পথে আগাইয়া দেয়— অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের কোনো সহায়তা না করে— এমন জাতীয় কর্মকেও ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে ভারতীয় মনে বিশেষ কোনো প্রতিকূল চাপ পড়ে না।

দৃষ্টান্তস্থলে আমরা বৌদ্ধ-ধর্মের উল্লেখ করিতে পারি। বৌদ্ধ-ধর্মকে আদৌ কোনো ধর্ম বলা যায় কি না এ বিষয়ে অভারতীয় পণ্ডিতগণের মনে, বিশেষ করিয়া সেমিটিক সংস্কৃতিপ্রভাবিত পণ্ডিতগণের মনে, অনেক সংশয় ও বিতর্ক দেখা দিয়াছে। যে প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম নির্বাণের আদর্শের উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দেয় সেই বৌদ্ধ-ধর্মকে একটা 'রিলিজন্' হিসাবে কি করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এই চেষ্টায় কেহ কেহ 'রিলিজন্'-এর একটা 'লঘিষ্ঠ সাধারণ হর' আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই 'লঘিষ্ঠ সাধারণ হর' হইল 'নিত্যের সহিত যুক্ত হওয়া', বা কোনো 'শাশ্বতপদ' লাভ করা। কিন্তু ধর্মের এই জাতীয় একটি 'লঘিষ্ঠ সাধারণ হর' বুদ্ধের সমর্থন লাভ করিত বলিয়া মনে হয় না। তিনি হয়তো বলিয়া বসিতেন, যে শাশ্বতপদের কথা বলে সে শাশ্বতবাদের দ্বারা দুষ্ট। কিন্তু মজা এই বৌদ্ধ-ধর্ম আদৌ একটি ধর্ম কি না এ প্রশ্ন একটি ভারতীয় হিন্দু-মনকে কোনোদিনই বিক্ষুব্ধ করে নাই। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মমত বিভিন্নযুগে গড়িয়া উঠিয়াছে— যেগুলি নাস্তিক্যবাদী; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে ধর্ম আখ্যাটি ব্যবহার করিতে আমরা কোনো দিনই কোনো দ্বিধা

বা সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সেমিটিক মনের নিকটে ইহা সমস্যার একটা অতি-সরলীকরণ বলিয়া বোধ হইতে পারে, ইহাকে চিন্তার জগাখিচুড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আমরা এব্যাপারে কোনো ভ্রান্তি বা মননের গোলযোগ দেখিতে পাইতেছি না। নিজের মঙ্গলের জন্য—মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য— জীবমাত্রেরই মঙ্গলের জন্য কর্তব্যকর্মে প্রচোদিত হইবার প্রাথমিক প্রেরণাই এ-সকল কর্মকে নিঃসন্দেহে ধর্মস্বরূপতা দান করিয়াছে। এই জন্য আমরা নির্ধারিত চরম লক্ষ্যের দ্বারাই সর্বত্র ধর্মের ধর্মত্ব বিচার করি না; প্রাথমিক প্রেরণার সততা দ্বারাও ইহার বিচার করি। কতকগুলি নীতি উপদেশের মধ্যে এবং তৎসহচরিত আচরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা যদি এমন কিছু দেখিতে পাই যে তাহা বেশ একটি লক্ষণীয় জনসমাজের চেতনাকে একটি সর্বাতিশয়ী মঙ্গলবাসনাতে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে— নিজেরও মঙ্গল, আবার ব্যাপকভাবে সমাজেরও মঙ্গল— তবেই আমরা বলিতে পারি, আমরা ইহার মধ্যে ধর্মের 'লঘিষ্ঠ সাধারণ হর'কে লাভ করিয়াছি। পালিশাস্ত্রের মধ্যে মজ্ঝিম-নিকায়ের (২।২।৩) 'মালুঙ্ক্যপুত্ত' উপাখ্যানের মধ্যেই আমরা আবিষ্কার করিতে পারি ধর্মের এই 'লঘিষ্ঠ সাধারণ হর'কে। ধর্মের লক্ষ্য সেখানে 'জগৎ কি, আত্মা কি, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরে কি'— এই সকল দার্শনিকতত্ত্বে নহে, জগতের সমস্ত লোক যে বিষমাখানো তীরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে সেই তীর অপসরণ করিয়া তাহাদের ক্ষত আরোগ্য করিবার আশু উৎকণ্ঠায় এবং এতদর্থে সকল কুশলকর্মের প্রেরণায়।

বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই যে অসীম করুণা এবং সেই করুণার ভিতর দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া কুশলকর্মের জন্য যে অনন্ত প্রেরণা— বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এই সদর্থক দিক্‌টাকে ততখানি বড় করিয়া দেখা হয় নাই— যতখানি বড় করিয়া দেখা হইয়াছে বৌদ্ধ-ধর্মের নঙর্থক শূন্যতা এবং নির্বাণের দিকটাকে। হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা মনে হয়। নির্বিশেষ অদ্বয়বাদের এবং অদ্বৈতবেদান্তানুসারী মায়াবাদের কথা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যেরূপ প্রচার লাভ করিয়াছে, নিরন্তর কুশলকর্মে উদ্বোধক ধর্মের আদর্শ এবং সর্বাতিশয়ী প্রভাবের কথা সেরূপভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। উপনিষদ্ সমূহের মধ্যে জগৎকে প্রতিমুহূর্তে চঞ্চল, প্রতিমুহূর্তে বিচারশীল— প্রতিমুহূর্তে সংস্রয়মাণ বলা হইয়াছে— এই কথাটি যেমন করিয়া সকলের চোখে পড়িয়াছে ঠিক তেমন করিয়া চোখে পড়ে নাই অপর কথাটি যে, চঞ্চল জগতের যাহা কিছু সকলকে এক শাশ্বত সত্য— এক 'ঈশ'-এর দ্বারা ওতপ্রোতভাবে বাসিত করিয়া লইতে হইবে— এবং সেই জীবন প্রত্যয়-লইয়া সকলকে এই মাটির পৃথিবীতেই কর্ম করিয়া একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ঈশ উপনিষদ্ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই কথা বলিয়াছেন,— প্রথমতঃ একশত বৎসর এই পৃথিবীতেই সকলকে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে— দ্বিতীয় কথা হইল, এই যে একশত বৎসর এখানে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তাহা— 'কুর্বন্ এব ইহ কর্মাণি'— এখানে কর্ম করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ব্রহ্ম-চৈতন্যে বা ঈশ-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কর্ম তাহাই হইল ধর্ম।

হিন্দু-সংস্কৃতিতে এই ধর্মের আদর্শ একটি সদর্থক আদর্শ এবং বাস্তবজীবনে অনন্ত কর্ম প্রেরণাময় আদর্শ, এই কথাটিকেই আমরা সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। কথাটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে কথাটির মূল আদর্শের খানিকটা তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। ধর্মকথাটিকে যাঁহারাই যখন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার ধাতুগত অর্থের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই ধাতুগত অর্থটি এতোই বলিষ্ঠ এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ যে তাহার উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই।

ধর্ম হইল যাহা ধারণ করিয়া রাখে। ধারণ করিয়া রাখিবার তাৎপর্য কি? তাহার সহজ তাৎপর্য এই— যাহা নীচে পড়িয়া যাইতে দেয় না। মানবীয় অস্তিত্বের একটি স্তর আছে; মানুষের ধর্ম হইল তাহাই যাহা মানুষকে সর্বদা এই মানবীয়স্তরে ধারণ করিয়া রাখে, এই স্তর হইতে নীচে নামিয়া যাইতে দেয় না। ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম ন্যায়নীতি— চরিত্রনীতি। ধর্মে যে লোক বিশ্বাসী তাহাকে এই বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় যে, যে-ন্যায়নীতি ব্যক্তিকে ধারণ করিয়া রাখে— ইহা সমাজকেও ধারণ করিয়া রাখে— ইহা মানুষের জগৎকেও ধারণ করিয়া রাখে। সে বিশ্বাসে এই ন্যায়নীতি একটি শাশ্বতনীতি, ইহা বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতনীতি। পূর্বেই বলিয়াছি, এই শাশ্বত ন্যায়নীতিকে স্বীকার করিতে হইলেই যে সর্বত্র একটি শাশ্বত ন্যায়াধীশকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কথা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে এবং জৈন-ধর্মে বহুপ্রসঙ্গে সনাতন ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই সনাতন ধর্মের কর্তারূপে কোনো সনাতন অপ্রাকৃত বা অধ্যাত্মসত্তাকে স্বীকার করা হয় নাই।

হিন্দু-সংস্কৃতির ভিতরে অবশ্য বহুক্ষেত্রেই এই সনাতন ধর্ম বা ন্যায়নীতিকে সনাতন বিশ্ববিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখি, এবং সেই বিশ্ববিধানের পশ্চাতে একটি বিশ্ববিধাতায় বিশ্বাসও দেখিতে পাই। এই বিশ্ববিধাতার বিশ্বাস কিন্তু সর্বত্র খুব প্রত্যক্ষ নহে, অধিকাংশস্থলেই এ বিশ্বাস একটি পরোক্ষ বিশ্বাস— বিধানে বিশ্বাসের চরম ভিত্তিভূমি রূপেই যেন এই বিধাতায় বিশ্বাস। সক্রিয় ব্যবহারিকক্ষেত্রে দেখিতে পাই বিধান এবং বিধাতাকে দুই করিয়া দেখা হয় না; বিধানই বিধাতা; বিধানের প্রতি অটুট আনুগত্যই বিধাতার প্রতি আনুগত্য। বিশ্বগতভাবে ধর্মের এই ন্যায়বিধানরূপের একটি সর্বাত্মক রূপ রহিয়াছে। যে বিধান ব্যক্তিকে তাহার সমগ্রজীবনে একটি চরমমঙ্গলাদর্শের দিকে নিয়ন্ত্রিত করে, যে বিধান সমস্ত বিপর্যয় ভাঙ্গাগড়া উন্নতি অবনতির ভিতর দিয়া কল্যাণের পথে সমাজবিবর্তনকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে— যে বিধান বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজীবনকে একটি বিশেষ গন্তব্যের অভিমুখে নির্দেশ দিতেছে— ইহারা পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত বিধানাবলী নহে, সর্বক্ষেত্রে একই বিধান। একই বিধান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণকর্মের পরিচয় বহন করিতেছে। বিধানের এই মূল ন্যায়স্বভাব এবং মঙ্গলস্বভাবে বিশ্বাস হইতেই মানুষের মানুষের প্রতি এবং মানুষের চতুর্দিগের জগৎটার প্রতি গভীর বিশ্বাস। এই ধর্মরূপ ন্যায়বিধানই সৃষ্টিপ্রবাহটিকে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মানুগ বিশ্ব প্রবাহকরিয়া তুলিয়াছে, বিশৃঙ্খল বস্তুপ্রবাহে পর্যবসিত করিতে পারে নাই।

ব্যবহারিক সমাজজীবনে এই 'ধর্মের' বিশ্বাস হিন্দু-মনকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে? সমাজজীবনের সকল রূঢ় এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্থিত হইয়াও সামাজিক মানুষ এই বোধে তাহার চেতনাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে যে, যে শক্তিসমূহ মানুষের ইতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে, সেগুলি নিছক কতকগুলি অন্ধ জড়শক্তি নয়, সেগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি যদি নাও হয়, অন্ততঃ এগুলি নৈতিক শক্তি। এই নৈতিক শক্তি বিশ্বমানবের মধ্যেও নিরন্তর ক্রিয়াশীল, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও একইভাবে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। এই যে বিশ্বপ্রবাহ এবং তন্মধ্যে মনুষ্যজীবনপ্রবাহ— এই উভয় জুড়িয়া যে একই নৈতিক শক্তি নিরন্তর ক্রিয়াশীল এই বোধ সমাজজীবনে মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক মহৎ প্রেরণারূপে দেখা দেয়। ইহাই সামাজিক মানুষকে তাহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ন্যায়-আচরণের পথে ও ন্যায়-বিচারের পথে উদ্বদ্ধ করিয়া দেয়, ইহাই আবার

সমাজজীবনের রূঢ়তম এবং বীভৎসতম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মুখেও সামাজিক মানুষের পৌরুষকে অনমনীয় করিয়া রাখে। ধর্মের বোধ সামাজিক মানুষকে অন্ততঃ এই চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে যে মানুষের ইতিহাসের বিবর্তনের সম্মুখে একটি নৈতিক নির্দেশ বর্তমান রহিয়াছে।

জীবনের সম্মুখে যে একটি মহৎ নৈতিক নির্দেশ রহিয়াছে এবং এই নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষেরই যে একটি বিশেষ করণীয় অংশ রহিয়াছে গীতার মধ্যে আমরা ইহার ইঙ্গিত এবং উপদেশ দেখিতে পাই। মানুষের ব্যক্তিজীবনের সকল মহৎ প্রয়াসের সহিত সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তর্নিহিত নৈতিক উদ্দেশ্যের সহিতও যে কি নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে গীতা আমাদের নিকটে সেই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। গীতা সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তর্নিহিত এই মহৎ উদ্দেশ্যকে যজ্ঞ-রহস্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সৃষ্টিপ্রবাহের ক্ষেত্রে এই যজ্ঞ একেবারে সহজাত তত্ত্ব। আরম্ভ হইতেই সমস্ত সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে একটি যজ্ঞ প্রক্রিয়া অনুস্যূত রহিয়াছে। এই যজ্ঞের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে দুইটি বিষয় আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি। যজ্ঞ স্থূলকে পরিস্রুত করিয়া এবং পবিত্রীভূত করিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম করিয়া তোলে— এই প্রক্রিয়ায় সে সর্বদাই ঊর্ধ্বায়নকে সহজ করিয়া তোলে। এই ঊর্ধ্বায়ন হইল যজ্ঞের একদিকের একটি প্রধান কথা। যজ্ঞের অন্যদিকের প্রধান কথা হইল বহুর সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ যোগ। যজ্ঞের মধ্যে কোথাও একাকী সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবার সুযোগ নাই; যজ্ঞ মূলেই একটি পরমযোগ— পরস্পরকে পরস্পরের সহিত একটি সুপরিকল্পিত নিয়মক্রমে যুক্ত করিয়া তোলা যজ্ঞের কাজ। যজ্ঞ বুঝাইয়া দেয়, সামগ্রিক প্রয়োজন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের মধ্যে কেহ বড় কেহ ছোট নহে; প্রত্যেকেরই রহিয়াছে একটি বিশেষ কৃত্য; সে কৃত্যটি সমগ্রতারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সেই কৃত্য সাধনের দ্বারা একদিকে যেমন কর্মকারক ব্যক্তিটি নিজেকে ঊর্ধ্বায়নের পথে টানিয়া লয় তেমনই সেই বিশেষ কৃত্য সাধনের দ্বারা সে সমগ্রতার একটি অতিপ্রয়োজনীয় অংশকে সুসম্পন্ন করিয়া সমগ্রের পরিপূর্ণতার সাহায্য করে।

এই যজ্ঞ-বুদ্ধিতে যে কর্ম গীতার মতে সমাজজীবনে তাহাই হইল ধর্ম। সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ যজ্ঞের তাৎপর্য একদিক হইতে হইল, সমগ্র জীবনযাত্রার মধ্যে স্থূল নিম্নতর দ্রব্যকে প্রতিমুহূর্তে কেবল উচ্চতর দ্রব্যের নিকটে আহুতি দেওয়া। বিষয় নিম্নতম দ্রব্য— তাহাকে আহুতি দিতে হইবে উচ্চতর ইন্দ্রিয়গুলির নিকটে, ইন্দ্রিয়গুলিকে আবার আহুতি দিতে হইবে উচ্চতর মনের কাছে, মনকে আহুতি দিতে হইবে বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধিকে আবার আত্মার কাছে। দেহের মধ্যে জৈবিক প্রক্রিয়ার ভিতরেও চলিতেছে সর্বদা এইরূপ যজ্ঞ— উচ্চতত্ত্বের নিকটে নিম্নতত্ত্বের আহুতি। দেহ অন্নগ্রহণ করিতেছে, অন্ন দেহস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুত হইল,— অন্ন তখন সেই বৈশ্বানর-অগ্নির মধ্য দিয়া সমর্পিত হইল প্রাণে— প্রাণ মনে, মন বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান আনন্দে। ব্যক্তির ভিতরকার এই কর্মকাণ্ড হইল যজ্ঞের ঊর্ধ্বায়ন প্রক্রিয়া। কর্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা এইরূপে নিরন্তর বাস্তব জীবনেও ঊর্ধ্বায়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সামাজিক জীবনে কর্মযজ্ঞের অপর দিকটি হইল সমষ্টির নিকটে ব্যক্তিকে আহুতিরূপে দান করা। ব্যষ্টির উপরে সমষ্টি জীবনের সামগ্রিক অভ্যুদয়ের এবং মঙ্গলের একটি বিশেষ অংশ অর্পিত রহিয়াছে। সকলকে জুড়িয়া বিশ্বজীবনের বিরাট সামগ্রিক পরিকল্পনা, কাহাকেও বাদ দিলেও চলিবে না, কাহারও কোনোভাবে পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। পাশ কাটাইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যে লোক নিজের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিবে, সে চোর, সে পাপ ভক্ষণ করিবে। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যে নিজের

অংশ ভোগ করিবে, সে যজ্ঞের প্রসাদই ভোগ করিবে, সে অমৃত পান করিয়া নিজে অমৃত হইবে। সমাজজীবনের ইহাই শাশ্বতবিধি— ইহাই শাশ্বত ন্যায়নীতি— ইহা যে লঙ্ঘন করিবে সে অধর্ম করিবে।

মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বার বিকাশ-সাধনায় এবং উপলব্ধির সাধনায় হিন্দু-সংস্কৃতি অত্যন্তভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার পক্ষপাতী এমন অভিযোগ বহুশ্রুত। বস্তুতঃ উপনিষদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপদেশ দিয়াছেন তাঁহারাই বড় করিয়া এই কথাটা বলিয়াছেন, নিজেকে জান, নিজেকে বোঝ— নিজের গভীর সত্য নিজের মধ্যেই গভীর করিয়া উপলব্ধি কর। প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, বলা হইয়াছে 'আত্মানং' জান; দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে পারি, বলা হইয়াছে যে এই 'আত্মানং' যে জানিবে তাহা আবার 'আত্মনা' জান, অর্থাৎ নিজের দ্বারাই জান। তাহার পরে আবার বলা হইল এই 'আত্মানং' যে 'আত্মনা' জানিবে তাহাও আবার 'আত্মনি'— অর্থাৎ নিজের মধ্যেই জান। নিজেকে জানিবে, নিজের দ্বারা জানিবে— নিজের মধ্যে জানিবে। সত্যদর্শন বা মহত্ত্বাবিকাশের সাধনায় তবে এইখানেইতো দেখিতে পাইলাম চরম আত্মকেন্দ্রিকতা। সমস্ত সাধনাই হইল নিজের মধ্যে কেবল সবরকমে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া নিজের সত্য উপলব্ধি— ইহাই হইল পরম অভীষ্ট। বহির্বিশ্বের এতোবড় একটি জীবজগৎ যদি সকল বন্ধন ক্লেশ লইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকেতো থাকুক, আমি যদি আমাদ্বারা আমার ভিতরে আমাকে দেখিয়া লইতে পারিলাম তবেই আমি মুক্ত, ইহাই আমার পরম লক্ষ্য।

আত্মদর্শন হিন্দু-সংস্কৃতির একটি গোড়ার কথা; কিন্তু উপরে ইহার যে ব্যাখ্যা দেখিলাম ইহা একটি অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়াই অপব্যাখ্যা। ঔপনিষদ আত্মদর্শন আত্মদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; আত্মদর্শনের দ্বারাই ঘটে বিশ্বদর্শন, আত্মোপলব্ধি দ্বারাই বিশ্বোপলব্ধি। উপনিষদের মতে আত্মোপলব্ধি যদি বিশ্বোপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া না দিল তবে তাহা সম্পূর্ণতাই লাভ করিল না। আসলে আত্মোপলব্ধি বিশ্বোপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া না দিয়াই পারে না। কারণ উভয়কে জুড়িয়া যে একই প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়ার খানিকদূর গিয়া থামিয়া থাকিবার উপায় নাই; তাহাকে একই অন্তরাবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াটির পূর্ণরূপের একটি পরিচয় উপনিষদের একটি শ্লোক হইতেই লওয়া যাইতে পারে।—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

এই সাধনার আরম্ভ ধীর হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া উঠায়। ইহার ভিতরে বৈরাগ্য আছে, বিবেক আছে, আত্ম-সংহৃত হইবার কথা আছে। নিজের ভিতরে নিজেকে এইরূপে সংহৃত করিয়া লওয়া; সেই আত্মসংহরণ এবং আত্মনিমজ্জনের মধ্যে লাভ হইল আত্মদর্শন। সেই আত্মদর্শনের দ্বারা এই প্রত্যয় লাভ হইল, আমার মধ্যে যে আমি সে আমি সম্পূর্ণ দেশকালাশ্রিত একটি ব্যবহারিক সত্তামাত্র নই, সে আমি একটি শাশ্বত সচ্চিদানন্দস্বরূপ অধ্যাত্ম সত্য। সাংখ্য হয়ত এইখানেই থামিয়া যাইতে বলিবে; আত্মার স্বরূপ পুরুষদর্শন হইবামাত্র প্রকৃতির বন্ধন খসিয়া গেল; পুরুষের মুক্তি হইল। কিন্তু ঔপনিষদ বেদান্ত এখানে থামিবে না; সে বলিবে, এখানে থামিয়া যাওয়া অর্থতো পথে থামিয়া যাওয়া। ঔপনিষদ অনুভূতিতে যেমনই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইল সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি, আমার মধ্যে আমার দ্বারা আমাকে (আত্মনি আত্মনা আত্মানং) যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ করিয়া দেখিলাম তাহা যে শুধু আমাতে সীমাবদ্ধ সত্য নহে, তাহা যে 'সর্বগ' সত্য— সর্বভূতস্থিত সত্য-- একই সত্য সমভাবে

সর্বভূতে— আত্মোপলব্ধির পরিণতি তাই হইল 'সর্বগকে সর্বভাবে' উপলব্ধিতে। আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়া যখন এই এক অদ্বয় 'সর্বগে'র উপলব্ধি হইল তখন আপনা হইতেই বাহিরের 'সর্বে'র সহিত 'আত্মা'র অখণ্ড যোগ উপলব্ধিতে আসিল; তখন প্রথমে যিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মলীন হইয়াছিলেন তিনি একেবারে নিঃশেষে 'সর্বে'র মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। এই সর্বগের ভিতর দিয়া সর্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার মধ্যেই হইল প্রাথমিক আত্মলীনতার পরিপূর্ণতা।

আসলে বিশ্বজীবে এবং বিশ্বজীবনে এক পরম অধ্যাত্মসত্যকে মানিয়া লইতে হইলে শুধু সংস্কারের দ্বারা তাহাকে পাইলে চলিবে না; শুধু শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে তাহাকে পাইলেও চলিবে না; কোথাও একস্থানে তাহাকে একবার প্রত্যক্ষে পাইতে হইবে। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রবণতা হইল, ব্যক্তিচৈতন্য হইল এই সত্যানুভূতির প্রথম কেন্দ্র। এই ব্যক্তিচৈতন্যকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া— সংহত করিয়া— একতান করিয়া— এই ব্যক্তিচৈতন্যের অধিষ্ঠানরূপে প্রথমে এক পরম সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে। ব্যক্তিচৈতন্য যে শুধু জীবন-স্নেহকে অবলম্বনে দেশকালে প্রজ্বলিত একটি শিখামাত্র নহে— ইহার মূল অধিষ্ঠানরূপে যে একটি পরম সত্য রহিয়াছে এই প্রত্যয় যখন দৃঢ় হইয়া গেল তখন জগৎ-জীবনের পশ্চাতেও যে এই এক পরম সত্যই মূল অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান তাহার বোধ জীবনে জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। এই বোধ জ্বলন্ত হইয়া উঠিলে আর আত্মপরের ভেদ থাকিবে কি করিয়া? তখন আর বহু ছাড়িয়া আমি নাই, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টি নাই; এই পরমাদ্বয়বোধের ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠে হিন্দু-সংস্কৃতিতে সর্বভূতহিতের প্রেরণা। এই সর্বভূতহিতের আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তিমুক্তির আদর্শে তাই হিন্দু-সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা নাই।

হিন্দু-সংস্কৃতির বিস্তৃত আলোচনায় বা খুঁটিনাটির আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া এখানে জীবনের মূল্য-বোধের যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি রহিয়াছে তাহার দিকেই ইঙ্গিত করাই আমার অভিষ্ট ছিল। আলোচনার ভিতর দিয়া অন্ততঃ দুইটি দিককে প্রধানভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলাম— যে দুইটি দিকে হিন্দু-সংস্কৃতি কোনো সম্প্রদায় গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সাবজনীন এবং সার্বকালিক মঙ্গল-দ্যোতনায় লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুইটি দিকের একদিকে হইল, জীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া সত্যকে গ্রহণের ক্ষেত্রে চিত্তের গ্রন্থিমুক্ততা। সত্যকে ঠিক এইভাবেই পাইতে হইবে, বা ঐভাবেই পাইতে হইবে— নতুবা সত্যকে মোটে পাওয়াই যাইবে না,— এমনতর কোনো কথা নহে। বড় কথা এই, জীবনের সত্যকে লাভ করিতে চিত্তকে পবিত্র নির্মল করিয়া সর্বদা উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে— সত্য স্বপ্রকাশ এবং সত্য সর্বপ্রকাশ। সত্য নিজ হইতেই যেমন প্রকাশিত হয়— তেমনই জাত সর্ববস্তুর ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়; উন্মুক্ত জাগ্রতচেতনা লইয়া এই সত্যের অনন্তমহিমার অনন্তস্পর্শ লাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথাটি হইল সমাজজীবনে ধর্মচেতনাকে সর্বদা জাগ্রত এবং সক্রিয় করিয়া রাখিতে হইবে। মানবজীবনের একটি মহৎ দায় রহিয়াছে, সেই মহৎ দায়ের বোধ আমাদের সকল সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করে। সেই দায়বোধের ভিতরে বড় কথাই হইল এই, নিখিলদেশ এবং নিখিলকাল জুড়িয়া যে মানুষের জীবনযাত্রা রহিয়াছে সে যাত্রা একটি অখণ্ড যাত্রা। সেই যাত্রার লক্ষ্য হইল মানবতার মধ্যে রহিয়াছে যাহা কিছু মহৎ— সেই মহত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ। ব্যক্তি মানুষ তাহার ব্যক্তিগত যাত্রাপথে এই অখণ্ড যাত্রার সঙ্গেই যুক্ত। এই যাত্রাকে যতটুকু সম্ভব হোক আগাইয়া লইবার যে দায়— তাহাই হইল তাহার সমাজজীবনের মহৎ দায়। আমাদের ধর্মচেতনা আমাদিগকে এই মহৎদায়বোধে জাগ্রত করিবে। ব্যবহারিক জীবনে সেই দায়ের

প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশ্বজীবনের উপরে একটি অমোঘ বিশ্বাস একটি অতলস্পর্শ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেই বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আসিবে এই বোধ হইতে যে মানুষের ইতিহাসকে আগে পিছে হইতে যে শক্তিসমূহ টানিয়া এবং ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহারা মঙ্গলময় নৈতিক শক্তি। বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত কোনো মঙ্গলময় অধ্যাত্মশক্তিমান্‌কে আমরা যদি না-ও মানি তথাপি এই বিশ্বাসে এবং শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হইতে আমাদের কোনো বাধা নাই। আমাদের সর্বসংস্কারমুক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে যে মনুষ্য ইতিহাসের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা যে বর্তমান কালখণ্ডে আসিয়া পৌছিয়াছি ইহার ভিতর দিয়া আমরা অগ্রসরই হইয়াছি। আমরা পিছনে হটিয়া যাই নাই,—আমরা সকল বিপর্যয় ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বেই উঠিয়াছি—নিম্নে পড়িয়া যাই নাই। এই অগ্র-পশ্চাৎ বুঝাইতে অথবা উর্ধ্ব-অধ বুঝাইতে আমাদের প্রচলিত অধ্যাত্ম ধারণাকে টানিয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন নাই; মানবতার মধ্যে নিহিত মহত্তার স্ফুরণের দ্বারাই আমরা এখানে অগ্র-পশ্চাৎকে বুঝিয়া লইতে পারি। যে শক্তি আমাদের ইতিহাসকে ঠেলিয়া দিতেছে বা টানিয়া লইতেছে তাহার ভিতরে যদি একটি নৈতিক স্বভাব না থাকিবে তবে আমাদের এই অগ্রগতির যৌক্তিকতাই বা কোথায়—নিশ্চয়তাই বা কোথায়? ধর্মবোধ শব্দের অর্থ-ই হইল একটি নিশ্চয়তাবোধ—একটি আশাবোধ। সেই আশাবোধই আবার আনে জীবনের সকল সক্রিয় অনুপ্রেরণা। হিন্দু-সংস্কৃতিকে যদি এই দুই দিক হইতে ভালো করিয়া বোঝা যায় তবে জীবনের পথে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে ইহা মানুষকে সক্রিয় মহৎ প্রেরণা দান করিতে পারে।

রবর্ট ফ্রস্ট

অমলেন্দু বসু

No room for mourning : he's gone out
Into the noisy glen, or stands between the stones
Of the gaunt ridge, or you'll hear his shout
Rolling among the screes, he being a boy again.
He'll never fail nor die,
And if they laid his bones
In the wet vaults or iron sarcophagi
Of fame, he'd rise at the first summer rain
And stride across the hills to seek
His rest among the broken lands and clouds.
He was a stormy day, a granite peak
Spearing the sky; and look, about its base
Words flower like crocuses in the hanging woods,
Blank though the delehead and the bony face.

—Sidney Keyes

শোকের স্থান নেই। তিনি চলে গেছেন
কোলাহলময় উপত্যকায় অথবা দাঁড়িয়ে আছেন
পাহাড়ের সংকীর্ণ পিঠের উপরে অথবা তোমরা শুনবে তাঁর চিৎকার
পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে গড়াচ্ছে যেন তিনি আবার বালক হ'য়ে গেছেন।
কখনো তিনি ব্যর্থ হবেন না, হবে না তাঁর মৃত্যু,
আর যদি ওরা তাঁর হাড় ক'খানা সাজিয়ে রেখে দেয় খ্যাতির খাতিরে,
ভূতলের খিলেন-করা স্যাঁতসেঁতে কবরখানায় অথবা লোহার তৈরি শবাধারে,
তা হলে তিনি উঠে পড়বেন গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষণ দিনে
আর পাহাড় পেরিয়ে চলবেন
ভাঙা জমি আর ছেঁড়া মেঘের দেশে, বিশ্রামের খোঁজে।
তিনি ছিলেন ঝোড়ো দিন, আকাশ-বেঁধা
কঠিন প্রস্তরশীর্ষ। দেখ সেই পাহাড়তলিতে
ঝুলে-পড়া গাছগাছালির মধ্যে ফুটছে কথার ক্রকাস্ ফুল,
অথচ নীচের উপত্যকায় আর অস্থিসার মুখমণ্ডলে দেখ শূন্যতা।

—সিড্নি কীজ্

কবিতাটি রচিত হয়েছিল ওয়র্ড্স্বোয়র্থের উদ্দেশে, তবুও সম্প্রতি-পরলোকগত আমেরিকান কবি রবর্ট ফ্রস্টকেও যেন মানায়। ওয়র্ড্স্বোয়র্থ মারা গিয়েছিলেন ৮০ বৎসর বয়সে, ফ্রস্ট ৮৮তে, দুজনেই প্রথম বয়সে শহরে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে স্বেচ্ছায় নিরালা গ্রামে বাস করেছিলেন। ফ্রস্ট খেত-খামার

রবর্ট ফ্রস্ট
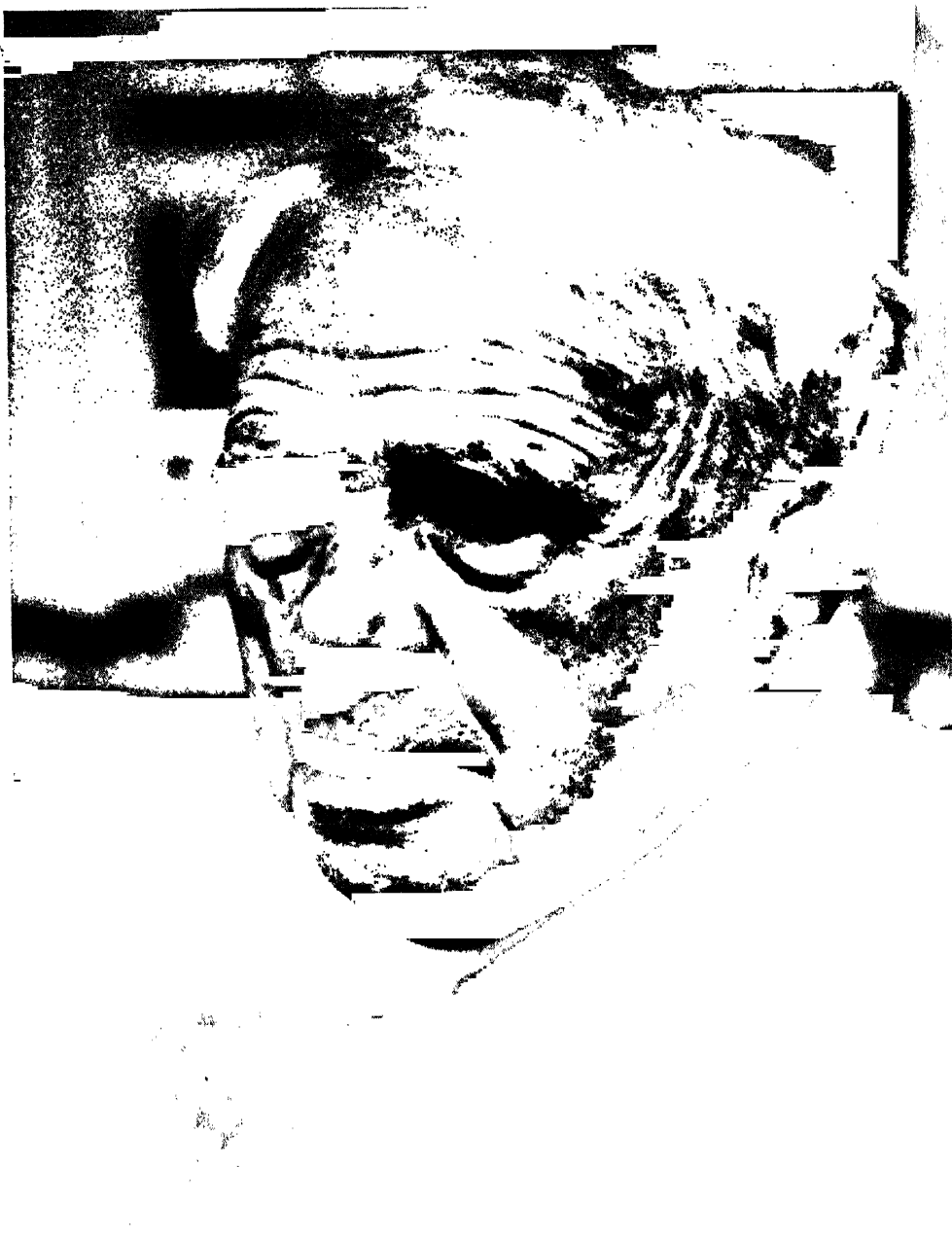
১৮৭৪ - ১৯৬৩

নিয়ে থাকতেন আর যদিও ওয়র্ড্স্বোয়র্থ স্বয়ং কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁর সমসময়ী অনেকেই তাঁর কৃষক-স্বভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ফ্রস্ট বলেছেন, 'I choose to be a plain New Hampshire farmer', ওয়র্ড্স্বোয়র্থ বলেছেন, 'So like a Peasant I pursued my road', দুজনেরই প্রতিকৃতিতে সেই অস্থিতীক্ষ্ণ কুঞ্চিতচর্ম অথচ উজ্জ্বলদৃষ্টিসম্পন্ন মুখমণ্ডল— যা স্বধর্মপরায়ণ কৃষকের চেহারার বৈশিষ্ট্য,— যা আরো দু'জন লেখকের চেহারায় লক্ষ্য করা যায়, অনতিখ্যাত জন্ ক্লেয়র ও প্রসিদ্ধ টমাস্ হার্ডি। আর এই সব কয়জন কবির রচনাতেই মানুষ ও নিসর্গের সেই নিবিড় সম্পর্ক বিধৃত যাকে আমরা শুদ্ধ অর্থে আঞ্চলিক ('রিজিঅনাল') বলতে পারি, যে অর্থে রবীন্দ্রনাথের এককালীন কাব্যে ও গদ্যে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, যে-অর্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং জীবনানন্দের নিসর্গ অবিস্মরণীয় ভাবে একান্তই আঞ্চলিক। ফ্রস্ট কাব্যের একনিষ্ঠ আঞ্চলিকতায় কেউ কেউ ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন, খণ্ডিত সত্যের ত্রুটি। শক্তিমান আমেরিকান সমালোচক গ্রেন্‌ভিল্ হিক্স্ বলছেন: 'Frost has achieved unity by a definite process of exclusion···Frost disregards many elements in New Hampshire life···Has he never heard of the railroads and their influence on the state's politics, touching the smallest hamlet? Do not automobiles and radios exist in New Hampshire?' (—'ফ্রস্ট ঐক্য অর্জন করেছেন সুস্পষ্ট বর্জন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে···নিউ হ্যাম্‌শায়ার জীবনের অনেক উপাদান তিনি ত্যাগ করেছেন··· ফ্রস্ট কি শোনেন নি রেলপথের কথা আর ক্ষুদ্রতম গ্রাম সমেত সমগ্র প্রদেশের রাজনীতির উপরে তার প্রভাবের কথা? নিউ হ্যাম্‌শায়ারে কি মোটরগাড়ি আর রেডিয়ো নেই?')— এই ত্রুটি নির্দেশের দীর্ঘ উত্তর দেওয়া খুব আবশ্যক নয়, শুধু এইটুকু বললেই হয়তো চলবে যে রেলপথ-মোটরগাড়ি-রেডিয়োর উল্লেখ না ক'রেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনবীক্ষায় কাব্য সমৃদ্ধ হতে পারে। দিব্যোন্মাদ উইলিয়ম্ ব্লেক বলেছেন, একটি বালুকণায় দেখা যেতে পারে বিশাল বিশ্ব অথবা একটি জংলী ফুলে স্বর্গ, অসীম বিধৃত হতে পারে করতলে আর মহাকাল একটি মাত্র ঘণ্টায়।— নিজ খেত-খামারের আশেপাশে যে-সব লোকজন গাছগাছালি লতাপাতা পশুপাখি ইঁটপাথর ফ্রস্ট দেখেছিলেন তাদেরই মধ্যে দেখেছিলেন ভূমাকে।

ফ্রস্ট দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রবীণ বয়সে স্বদেশে বহুবিধ সম্মান ভোগ করেছিলেন এবং যদিও সাধারণতন্ত্রী আমেরিকায় কোনো সরকারী রাজকবি নেই, তিনি মর্যাদা লাভ করেছিলেন রাজকবির মতোই। প্রেসিডেন্ট কেনেডি দেশের যে-সব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নিজ উচ্চপদ অলঙ্করণ সমারোহের দিবসে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফ্রস্ট। আমেরিকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক পুরস্কার 'পুলিট্জার প্রাইজ' পেয়েছিলেন চার বার, ১৯২৪, ১৯৩১, ১৯৩৭ ও ১৯৪২ সালে। আমেরিকার কোনো কোনো বিদ্যায়তনে Poet in Residence (আবাসিক কবি) নিয়োগের সুন্দর প্রথা আছে, অ্যাম্‌হার্স্ট কলেজের আবাসিক কবি ছিলেন ফ্রস্ট। কত বিশ্ববিদ্যালয়ে, কত পৌরসভায় বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি ১৯৫৭ সনে ফ্রস্টকে 'ডক্টর' উপাধিদানে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সনে ফ্রস্টের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এবং ১৯৬০ সনে তাঁর পঞ্চাশীতিতম বর্ষপূর্তি

উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত আমেরিকার অথবা অন্য দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

যদিও আজ অবধি আমেরিকার কবিদের মধ্যে হুইট্‌ম্যানেরই প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি (সঙ্গত কারণেই বেশি), তথাপি নিজ জীবৎকালে কোনো আমেরিকান কবি ফ্রস্টের মতো এত মর্যাদা ও জনস্বীকৃতি লাভ করেন নি। বিশশতকী আমেরিকান সাহিত্য বিশ্বের প্রাগ্রসর সাহিত্যগুলির অন্যতম। একদা আমেরিকান সাহিত্য ছিল ইংরেজি সাহিত্যের ছোটো শরিক মাত্র কিন্তু শরিকীর বিষণ্ণ পরিধি অতিক্রম ক'রে (উনিশ শতকী লেখক হথর্ন, মেল্‌ভিল্‌, হুইট্‌ম্যানের প্রতিভাতেই এ-অতিক্রম সম্ভব হয়েছে) আজ বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান নাটক (ইউজিন্‌ ও'নীল, আর্থার মিলার, টেনেসি উইলিয়ম্‌স্‌), আমেরিকান উপন্যাস (সিন্‌ক্লেয়র্‌ লিউইস্‌, পার্ল বাক্‌, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইলিয়ম ফক্‌নার), আমেরিকান কাব্য (এমিলি ডিকিন্‌সন্‌, এড্‌উয়িন আর্লিংটন্‌ রবিন্‌সন্‌, কার্ল স্যান্‌ড্‌বার্গ, রবর্ট ফ্রস্ট, উইলিয়ম কার্লস্‌ উইলিয়মস্‌ যাঁর দেহান্ত ঘটেছে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির সমতুল্য হয়েছে। স্বদেশীয় সাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছেন ব'লে রবর্ট ফ্রস্ট আমেরিকান ইতিহাসে পুরোবর্তী পুরুষ কিন্তু ইতিহাসের খ্যাতি ছাড়া শুদ্ধ কবিকৃতির মহিমায়ও ফ্রস্ট যশস্বী।

ফ্রস্টের জন্ম হয়েছিল সানফ্রানসিসকো শহরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে। (বিস্ময়ের বিষয় যে ফ্রস্টের জন্মতারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অনেক বইয়েই তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৭৫, এমনকি স্পিলার-থর্প-জন্‌সন্‌-ক্যান্‌বি রচিত 'লিটেরারি হিস্‌টরি অব্‌ দি ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌' নামক প্রামাণ্য বৃহৎ গ্রন্থেও এই তারিখই দেওয়া হয়েছে, আবার হোরেস্‌ গ্রেগরি ও তাঁর স্ত্রী যে 'হিস্‌টরি অব্‌ আমেরিকান পোইট্রি' রচনা করেছেন তা'তে তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ। আমি গ্রহণ করেছি লরেন্স্‌ টম্‌সন্‌ প্রদত্ত তারিখ)। ফ্রস্টের পিতা উইলিয়ম প্রেস্‌কট্‌ ফ্রস্ট ছিলেন নিউ ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা, তাঁর মা ইসাবেল মুডি ফ্রস্ট স্কটল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন, এককালে এঁরা দুজনেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পরে এই দম্পতি ভাগ্যসন্ধানে চলে যান সুদূর কালিফর্ণিয়ায়, সেখানেই রবর্ট ও তাঁর বোন জীনির জন্ম হয় কিন্তু উইলিয়ম প্রেস্‌কট্‌ অল্প বয়সেই ক্ষয়রোগে মারা যান। ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে মিসেস্‌ ফ্রস্ট স্বামীর আদি বাসস্থান নিউ হ্যাম্‌শায়ারে ফিরে যান ও শিক্ষকতা অবলম্বন ক'রে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। স্কুলে পড়ার সময়ই ফ্রস্ট কবিতা লেখা শুরু করেন এবং স্বীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে গণ্য হন। এক কলেজে কয়েক মাস থাকার পরে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে নানারকম জীবিকায় রত হলেন, কিছুদিন কারখানার কাজে, কিছুদিন এক পত্রিকা-সম্পাদনায়। ১৮৯৫ সালে ফ্রস্টের বিবাহ হয় এলিনর হোয়াইটের সঙ্গে। বিবাহের পূর্বে তাঁর একটি কবিতা ('মাই বাটারফ্লাই') একটি সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর রচনার সর্বপ্রথম মুদ্রণ ব্যাপারটি স্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি "টোয়াইলাইট" নাম দিয়ে ছয়টি কবিতা সম্বলিত এক পুস্তিকা মুদ্রিত করেন, এই পুস্তিকা ফ্রস্টের প্রথম ছাপা বই, এর মাত্র দুই কপি ছাপা হয়েছিল, এক কপি বাগ্‌দত্তার জন্য, একখানা নিজের জন্য। বিবাহের পরে ফ্রস্ট কিছুকাল মায়ের সঙ্গে শিক্ষকতায় লিপ্ত থেকেছিলেন, তার পরে কিছুকাল হার্ভার্ড কলেজে লেখাপড়া ক'রে বুঝলেন যে বিদ্যায়তনের জীবন তাঁর নয়। শিক্ষকতা ছেড়ে ফ্রস্ট হাঁসমুর্গি পালার ব্যবসায় শুরু করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য দৃঢ় ছিল না, তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল ক্ষয়রোগে, তিনি নিজেও

প্রথম জীবনে কয়েকবার পীড়িত হয়েছিলেন এবং ডাক্তারেরা আশঙ্কা করতেন যে তাঁরও পিতৃরোগ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব অন্য সব জীবিকা ছেড়ে দিয়ে এক গ্রামে গিয়ে ফ্রস্ট চাষবাস আরম্ভ করেন। এগারো বছর কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকার পরে বুঝলেন এ জীবিকায় স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছে না; তখন স্ত্রীকে ও চারিটি কন্যা সন্তান নিয়ে ফ্রস্ট পাড়ি দিলেন পূর্বপুরুষের মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে। ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সাল অবধি ফ্রস্ট ইংল্যাণ্ডে বাস করেছিলেন, প্রথমে লণ্ডনের অন্যতম শহরতলী বীকন্‌স্‌ফিল্ডে, পরে গ্লস্টারশায়ারের এক ছোটো গ্রামে। ইংল্যাণ্ডে বাসের কয়েক বছরে ফ্রস্টের কাব্যসৃষ্টি উদ্বেল হ'য়ে উঠল, সেখানকার উদীয়মান কবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ সম্পর্ক স্থাপিত হল— রিউপার্ট ব্রুক্, ল্যাসেল্ এবারক্রম্‌বি, উইলফ্রেড গিব্‌সন্, এডোয়র্ড মার্শ, এডোয়র্ড টমাস্ প্রভৃতি সেই সব বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, সহৃদয়তায় ঐশ্বর্যবান কবিগণ যাঁরা ফ্রস্টের প্রায় সমবয়সী, যাঁরা হ্যারল্ড মান্‌রো'র গ্রেট্ রাসেল্ স্ট্রীটে অবস্থিত বইয়ের দোকানে আড্ডা দিতেন। এই আড্ডার উপরে উইলফ্রেড্ গিব্‌সন্ কবিতা লিখেছিলেন :

Do you remember the still summer evening
When in the cosy cream-washed living-room
Of the old Nailshop we all talked and laughed—
Our neighbours from the Gallows, Catherine
And Lascelles Abercrombie ; Rupert Brooke ;
Elinor and Robert Frost, living awhile
At Little Iddens, who'd brought over with them
Helen and Edward Thomas? In the lamplight
We talked and laughed, but for the most part listened
While Robert Frost kept on and on and on
In his slow New England fashion for our delight.

—গ্রীষ্মের সেই স্তব্ধ সন্ধ্যা মনে পড়ে কি যখন ওল্ড্ নেইল্‌শপ্ নামে হোটেলের সর-রঙা বৈঠকখানায় আমরা আরামে বসতাম আর কথা বলতাম ও হাসতাম? গ্যালোস্ নামে প্রতিবেশী হোটেল থেকে আস্‌ত ক্যাথেরিন্ ও ল্যাসেল্ এবারক্রম্‌বি। আর আসত রিউপার্ট ব্রুক্। আর এলিনর্ ও রবর্ট ফ্রস্ট যারা লিটল্ ইডেন্‌স্ নামে পাড়ায় কিছুদিন যাবত বাস করছিল, আর তাদের সঙ্গে আসত হেলেন ও এডোয়র্ড টমাস্। প্রদীপ-আলোতে বসে আমরা কথা বলতাম ও হাসতাম, তবে বেশি সময়ই শুনতাম রবর্ট ফ্রস্টের কথা যে তা'র ইয়াঙ্কিসুলভ বিলম্বিত উচ্চারণে কথা বলেই যেত, ব'লেই যেত, আর আমরা আনন্দ পেতাম।

এই আড্ডার নিকটেই আরেকটি আড্ডা ছিল, জনকয়েক অভিজাত নরনারীর আড্ডা, ব্লুম্‌স্‌বেরির ভার্জিনিয়া ও লেনার্ড উল্‌ফ্, ক্লাইভ্ বেল্, লিট্‌ন্ স্ট্রেচি, মেনার্ড কেইন্‌স্ প্রভৃতির তীক্ষ্ণমনা আড্ডা। এই দুই আড্ডার সান্নিধ্য কেবল কুতূহলী ঐতিহাসিক তথ্য, আড্ডার সদস্যদের মধ্যে কোনো সংযোগ বা সহযোগ ছিল না। ইংল্যাণ্ডে প্রবাসকালে রবর্ট ফ্রস্টের দু'খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, "এ বয়জ্ উইল্" (১৯১৩) ও "নর্থ অব্ বস্টন্" (১৯১৪)। এই সময়ের কিছুকাল আগে থেকেই আমেরিকার সাহিত্যপ্রবাহে ভাঁটা চলেছিল, সেজন্য হেন্‌রি জেম্‌স্ ও গারট্রুড স্টাইন্ ছাড়াও আরো অনেক আমেরিকান লেখক য়ুরোপে

চলে গিয়েছিলেন। অন্তত চারজন স্বনামধন্য আমেরিকান কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ইংল্যাণ্ডেই প্রকাশিত হয়েছিল: এলিনর উইলি, "ইন্‌সিডেন্টাল নাম্বার্স" (১৯১২), রবর্ট ফ্রস্ট, "এ বয়জ্ উইল" (১৯১৩), জন গোল্ড্ ফ্লেচর, "ইর‍্যাডিয়েশন্‌স্" (১৯১৫), হিল্‌ডা ডুলিট্‌ল্, "সী গার্ডেন" (১৯১৬)।

তিন বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করার পরে ফ্রস্ট দেশে ফিরে যান। জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর তাঁর কোনোই কবিখ্যাতি ছিল না, সুনামের সূত্রপাত ইংল্যাণ্ডে। এলিয়ট বলেছেন, "আমি ইংল্যাণ্ডে যাবার পরে, ১৯১৫ সালে, রবর্ট ফ্রস্টের নাম জানতে পাই।" ইংল্যাণ্ড থেকে খ্যাতির ঢেউ পৌঁছল আমেরিকায়, নানা সাহিত্যপত্রে ফ্রস্টের কবিতার চাহিদা প্রবল হল। নতুন কাব্যসৃষ্টির আন্দোলন এই সময়ে আমেরিকায়ও শুরু হয়েছিল এবং গুটি কয়েক কবিগোষ্ঠীর উদ্বেজিত চিন্তায় আলোচনায় ও রচনায় সৃষ্টি-পরায়ণ হয়ে দাঁড়াল। তিনটি কবিগোষ্ঠী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: এজ্‌রা পাউণ্ড, হিল্‌ডা ডুলিট্‌ল্ ও পরে এমি লোয়েল-চালিত 'ইমেজিস্‌ট্' গোষ্ঠী; শিকাগো থেকে প্রকাশিত 'দ্য লিট্‌ল্ রিভিউ' নামক সাহিত্যপত্রিকা মার্গারেট অ্যান্ডার্‌সনের সম্পাদনায় উইলিয়ম কার্লস্ উইলিয়ম্‌স্, ইয়েট্‌স্, ওয়লেস্ ষ্টীভ্‌ন্‌স্ প্রভৃতি কবিদের রচনা প্রকাশ করে এবং জেম্‌স্ জয়সের 'ইউলিসিস্' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ ক'রে রাজরোষে পড়ে; শিকাগো থেকে প্রকাশিত ও হ্যারিয়েট মন্‌রো-সম্পাদিত "পোইট্রি" নামক পত্রিকা অনেক নবীন কবির রচনায় সমৃদ্ধ হত— এলিয়ট, ফ্রস্ট, কার্ল স্যান্ড্‌বার্গ, এমি লোয়েল, ভ্যাচেল লিণ্ডজে, হার্ট ক্রেইন প্রভৃতির রচনায়। ফ্রস্টের কাব্য অবশ্যই সমকালীন এই কাব্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে অধীত হওয়া উচিত কিন্তু যে অর্থে এজ্‌রা পাউণ্ড অথবা কার্ল স্যাণ্ডবার্গ অথবা অন্য কেউ কেউ কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীতে পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ফ্রস্টের সৃজনীপ্রেরণা কখনই সে অর্থে কালসীমিত রুচিতে রঞ্জিত হয় নি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় আমেরিকায়ও ফ্রস্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনন্য। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই সদ্বিচারী কাব্যপাঠক জানলেন যে, নবীন কবিদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও এডুইন্ আর্লিংটন্ রবিন্‌সন্, কন্‌রাড এইকেন ও এলিনর উইলির মতোই রবর্ট ফ্রস্ট পুরাতনবিরোধী নন বরং ঐতিহ্যপন্থী, তাঁর কাব্যের উপকরণ 'অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা'।

৩

ফ্রস্টের মতো অসাধারণ কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য যথাযথ ভাবে আলোচনা করা পরিচিতি-প্রবন্ধের সীমায় সম্ভব নয়। মোটামুটি দিঙনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গোড়াতেই কয়েকটি সাল-তারিখের উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি।

ফ্রস্ট এই কয়খানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন:

এ বয়জ্ উইল (লণ্ডন, ১৯১৩; নিউ ইয়র্ক, ১৯১৫)
নর্থ অব্ বস্টন্ (লণ্ডন, ১৯১৪; নিউ ইয়র্ক, ১৯১৪)
মাউণ্টেন ইন্‌টর্‌ভ্যাল্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৬)
নিউ হ্যাম্‌শায়ার (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৩)
ওয়েস্ট রানিং ব্রুক্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৮)
এ ফার্দার রেন্‌জ্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৬)

এ উইট্‌নেস্ ট্রী (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪২)
এ মাস্‌ক্ অব্ রীজ্‌ন্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬)— কাব্যনাট্য
স্টীপ্‌ল্ বুশ্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭)
এ মাস্‌ক্ অব্ ম্যর্সি (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭)— কাব্যনাট্য

আমাদের দেশে ইদানীং ফ্রস্টের কাব্যগ্রন্থ আদৌ তুর্লভ নয়। যাঁরা মাত্র দু চারটি কবিতা দিয়ে শুরু করতে চান, তাঁরা পেঙ্গুইন বুক অব্ মডর্ন অ্যামেরিকান ভর্স অথবা মডর্ন লাইব্রেরি-প্রকাশিত কন্‌রাড এইকেন্ সম্পাদিত টুয়েন্‌টিয়েথ্ সেঞ্চুরি অ্যামেরিকান পোইট্রি নামক স্থলভ সঙ্কলনগ্রন্থে অথবা অক্‌স্‌ফোর্ড বুক অব্ অ্যামেরিকান্ ভর্স নামক গ্রন্থে কয়েকটি স্থনির্বাচিত কবিতা পাবেন। যাঁরা একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতা প'ড়ে ফ্রস্ট-প্রতিভার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে চান তাদের জন্য তুখানা স্থলভ গ্রন্থ আছে: লুই আন্‌টার্‌মায়ার সম্পাদিত পকেট বুক্ সংস্করণ, অথবা মডর্ন লাইব্রেরি-প্রকাশিত রবর্ট ফ্রস্টের কবিতাবলী। মডর্ন লাইব্রেরি সংস্করণে "গু কন্‌স্ট্যান্ট্ সিম্‌বল্" নামে ফ্রস্টের লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে, তাঁর কাব্যভাবনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন। যাঁরা নিষ্ঠার সহিত সমগ্র কাব্য অধ্যয়ন করতে চান তাঁদের জন্য হোল্ট্ রাইন্‌হার্ট উইন্‌স্টন্ প্রকাশিত "কম্‌প্লিট্ পোয়েম্‌স্ অব্ রবর্ট ফ্রস্ট" অবশ্য পাঠ্য। এই বইয়ে 'গু ফিগার এ পোয়েম্ মেক্‌স্' নামে প্রবন্ধে ফ্রস্টের কাব্যভাবনা সূচিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থ কয়টির তারিখ থেকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত হয় যে ফ্রস্ট কবিতা লেখা শুরু করেন বেশি বয়সে, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যে তাঁর কবিত্বশক্তি আত্মপ্রকাশের স্থগম পথ পেয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয় না আমেরিকান সমালোচনায়। আমার বিশ্বাস, ফ্রস্টের সহজাত কবিত্বশক্তি অবরুদ্ধ হয়ে থাকত যদি না কিছুকালের জন্য আমেরিকার তৎকালীন মানস-খর্বতা থেকে তিনি মুক্তি পেতেন। সে মুক্তি তিনি পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে, নবীন কবিগোষ্ঠীর সাহচর্যে। এই কবিগোষ্ঠী সম্বন্ধে ইদানীং কোনো কোনো কাব্যপাঠক কুঞ্চিতনাসা। এবারক্রম্‌বি, রিউপার্ট ব্রুক, এডোয়ার্ড টমাস্ প্রভৃতি কবি নাকি আধুনিক কাব্যপ্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে পারেন না যদিও এলিয়ট-ডিলান্ টমাসের কাব্যে আমরা ভরপুর হয়ে আছি বলেই যাবতীয় পূর্বস্থরীর কাব্য বরবাদ হয়ে যাবে— এ হেন ধারণায় নিজেদের রসবোধ কত সঙ্কীর্ণ সে কথাই প্রমাণ হয়। এই কবিকুল দীর্ঘজীবী ছিলেন না, দীর্ঘজীবী হলেই যে তাঁরা মহৎ কাব্য রচনা করতেন এমনও মনে হয় না (এড্‌মাণ্ড্ ব্লান্‌ডেন্-এর কথা চিন্তা করুন) কিন্তু এঁদের ভিতরে যে সম্ভাবনা অচিরস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রথম মহাসমরের দীর্ণ-উৎপাটিত ইংরেজ শিল্পীচিত্তের বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে (যে-স্তব্ধতা আমেরিকান শিল্পীচিত্তেও প্রবেশ করার ঐতিহাসিক কারণ ছিল না বলেই সমকালীন আমেরিকান কবিগণ— এলিয়ট, পাউণ্ড, ওয়লেস্ ষ্টীভ্‌ন্‌স্ প্রভৃতি প্রস্তুতি থেকে পরিণতিতে পৌছতে পেরেছিলেন), সে সম্ভাবনা সহজ পথ পেলে কোন্ পরিণতিতে পৌছতে পারত তার ধারণা পাওয়া যায় রবর্ট ফ্রস্টের কাব্য পাঠে। ইংরেজি জর্জিয়ান্ কাব্যের প্রকৃষ্ট প্রকাশ আমেরিকান কবি ফ্রস্টের কাব্যে যেমন ইংরেজি ১৮৯০ দশকের কাব্যের (যাকে বর্তমান শতকের 'প্রগতি'-পন্থী পাঠক বলেছেন, অবক্ষয়শীল আত্মরতিশীল কাব্য) অকালমৃত্যু-ব্যাহত সম্ভাবনা প্রকৃষ্ট এবং প্রদীপ্ত প্রকাশ পেয়েছে আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের কাব্যে। ইয়েট্‌স্ ও ফ্রস্টের কাব্যের মূল অধুনা-নিন্দিত ১৮৯০ দশকের ও ১৯১০ দশকের ইংরেজি কাব্যে। কিন্তু কোন্ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ফ্রস্ট ১৯১০ দশকের আবহাওয়ায়? এখানে আবার

কয়েকটি সন-তারিখ লক্ষ্য করা যাক। ফ্রস্ট দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে আর স্বদেশের বাইরে তাঁর কবিখ্যাতির বিস্তার বিলম্বে হয়েছিল বলে ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, তাঁর সমকালজ কোনো কোনো লেখক তাঁর কত আগেই না ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গেছেন! হিউগো ফন্ হফ্‌মান্‌স্টাল্ জন্মেছিলেন ফ্রস্টের সঙ্গে একই সালে ১৮৭৪ সালে। ১৮৭৫ সালে জন্মেছিলেন টমাস্ মান্ এবং রিল্‌কে। ফ্রস্টের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মেছিলেন গোর্কি এবং স্টেফান গিয়র্গ (১৮৬৮), আঁদ্রে জিদ্ (১৮৬৯), মার্সেল্ প্রুস্ত্ ও পোল্ ভালেরি (১৮৭১)। তাঁর জন্মবৎসরের কয়েক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলেকজাণ্ডার ব্লক (১৮৮০), জেম্‌স্ জয়স্ ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ (১৮৮২), ইউজিন্ ও'নীল (১৮৮৮)। ফ্রস্টের প্রতিভা যদি এই-সব সমকালজদের প্রতিভার সমগোত্র সমধর্মা হত (সমশক্তিমান না হ'য়েও) তা হলে তাঁর শক্তিস্ফুরণও রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রতিভার তড়িৎদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই, অন্ততঃ তাঁর ইংল্যাণ্ড যাত্রার পূর্বেই, তাঁর কাব্যের সব না হোক কিছু উজ্জ্বল পর্যায় সাঙ্গ হত। কিন্তু এই-সব লেখকদের সমকালজ হয়েও ফ্রস্ট এঁদের সমধর্মা নন। যে-জটিল নব-রোমান্টিক চিন্তাপথে চলেছে এঁদের স্ব-তন্ত্র বিক্ষুব্ধ শিল্পাবেগ, সে পথ ফ্রস্টের নয়। ফ্রস্টের প্রতিভা আপন স্বভাবের ধ্রুপদী অনুশাসনে, য়ুরোপের বহুদিনাচরিত ক্লাসিক্যাল শিল্পস্বভাবের নিয়মে বিলম্বে ধীরে অভিব্যক্ত আর যদিও সমকালচেতনার দরুন (কেননা কোনো সৎ শিল্পীই কালবিযুক্ত নন যেমন আবার একান্তই কালসীমিতও নন) তাঁর কাব্যে এমন অনেক শিল্প-প্রকরণ প্রবেশ করেছে (যথা, প্রতীক, তির্যক উল্লেখ, শ্লেষ, বাকসংহতি, বাক্‌প্রতিভার আভাস, পুঞ্জীকৃত উল্লেখ ইত্যাদি) যা সর্বতোভাবে আধুনিক কাব্যেরই প্রথাসম্মত, তবুও তাঁর কাব্য নিঃসংশয়ে ও নিঃসংকোচে ঐতিহ্যপন্থী, রিল্‌কে-পাউণ্ড-এলিয়ট-ভালেরির মতো নব্যপন্থী নয়। কাব্য স্বতোৎসার— রোমান্টিক কবিদের এই অতীন্দ্রিয়বাদ তিনি মানেন নি, বরং তাঁর প্রিয় লাটিন কবি হোরেস্-এর মতোই Poeta nascitur বলার আগে বলেছেন Poeta fit। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি স্মরণীয়: There are two types of realist— the one who offers a good deal of dirt with his potato to prove that it is a real one; and the one who is satisfied with his potato scrubbed clean.— To me the thing that art does for life is to strip it to form. — বাস্তববাদী দু ধরণের। একজন তাঁর আলুর সঙ্গে প্রচুর মাটি মাখিয়ে রাখেন ওগুলি সত্যিকারের আলু তাই প্রমাণ করার জন্য। অন্যজন আলুগুলি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট। আমার বিচারে শিল্পের কাজ জীবন পরিষ্কার ক'রে তার আকার প্রকট করা।

অর্থাৎ ফ্রস্ট বাস্তববাদী কিন্তু তাঁর বাস্তবতা গতানুগতিক বাস্তবতা থেকে আলাদা। যে বাস্তবতায় কাদামাখানো আলুই বাস্তব, অপরিচ্ছন্নতায় ও ক্লিন্নতায় মণ্ডিত জীবনই বাস্তব, উনিশ শতকী ফ্রান্সে যে-বাস্তবতার আহ্বান রণডঙ্কায় পরিণত হয়েছিল (জোলা ও তাঁর অনুগামিদের রচনায়), সে-বাস্তবতা ফ্রস্টের নয়। তাঁর বাস্তবতায় জীবনের অবয়ব পরিচ্ছন্ন রূপশালী। Strip it to form— এই কথায় ফ্রস্টের শিল্পীমনের পরিচয়। কবি অন্যত্র বলেছেন:

Let chaos storm!
Let cloud shapes swarm!
I wait for form.

Raw life, অসংস্কৃত জীবন, কাদামাটি মাখানো জীবন, হুবহু এই জীবনের প্রতিফলন শিল্পীর লক্ষ্য হতে পারে না। শিল্প কথাটির মধ্যেই সংস্কার কর্মের আভাস। ফ্রস্টের বাস্তববাদে সংস্কার অবশ্যকর্ম, সংস্কারের জন্যই বাক্‌যোজনা শিল্পগুণ পরিগ্রহণ করে— কেননা কাদামাখানো অবস্থায় জীবনের স্বরূপ ঢাকা পড়ে থাকে, কাদার সংস্কার হলে পরে জীবনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। রূপই শিল্প, শিল্পী রূপকার।

আসলে ফ্রস্ট বাস্তববাদী নন। ফর্ম বা রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদী শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। রূপের পূজারী ফ্রস্টকে যদি নেহাৎই কোনো শিল্পপন্থার ছাপে ভূষিত করতে হয় তা হলে সুষ্ঠু ছাপ পাওয়া যাবে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পপন্থায়। সে জন্যই সমকালজদের সঙ্গে ফ্রস্টের আত্মিক সংযোগ ক্ষীণ। বাস্তববাদীদের সঙ্গে যদি-বা সূক্ষ্ম এবং গৌণ সংযোগ থেকে থাকে, নব্য-রোমাণ্টিকদের সঙ্গে সেটুকু সংযোগও তাঁর নেই। রোমাণ্টিক কাব্যের অন্তর্দ্বন্দ্ববিমথিত কবিচিত্তের একান্ত নিজস্ব আবেগ তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নয়, রিল্‌কে ইয়েট্‌স্ ডিলান্ টমাসের মানস ফ্রস্টের নয়। নিরন্তর নিজ আবেগের পীড়নমুক্ত ফ্রস্ট পূর্বসূরী ব্রাউনিংয়ের মতো Men and Women এর জগতে, নরনারীর মনোজগতে, প্রবেশ করলেন আর নাট্যায়িত আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিশাণিত বিশ্লেষণশক্তি সংযুক্ত করলেন ড্রামাটিক মনলগ্ রচনা করে। সর্বোপরি তিনি আসক্ত হলেন গ্রীক পাস্‌টরাল কাব্যের প্রতি, বিশেষত থিয়ক্রিটাসের কাব্যের প্রতি, আর তারি ফলে তাঁর নিজের কাব্যে এমন এক সংযম-সমৃদ্ধ শুভ্র ঋজু উচ্চারণ এসে গেল যার তুলনা আমার জানা বাঙালি কবিদের মধ্যে সচরাচর হেম বাগচীর কাব্যেই পাই। ফ্রস্টের কাব্যোচ্চারণ মাত্র একস্বর অথবা দ্বিস্বর নয়, বস্তুতঃ বহুস্বরের ঐকতান, সেখানে আছে আত্মস্থ বোধির খরশাণ দার্ঢ্য, সংবৃত বেদনার স্মিত আভাস, প্রত্যক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ চতুর শ্লেষ, নিষ্কলুষ প্রসন্ন কৌতুক, জমাট আবেগের কঠিন তীক্ষ্ণতা, স্নিগ্ধ জীবনপ্রত্যয়ের স্বচ্ছ সারল্য।

রবর্ট ফ্রস্টের কবিতা : অনুবাদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঝরা পাতা

ঝরা পাতা চেঁছে তুলতে
কোদাল যা তাই চাম্‌চেও।
শুখনো পাতার বস্তা
বেলুনের মত হাল্কা।

সারাদিন আমি অবিরাম
মর্মরধ্বনি তুলি।
শশক কি মৃগ ধাবমান
যেমনটি তোলে পালাতে।

পাতার পাহাড় যা তুলি
এড়িয়ে আলিঙ্গন
বাহু বেয়ে বহে গিয়ে
মুখে এসে পড়ে কিন্তু।

ফিরে ফিরে আমি যত-না
ওঠাই নামাই বোঝা।
সারা চালাটাকে ভরলেও
আমার কি থাকে তার পর ?

ওজন বলতে শূন্য।
মাটির ছোঁয়ায় ক্রমশঃ
বিবর্ণ হতে হতে
রঙ আছে নামমাত্র।

কি কাজে বা তারা লাগবে!
তবুও ফসল সত্য।
কার হিম্মৎ বলবার
ফলন কোথায় থামবে ?

সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

> "If Sanskrit disappears, all the great Indian tradition risks to be lost for ever...Sanskrit and India are inseparably connected, in spite of all the transitory harangues of the politicians."—Louis Renou.

১

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একসময় বলিয়াছিলেন—

> "If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language and literature, and so long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue."

পণ্ডিতজীরই ইহা একক অভিমত নহে। দেশ-বিদেশের বহু মনীষীই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শুদ্ধ ভাষা হিসাবে বিচার করিলেও, ইহার অপূর্ব গঠনশৈলী আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সংস্কৃত ভিন্ন আর সকল ভাষাকেই 'ম্লেচ্ছ' বা 'অপশব্দ' রূপে গণনা করিতেন, সংস্কৃতই তাঁহাদের দৃষ্টিতে একমাত্র 'দৈবী বাক্' বা 'দেবভাষা' (divine speech) রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহা যে শুধুই স্বকীয় ভাষার প্রতি যুক্তিবিহীন মমত্ব ও গৌরব-বোধ তাহা নহে। সার্ উইলিয়াম জোন্সের ন্যায় বহুভাষাবিদ্ মনীষীও ১৭৮৬ খৃ. অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই যে ভাষা হিসাবে সংস্কৃত—"more perfect than Greek, more copious than Latin, and more exquisitely refined than either." কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই অপূর্ব ভাষাসম্পদ্ ও এই ভাষানিবদ্ধ বিচিত্র চিন্তার ঐশ্বর্য হইতে সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসী আজ স্বেচ্ছায় আপনাদের বঞ্চিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াও অব্যাহত ছিল, দেশের বিদগ্ধসমাজের চিত্তে ইহার গৌরবের আসন ছিল অক্ষুণ্ণ ও অম্লান। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা যেন আকস্মিকভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। টোল ও স্কুলকলেজের ছাত্রসংখ্যায় লক্ষণীয় ও ক্রমবিবর্ধমান হ্রাস ও সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রসমাজের বিদ্যার ও বুদ্ধির আপেক্ষিক নিম্নমান—সংস্কৃত শিক্ষার এই ক্রমিক অধোগতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

২

সংস্কৃতচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে, লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাদবিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান—সংস্কৃত কলেজ—ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে উত্থান-পতনের

ভিতর দিয়া আজ পর্যন্ত আপন সত্তা বজায় রাখা—ইহারই ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করিয়া দেখি,[১] তবে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার মোটামুটি চিত্র আমরা পাইতে পারি। লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী যখন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতায় সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্ররূপে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন আমাদের দিক হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা হইয়াছিল। এবং বিরোধিতা করিয়াছিলেন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৩ খৃ. ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টের নিকট তিনি যে প্রসিদ্ধ স্মারকলিপি পেশ করেন, তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি মাত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"We now find that the Government are establishing a Sangscrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This Seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youths with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practicable use to the possessors or to Society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sangscrit language, so difficult that almost a life-time is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge; and the learning concealed under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sangscrit College; for there have been always and are now numerous professors of Sangscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of new Seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions."

---

১ দ্র° কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। ১৮২৪-১৮৫৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮-১৮৯৫। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য।

এমন কি, তিনি এ পর্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না যে সংস্কৃত-শিক্ষাকে জীয়াইয়া রাখিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসিগণকে চিরকালের জন্য অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে চান—

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sangscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature . . . "

কিন্তু রামমোহন রায়ের এই বিরোধিতা সত্ত্বেও *General Commitee of Public Instruction* তাঁহার স্মারকলিপি নীরবে উপেক্ষা করিলেন এবং ১৮২৪ খৃ. ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল। প্রতিষ্ঠার পরও ইহার অস্তিত্ব বার বার বিপন্ন হইয়াছে। সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ মনীষী হোরেস্ হেমান উইলসন প্রমুখ হিতৈষী পৃষ্ঠপোষকগণের আন্তরিক আগ্রহ ও সহায়তায় ইহা ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। মেকলে সাহেব যখন সংস্কৃত বিদ্যার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য উদ্যত, তখন তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় বিলাতস্থ উইলসন সাহেবের নিকট যে ব্যাকুল আবেদন পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে—

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলেব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ক্রূতে স ভো ভো উইলসন মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥"

ইহার উত্তরে উইলসন সাহেব বিলাত হইতে যে সান্ত্বনাবাণী প্রেরণ করেন, তাহা যেন সংস্কৃতশিক্ষার ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ—

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে ॥"

শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিলে সংস্কৃত-শিক্ষার নূতনভাবে সংস্কারসাধন করতঃ উহাকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি তৎপর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সহিত ইংরেজী শিক্ষার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। সংস্কৃতশিক্ষার্থীকে যেমন আপন দেশের সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতির আলোচনায় পারদর্শী হইতে হইবে, য়ুরোপের সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিতও তাহার সমান পরিচয় লাভ করিতে হইবে, নতুবা তাহার দৃষ্টি উন্মুক্ত হইবে না। আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের অভাবে তাহা হইবে একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কারসাধন ও সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনকল্পে

১৮৫০ খৃ. ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় মোয়াট সাহেবের নিকট যে দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করেন, তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতে "রেনেসাঁস পণ্ডিত" বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য কি ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সহিত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা কেন করা উচিত, তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

"The period of study in the Sanscrit College is 15 years. One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so long a period. But no one may be considered to have such knowledge who is not familiar with all the systems of philosophy prevalent in India. True it is that the most part of the Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy Class, their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they, shall have an ample opportunity of comparing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the Western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of Philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merit of the different systems."

উপসংহারে তিনি এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ কার্যকর হইলে শুধুই যে সংস্কৃত শিক্ষার নবজাগরণ হইবে তাহা নহে, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত যুবকগণের হস্তেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি ও প্রসার ঘটিবে—

"In conclusion, I beg leave to observe, that the changes now proposed by me in the system of the College are the results of a long and anxious consideration of the subject. . . . Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results under an efficient and steady supervision, will be, that the College will become a seat of

pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen."

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আশা যে বিফল হয় নাই, তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন বিদ্যার্থিগণ শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির আলোচনার জন্যই স্মরণীয় হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাদের রচনাসম্ভারে মাতৃভাষা ও সাহিত্য কম ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয় নাই।

সংস্কৃত কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ মনীষী কাওয়েল বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন— ইংরেজী শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার পরস্পর সমন্বয়েই যে শিক্ষার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হইতে পারে, ইহা বিদ্যাসাগরের মত কাওয়েলেরও সুদৃঢ় অভিমত ছিল। তাই তিনি ১৮৬৩ খৃ. ৭ই নভেম্বর শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রে জানান—

"My great aim is that our senior students should be able to pass the First Public Examination and at the same time carry on their advanced Sanskrit studies as my firm conviction is that the two lines of study only help instead of hindering each other."

শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন ডি. পি. আই. গর্ডন ইয়ং যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পক্ষে প্রথমে এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে ন্যায় ও অলংকার শাস্ত্রের চর্চা বিধেয় বলিয়া প্রস্তাব করেন, তখন কাওয়েল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া লিখিলেন—

"The consequence of this, I fear, would have been the gradual elimination of the higher Sanskrit studies from the curriculum of the college altogether; and I fear the Sanskrit College would have sunk into an Anglo-Sanskrit School. Instead of this, we now endeavour to secure as much Sanskrit as possible previous to the Entrance Class—as it may be readily conceived that the rush of university work would materially hinder an undergraduate in commencing a new subject like Hindu Rhetoric or Logic; although it need not hinder him from pursuing a subject further, of which he has already acquired some knowledge."

উদ্ধৃত মন্তব্যের ভিতর দিয়া কাওয়েলের সংস্কৃতপ্রীতি যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার দূরদৃষ্টিরও ইহা নিদর্শন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মত একটি দুরূহ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রীতিমত উদ্যোগ ও অধ্যবসায় প্রয়োজন; নতুবা পরবর্তী কালে ইহার বনিয়াদ সুদৃঢ় হইবে না। সংস্কৃত-শিক্ষার উত্তরোত্তর অবনতি কাওয়েলের এই ধারণার সত্যত্ব প্রমাণিত করিয়াছে।

কাওয়েলের অবসরগ্রহণের পর আচার্য প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন—তাঁহার পর অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সহিত ইংরেজী শিক্ষার সমন্বয়—যাহা বিদ্যাসাগর এবং কাওয়েল তাঁহাদের কর্মপদ্ধতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে— প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। সংস্কৃতশাস্ত্রসমূহে যথার্থ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে কলেজীয় শিক্ষার অঙ্গ রূপে সংস্কৃতকে চালু রাখিলে চলিবে না, ইহার জন্য প্রাচীন চতুষ্পাঠীসমূহে প্রচলিত শিক্ষাকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল মহেশচন্দ্রের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। ১৮৮৫ খৃ. ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন ডি. পি. আই.এর নিকট লিখিত এক পত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার এই অভিমত দৃঢ়তার সহিত জানান—

"I may even mention that the Sanskrit College itself can by no means claim to impart that deep knowledge of Sanskrit which the Tols do. The instruction imparted in this institution is more of a Philological nature and it seeks to give an education embracing both Western and Eastern culture. The Tols however teaching Sanskrit alone in all its higher departments are best calculated to produce scholars with deep knowledge of Sanskrit."

১৮৮৩ খৃ. মহেশচন্দ্র নদীয়া ও ভাটপাড়ার টোলসমূহের তৎকালীন অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি টোলশিক্ষণব্যবস্থার পরিসংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং বলেন—

"Unless extraneous help should come to give a fresh impetus to our Tols, indigenous learning, I fear, would gradually die out and be almost totally extinct within the next 20 years and Navadwipa which has been for centuries the place of resort of students from various parts of India—as being unparalleled school for study of Hindu Logic would be reduced to a literary desert . . .

"Under the circumstances I am of opinion that should Government think it desirable to keep indigenous Sanskrit learning undoubtedly one of the chief causes of India's great glory intact, it would be necessary for Government to intervene by direct pecuniary aid and by inviting the generous public to contribute their mite towards the improvement and maintenance of Tols."

মহেশচন্দ্রেরই ঐকান্তিক আগ্রহ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ লর্ড লিটনের শাসনকালে ১৮৭৮ খৃ. সাহিত্য দর্শন স্মৃতি এবং বেদ এই কয়টি বিষয়ে উপাধি বিতরণের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতবিদ্যার্থিগণের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণপদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং আজও পর্যন্ত সেই প্রথাই পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেভাবে সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিকল্পিত পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের তাহা উপরি-উদ্ধৃত কয়েকটি বিবৃতি হইতেই

স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় চাহিয়াছিলেন সংস্কৃতশিক্ষাকে চতুষ্পাঠীর সংকীর্ণ গৃহকোণ হইতে উদ্ধার করিয়া নবপ্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতির সহিত যুক্ত করিতে, য়ুরোপের যুক্তিবাদের ভিত্তিতে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের নূতনভাবে মূল্যনিরূপণ করিতে এবং সংস্কৃতশিক্ষার ও ইংরেজী-শিক্ষার সমন্বয় সাধনের দ্বারা একটি নবীন শিক্ষাদর্শ গড়িয়া তুলিতে— যে শিক্ষাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তরুণ শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় আপন মাতৃভাষাকে সর্ববিধ চিন্তার বাহনরূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পেই আবশ্যক সংস্কৃতশিক্ষার পুনরভ্যুত্থান এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সহিত তাহার মৈত্রীবন্ধন। বিদ্যাসাগরের জীবনের এই ঐকান্তিক অভীপ্সাটি *Notes on the Sanscrit College*[২] শীর্ষক তাঁহার স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ খসড়া প্রস্তাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃ. ১২ই এপ্রিলের এই স্মরণীয় লিপিটি হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি প্রণিধানযোগ্য—

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well-versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.

...

19. The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two thirds of the time to the Sanscrit and one third to the

২ দ্র° বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। তৃতীয় খণ্ড। পৃ. ৪৩৪-৪৩৯।

English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of education.

মাতৃভাষার উন্নতিসাধনই ছিল শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের জীবনের ধ্রুবতারকা; সংস্কৃতভাষার কঠিন অবরোধের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞানভাণ্ডারকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, প্রাচীন বিদ্যার সহিত নবীনবিদ্যার সমন্বয়সাধন করিতে হইবে— এই লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজকে আপন সাধনার পীঠভূমিরূপে পরিগণনা করিয়াছিলেন। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. ব্যালাণ্টাইনের সহিত সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে ঐতিহাসিক বাদানুবাদ ঘটে, সেই প্রসঙ্গেও তিনি তাঁহার এই ধ্রুবলক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। ড. ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—

"The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the country has taught us what we can do, without reconciling the learned of the Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object which I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of *our* Sanscrit College should be directed . . ."

সংস্কৃত কলেজের পরবর্তী কোনো অধ্যক্ষের কণ্ঠ হইতেই বোধ হয় এই উদাত্তবাণী এইরূপ দৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠে বিঘোষিত হয় নাই যে সংস্কৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন, এবং ইংরেজী শিক্ষাকে সংস্কৃতশিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া সেই মূল লক্ষ্য সাধনেরই অপরিহার্য উপায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ-প্রথা নিবারণ প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের দ্বারাই তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, তাহা নহে; সংস্কৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই বৈপ্লবিক মতবাদ পোষণ এবং তাহা কার্যে রূপায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট সংস্কারপদ্ধতির প্রবর্তনও তাঁহাকে অনুরূপভাবে প্রাচীনধারার অনুগামী পণ্ডিতগণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নির্ভীক বীরহৃদয় এই বিরোধিতার ভয়ে বিচলিত হয় নাই। ড. ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascendancy . . . "

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবিত সংস্কারের মধ্যে হয়তো একটি দুর্বল দিক্ ছিল— তিনি চাহিয়াছিলেন সংস্কৃত-শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার জন্যই ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার সমন্বয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়তো সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের আগ্রহ এই উভয়বিধ শিক্ষাক্রমের দিকে তুল্যভাবে নিবদ্ধ হয় নাই, হয়তো ইহা কিছুকাল পরে পল্লবগ্রাহিতাকেই প্রোৎসাহিত করিয়া থাকিবে, হয়তো ইংরেজীশিক্ষিত সংস্কৃতবিদ্‌গণের মধ্যে চতুষ্পাঠীপদ্ধতির প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞার ভাব দেখা দিয়া থাকিবে, যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষাচর্চার এই দুইটি প্রধান শাখার মধ্যে বিভেদ ও বিরোধিতা ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে— অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন হয়তো এই সকল কারণে সংস্কৃতচর্চার চতুষ্পাঠীপদ্ধতির বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যাকে আধুনিক পাশ্চত্যবিদ্যার সহিত মিলিত করিয়া যে অভিনব শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায়, পল্লীতে ও নগরে আর যে সকল শত শত চতুষ্পাঠীর মধ্য দিয়া সংস্কৃতচর্চা ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিল, তাহাদের উপর সেই বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ যে অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য। তাই বিদ্যাসাগরের আদর্শ সংস্কৃত কলেজে মূর্ত হইয়া উঠিলেও বৃহত্তর সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে উহা অসংকল্প ছিল বলিলেই হয়। ফলে কালক্রমে চতুষ্পাঠীপদ্ধতি ও আধুনিকপদ্ধতি— সংস্কৃতশিক্ষার এই উভয় পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক না হইয়া, পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত-শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে— চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থিগণ যেমন আধুনিক গবেষণা ও শিক্ষণ পদ্ধতি বর্জন করিয়া সংকীর্ণ কুসংস্কারকে আশ্রয় করিয়াছেন, ইংরেজিনবীশ সংস্কৃতজ্ঞগণও সেইরূপ প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের সহিত সাক্ষাৎ ব্যাপক পরিচয়ের অভাবে বস্তুশূন্য, অগভীর আধুনিক ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতিকে সম্বল করিয়া তুলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মহেশচন্দ্রের যুগে সংস্কৃতশিক্ষার যে সমস্যা ছিল, আজও তাহা ঠিক একরূপই আছে। তাই দেখি ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'সংস্কৃত কমিশনে'র (১৯৫৬-৫৭) সদস্যবৃন্দ বলিতেছেন—

"It is not possible to undo the historical circumstances which brought into existence the dual system of Sanskrit study pursued respectively in the Pathasalas and the Universities. With the lapse of a century, they now appear unconnected and apparently divergent. It is no longer a question of ending or mending either of the two systems, nor even of blending. Both have their defects and merits, but we have to accept the systems as accomplished historical

facts. A rapprochement may be attempted, eliminating the defects and appropriating the merits, taking care not to destroy the essential characteristics of either." ৩

অতএব সংস্কৃতশিক্ষার অবক্ষয়কে রোধ করিতে হইলে যেমন ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক গবেষণপদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সেইরূপ ইহার অন্তর্নিহিত গভীরতাও যাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যাহাতে কিছুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত না হয়— সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে— বর্তমান যুগে সংস্কৃতশিক্ষার আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মাননীয় চার্চিল সাহেব হ্যারোয় তাঁহার ছাত্রজীবনে পাশ্চাত্ত্যের দুইটি প্রাচীন ভাষা, যাহা য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত, গ্রীক ও লাতিন, এই দুইটির প্রতিই সমান বিমুখ ছিলেন। শিক্ষকগণ তাঁহাকে নানাভাবে এই দুই ভাষার ব্যাবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার ধারণা অপরিবর্তিতই রহিয়া গেল। তিনি বলিতেছেন—

"But even as a schoolboy I questioned the aptness of the classics for the prime structure of our education. So they told me how Mr. Gladstone read Homer for fun, which I thought served him right; and that it would be a great pleasure to me in after life. When I seemed incredulous, they added that Classics would be a help in writing or speaking English. They then pointed out the number of our modern words which were derived from the Latin or Greek. Apparently one could use these words much better, if one knew the exact source from which they had sprung. I was fain to admit a practical value. But now even this has been swept away. The foreigners and the Scotch have joined together to introduce a pronunciation of Latin which divorces it finally from the English tongue." ৪

চার্চিলের মেধাবী সহাধ্যায়িগণ যখন গ্রীক ও লাতিন ভাষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, চার্চিল নিজে তখন তাঁহার মাতৃভাষার দিকে আকৃষ্ট হইলেন—

"They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. But I was taught English. We were considered such dunces that we could learn only English. Mr. Somervell—a most delightful man, to whom my debt is great—

৩ দ্র° *Report of the Sanskrit Commission 1956-1957.* pp. 111-112

৪ Winston S. Churchill: *My Early Life* (Harrow).

was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing—namely, to write mere English. He knew how to do it. He taught it as no one else has ever taught it. . . . . And when in after years my school-fellows who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to common English, to earn their living or make their way, I did not feel myself at any disadvantage. Naturally I am biased in favour of boys learning English. I would make them all learn English and then I would let the clever ones learn Latin as an honour, and Greek as a treat. But the only thing I would whip them for is not knowing English, I would whip them hard for that."

এই দুইটি উক্তির ভিতর দিয়া চার্চিলের গ্রীক ও লাতিন ভাষা শিক্ষার প্রতি শাণিত বিদ্রূপ যেমন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগও সেইরূপ গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীক ও লাতিনের সহিত ইংরেজীভাষার সম্পর্ক কতখানি গভীর তাহা জানিনা, তবে সংস্কৃতের সহিত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সম্পর্ক যে তাহা অপেক্ষাও সুগভীর এবং অন্তরঙ্গ ইহা বিশেষজ্ঞগণই ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কৃত-কমিশনের সদস্যগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"It is customary to compare Sanskrit with Greek and Latin merely as a classical language, for which there might be some place—even some honoured place—in education, and people would be inclined to leave it at that. But we must remember that the place of Greek and Latin is not the same everywhere all over Europe. . . . . Greek and Latin, no doubt, are the rallying points for a common European civilization, and Europe admits the fact that its mind has been moulded by these two languages and their literatures. But it does not go beyond that. . . . Greek and Latin did not and do not have that same sort of deep and all-inclusive influence (except in the case of some monastic scholars) which Sanskrit has still in Indian life. They are at the best academic, the concern of scholars. But Sanskrit is something more profound and more vital than that. Not only is it academic in the true sense of the term, but it is popular also."

চার্চিল সাহেবের ব্যঙ্গোক্তি সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের যাঁহারা চিন্তাশীল কবি ও সমালোচক তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীক ও লাতিন এই দুইটি ভাষার অন্তরঙ্গ অনুশীলন ভিন্ন ইংরেজী কাব্য ও নাট্য সাহিত্যেও যে সকল শ্রেষ্ঠ ও সার্বকালিক নিদর্শন সেগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা বা ব্যাখ্যান করা আদৌ সম্ভব নহে। মিল্টনের *Paradise Lost* বা *Samson Agonistes*'এর কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কেননা উহাদের প্রতিটি ছত্রে কবির অতীতের ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সহিত গভীর পরিচয়ের সাক্ষ্য ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। কবি এলিয়ট একটি প্রবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"An understanding of Milton's poetry requires some acquaintance with several subjects none of which is very much in favour today: a knowledge of the Bible, not necessarily in Hebrew and Greek, but certainly in English; a knowledge of classical literature, mythology, and history, of Latin syntax and versification and christian theology. Some knowledge of Latin is necessary, not only for understanding what Milton is talking about, but much more for understanding his style and music. . . . . The point is that Milton's Latinism is essential to his greatness, and that I have only chosen him as the extreme example of English poetry in general. You may write English poetry without knowing any Latin; I am not so sure whether without Latin you can wholly understand it."[৫]

শুধু মিলটনের কাব্যই নহে, শেকস্‌পীয়রের ন্যায় রোম্যান্টিক কবিও যে প্রাচীন ঐতিহ্যকেই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপ দিয়াছেন, তাঁহার আপাতরোম্যান্টিকতার অন্তরালে যে গ্রীকো-রোমান আদর্শই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই প্রবাহিত ইহাও এলিয়ট সূক্ষ্মভাবে দেখাইয়াছেন—

"Shakespeare's education, what he had of it, belongs in the same tradition as that of Milton: it was essentially a classical education. The significance of a type of education may lie almost as much in what it omits as in what it includes. Shakespeare's classical knowledge appears to have been derived largely from translations. But he lived in a world in which the wisdom of the ancients was respected, and their poetry admired and enjoyed, he was less well educated than many of his colleagues, but his was education of the same kind—and it is almost more important for a man of letters, that his associates should be well educated than that he should be well educated himself."

যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে সেইরূপ ইংরেজী গদ্যসাহিত্যেও গ্রীকো-রোমান চিরায়ত আদর্শ শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে—ক্ল্যারেণ্ডন, গিবন প্রভৃতির গদ্যশৈলীই তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

উনবিংশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর হস্তে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষীণপ্রাণ স্রোতে যে মহাপ্লাবন দেখা দিল—

"সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে;
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!"[৬]

তাহা যে 'সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে'— ইহারই দান, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকই স্বীকার করিবেন। য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রবর্তন এককভাবে বাংলাসাহিত্যের এই নবজাগরণে কতকখানি সফল হইত, তাহাতে যথেষ্ট

৫ T. S. Eliot: *The Classic and the Man of Letters; Selected Prose* গ্রন্থে সংকলিত (Penguin Books 1953).

৬ দ্র° মাইকেল মধুসূদন দত্ত: চতুর্দশপদী কবিতাবলী ('সংস্কৃত')

সন্দেহ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-আন্দোলনের যাঁহারা পুরোধা তাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকেই বরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার সহিত আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটাইয়াছিলেন ; য়ুরোপের নবীন সংস্কৃতিকে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতির মূল্যায়নে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেঘনাদবধ কাব্যের আবির্ভাব ইহার জলন্ত নিদর্শন। এই মহাকাব্যের বহিরঙ্গ আবরণের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা স্পন্দিত হইতেছে, বহুভাষাবিদ্ কবিকে সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ; তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস প্রভৃতি কবিকুলমূর্ধন্যগণের কাব্যশৈলী, তাঁহাদের প্রয়োগপদ্ধতি ও অলংকারবিন্যাস কবি আত্মসাৎ করিয়াছেন— মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠকবর্গের নিকট তাহা কিছুমাত্র অজ্ঞাত নহে। বীরাঙ্গনা-কাব্যের রূপ-কল্পনায় আমরা ওভিদের প্রভাবের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকি। কিন্তু বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিয়াও শব্দচয়নে ও অলংকারবিন্যাসে তিনি যে তাঁহার স্বদেশের পূর্বকবিগণকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা একটু প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' শীর্ষক পত্রিকার অংশবিশেষ উদ্ধার করিতে পারি—

"চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,
যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জকায়া ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে। ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে !"

মাইকেল যে এই কয়েকটি পংক্তিতে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের প্রথম অঙ্কের পুরূরবার প্রসিদ্ধ উক্তিটিরই হুবহু অনুবাদ করিতেছেন, ইহা কি কখনও আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি ?[৭]

"আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রিঃ—
নৈশস্যার্চিহুর্তভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥"

মহাকবি কালিদাসের মূল রচনার সহিত মধুসূদনের কিরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, ইহা তাহার এক নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য। রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত এক পত্রে মধুসূদন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

৭ জনৈক টীকাকার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র উদ্ধৃত পংক্তিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন : "রিচ্যমান— এই কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ এখানে আদৌ সঙ্গত হয় না, 'সংযুক্ত' বা 'সম্পৃক্ত' বলিতে এখানে কোনও অর্থবোধ হয় না। মনে হয়, কথাটি 'রিচ্যমান' না হইয়া 'রুচ্যমান' হইবে। 'রুচ্যমান' অর্থে 'কান্তিমান' বুঝায়, অর্থাৎ যাহার কান্তি বা আভা এখন ক্রমশ ফুটিতেছে।"— ইহাকেই বলে পাণ্ডিত্য !

"You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me."[৮]

"Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these. . . ."[৯]

এই তো গেল মধুসূদনের কথা। আর বঙ্কিম? সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের অভাবে বঙ্কিমের মনীষার যথার্থ মূল্যনিরূপণ, তাঁহার শিল্পবোধের সূক্ষ্মতা ও গভীরতার যথাযথ পরিমাপ করা যে আদৌ সম্ভব নয়, ইহা কি আজও প্রমাণসাপেক্ষ? কপালকুণ্ডলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে 'রঘুবংশ' 'শকুন্তলা' 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব' 'রত্নাবলী' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যসাহিত্য হইতে যে-সকল সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ই সূচিত হইতেছে না। এইসকল উদ্ধৃতি মূল আখ্যানের বহিরঙ্গ আভরণ মাত্র নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ এই সকল উদ্ধৃতি সেই সকল পাঠকের নিকট দীপশিখার ন্যায় এক-একটি পরিচ্ছেদকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, মূলকাহিনীর সহিত ভাবানুষঙ্গসূত্রে এমন সকল আখ্যানভাগের সম্বন্ধ স্থাপন করে, যাহাতে পাত্র-পাত্রী-গণের চরিত্র একটি অভিনব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'অরণিকাষ্ঠ— উর্বশী' ও 'অরণিকাষ্ঠ— পুরূরবা'— দুইটি পরিচ্ছেদের অভিনব নামকরণের মধ্যে যে নাটকীয়তা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা কয়জন পাঠক অনুধাবন করিয়া থাকেন? 'কৃষ্ণচরিত্র' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে যে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দেদীপ্যমান, তাহা কি বর্তমান বাঙালী পাঠককুলের নিকট অন্ধকারাবৃতই থাকিয়া যাইবে? 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধের স্বাদগ্রহণে কি আমরা চিরকাল বঞ্চিত থাকিব? যে প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন তাঁহার উপন্যাস-সৃষ্টির মধ্য দিয়া ফুটাইয়া

---

৮ ও ৯ দ্র° নগেন্দ্রনাথ সোম: মধুস্মৃতি (২য় সংস্করণ, ১৩৬১)

মধুসূদনের সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে 'মধুস্মৃতি' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু বিশেষ উল্লেখযোগ্য— "পূর্বে এই বেলগেছিয়ার বাগানেই রত্নাবলী নাটকের মহড়ার সময়, গৌরদাসের সহিত নাটক-রচনা সম্বন্ধীয় কথোপকথনের ফলে মধুসূদন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে একদিন গৌরদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তাঁহাকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, গৌর! 'গৌর! আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি। হায়, এতদিন আমি কেন এই দেবভাষা অধ্যয়ন করি নাই! ইহাতে যে এত রত্নরাজী বিদ্যমান আছে। তাহা আমি জানিতাম না!'

"মধুসূদন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য (বর্ধমান) ভেদিয়া নিবাসী পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট রীতিমত সংস্কৃত কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত রামকুমারের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, বিশ্বনাথ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন এবং মেঘদূত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। এই খণ্ডকাব্যখানি তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, তিনি ইংরেজি, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন হইলেও, তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থের উপরিভাগে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; এই সকল উদ্ধৃত শ্লোক (Quotations) তাঁহার সংস্কৃতানুরাগেরই একান্ত পরিচায়ক।"

তুলিতে চাহিয়াছেন, তাহার দার্শনিক ভিত্তির অনুসন্ধানে কি আমরা কিছুমাত্র আগ্রহান্বিত নই? মনে পড়িতেছে উদয়গিরি ও ললিতগিরি দর্শনে প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আবেগপূর্ণ খেদোক্তি—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য মাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলন স্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"[১০]

জানিতে ইচ্ছা হয় বর্তমানে কয়জন সহৃদয় বাঙালী পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে মনীষী দেশপ্রেমিক স্রষ্টা ভবিষ্যদ্দর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাণী অনুরূপভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে! পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাস যিনি জীবন ভরিয়া মন্থন করিয়াছেন, সেই আত্মসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্রই গভীর দুঃখে বলিতেছেন—

"হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইন্‌বর্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।"

কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বাজারের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য লিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য।"[১১]

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নহেন; উনবিংশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের যাঁহারা অগ্রদূত তাঁহারা সকলেই

---

১০ 'সীতারাম', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১১ দ্র° 'কমলাকান্তের দপ্তর': বড়বাজার।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অমৃতরস আকণ্ঠপান করিয়াছিলেন,[১২] সেই অমৃতরস তাঁহারা আপন আপন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেরা সেই অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তো বটেই— 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম'— সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের সাহিত্যকেও অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাঁহারা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী, আমরা স্বেচ্ছায় সেই অমৃতের উৎস হইতে নিজেদের বিমুখ করিয়া তুলিয়াছি। অমৃত-ফলে আজ আমাদের অরুচি জন্মিয়াছে, আমরা আপাত সুস্বাদু লিচু পীচ পেয়ারা আনারস এবং আঙুরের, এমন কি 'অপক্ব কদলীর' মোহে মুগ্ধ। পিণ্ডখর্জুরের দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া আমরা তিন্তিড়ীর অম্লরস আস্বাদনের জন্য লালায়িত। জাতীয় চিত্তের এই নিম্নাভিমুখী গতিকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু উপায়? মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতের চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, ইহার প্রধান কারণ যে পাঠক-কুলকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য দর্শন এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিল জাগ্রত। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় কিছু না কিছু ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তৎপর হইতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে স্রষ্টা ও রসয়িতা, লেখক ও পাঠক— এই উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ভিন্ন কখনও কাব্য সৃষ্টি সার্থক হয় না, ইহা ত' অবিসংবাদিত সত্য। সুতরাং মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগে যে বাংলার সাহিত্যোদ্যান বিচিত্র নয়নমনোহারী পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ হইতে পারিয়াছে, এবং প্রাচীন

---

১২ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বোদ্ধৃত পত্রখানি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> "The value of this letter becomes all the more significant when it is borne in mind that the great reformer, the Maker of modern Bengal, or, for the matter of that, of modern India, was himself a great Sanskrit scholar. It was he who for the first time gave an impetus to the study of the *Upanishads* in Bengal, some of which he rendered into Bengali and afterwards into English. Ram Mohon though deeply imbued with *Vedanta* has a vision of the India of the future in which the study of the physical sciences was to play a conspicuous rôle. . . . Happily for India, Ram Mohon sounded the note of warning, pointed out the direction in the midst of his pitch dark and obscure surroundings with the accuracy of a mariner's compass. Macaulay's famous minute (1835) was in no small measure responsible for the intellectual renaissance of India, however much neo-Hindu revivalists may take offence at some passages in it. The victory of the Anglicists over the Orientalists ushers in a new era in the history of modern India. . . . No wonder that they became almost intoxicated by drinking the new wine and even ran amock so to say.
>
> "Fortunately, steadying influences were at work almost imperceptibly side by side. Bhudeb Mukherjee and Rajnarayan Bose, though among the votaries who worshipped in the new temple, did not altogether cast off the old moorings. Devendranath Tagore, another alumnus of the Hindu College, must also be regarded as a product of the confluence of the east and the west and a disciple of Ram Mohon Ray; and this early torch-bearer of the Brahmo Samaj was deeply imbued with Vedanta Philosophy."
>
> —*Autobiography of a Bengali Chemist,* pp. 113-115

ভারতীয় সংস্কৃতির পবিত্র ঘ্রাণতর্পণসৌরভ-সমারোহ সেই উদ্যানকে মহিমান্বিত করিয়াছে, ইহার কারণ, সেই উদ্যান রচিত হইয়াছিল যে ভূমিতে, তাহা ছিল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণদ প্রবাহের দ্বারা উর্বর। ইংরেজ কবিসমালোচক টি. এস. এলিয়ট সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের সমসাময়িক শিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন—

> "You cannot draw a sharp line between the man of letters and his audience, between the critic in print and the critic in conversation. Nobody suffers more from being limited to the society of his own profession than does the writer: it is still worse when his audience is composed chiefly of other writers or would-be writers. He needs a small public of substantially the same education as himself, as well as the same tastes; a larger public with some common background with him; and finally he should have something in common with everyone who has intelligence and sensibility and can read his language."

অতএব বাংলাসাহিত্যের সহিত চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যের যোগ, যাহা বর্তমানে বিচ্ছিন্নপ্রায়, তাহাকে যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে সাহিত্যিকগণকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে হইবে, সেইরূপ যাহাদের উদ্দেশ করিয়া সেই সাহিত্য রচিত হইবে, তাহাদের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ব্যাপকভাবে সঞ্চারের আয়োজন করিতে হইবে। তবেই কেবল উন্নত আদর্শের সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হইবে; অন্যথা নহে। সংস্কৃতের চর্চা যদি কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহার দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যেমন উপকার হইবে না, সেইরূপ প্রবহনশীল জীবনস্রোতের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে ইহা নিজেও ক্রমশঃ শীর্ণ ও পাণ্ডুর হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে, যুগ যুগ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে তাহারই অনুকরণ করিয়া চলিতে হইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না। সাহিত্যসৃষ্টি প্রতিভা-সাপেক্ষ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; এবং প্রতিভা স্বভাবতই বন্ধন বিষয়ে অসহিষ্ণু। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বাধীনতা এক কথা নহে। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

> "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
> ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
> সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
> মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

কিন্তু এখন বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক বিপরীতমুখী বলিয়া মনে হয়। যাহা কিছু নূতন তাহাই প্রশংসনীয়, আর যাহা কিছু পুরাতন তাহাই বর্জনীয়, ইহাই তাঁহাদের মনোভাব। এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত সমালোচক Gilbert Murrayর একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

> "Self-assertion is not as a rule disagreeable to the assertor, whatever it may be to his neighbours; and it looks as if many causes had cooperated to put a premium upon it during the last few generations. First, there is the analogy—

so fatal in many spheres—of the mechanical arts in an age of invention. We expect every year a new and improved method in window-catches or steam-ploughs or motor-engines; and consequently, by false analogy, we expect a new and improved method in music or painting or literature or even morals. This error sometimes approaches the idiotic. People actually cannot accommodate themselves to the fact that there is better poetry in Isaiah than in the New York *Saturday Post*."[১৩]

আমাদের বর্তমান বাংলাসাহিত্যের যাঁহারা সৃষ্টিশীল লেখক তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি যে পরাঙ্মুখতা দেখা যাইতেছে, তাহা স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নহে, পরন্তু পরিপন্থী। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারের প্রবেশদ্বার তাঁহাদের নিকট আজ রুদ্ধপ্রায়। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারা আপন সাধনক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন সংঘটন করিতে অক্ষম, ফলে উদ্দাম নবীনতার মোহে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তাঁহারা যে অন্ধ এবং অক্ষম অনুকরণে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার সহিত স্বদেশের যুগ-যুগান্তর-প্রবাহিত ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নাই; তাহা স্বদেশের মাটিতে বিদেশী ফুলের মতই আপাতনয়নরঞ্জক হইলেও সৌরভহীন। অধ্যাপক মারে'র প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন বলিতে ইচ্ছা হয়—

"I can hardly believe, in spite of temporary appearances, that civilization will ever permanently and of set purpose throw aside the great remote things of beauty just because it needs some time and effort to read and understand them; and the whole world will ever deliberately turn away from the best because it is difficult, and feed contentedly on second—and third—and twelfth-rate substitutes. It would surely be too dire an apostasy."[১৩]

সুতরাং যদি আমাদের দেশীয় সাহিত্যকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হয়, তাহাকে যদি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যাবতীয় উন্নত চিন্তার বাহন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ইহার মৈত্রীবন্ধন সাধন করিতে হইবে। দুরূহ মৃত ভাষা বলিয়া সংস্কৃতকে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। সংস্কৃত বিদ্যার শিক্ষণপদ্ধতি যাহাতে উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী হয়, শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাহাতে ইহার সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিচিত হইতে পারেন, তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে যাঁহাদেরই বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, স্বদেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণকামনায় যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও নিজেদের নিযুক্ত রাখেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

---

১৩ দ্র° *The Classical Tradition in Poetry* (Oxford University Press, London, 1927).

গান্ধিজী তাঁহার আত্মজীবনীর এক স্থলে বলিয়াছেন—

"Today I cannot but think with gratitude of Krishnashankar Pandya. For if I had not acquired the little Sanskrit that I learnt then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. In fact I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language, because I have since realised that every Hindu boy and girl should possess sound Sanskrit learning."

শুধু গান্ধিজীই নহেন, তাঁহার ন্যায় জীবনের নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, এইরূপ বহু কৃতবিদ্য পুরুষকেই উত্তরকালে খেদ করিয়া বলিতে শুনা যায়—'হায়! কেন বাল্যকালে সংস্কৃত পড়ি নাই!' সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ একটি ভাষার চর্চা যতই পিছাইয়া দেওয়া যাইবে, ততই শিক্ষার্থীদের ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার আগ্রহও যেমন ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, সেইরূপ ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন, তাহাও দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ফলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির মান ক্রমশঃই অধোগামী হইতে থাকিবে। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক যে ভাষা শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত এবং হিন্দী এই চারিটি ভাষাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় রূপে নির্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে ইংরেজী ভাষা তৃতীয় হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য রূপে নির্দিষ্ট হয়। অপরপক্ষে সংস্কৃত পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য হইলেও নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর Humanities শাখার ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ভাবে সংস্কৃত শিক্ষাকে অনাবশ্যক বিষয় রূপে গণনা করার ফলে ছাত্রছাত্রীগণের সংস্কৃতের প্রতি কোনো আন্তরিক অনুরাগ জন্মাইতেছে না। আর যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বাণিজ্য অথবা কারিগরী বিদ্যাকেই বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষে নবম শ্রেণী হইতে সংস্কৃতের সহিত কোনো সম্পর্ক আদৌ থাকিবে না। অথচ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর পক্ষে স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত কিছুটা পরিচয় লাভ করা যে অবশ্যকর্তব্য, সে-বিষয়ে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিরই বৈমত্য থাকা উচিত নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের জ্ঞান কতদূর ফলপ্রসূ হইতে পারে, তাহার জলন্ত নিদর্শন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"My predilection for Chemistry induced me to choose the "B" Course. For the B.A. Examination English was then a compulsory subject. Morley's *Burke* and Burke's *Reflections on the French Revolution* were the prose texts among others and Surendranath Bannerji's exposition of both was as masterly as attractive. At this period of my college life I had to suppress my passion for literature as my attention was much distracted by some rival pursuits. I had

gained as I have already said a passable acquaintance with Latin and French by my own unaided efforts and Sanskrit I learnt as a matter of course—the first seven cantos of *Raghuvansam* and the first five of *Bhattikavyam* were texts for the F.A., and also in my private capacity with the aid of a Pandit I tasted the beauties of some cantos of another peerless production of Kalidasa, the *Kumarasambhavam.* I had by now begun to cherish the hope of competing for the Gilchrist Scholarship examination, the standard for which was the same as that of the London University Matriculation and for which a fair acquaintance with Latin, Greek or Sanskrit, French, or German, was essential."

ছাত্রবস্থায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এইরূপ গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য রায় হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় উৎসাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই দুঃসাহসিক গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁহার আত্মজীবনীর নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে বিবৃত হইয়াছে।—

"I was not at all appalled by the gigantic nature of the task. I instituted a vigorous search for manuscripts bearing upon the subject and ransacked the pages of Aufrecht's *Catalogous Catalogorum*, Bhandarkar's Rajendra Lal Mitra's, H. P. Sastri's and Burnell's Notices of Sanskrit Mss, and put myself in communication with the librarians in India and the India Office, London, where some of the manuscripts have been preserved. Pandit Navakanta Kavibhushan, who acted for four or five years as my amanuensis, was also deputed to Benares in search of old works on alchemy. Any one who has experiences in collecting Mss. in India knows what ravages the white ant, the silver fish and other insects commit on them. The damp climate of Bengal is specially unfortunate in this respect. It was often necessary to collect as many as 3 or 4 Mss. of the same Tantra since sometimes the introductory pages were found eaten up by worms, sometimes again the concluding portion; there were also discrepancies in the readings of different Mss. In order to bring this home to the reader it is only necessary to refer to the edition of *Rasarnava* in the *Bibliotheca Indica.*"

সুবিখ্যাত ফরাসী সংস্কৃতবিদ্ মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি আচার্য রায়কে যে "excellent Sanskritist" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা যে কতখানি সংগত উদ্ধৃত অংশটুকুই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরই সংস্কৃত অবশ্যশিক্ষণীয় রূপে নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়—ইহার দ্বারা তরুণসমাজের মনে যেমন ব্যাপকভাবে স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মিবে, সেইরূপ ভবিষ্যৎ কালে প্রাচীন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক লইয়া মূল্যবান্

গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিবার সম্ভাবনার বীজও একাধিক প্রতিভাবান্ ছাত্রের জীবনে ফলপ্রসূ হইবার সুযোগ পাইবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে *'Three-Language Formula'* উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, (২) ইংরেজী অথবা আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা এবং (৩) হিন্দী, এই তিনটি ভাষাই মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে অবশ্যশিক্ষণীয় রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ বহু রাজ্য সরকারই অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার ফলে সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে একরূপ নির্বাসিত হইতে চলিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু সংস্কৃত কমিশনের সভ্যবর্গ কেন্দ্রীয় সরকারের এই ত্রৈভাষিক নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইতে নির্বাসনের নীতি যে আত্মঘাতের তুল্য হইবে ইহা সুদৃঢ় ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার দুইটি মাত্র পন্থা আছে—প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রৈভাষিক নীতি স্বীকার লইয়াও (১) মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক ভাষা), (২) ইংরেজী (অথবা হিন্দী) এবং (৩) সংস্কৃত, এই ভাবে উক্ত নীতির পুনর্বিন্যাস সম্ভব। হিন্দীকে যদি অবশ্যপাঠনীয় রূপে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মানের আসন দিতেই হয়, তবে 'সংস্কৃত'কে চতুর্থ ভাষারূপে স্থান অবশ্যই দিতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত।[১৪] কিন্তু সংস্কৃতের সম্মানরক্ষার অজুহাতে মাত্র দুই-এক বৎসরের জন্য সংস্কৃতের বর্ণপরিচয় মাত্র করাইয়া দিয়াই যদি আমরা নিজেদের কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করি, তবে তাহা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।[১৫] ইহার দ্বারা সংস্কৃত চর্চার যেমন কোনও উন্নতি সাধিত হইবে না, সেইরূপ শিক্ষার্থিগণও যথোপযুক্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে না। ফলে তাহাদের সংস্কৃত জ্ঞান হইবে একান্ত পঙ্গু। এবং উত্তরকালে তাহার দ্বারা কোনোরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে না, পরন্তু এইরূপ অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ফলে শিক্ষার্থিগণের চিত্তে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হওয়াই

---

১৪ Report of the Sanskrit Commission 1956-57, p. 103.

১৫ এই প্রসঙ্গে একজন ইংরাজ শিক্ষাব্রতীর *Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত 3-Language Plan and Sanskrit' শীর্ষক পত্রখানির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। লেখক আজমীরে Mayo Collegeএর অধ্যক্ষ রূপে ২৫ বৎসরেরও অধিককাল কাজ করিতেছেন। তাঁহার মতামতের গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

> " . . . the solution of the three-language formula is to allow Sanskrit as one of the three, the other two proably being Hindi and English. Not only is Sanskrit recognised by the constitution as one of the languages of India but its study is educationally disirable for many reasons, and as far as I know is not objected to by those whose mother tongue is not Hindi, because so many Indian languages have their roots in Sanskrit.
>
> "It would be objectionable to force all pupils to learn any one particular regional language for the convenience of teaching, but it is possible to organise the efficient teaching of Sanskrit throughout the school, and it should be permitted, or the three-language formula should be recognised as unworkable in schools where the pupils speak many mother tongues."

—*J. T. M. Gibson*: *The Statesman, Monday, April 29, 1963* (*Calcutta Edition*)

স্বাভাবিক। সংস্কৃত দুরূহ ভাষা বলিয়া, ইহার ব্যাবহারিক কোনো উপযোগিতা নাই বলিয়া ছাত্রগণ স্বভাবতই ইহার প্রতি বিমুখ—জোর করিয়া ছাত্রগণের স্কন্ধে ইহার বোঝা চাপাইয়া দেওয়ার কোনো হেতু নাই—আধুনিক শিক্ষাবিদগণের এই বহুধাঘোষিত সংস্কৃতবিরোধী যুক্তিজাল যে নিতান্তই নিঃসার, তাহা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই ধরা পড়ে। টি. এস্. এলিয়ট তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

> "No one can become really educated without having pursued some study in which he took no interest—for it is part of education to learn to interest ourselves in subjects for which we have no aptitude." [১৬]

ছাত্রদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি অরুচির দিকে তাকাইয়া যদি শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করিতে হয়, তবে অর্থকরী বিদ্যা ভিন্ন আর কোনো বিদ্যারই পাঠ্যতালিকায় স্থান থাকা উচিত হইবে না; কেন না—

> "if it is not going to mean more money, or more power over others, or a better social position, or at least a steady and respectable job, few people are going to take the trouble to acquire education. For deteriorate it as you may, education is still going to demand a good deal of drudgery."

সুতরাং শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সব কয়টিতেই শিক্ষার্থীর সমান অনুরাগ থাকিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চাহিয়া শিক্ষার সংস্কার কার্যে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, এ বিষয়ে কোনো বৈমত্য থাকিতে পারে না। এলিয়ট শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে একস্থলে একটি অতিশয় মূল্যবান্ মন্তব্য করিয়াছেন—

> "There are two kinds of subject which, at an early stage, provides but poor training for the mind. One is the subject which is concerned more with theories, and the history of theories, than with the storing of the mind with such information and knowledge as theories are built upon. . . . The other kind of subject which provides indifferent training is that which is too minute and particular, the relation of which to the general business of living is not made evident. And there is a third subject, equally bad as training, which does not fall into either of these classes, but which is bad for reasons of its own: the study of *English Literature,* or, to be more comprehensive, the literature of one's own language." [১৬]

এলিয়ট তাঁহার মাতৃভাষা ইংরেজী সম্পর্কে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের মাতৃভাষাগুলি সম্পর্কেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য কি না বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। কেন-না, স্বদেশের মাতৃভাষার চর্চা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হউক এবং উন্নত হউক—ইহা নিঃসন্দেহে দেশবাসী মাত্রেরই কাম্য। কিন্তু, ভারতীয় ভাষাসমূহ এখন উন্নতির যে-স্তরে অবস্থিত, সে-অবস্থায় কেবলমাত্র মাতৃভাষার চর্চার দ্বারা, বিশেষতঃ তাহার সহিত যদি সংস্কৃত এবং তদ্ভব কয়েকটি ভাষার যুগপৎ চর্চার মিলন

---

১৬ *Modern Education and the Classics*: Selected Essays.

সাধিত না হয়, তবে শিক্ষার্থিগণের বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ পরিশীলন যে সার্থকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের আর-একটি মন্তব্য প্রত্যেক শিক্ষাসংস্কারকের পক্ষেই গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"The doctrine of studying the subject we like is most disastrous for those whose interests lie in the field of modern languages or in that of history, and worst of all for those who fancy that they will become writers. For it is these people and there are many of them—for whom the deficiency of Latin and Greek is most unfortunate. Those who have a real genius for acquiring these dead languages are few, and they are pretty likely of their own accord to devote themselves to the Classics—if they are given the opportunity. But there are many more of us who have gifts for modern languages, or for our own language, or for history, who have only a modest capacity for mastering Latin and Greek. We can hardly be expected to realise, during adolescence, that without a foundation of Latin and Greek we remain limited in our power over these other subjects."[১৬]

আধুনিক কালে অনেকেই আমাদের দেশে সাহিত্যসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার জন্য যে প্রস্তুতি, মাতৃভাষায় যে সুদৃঢ় ব্যুৎপত্তি, প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ-শক্তি এবং বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির যে অনুশীলন ও পরিমার্জন একান্ত অপেক্ষিত, বহু ক্ষেত্রেই তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সৌষ্ঠব সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই নহে, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যাঁহারা উত্তরকালে বিশেষভাবে ব্রতী হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাব তাঁহাদের পক্ষে যে কিরূপ ক্ষতিকর এবং গবেষণার অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগম্য। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইতে সংস্কৃতশিক্ষার সহিত ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ এইসকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার মানকে উত্তরোত্তর নিম্নাভিমুখী করিতেই সাহায্য করিতেছে। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ব্রতী হইয়াও ভারতীয় দর্শনের মহিমা, ইহার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কি আছে। বৌদ্ধ দর্শনের 'প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব'-বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত রুশ দার্শনিক অধ্যাপক শেরবাৎস্কি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

"Although the Buddhist doctrine of causation has attracted the attention of scholars at the very outset of Buddhistic studies in Europe, its comprehension and the knowledge of its historical development have made till now but very little progress. . . . . The reason for this partly lies in the circumstance that it seemed

highly improbable, too improbable beside sheer logical possibility, that the Indians should have had at so early a date in the history of human thought a doctrine of causation so entirely modern, the same in principle as the one accepted in the most advanced modern sciences."[১৭]

প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে অনুরূপ প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফার্থ্—

"Without the Indian grammarians and phoneticians . . . . . it is difficult to imagine our nineteenth century school of phonetics."[১৮]

আমাদের স্বদেশের সাহিত্যসমালোচক-সম্প্রদায় যাহাই বলুন-না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচারশাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্বের গভীরতা ও অভিনবত্বের দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছেন। একজন ইতালীয় বিশেষজ্ঞ সমালোচক আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ক প্রমুখ সাহিত্যমীমাংসকগণের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

". . . . their thought, although at times uncertain and ingenuous, reaches, with Abhinavagupta, conclusions which are still valid today and even relatively novel to Western thought. The conception of art as an activity and an independent spiritual experience, freed of practical interest, which the intuition of Kant perceived in the West, was already, in the 10th century India, an object of study and controversy."[১৯]

অপিচ—

"In some observations about practical and poetical language, one of the most sensitive critics of our times, Paul Valéry, ideally connects himself to Anandavardhana."[২০]

শুধু প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রের রহস্য উদ্ভেদের জন্যই সংস্কৃত জ্ঞান আবশ্যক তাহা নহে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা চিত্র সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্য—সব কিছুই ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে সে-সকলের সৌন্দর্য এবং মহিমার পরিপূর্ণ আস্বাদনও সংস্কৃত-সাহিত্যে অব্যুৎপন্ন সামাজিকের পক্ষে সম্ভব নহে। মামল্লপুরমের গঙ্গাবতরণের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কার্য-শিল্প সম্পর্কে একজন মনীষী পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য—

---

১৭ Stcherbatsky: *Buddist Logic,* Vol. I, pp. 141-142 (Dover Publications, Inc. New York).

১৮ W. S. Allen: *Phonetics in Ancient India* (Oxford University Press, 1961) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত

১৯ Raniero Gnoli: *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta,* Introduction, p. xxxii (Seric Orientale Roma xi, 1956).

২০ Raniero Gnoli: *Udbhata's Commentary on the Kāvyālamkāra of Bhāmaha,* p xxvii (Roma, 1962).

"Here is an art inspired by the monistic view of life that appears everywhere in Hindu philosophy and myth. Everything is alive. The entire universe is alive; only the degrees of life vary. Everything proceeds from the divine life; substance and energy as as temporary transmutation. All is a part of the universal display of God's Māyā."[২১]

এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির যে কোনও দিক আলোচনা করা যাউক-না কেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ইত্যাদির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সর্বত্রই অপরিহার্য এবং সংস্কৃত এবং সংস্কৃতসম্বন্ধী প্রাকৃত পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহই সেই সকল জ্ঞানের একমাত্র বাহন। অতএব শিক্ষার শুরু হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত বিদ্যার্থিগণের পরিচয় যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, সে-জন্য ভারতীয় শিক্ষানীতির যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদের সে-বিষয়ে যথোপযুক্তভাবে অবহিত হইতে হইবে, ইহাতে কোনও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিরই বৈমত্য থাকিতে পারে না।

১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সার্ এণ্টনী ইডেন লর্ড্ স্কারব্রাফ্'এর নেতৃত্বে প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ক অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং গবেষণার সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন নিয়োগ করেন। স্কারব্রাফ্ কমিশনের যে রিপোর্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রাচ্যতত্ত্ব, বিশেষতঃ ভারত-তত্ত্ব (Indology) বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি বিধানের জন্য কয়েকটি অতি মূল্যবান্ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।[২২] এক সময় সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ মনীষী সার্ মনিয়র্-উইলিয়ম্স্, আর্যবিদ্যাকে আর্যাবর্ত ও আঙ্গলদেশের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন—

"ঈশানুকম্পয়া নিত্যমার্য্যবিদ্যা মহীয়তাম্।
আর্য্যাবর্ত্তাংগ্লভূম্যোশ্চ মিথো মৈত্রী বিবর্দ্ধতাম্।"

কিন্তু কালক্রমে অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে এবং বিশ্বের মানবসমাজের বিবেক আধুনিক জড়বাদের (materialism) দ্বারা উত্তরোত্তর অধিকমাত্রায় কবলিত হওয়ার ফলে, প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। স্কারব্রাফ্ কমিশনের সদস্যবৃন্দ প্রাচ্যবিদ্যাকে পুনরায় কিভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারা যায় এবং আধুনিক অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহার সমন্বয় সাধনের দ্বারা কিভাবেই বা ইহাকে যুগোপযোগী রূপ দান করিতে পারা যায়, সে-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহাদের প্রস্তাবিত কয়েকটি সংস্কার আমাদের দেশেও সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকল্পে বিশেষভাবে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন—

---

২১ Heinrich Zimmer: *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization*, p. 119 (Harper & Brothers, New York, 1962).

২২ Report of the Scarbrough Commission of Enquiry on Oriental, Slavonic, East European and African Studies (1947).

"At a time when great efforts are being undertaken to make co-operation between nations the basis of world peace and future prosperity, this foundation of scholarship [in Oriental subjects] has an importance which cannot be disregarded without injury to the national and to the international .... interest."[২৩]

হায়! আমাদের দেশে কয়জন সাহিত্যব্রতী মেকলের ন্যায় ভারতের চিরায়ত সংস্কৃত-সাহিত্যের এইরূপ একনিষ্ঠ সেবা করিতে পারিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যাকে এক্ষণে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। ১৮৩৫ খৃ. মেকলে সাহেব তাঁহার কুখ্যাত *Minute*এ সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে বিষোদ্গার করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

" . . . . a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."[২৪]

কিন্তু আজ তাঁহার এই বিদ্রূপ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ধর্ম শিল্পকলা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ভারতীয়

---

২৩ V. Raghavan: *Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe* (University of Madras, 1956) p. 61.

২৪ অথচ, ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যে, এই মেকলে সাহেবই গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৩৫ খৃ. ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে লিখিত একপত্রে তিনি বিগত ১৩ মাসের সাহিত্যচর্চার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—

"I have cast up my reading account, and brought it to the end of the year 1835. It includes December 1834; for I came into my house and unpacked my books at the end of November 1834. During the last thirteen months I have read Aeschylus twice; Euripides once; Pindar twice; Callimachus; Apollonius Rhodius; Quintus Calaber; Theocritus twice; Herodotus; Thucydides; almost all Xenophon's works; almost all Plato; Aristotle's Politics; and a good deal of his Organon, besides dipping elsewhere in him; the whole of Plutarch's Lives; about half of Lucian; two or three books of Athenaeus; Plautus twice; Terence twice; Silius Italicus; Livy; Valleius Paterculus; Sallust; Caesar; and, lastly, Cicero. I have, indeed, still a little of Cicero left; but I shall finish him in a few days. I am now deep in Aristophones and Loucian. . . ."—The *Life and Letters of Lord Macaulay*: By his nephew George Otto Trevelyan, M.P. (New Edn. in 2 vols. London. Longmans, Green & Co. 1878), Vol. I. p. 452.

অপিচ—

"I think myself very fortunate in having been able to return to these great masters while still in the vigour of life, and when my taste and judgment are mature. Most people read all the Greek that they ever read before they are five and twenty. They never find time for such studies afterwards till they are in the decline of life; and then their knowledge of the language is in a great measure lost, and cannot easily be recovered. Accordingly. almost all the ideas that people have of Greek literature, are ideas formed while they were still very young. . . . . I could not bear Euripides at College. I now read my recantation. He has faults undoubtedly. But what a poet! The Medea, the Alcestis, the Troades, the Bacchae, are alone sufficient to place him in the very first rank. Instead of deprecating him, as I have done, I may, for aught I know, end by editing him."—ঐ- Vol. I. pp. 439-440.

সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র অবদানের চিত্র ক্রমশই আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। সুতরাং বর্তমান যুগে সংস্কৃত শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতির অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের সহিত যুক্ত করিবার যে অবকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহা মেকলের যুগে ছিল না। ১৯৫৩ খৃ. জুলাই মাসে এডিনবার শহরে ব্রিটেনের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সংস্কৃতবিদ্যাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সহিত অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়—

> "At their sixth conference at Edinburgh in July 1953, the British Orientalists resolved that Oriental Scholarship should not only form an academic speciality, but should contribute the oriental counterpart to the respective humanistic faculties, philosophy, history, art or literature, so that liberal university education would no longer be purely parochial or even merely European, but truly universal comprehending a knowledge of the contributions of the Orient in the respective spheres, and that steps should be taken to make not only the community at large but university authorities too recognize this. That is, the findings of India for example in the various branches of knowledge should be made part of the general body of knowledge." [২৫]

এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের সহিত ভরতের রসতত্ত্বের, পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের, য়ুরোপীয় দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মনীষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক অভিনব—সমন্বয়াত্মক চিন্তাপদ্ধতির প্রবর্তন যেমন সম্ভব হইবে, সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির আলোচনাও আধুনিক যুক্তিবাদের প্রেরণায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশেও অনুরূপভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার সহিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের সংযোগ-সাধন করিতে পারি; দর্শন ইতিহাস রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চতর পর্যায়ে সংস্কৃত বিদ্যার সেই সেই বিভাগের যথোপযুক্ত তুলনামূলক আলোচনার প্রবর্তনের দ্বারা আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার করিতে পারি। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার ভিত্তি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইতেই যদি ব্যাপক ও দৃঢ় না হয়, তবে উচ্চস্তরে এই সকল সংস্কার কেবলমাত্র নিষ্ফলই হইবে না, পরন্তু ভ্রান্তিকেই প্রশ্রয় দিবে মাত্র।[২৬] স্কারব্রাফ্ কমিশনের সদস্যবৃন্দও সেইজন্য শিক্ষাজীবনের শুরু হইতেই প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সংস্কৃত কমিশনের প্রতিবেদনেও একথা অতি স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—

---

২৫ দ্র. V. Raghavan: *Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe,* p. 82-83.

২৬ এই প্রসঙ্গে T. S. Eliot-এর অভিমত উদ্ধারযোগ্য—

> "I would also observe in passing, that to postpone the introduction to Latin to the age at which a boy appears to be more gifted for languages than for other studies is to postpone it too long—apart from my belief that it would be most desirable for everyone to possess some knowledge of Latin even if none of Greek."

"Provision must certainly be made even in Secondary Schools for a specialised study of Sanskrit. But the Compulsory General Course in Sanskrit would be intended mainly to give a pupil the necessary inkling into his cultural past, to arouse in him an interest in the language and literature of his ancestors, to afford him a wholesome training of mind and character, and to inculcate in him real respect for pure learning. Nobody ever thought of making every school-boy a miniature Pandit. At the same time, it should be realised that, only when the number of persons possessing a general acquaintance with Sanskrit increased, a few specialists in Sanskrit could arise from among them. The base of the pyramid must always be sufficiently broad."

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আমরা ভারতবর্ষের নিজস্ব সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে উদাসীন হই, তবে ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর আর কি হইতে পারে—বিশেষভাবে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিই যখন বিশ্বের সম্মুখে ভারতকে গৌরব ও মহিমার শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৬

সংস্কৃত কমিশনের প্রতিবেদনের ভূমিকায় সভাপতি আচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—

"As an Educationist, who has been connected with Linguistic and Humanistic studies and Research for over 40 years, I can only put in a plea before our National Government for the support of Sanskrit which forms one of the bases of the cultural and political unity of India. In my opinion as a Professor of Linguistics who has not cut himself off from public contacts and public affairs, the rehabilitation of Sanskrit in Indian education and Indian public life, apart from the general cultural life of the people will be a potent factor which the Government may well employ to fight the growing fissiparousness of Linguism and to strengthen the bonds of unity among the Indian people. . . ."

ইহার পরেও একাধিকবার তিনি ভারতবর্ষের বর্তমান ভাষাসমস্যার সমাধান কল্পে সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ১৯৬০ খৃ. ৩১ আগস্ট তারিখের একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন—

"...এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত, ভাষাকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়ে যে দাবানল জ্বলে উঠেছে, সে আগুন নিবিয়ে ফেলা। ভারতের সমস্ত ভাষা তুল্যমূল্য স্থান পাক আর সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় হোক সংস্কৃত ও ইংরেজীর মাধ্যমে। দেয়ালের জলজ্বলে লেখা পাঠ করেও কি আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো না?"[২৭]

২৭ দ্র° 'যুগান্তর', বুধবার, ৩১শে আগস্ট ১৯৬০।

কেবলমাত্র ড. চট্টোপাধ্যায়ই নহেন ; ভারতবর্ষের কল্যাণকামনা করেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, এইরূপ দেশ-বিদেশের বহু মনীষীও ভারতের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-কল্পে সংস্কৃতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। এমনকি পরলোকগত ড. F. W. Thomas'এর ন্যায় একজন বিচক্ষণ সংস্কৃতবিদ্ মনীষী বহু পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"I, therefore, do not feel that the idea of Sanskrit resuming its place as a common literary medium for India is a hopelessly lost cause, since the alternative are either that there should be no such medium (other than English, which, it should be remembered, is, in regard to many necessary Indian notions, itself without resource), or the dominance, despite unavoidable reluctances, of some particular vernacular."[২৮]

প্রাচীনকাল হইতেই আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূখণ্ডে সংস্কৃতভাষাই বিভিন্ন প্রদেশ এবং জাতির মধ্যে চিন্তাবিনিময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ একক বাহনরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রসঙ্গে খৃ. দ্বাদশ শতকে রচিত মহাকবি শ্রীহর্ষ প্রণীত 'নৈষধীয়চরিত' নামক সুবিখ্যাত মহাকাব্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উদ্ধার যোগ্য—

"অন্যোন্যভাষানববোধভীতেঃ সংস্কৃত্রিমাভির্ব্যবহারবৎসু।
দিগ্‌ভ্যঃ সমেতেষু নৃপেষু তেষু সৌবর্গবর্গো ন জনৈরচিহ্নি॥"[২৯]

দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় ভারতের বিভিন্ন দিক হইতে যে সকল রাজন্য সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব ভাষার পরিবর্তে একমাত্র সংস্কৃতভাষার মধ্য দিয়াই পরস্পর কথোপকথন নির্বাহ করিয়াছিলেন। এখনও পর্যন্ত সেই সংস্কৃতভাষার ক্ষীয়মাণ স্রোতই প্রাদেশিক বিদ্বেষজর্জরিত ভারতভূখণ্ডের বহুধাবিভক্ত অংশকে একটি অখণ্ড সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ইহারই অমৃতস্পর্শে এখনও পর্যন্ত আমাদের চিত্ত হইতে বিদ্বেষবিষ দূরীভূত হইতেছে এবং সর্ববিধ প্রভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আমরা ভারতীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিতেছি। সংস্কৃত কমিশনের সদস্যবৃন্দ সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন—

"This was the greatest discovery of India that the Commission made as it travelled from Kerala to Kashmir and from Kamarupa to Saurashtra: that while the way of life and the social habits and customs which we found among the peoples differed in a number of ways, they all felt as one people and were proud to regard themselves as participants in a common heritage and a common nationality. That heritage emphatically is the heritage of Sanskrit."

---

২৮ দ্র° Report of the Sanskrit Commission, p. 81.

২৯ ১০ম সর্গ, ৩৪ শ্লোক।

কিন্তু আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের নিকট সংস্কৃতভাষা কোনো কালে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণীয় হইবে কি না, সেবিষয়ে মনের মধ্যে কোনোরূপ দুরাশা পোষণ না করাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে। অথচ ইসরায়েলের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও হিব্রু ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

কিন্তু সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হউক বা নাই হউক, সংস্কৃত শিক্ষাকে ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত করা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, আর-এক কারণে। সংস্কৃত কমিশনের সদস্যবৃন্দ যথার্থ ই মন্তব্য করিয়াছেন—

> "Sanskrit may not yield tangible material results, but it does influence, in an intangible manner, the moulding of the character and the personality of a pupil. For Sanskrit does not possess merely an academic or even a purely intellectual interest: *it is a way of life.*"[৩০]

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে এমন-এক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার দ্বারা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইতে পারে।[৩১] কিন্তু তাঁহার সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ ও ইহলোক-সর্বস্ব জীবনদর্শন ভারতীয়গণের চিত্তকেও বিকৃত করিয়াছে। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে এমন-একটি সর্বতোভদ্র আদর্শ মূর্তিমান হইয়াছে, যে আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিলে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পুরুষার্থ ই স্ব-স্ব পরিতৃপ্তির সাধন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য-কারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির যথাযথ অনুশীলনের দ্বারাই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন যে এই চতুর্বিধ বৃত্তিরই উন্মেষসাধনে সহায়তা করে ইহা অভিজ্ঞ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের সুদৃঢ় ধারণা। সংস্কৃত শিক্ষা বিদ্যার্থিগণকে সংসারের অসারতা শিক্ষা দেয়, তাহাদিগকে বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়া তুলে এবং পরিণামে ঐহিক লোকযাত্রা নির্বাহের পক্ষে অযোগ্য করিয়া তুলে— এই ধারণা একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। মনে রাখিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যাঁহারা অলৌকিকত্বসম্পন্ন চরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছেন, যেমন অভিরাম স্বামী, চন্দ্রশেখর, রামানন্দ স্বামী, ভবানী ঠাকুর ইত্যাদি— তাঁহারা সকলেই এই সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শেরই প্রতিনিধি। আধুনিক কালেও আমাদের দেশে যে-সকল যুগনায়ক মহাপুরুষের আবির্ভাবে জাতীয় জাগরণ সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারাও সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শকেই স্ব-স্ব জীবনে বরণ করিয়া ধন্য হইয়া ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ কত নাম করিব? বাংলার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই অগ্নিযুগের কথা মনে পড়ে, যখন বাংলার তরুণবৃন্দ এক হস্তে ভগবদ্গীতা ও অন্য হস্তে আগ্নেয় মারণাস্ত্র ধারণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্যপ্রবণতা হইতেই এই আদর্শনিষ্ঠার উদ্বোধন হইতে পারে— জড়বাদী দার্শনিকতা হইতে জন্ম

---

৩০ তু° 'To love Homer, as Steele said about loving a fair lady of quality, "is itself a liberal education".'—Andrew Lang.

৩১ দ্র° "It is man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want."—Vivekananda: *Madras Address.*

হইতে পারে শুধু ভোগাসক্তির এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির প্রতি সীমাতিশায়ী পক্ষপাতিত্বের। ভোগের সহিত বৈরাগ্যের, প্রেমের সহিত বীর্যের, দেশপ্রেমের সহিত বিশ্বমৈত্রীর, ইহকালের সহিত পরলোকের মৈত্রীবন্ধনের নিগূঢ় রহস্য সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন যেভাবে আমাদিগকে শিখাইতে পারে, পৃথিবীর অল্প সভ্য দেশের সাহিত্যেরই সেই শক্তি আছে। 'কামসূত্রে'র অন্তিম কয়েকটি শ্লোকে মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—

"ধর্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ।
পশ্যত্যেতস্য তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ত্ততে॥
অধিকারবশাদুক্তা যে চিত্রা রাগবর্ধনাঃ।
তদনন্তরমত্রৈব তে যত্নাদ্বিনিবারিতাঃ॥ · ·
তদেতদ্ ব্রহ্মচর্যেণ পরেণ চ সমাধিনা।
বিহিতং লোকযাত্রায়ৈ ন রাগার্থোঽস্য সংবিধিঃ॥
রক্ষন্ ধর্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্ত্তিনীম্।
অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

কামশাস্ত্রও মহর্ষির মতে রাগবর্ধন নহে, ইহা লোকযাত্রার প্রবর্তক। এইভাবে আমাদের শাস্ত্রকারগণ পুরুষার্থসিদ্ধিকেই তাঁহাদের সমগ্র চিন্তার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়াছেন। 'আনন্দমঠে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এক অভিজ্ঞ সমালোচকের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"Knowledge is of two kinds—external and internal. The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared from the country, and with it has vanished the Arya faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge . . . English education will give our men a knowledge of physical science and this will enable them to grapple with the problem of their inner nature."

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য ঔৎসুক্য যেমন আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ বিজ্ঞানের নানাবিধ অভিনব আবিষ্কার বহিঃপ্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার দ্বারও ক্রমশই প্রশস্ত করিয়াছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের মোহময় প্রভাবের দ্বারা আমরা এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, সকল বিশ্বের মূলতত্ত্ব যে আত্মতত্ত্ব, তাহার অনুসন্ধান হইতেই আমরা বিরত হইয়াছি। আমরা প্রেয়ের পথ বাছিয়া লইয়াছি, শ্রেয়ঃ হইতে আজ আমরা পরাঙ্মুখ। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মজ্ঞানের যে-সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা আজও সফল হয় নাই। এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানী মনীষী Jungএর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"All science (*Wissenschaft*) however is a function of the soul, in which all knowledge is rooted. The soul is the greatest of cosmic miracles, it is the

conditio sine qua non of the world as an object. It is exceedingly astonishing that the Western world (apart from very rare exceptions) seems to have so little appreciation of this being so. The flood of external objects of cognizance has made the subject of all cognizance withdraw to the background, often to apparent non-existence."[৩২]

জড়বিজ্ঞানকে বর্জন করিলে চলিবে না, কিন্তু উহার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ না করিতে পারিলে ব্যষ্টিরও কল্যাণ নাই, সমষ্টিরও কল্যাণ নাই। আত্মাই প্রভু, প্রকৃতিই দাস—

"Technical science has its utility in making life easier, in allowing men to enjoy more freely, more fully, the life of the mind; but it does not afford an aim to human life. Mind is the chief and must command. Long years before Christ, Buddha had already announced that Supreme truth:

manopubbangamā dhammā,
manosetthā manomayā."[৩৩]

ভারতের সাহিত্য দর্শন ধর্ম শিল্প—এক কথায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ—যাহার বাহন সংস্কৃত ভাষা, আমাদিগকে সেই শ্রেয়ের পথের ইঙ্গিত দিতেছে। আমরা যেন মোহবশে সে ইঙ্গিত উপেক্ষা না করি।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে য়ুরোপের মানসভূমণ্ডল যখন গাঢ় অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন গ্রীসের সাহিত্য দর্শন ভাষা এমনকি গ্রীক অক্ষর সমূহও য়ুরোপের চিত্তপট হইতে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমাদের দেশেও বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সেইরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সংস্কৃত শিক্ষাকে অবিলম্বেই যদি যথোচিত মর্যাদাসহকারে আমাদের জাতীয় জীবনে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা উদ্যোগী না হই, তবে বিশ্ববাসীকে শুনাইবার মত কোনো বাণীই ভারতবাসীর কণ্ঠ হইতে আর উদ্ঘোষিত হইবে না। বিধাতা যেন ভারতবর্ষের ললাটে সেই দুর্ভাগ্য বিধান না করেন।

---

৩২ C. G. Jung: *Eranos Jahrbuch* (1946) p. 3981 বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্বর্গত অধ্যাপক Erwin Schrödinger প্রণীত *Mind and Matter* গ্রন্থে উদ্ধৃত (Cambridge University Press, 1959, p. 40).

"European science has now attained to such a high pitch of cultivation that it could observe with the utmost accuracy the laws governing modern physics . . . But even this science was as nothing to what the grotesque-looking Yogi studies in his solitude—Nature. His was a grander study than the study of the other intellectual activities put together. To them who could distinguish by their spiritual attainments the real in the midst of the unreal, and life in the midst of death, belonged eternal strength and empire and to none else." —ভগিনী নিবেদিতার একটি ভাষণ হইতে

৩৩ *L'Inde et le Monde* শীর্ষক প্রবন্ধসংকলনের অন্তর্গত আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২২) Eastern Humanism নামক ভাষণ দ্রষ্টব্য।

রাগদর্পণরচয়িতা ফকীরুল্লাহ্

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

১৬৬৩ সাল। ছয় বছর হল ঔরঙ্গজীব সম্রাট হয়েছেন। দ্রুতগতিতে ভারতবর্ষে তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত হচ্ছে, এমন সময় বাদশা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগমুক্তির পর তিনি কাশ্মীরে অবসর-যাপনের পরিকল্পনা করেন। কাশ্মীরে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন যিনি সম্পূর্ণ করলেন তাঁর নাম ফকীরুল্লাহ্ সাইফ্ খাঁ। ফিরবার সময় বাদশা তাঁকে কাশ্মীরের সুবেদার নিযুক্ত করে এসেছিলেন। এই দুর্ধর্ষ আমীরটি কিছুকাল পরে গিলগিট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তিব্বতের দিকে এক অভিযান করেন। গিলগিটকে তিনি বরাবর গুল্গশ্ং (গোলাপ বিস্তীর্ণ পথ) এই নামে অভিহিত করেছেন। বর্শাল্ কাশঘর এবং তশ্কীরও তিনি মুঘলদের দখলে এনেছিলেন বলে দাবী করেন। ১৬৬৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর সম্রাটের কাছে যখন এই খবর পৌঁছলো তখন সাইফ্ খাঁ প্রচুরভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এই সমরনিপুণ যোদ্ধাই ফার্সী ভাষায় ভারতীয় সংগীতের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন— নাম, রাগদর্পণ। যাঁরা সংগীত-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা বহু গ্রন্থে এর উল্লেখ পেয়েছেন। সমগ্র মুসলমান শাসনে এটি একটি উত্তম গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। ঔরঙ্গজীব সংগীতের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালেই দুজন মুসলমান পণ্ডিত দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যার প্রামাণিকতা এবং মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। একটি রাগদর্পণ, অপরটি মীর্জা খাঁ রচিত তুফাতুল্ হিন্দ্। শেষোক্ত গ্রন্থের সংগীত অধ্যায়টি বহু তথ্যে সমৃদ্ধ এবং প্রথম গ্রন্থের অল্পকাল পরেই এটি রচিত হয়। ১০৭৬ হিজরী (১৬৬৬) সালে রাগদর্পণ রচনা সমাপ্ত হয়। ফকীরুল্লাহ্ গ্রন্থশেষে বলছেন— গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হলেও যে পর্যন্ত না মহামহিম আলমগীর আলমবক্শ্ স্বয়ং খুৎবা পড়ে এই গ্রন্থের স্বীকৃতি ঘোষণা করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি যথার্থ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঔরঙ্গজীব এই গ্রন্থটি স্বীকার করেছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ এই সময় থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর আসক্তি কমে আসতে থাকে; অবশেষে ১৬৬৮-১৬৬৯ সালের মধ্যে তিনি দরবারে সংগীত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। প্রধান গায়ক খুশ্হাল্ খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, বাদক-রসবীন এঁদের প্রতি আদেশ হয় যে এঁরা দরবারে আসতে পারেন কিন্তু এঁদের সংগীত বন্ধ থাকবে।

ফকীরুল্লাহ্ যে নিজে গানবাজনা ভালো জানতেন এবং বুঝতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সমরনায়ক ও শাসক। মোগল ইতিহাসে তিনি এই হিসাবেই স্বীকৃত। তাঁর রাগদর্পণ গ্রন্থে কিন্তু তিনি একবারও তাঁর পরিচিত নাম সাইফ খাঁ'র উল্লেখ করেন নি এবং ঔরঙ্গজীবের রাজ্যলাভের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমরকুশলতারও উল্লেখ করেন নি। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তাঁর তিব্বত-অভিযানের বর্ণনা আছে যা একটি বিচ্ছিন্ন সামরিক প্রসঙ্গ। রাগদর্পণ গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে এই বইটি এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার রচনা যিনি বিদ্বান রসিক এবং বিচক্ষণ শাসনকর্তা; ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর যে অন্য একটি সম্বন্ধ ছিল সেটি গ্রন্থকার সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করেছেন।

ফকীরুল্লাহ্র পিতা তর্বিয়ৎ খাঁ তুরান্ থেকে ভারতে এসেছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। শাজাহান তাঁকে তুরানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এঁর

জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জা মুহম্মদ আফজল একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। পত্ররচনায় তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসা অর্জন করেছিল। অপরদিকে তিনি একজন নিপুণ অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ফকীরুল্লাহ্ বিদ্বান বিচক্ষণ এবং সমরকুশল ব্যক্তি ছিলেন। সংগীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর পরিবারে তৎকালীন সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং রণনীতির চর্চা— এই দুটির প্রতিই সমান মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। এর ফলে ফকীরুল্লাহ্‌র মধ্যে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখা যায়। ভয়াবহ রণক্ষেত্রে থেকে তিনি সহসা অবসর গ্রহণ করে সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন। জীবনে কয়েকবারই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করেছেন; আবার কর্মে যোগ দিয়েছেন। ঔরঙ্গজীব তাঁর প্রতি খুব কঠিন নীতি প্রয়োগ করতে পারেন নি। একবার মাত্র বাদ্‌শার বিনানুমতিতে বিহারের কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণের জন্য তাঁকে এক মাস আটক রাখা হয় এবং সে টাকা প্রত্যর্পণ করার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অপর কেউ হলে ঔরঙ্গজীবের মত দুর্ধর্ষ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করতেন না হয়তো বা জীবিতও রাখতেন না। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল। ফকীরুল্লাহ্‌র সহায়তা না পেলে আলমগীর হিন্দুস্তানের তথ্‌ৎ-ই-তাউস্'এ আরোহণ করবার সুযোগ পেতেন কিনা সন্দেহ। একটা প্রবল কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁকে বার বার ফকীরুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কঠোর নীতি প্রয়োগ করতে নিরস্ত করেছে।

রাজা যশোবন্ত সিং যখন প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে ঔরঙ্গজীবকে দমন করবার জন্য মালবে এলেন তখন ফকীরুল্লাহ্‌রও পদোন্নতি ঘটেছে। তিনিও রাজার দলভুক্ত ছিলেন। রাজা প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করেও বিদ্রোহী বাদশাজাদার পথরোধ করতে পারলেন না। তাঁর বাহিনী যখন পলায়নপর তখন কতিপয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভুপক্ষ পরিত্যাগ করে ঔরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করলেন। ফকীরুল্লাহ্ এঁদের মধ্যে একজন। ঔরঙ্গজীব তাঁকে তখনই দেড়-হাজারি নায়কত্ব প্রদান করলেন আর উপাধি প্রদান করলেন— সাইফ্ খাঁ। বাকি জীবনে মুঘল ইতিহাসে তাঁর সম্বন্ধে যখনই উল্লেখ করা হয়েছে তখনই এই নামটি উচ্চারিত হয়েছে। দারার সঙ্গে যুদ্ধেও ফকীরুল্লাহ্ বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁকে দেহরক্ষীবাহিনীর নায়কত্ব প্রদান করা হয়। শুজার সঙ্গে খাজোয়ায় যে যুদ্ধ হয় (১৬৫৯) তাতেও ফকীরুল্লাহ্ অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধেও রাজা যশোবন্ত সিং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্যবাহিনীর পরিচালক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলে তাঁর স্থানে পশ্চাদ্‌বাহিনীর অধ্যক্ষ ইসলাম খাঁকে নিয়ে আসা হল এবং পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করতে নিযুক্ত করা হল ফকীরুল্লাহ্ আর ইক্রম খাঁকে। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে হঠাৎ গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজে ইসলাম খাঁর বিরাট হাতি গেল বিগড়ে এবং সঙ্গেসঙ্গে ছুটে চলল বিপুল বেগে রণক্ষেত্র থেকে। ফলে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল— সৈন্যেরা ছিট্‌কে পড়ল এদিকে ওদিকে। দক্ষিণবাহিনীর গোলন্দাজনায়ক এবং তাঁর পুত্র মারা পড়লেন। রণক্ষেত্রের সেই সংকটময় মুহূর্তে নিশ্চিত পরাজয়কে রোধ করে দাঁড়ালেন ফকীরুল্লাহ্ আর ইক্রম খাঁ সামান্য সৈন্য সম্বল নিয়ে। ফকীরুল্লাহ্ ভয় কাকে বলে জানতেন না, প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে চললেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজীব এসে পড়লেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল। ভাগ্যহীন শুজা নির্মমভাবে নিঃশেষে পরাজিত হলেন। যুদ্ধের পরেই কিন্তু কিছুকালের জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন ফকীরুল্লাহ্; হয়তো বা যে পুরস্কার ঔরঙ্গজীব তাঁকে দিয়েছিলেন তা তাঁর আশানুরূপ হয় নি, অথবা নিছক বিশ্রাম এবং সংগীতালোচনাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কিছুকাল পরে তিনি আবার কাজে যোগ দিলেন। এবার পেলেন আড়াই-হাজারি নায়কত্ব— সঙ্গে দেড় হাজার ঘোড়া।

সেই বছরেই ঔরঙ্গজীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার হত্যাসাধন করেন। এই হত্যাকার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করবার ভার পড়েছিল সাইফ খাঁ ফকীরুল্লাহ্‌র উপর। অবশ্য ঘাতক ছিল অন্য ব্যক্তি, কিন্তু এই ব্যাপারের সর্বময়কর্তা ছিলেন এই একান্ত সংগীতপ্রেমিক সাইফ্ খাঁ ফকীরুল্লাহ্। দারার নিষ্ফল প্রতিরোধের নিরাশ আর্তনাদ আর সুকুমার বালক সিপিহির্ এর কাতর ক্রন্দন সবই এই সুরসাধকের কানে পৌছচ্ছিল কিন্তু তাঁর হৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় নি। পরদিন ফকীরুল্লাহ্ আদেশ অনুযায়ী সিপিহির্‌কে গোয়ালীয়র দুর্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হাতে তুলে দিয়ে কর্তব্যপালন করলেন। এইবার মিলল বড় পুরস্কার— রাজধানী আগ্রার সুবেদারী। এমন ব্যক্তির প্রতি আলমগীর যদি কৃতজ্ঞ না হন তা হলে হবেন কার প্রতি? এমন লোকের সাহায্য নইলে কি রাজনীতি চলে?

কৃতজ্ঞতাবোধ জিনিসটা তখনকার দিনে বাহুল্যই ছিল, কেননা একা ফকীরুল্লাহ্ নন এই রকম বহু ব্যক্তিই ছিলেন যাঁরা সুবিধার জন্য কোনও অপকর্মেই কুণ্ঠিত ছিলেন না। শাজাহানের দরবারে পিতার সঙ্গে নিয়মিত-ভাবে আসতেন ফকীরুল্লাহ্। শাজাহান তাঁকে স্নেহ করতেন। দরা শিকোর মত শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় থাকাও স্বাভাবিক, বিশেষতঃ দারা যখন নিজেও ছিলেন সংগীতানুরাগী। বস্তুতঃ ফকীরুল্লাহ্ শাজাহানের পুত্রদের দীর্ঘকাল থেকে চিনতেন এ অনুমান এতটুকু অসংগত নয়। এই কারণেই তিনি ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন সহজে। যে বাদশার স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বর্ধিত সেই বাদশা যখন আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে অসহায়ভাবে বন্দী তখন সেই মহানগরীর শাসনকর্তা হতে তাঁর এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা হল না। যে দারাকে তিনি দিনের পর দিন মাথা নত করে প্রণতি জানিয়েছেন তার হত্যাকার্য সমাধা করতেও তাঁর এতটুকু করুণার উদ্রেক হল না। একজন সংগীতসেবীর চরিত্রের একটা দিক যে এমন নির্মম হয় ইতিহাসের স্বাক্ষর না থাকলে এটা বিশ্বাস করা কঠিন হত। এই নির্মমতা তাঁর চরিত্রে বরাবরই ছিল। কাশ্মীরের সুবেদার থাকাকালে তিব্বতের দিকে তিনি যে সমরাভিযান করেছিলেন তাতেও তাঁর অত্যাচারের সাক্ষ্য মেলে। রাগদর্পণের শেষ অধ্যায়ে নিরীহ পার্বত্যজাতিদের উপর যে উৎপীড়নের বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাকে বীরত্ব না বলে অত্যাচার বলাই সংগত। অথচ, রাগদর্পণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে শাজাহানের উল্লেখ তিনি যে ভাবে করেছেন তাতে শাজাহানের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। আসলে ঔরঙ্গজীবের আনুগত্য স্বীকার করে তিনি নিজের প্রচুর সুবিধা করে নিয়েছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজীবকে তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। রাগদর্পণে ঔরঙ্গজীবের সম্বন্ধে বহু চাটুবাদ আছে কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হবে ঔরঙ্গজীবের আগের আমলকেই তিনি ভালোবাসতেন বেশি। এই তোষামোদের মূলকারণ যে তাঁর গ্রন্থের স্বীকৃতি এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। বোধ করি অকৃতজ্ঞতার যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন তার ধিক্কার বশতই সৈনিকরূপে পরিচিত হতে তিনি চান নি, তিনি চেয়েছিলেন বিদ্বান হিসাবে তাঁর নাম সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পরিচিত থাকুক।

সাইফ খাঁর সৌভাগ্যে অনেকেরই ঈর্ষা জাগ্রত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রবল হয়ে উঠল। ঔরঙ্গজীব বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। প্রতিকূল অবস্থায় সাইফ খাঁ সির্‌হিন্দে আত্মগোপন করলেন। এই সময় (১৬৬৩) তিনি গোয়ালিয়রের রাজা মানের রচনা মানকুতূহল গ্রন্থের খোঁজ পান এবং তার ফার্সী অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে বাদশা সদয় হলেন। সাইফ খাঁ ফকীরুল্লাহ্ সির্‌হিন্দ্ থেকে দরবারে ফিরে এলেন। এবারে দু-হাজারি নায়কত্ব মিলল, আর মিলল সম্মানিত উপহার একটি

তরবারি। অতঃপর তিনি কাশ্মীরে বাদশাকে সন্তুষ্ট করে সেখানকার স্থবেদারি লাভ করলেন। তিব্বতের কিয়দংশ দখল করবার পর তাঁর পদবৃদ্ধি হল, খেলাৎও মিলল। এর পর কিছুকাল তিনি মুলতানের স্থবেদার ছিলেন, তার পর ১৬৬৯ সালে আবার কাশ্মীরের স্থবেদার নিযুক্ত হন। বছর ছয়েক বাদে ফকীরুল্লাহ্ আবার বাদশার রোষ উদ্দীপ্ত করেন। এই স্বাধীনচেতা সমরনায়ক নতি স্বীকার করতে পারতেন না সহজে। আবার তিনি নায়কত্ব হারালেন এবং অবসরগ্রহণ করলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রায় বরাবরই প্রসন্ন ছিল। বছর খানেক বাদেই আবার তিনি হৃত সম্মান ফিরে পেলেন এবং পুনরায় স্থবেদারিতে নিযুক্ত হলেন। পদগৌরবের লোভে তিনি অনেক বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন, কিন্তু লোভী বলেও তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ ; কারণ যখনই তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে তখনই পদত্যাগ করেছেন এবং নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন। কোনও রাজনৈতিক চক্রান্তে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এমন উল্লেখ নেই। সাধুসন্ত এবং ফকীরদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। এঁদের সাহচর্যেও তিনি কাল কাটাতে ভালোবাসতেন। রাগদর্পণে সাধু ফকীরদের কথা প্রায়ই বলা হয়েছে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে। আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী মানুষ। যা তাঁর কাম্য ছিল তা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না, কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন উদাসীন। এক মুহূর্তে উচ্চপদের বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করতেও তাঁর এতটুকু কষ্ট হত না। ১৬৭২ সালে স্থবেদারি পাবার পর তিনি আবার কর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন ; কিন্তু ১৬৭৫ সালে নির্জনবাস থেকে ফিরে তাঁর উপাধি, খেলাৎ, তরবারি এবং মনসব ফিরে পেয়েছিলেন। ১৬৭৭ সালে তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। কিন্তু ১৬৮৩ সালের ৮ই মার্চ তাঁকে কর্মচ্যুত করা হল এই অভিযোগে যে তিনি সম্রাটের বিনা অনুমতিতে কোষাগার থেকে ছাপান্ন হাজার টাকা বের করে নিয়েছেন। তাঁকে বাহ্রামন্দ খাঁর রক্ষীগৃহে বন্দী করে রাখা হল। ৩রা এপ্রিল সে টাকা প্রত্যর্পণ করবার পর তাঁর মুক্তি মিলল। বিহার থেকে তিনি এলাহাবাদের স্থবেদার নিযুক্ত হন। এলাহাবাদে ২৬শে আগস্ট ১৬৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সির্হিন্দের কাছে যেখানে তিনি থাকতেন সে স্থানের নাম ছিল সাইফাবাদ। সেইখানেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

রাগদর্পণ গ্রন্থখানি নিছক তর্জমা নয়। এতে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যাদি যেমন আছে তেমনি তাঁর সমসাময়িক সাংগীতিক বিবরণও যথেষ্ট আছে। রাগদর্পণ-পাঠে জানা যায় শাজাহানের রাজত্বকাল থেকে উত্তর-ভারতে খেয়ালের প্রচলন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছে ; টপ্পাও (যাকে তিনি "ডপা" বলেছেন) প্রচলিত সংগীত হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং ঠুংরীও ধীরে ধীরে স্থিতিলাভ করছে। কাশ্মীরে প্রচলিত সংগীত প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে বারোঁয়া ধরণের গানকে তখন কেউ কেউ ঠুংরী বলতেন। এখনও বারোঁয়ার ঢঙ প্রধানত ঠুংরীরই অনুরূপ। তিনি নিজে মিশ্ররাগ সৃষ্টি করেছেন। এগুলি হচ্ছে— জয়েৎ-বসন্ত, রাবী-সিন্ধবী, স্থন্দরাবতী এবং আড়ানা-কেদারা। এতদ্ব্যতীত আমীর খুস্রও, স্থলতান হুসেন শর্কী, নায়ক বখ্শু, রাজা মান এবং তানসেনের রচিত রাগগুলির বিস্তারিত উল্লেখ তিনি করেছেন। তাঁর গ্রন্থে চন্দ্রাবতী নামক একজন নর্তকীর উল্লেখ আছে যিনি কয়েকটি রাগের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। অপরাপর ব্যক্তির মধ্যে বেঙ্কটমানী, শেখ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া, শেখ শাহাবুদ্দীন, ওমর সেহর্ওয়ার্দী, স্থলতান বাহাদুর গুজরাটী, কাজী মাহমুদ্ গুজরাতীয়াৎ, খাজা মুহম্মদ সালাহ সল্মিয়া এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রামাণিক গ্রন্থাদির মধ্যে ভরতসংগীত, সংগীতদর্পণ, সংগীতরত্নাকর, নৃত্যনির্ণয়, রাগসাগর, রাগপ্রকাশ, রিশালা-

ই-সইদ্‌মনসুর, কিরাণ উস্ সাদায়িন্, সংগীতবল্লভ, মহরাঞ্জলায়ী (?) এবং এল্‌ম্-ই-মৌশিকী'র নাম পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থের কতখানি মানকুতূহলের তর্জমা এবং কতটা তাঁর নিজের রচনা তা সবসময় যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় না। মূলগ্রন্থ মানকুতূহলের উদ্ধার এবং তার পাঠোদ্ধার না হলে দুটি রচনাকে পৃথক করে দেখা সম্ভব হবে না। রাগদর্পণ দশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়— প্রস্তাবনা; দ্বিতীয় অধ্যয়—রাগসম্বন্ধীয় বিবরণ; তৃতীয় অধ্যায়— ঋতু অনুসারে রাগাদির গায়ন এবং কাল অনুসারে সংগীতপ্রয়োগের আলোচনা; চতুর্থ অধ্যায়— স্বরসমূহের জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিবিধ নিবদ্ধ গীতরূপের বর্ণনা; পঞ্চম অধ্যায়— বাদ্যাদির বিবরণ, নায়ক নায়িকা ও সখী প্রভৃতি আলংকারিক তথ্য; ষষ্ঠ অধ্যায়— গায়কের দোষ; সপ্তম অধ্যায়— কণ্ঠ সম্বন্ধীয় তথ্য; অষ্টম অধ্যায়— গায়কের সাফল্য নির্ধারণ; নবম অধ্যায়— বৃন্দ সম্বন্ধীয় তথ্য; দশম অধ্যায়—জীবিত ও ভূতপূর্ব গায়ক ও বাদকগণের পরিচয়।

দশম অধ্যায়টি বিশেষ চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে এই অধ্যায়ে সর্বসমেত সাতচল্লিশ জন সুরশিল্পীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কবিরায় জগন্নাথ, লাল খাঁ ও তৎপুত্র খুশহাল খাঁ এবং বাদক রসবীনের বিবরণও রয়েছে। জগন্নাথ কবিরায় তানসেনের প্রশংসা অর্জন করছিলেন এবং শাজাহানের আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে জগন্নাথ এবং মুসলমানদের মধ্যে লাল খাঁ গুণসমুদ্র শাজাহানের আমলে শ্রেষ্ঠ গীতশিল্পীর সম্মানলাভ করেছিলেন। লাল খাঁর পুত্র খুশহাল খাঁ ঔরঙ্গজীবের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। ঔরঙ্গজীব গান-বাজনা বুঝতেন এবং গোড়ার দিকে সংগীতচর্চায় বাধাও দেন নি। ১৬৫৯ সালে তাঁর প্রধান অভিষেক উপলক্ষে ওস্তাদদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৬৬৮ সালে তিনি সংগীতচর্চা রহিত করতে মনস্থ করেন। ওই বছরেই অক্টোবর মাসে খুশহাল খাঁ এবং অন্যান্য ওস্তাদগণ তিন হাজার টাকা এবং চল্লিশটি পোশাক খেলাৎ পেয়েছিলেন। ১৬৭১ সালে বিশ্রাম খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ভূপৎ এবং খুশহাল খাঁ সম্মানসূচক পোশাক পেয়েছিলেন। অতএব ১৬৬৬ সালে ফকীরুল্লাহ্ যখন খুশহাল খাঁ সম্পর্কে বলেছিলেন যে সম্রাটের কাছে এঁর আদর দীর্ঘকাল থাকবে তখন তিনি এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। ফকীরুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে যেসমস্ত সন-তারিখ উল্লেখ করেছেন সেগুলি সবই নির্ভরযোগ্য। তাঁর বর্ণনার কোথাও আতিশয্য নেই। যাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যতটুকু বলা দরকার ঠিক ততটুকুই বলেছেন, ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। কাশ্মীরে প্রচলিত সংগীত, আমীর খুসরও এবং সুলতান হুসেন শর্কীর রচনা, কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখ— এগুলি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া এমন কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায় যা আমাদের জানা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ তিরহুতে প্রচলিত রাগগুলির কথা বলা যায়। মানকুতূহল তথা রাগদর্পণ এ কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে বীরারী (বাংলা সাহিত্যে যা বরাড়ী নামে পরিচিত), মারু, ধূল, ধনাশ্রী, গান্ধারী ও পটমঞ্জরী তিরহুত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গুণকেলী বা গোন্দকলী যে গোরখনাথের গাওয়া রাগ এটিও ইতিপূর্বে জানা ছিল না। ধ্রুপদের চতুঃসীমার উল্লেখও তিনি করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় সেকালে ধ্রুপদ আগ্রা গোয়ালীয়র বারী অঞ্চল থেকে উত্তরে মথুরা পর্যন্ত, পূর্ব দিকে এটোয়া পর্যন্ত, দক্ষিণে উঞ্চ্ ও পশ্চিমে বয়ানা ও ভূগাও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খেয়াল যে আকবরের সময় থেকে শ্রীবৃদ্ধি লাভ ক'রে শাজাহানের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাও এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। খেয়ালের সঙ্গে রবাবের সংগত হত এ খবরও লেখক আমাদের জানিয়েছেন।

তৎকালীন সংগীত সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যায়। রাগমিশ্রণ সম্পর্কে তিনি বলছেন যে রাগগুলি পর পর গেয়ে গেলেই তা থেকে একটি নূতন রাগ উদ্ভূত হয় না। রাগসাগর এবং শঙ্কর-রাগ— এই দুইএর পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেছেন। আমরা বর্তমানে যাকে রাগমালা বলি রাগসাগর এই জাতীয় বস্তু। এতে রাগগুলি পর পর গাওয়া হয়ে থাকে। কয়েকটি রাগ মিশ্রিত করে একটি নূতন রাগ গঠন সম্পর্কে গ্রন্থকার বলছেন— যদি কেউ কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি রাগ বাঁধতে চান তাহলে রাগগুলি সেইভাবে একত্র করে প্রদর্শন করা উচিত হবে, যেভাবে কয়েকটি বিভিন্ন তার একত্র করে সেইগুলি থেকে একটি খাঁটি আওয়াজ উৎপন্ন করা হয়। উপাদানভুক্ত রাগগুলির মধ্যে এই মিল না থাকলে সংকীর্ণরাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। মিশ্ররাগের কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে আসবে সে সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, প্রত্যেক রাগে অপর একটি রাগ যোগ করলে আসল রাগটি পাওয়ার সময় প্রথমে আসবে। উদাহরণস্বরূপ পূরিয়াধনাশ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পূরিয়াই হবে প্রধান রাগ, তার পরে আসবে ধনাশ্রী। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে এমন নয়। তিনি বহু রাগের উল্লেখ করেছেন যে ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ললিত-পঞ্চমের উল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে পঞ্চম রাগে ললিত যোগ করে এই রাগটি প্রস্তুত হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীরাগ পঞ্চম এখানে প্রধান হলেও ললিত পূর্বে যুক্ত হয়েছে।

তিনি ঋতু এবং সময় অনুযায়ী গান করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে তাঁর সময়ে এই শাস্ত্রীয় রীতিটি অনুসরণ করা হত না। তাঁর যুগকে তিনি সংগীতের অবনতির যুগ বলেই স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ, তাঁর মতে আকবরের সময় থেকেই সংগীতের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করেছে। তার পূর্বে যখন নায়ক বখ্‌শু, নায়ক ভানু প্রভৃতি নায়কগণ জীবিত ছিলেন তখনই ছিল সংগীতের আদর্শ যুগ। তিনি নির্ভীকভাবে প্রচার করেছেন যে আকবরের সময় তাবৎ গায়ক ছিলেন 'আতায়ী' পর্যায়ের। যাঁরা যেমনটি শেখেন তেমনটি গান করেন, কিন্তু নিজস্ব বিদ্যার উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁদেরই বলে 'আতায়ী'। তানসেন থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব ওস্তাদকেই তিনি এই শ্রেণীর গায়ক বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আকবরের সময়ে রচিত 'রাগসাগর' নামক গ্রন্থ প্রামাণিক নয়। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "এই গ্রন্থটিতে তৎকালীন নায়কগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি লিখিত হয়েছে। মানকুতূহল আর রাগসাগর এর বর্ণনায় বেশ তফাত আছে। কেননা সেই সময়ে (মানকুতূহলের সময়ে) নায়কগণ জীবিত ছিলেন। আকবরের সময় এমন ব্যক্তি খুব কম সংখ্যকই পাওয়া যেত যাঁরা বিদ্যায় রাজা মানের যুগের সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন। এইসব নায়ক তাঁদের জ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার প্রমাণ এই নিবন্ধ (রাগদর্পণ)। অপর পক্ষে আকবরশাহী জমানায় গায়কগণ আকছার আতায়ী হতেন। প্রয়োগের দিক থেকে এঁদের কায়দা ছিল ওস্তাদের মত কিন্তু তা জ্ঞানসমৃদ্ধ নয়।" গ্রন্থকারের এই মতটি খুবই সত্য। আকবর সমর্থিত তানসেনপন্থীরা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তানসেন ভিন্ন অপর রচয়িতাগণের সংগীতের বিলোপ সাধন করেছেন। এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা ফকীরুল্লাহ্‌র মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয় নি। এর ফলে বর্তমান সাংগীতিক ঐতিহ্যে তানসেনের একাধিপত্য বজায় আছে; পূর্ববর্তী মহত্তর শিল্পীরা বিস্মৃতির অন্তরালে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

ফকীরুল্লাহ্‌ কী ভাবে মানকুতূহল'এর তর্জমা করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানান নি। এই কারণে

তাঁকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করতে হয়েছিল সেটা নিশ্চিত— নতুবা এই গ্রন্থের অলংকার অংশটি তিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে রচনা করতে পারতেন না। বহু স্থানে আইন্-ই-আকবরীর ভাষার সঙ্গে রাগদর্পণের ভাষার কোনও তফাত নেই। অথচ, আইন্-ই-আকবরীর উল্লেখ ফকীরুল্লাহ্ একবারও করেন নি। স্বর এবং বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা অধিকাংশই আবুল ফজল-সম্পাদিত আইন্-ই-আকবরী থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয়; তবে তাঁর নিজস্ব যোজনাও আছে, যথা— জলতরঙ্গ, রবাব প্রভৃতির বিস্তারিত উল্লেখ। খেয়ালের সঙ্গে রবাবের সংগত হত সে কথা পূর্বেই বলেছি। চিনেমাটির পাত্রে জল রেখে জলতরঙ্গ বাজাবার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। পারস্যে এই বাজনার প্রচলন ছিল এবং তার নাম যে 'চিনী নওয়াজ' সেটিও তাঁর গ্রন্থ থেকেই জানা যায়।

রাগদর্পণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মুসলমান ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নামের পূর্বে বহু সম্ভ্রান্ত আখ্যা যোগ করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দু নামের পূর্বে এই রকম একটি আখ্যাও যোজিত হয় নি। আবুল ফজলের আইন্-ই-আকবরীতেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে, আবুল ফজল কোনো বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেন নি। ফকীরুল্লাহ্ 'হিন্দু' শব্দের বদলে 'দীন্ বেগানা' এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ যে ধর্ম অপরিচিত বা অস্বীকৃত। কোনও কোনও প্রসঙ্গে হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য সত্য হলেও কটূক্তির পর্যায়ে পড়বে। ইচ্ছা করলে তিনি এইসব ভাষার প্রয়োগ থেকে অনায়াসেই বিরত থাকতে পারতেন। অথচ, যে গ্রন্থটি তিনি অনুবাদের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিলেন সেটি একটি হিন্দু রাজার লেখা এবং এই রাজা মান সম্পর্কে তিনি গভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন। বহু হিন্দু গায়ক এবং বাদক সম্পর্কে তিনি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। যে সংগীতের প্রতি তিনি অনুরক্ত সেটি হিন্দুসংগীত। আলাউদ্দীনের রাজসভায় লাঞ্ছিত নায়ক গোপাল সম্বন্ধেও তাঁর শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ সব সত্ত্বেও তিনি যে স্থানে স্থানে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ উক্তি করেছেন তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, রাগদর্পণ গ্রন্থটি ঔরঙ্গজীবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এইসব উক্তি দ্বারা তিনি তাঁর বাদশাকে খুশি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কিনা সন্দেহ, কেননা এই গ্রন্থটি বাদশার আনুকূল্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নি; তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের স্বীকৃতির ফলেই এটি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। ফকীরুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে এটি জানিয়েছেন যে তাঁর রচনার অনেক নকল তিনি নানা স্থানে দেখেছেন। বস্তুতঃ রাগদর্পণ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তাঁর সংগীতজ্ঞ বন্ধুগণ পাণ্ডুলিপির নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। রাগদর্পণ লেখা শেষ হয় ১৬৬৬ সালে।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও 'রাগদর্পণ'এর মূল্য এবং গৌরব একটুও ম্লান হয় না। গ্রন্থটি সাহিত্য এবং সংগীত উভয় দিক থেকেই সমৃদ্ধ। সর্বোপরি যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমালোচক মন এই গ্রন্থে পাওয়া যায় তা সে যুগের দরবারী স্তুতিপূর্ণ সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই নির্ভীকতা এবং নিষ্ঠার জন্যই ফকীরুল্লাহ্ ভারতীয় সংগীতসাহিত্যে সুযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন।

ইব্‌নে-খল্‌দূন্‌ ও তাঁহার ইতিহাস-দর্শন

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

"মুক্‌দিময়ে-তারীখ্‌" (বা ইতিহাসের ভূমিকা) নামে ইতিহাসতত্ত্বমূলক প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ লিখিয়া ইব্‌নে-খল্‌দূন্‌ বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই "মুক্‌দিমহ্‌" বস্তুতঃ তাঁহার মূল গ্রন্থ "কিতাবুল্‌-'ইবর্‌ ও দীরান্‌ অল্‌-মুব্‌তদহ ও অল্‌-খবর্‌ ফী আয়াম্‌ অল্‌-আরব্‌ ও অল্‌-অজম্‌ ও অল্‌-বর্‌বর্‌ ও অল্‌-মন্‌ আস্বরাহুম্‌ মিন্‌ ধরী অল্‌-স্থল্‌ত্বান্‌ ও অল্‌-আক্‌বর্‌" (বা মহাবীর্যশালী আরব, পারস্য ও বর্বর দেশীয় সম্রাট ও তাঁহাদের সমসাময়িকগণের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত, ইহার সূচনা ও পরিণামের বিবরণ ও ইহার 'ইবর্‌-গ্রন্থ) বা সংক্ষেপে "কিতাবুল্‌-'ইবর্‌"এর ভূমিকা মাত্র। এই বিশাল গ্রন্থ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মুক্‌দিমহ্‌ (বা ভূমিকা), মূলগ্রন্থ কিতাবুল্‌-'ইবর্‌ এবং অল্‌-তারীফ্‌ (বা জীবন-চরিত)। ইহাদের মধ্যে তাঁহার মুক্‌দিমহ্‌-ই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনটি খণ্ডই আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার "অল্‌-তারীফ্‌" বা "অল্‌-তারীফ্‌ বি-ইব্‌নে-খল্‌দূন্‌ ও রিহ্‌লতুহু ঘরবন্‌ ও শরকন্‌" (বা খল্‌দূনের পশ্চিম ও পূর্ব-দেশীয় দেশসমূহে পরিভ্রমণ কাহিনী) আরবী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ আত্মচরিতগ্রন্থ। "কিতাবুল্‌-'ইবর্‌" একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ হইলেও, ইহার প্রকাশভঙ্গি ও বর্ণনামাধুর্যে ইহা একটি সরস সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। আর মুক্‌দিমহ্‌ তো ইতিহাসতত্ত্বমূলক একটি দর্শনশাস্ত্র হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।

তাঁহার আত্মচরিত হইতে ইব্‌নে-খল্‌দূনের জীবনকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণই জানিতে পারি। তিনি ৭৩২ হিজরীর ১লা রমজান (২৭শে মে, ১৩৩২ খৃঃ) তারিখে তিউনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই আন্দুলুসিয়া বা মুসলিম-স্পেনের খল্‌দূন্‌-পরিবার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে তথা হইতে ইব্‌নে-খল্‌দূনের জন্মভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইয়মেন বংশীয় দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত হজরমাউতের আদি-অধিবাসী। কিন্তু এই বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে দেখিতে পাই। কাহারো কাহারো মতে তিনি পারস্য, বর্বর দেশীয় বা আরব-অন্তর্গত একজন মওলহ্‌ (বা ক্রীতদাস) মাত্র। এই স্বীকৃতি রচনাকারের আরবীয়দের প্রতি বৈষম্যভাব ও বর্বর দেশীয় রাজন্যবর্গের চরিত্রপ্রশংসা হইতে কতকটা অনুমিত হয়।

মুসলিম ইতিহাসের প্রথম যুগে খল্‌দূন্‌-পরিবার উম্মীয় বংশীয়দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এবং তাঁহাদের পক্ষ হইয়া এই পরিবার স্পেন আক্রমণে সাহায্য করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মুসলিম-স্পেনের রাজকীয় দলাদলিতে এই পরিবার একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং তাঁহাদের অনেকে রাজ্যশাসনে পদাধিকার লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উমর বিন খল্‌দূন্‌ সেই সময়কার একজন পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ভয়ে এই পরিবার স্পেন হইতে উত্তর-আফ্রিকার তিউনিস শহরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং তথাকার হফ্‌সীয় রাজগণ সাদর অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাদের আশ্রয় দান করিয়া, তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন করেন। বউঝি (Bougie)-র স্বাধীন সম্রাট আবু ইসহাক-এর রাজত্বকালে ইব্‌নে-খল্‌দূনের প্রপিতামহ আবুবকর এবং পিতামহ মুহম্মদ যথাক্রমে রাজমন্ত্রী ও যুবরাজ আবুফারিসের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই এই রাজশক্তির পতন

সূচিত হইলে বিরুদ্ধ শক্তি কর্তৃক আবুবকর নিহত হন ও তাঁহার সকল শক্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইহাতে নিরাশ হইয়া পিতামহ মুহম্মদ নির্জন ধর্মজীবন যাপন করেন এবং তাঁহার পুত্রকেও এইরূপ জীবন গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ক্রমে পিতা-পুত্র উভয়ে তিউনিসের প্রসিদ্ধ সূফী আবু আব্দুল্লা অল্-জুবায়দীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহাদের ধর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

ইব্‌নে-খল্‌দূনের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে না পারিলেও, তিনি যে একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইতেছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। 'সুন্না'-ধর্মনীতি অন্তর্ভুক্ত মালিকিয় শরিয়ৎ বা ধর্মনিষ্ঠা ফখরুদ্দীন রাজীর অনুসরণকারীদের কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া সেইকালে তিউনিসে প্রবর্তিত ছিল। ইব্‌নে-খল্‌দূন্ এই ধর্মনিষ্ঠা ও ইহার দার্শনিক আলাপ-আলোচনায় প্রথম-জীবনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। ক্রমে ইসলাম জগতের বিখ্যাত দার্শনিক তথা ফারাবী, ইব্‌নে-সিনা ও ইব্‌নে-রশ্‌দ্ (বা এবাররস)-এর দার্শনিক ভাবধারা তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। ইব্‌নে-খল্‌দূন্ তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে আবিলিঈ'কে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াও তিনি দরবেশের পোশাকে মুসলিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় জগতই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এবং এই বিশ্বভ্রমণের সুযোগে শিয়া-ধর্মনীতি, সুফীতত্ত্ব ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারায় নিপুণতা লাভ করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আবিলিঈ মরীনিয় শাসক আবুল হসনের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি ইব্‌নে-খল্‌দূনের পিতার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার বাড়িতেই বসবাস করিতে থাকেন। তখন ইব্‌নে-খল্‌দূনের বয়স মাত্র ১৬। কিন্তু শীঘ্রই ভয়াবহ প্লেগে তিউনিসের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার পিতাও আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তী তিন বৎসর আবিলিঈ'র সহিত ইব্‌নে-খল্‌দূন নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে, এই আবিলিঈ-ই সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ শিয়াধর্মীয় দার্শনিক নসীরুদ্দিন তূসীর চিন্তাধারা মুসলিম পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত করেন।

১৩৫২ খৃষ্টাব্দে মরীনিয় সম্রাট আবু 'ইনান কর্তৃক আহূত হইয়া আবিলিঈ ফেজ রাজদরবারে যোগদান করিলে ইব্‌নে-খল্‌দূন্ নিজকে বড় নিঃসহায় ও একাকী মনে করিতে লাগিলেন। সেই কারণে তুনিসিয় সম্রাট তাঁহাকে "কাতিব্ অল্-'অলামহ" বা বিচারাদেশ সম্পাদনার পদ দিতে চাহিলে তিনি ইহা গ্রহণ না করিয়া দেশভ্রমণের অজুহাতে রাজশক্তির উত্থানপতনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ফেজ-সম্রাট কর্তৃক ত্বৌকী (রাজাদেশ)-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে মুস্লিম-স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা এই উভয় দেশই বর্বর উপজাতি এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া নানাপ্রকার রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছিল। সেই কারণে ইব্‌নে-খল্‌দূনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল বড় চাঞ্চল্যকর এবং তখনকার স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ অনেকটা অত্যাচারী দলপতি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এই অবস্থায় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হইতে হইলে ইব্‌নে-খল্‌দূনকে কোনো দলপতির পক্ষ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন হফসিয় যুবরাজ আবু আব্দুল্লার দক্ষিণহস্ত। এই আবু আব্দুল্লা তিউনিস রাজ্যকে আয়ত্তাধীনে আনিতে ফেজ-সম্রাটের ছিলেন পরম সহায়ক। কিন্তু শীঘ্রই সন্দেহক্রমে আবু ইনান উভয়কে কারারুদ্ধ করেন। যুবরাজ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিলেও ইব্‌নে-খল্‌দূন্ প্রায় দুই বৎসর কাল (১৩৫৭-৫৮) কারাজীবন অতিবাহিত করেন। রাজমন্ত্রীর চক্রান্তে আবু ইনান নিহত হইয়া তৎপুত্র সিংহাসন লাভ করিলে ইব্‌নে-খল্‌দূন্

মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ করিয়াই তিনি আবু ইনানের নির্বাসিত পুত্র আবু সালিমকে এই নাবালক রাজার স্থলাভিষিক্ত করিতে সযত্ন হইলেন। আবু সালিমের রাজত্বকালে তিনি রাজাদেশ ও রাজকীয় সকল গোপনতত্ত্বের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক[১] নিযুক্ত হইলেন এবং পরে প্রধান বিচারক পদে[২] উন্নীত হইলেন। কিন্তু রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও কেবল অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার অভাব দৃষ্টে তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ফেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ১৩৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলিম-স্পেন অন্তর্ভুক্ত আন্দুলুসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গ্রণাডা (ঘরনাত্বহ)-সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ (১৩৫৪-১৩৯১) তাঁহাকে পূর্ব-সাহায্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ইব্‌নে-খল্‌দূনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট শীঘ্রই তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া ইব্‌নে-খল্‌দুনের একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সম্রাটের সুদক্ষ কর্মসচিব ইব্‌নুল্‌-খত্বীব ইহার অশুভ পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারিয়া ইব্‌নে-খল্‌দুনকে তথা হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য করিলেন। বস্তুতঃ এই রূপান্তরিত 'দার্শনিক-সম্রাট' ইব্‌নে-খল্‌দুনের 'দুষ্ট' প্রভাবে ও তৎকালীন গোড়া-ধর্ম-পরিবেশে একজন অত্যাচারী শাসকরূপে চিত্রিত হইয়া ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। আর ইব্‌নে-খল্‌দূন তথা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তাঁহার পূর্ব-বন্ধু ইফ্‌সীয় সম্রাট আবু আব্দুল্লার সাদর অভ্যর্থনায় ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজায়া শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও তাঁহার দার্শনিক রাজনীতিতে প্রভাবান্বিত আবু আব্দুল্লা তাঁহার ভ্রাতা আবুল আব্বাসের সহিত পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, আর দার্শনিক প্রবর প্রধানমন্ত্রী ইব্‌নে-খল্‌দুনের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহকে একতাবদ্ধ করিবার দুরাশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

রাজনৈতিক জীবনপাতে বীতশ্রদ্ধ ইব্‌নে-খল্‌দুনকে তাঁহার পরবর্তী জীবনে বস্‌রা ও ফেজ শহরে সুফী-চিন্তাধারা শিক্ষা দিতে দেখিতে পাই। কিন্তু তখনও তিনি রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। অনেক রাজকীয় মর্যাদা তিনি উপেক্ষা করিলেও এই সময়ে তিনি জিয়ানীয় সম্রাট আবু হম্মু ও মরীনিয় শাসক আব্দুল আজীজকে রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তৎকালীন উত্তর-আফ্রিকা ও মুসলিম-স্পেনের রাজ্যসমূহ পারস্পরিক গৃহবিবাদ ও ধর্মানুশাসনের অন্ধ শৃঙ্খলায় একেবারে জর্জরিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইব্‌নে-খল্‌দূনের দার্শনিক উদার রাজনীতি কেমনভাবে কার্যকরী হইতে পারে! রাজনৈতিক জীবনে তিনি সফলকাম হইতে না পারিলেও তাঁহার এই কর্মধারা ও অভিজ্ঞতা তাঁহাকে তাঁহার পরবর্তী জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। তাঁহার এই ৪০ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়-জীবনকে এখন তিনি একান্তভাবে দার্শনিক চিন্তাধারায় নিবিষ্ট করিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রায় ২০ বৎসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়া পণ্ডিত-প্রবর ইব্‌নে-খল্‌দূন তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাস দর্শন লিখিতে উৎসাহিত হন। এবং তাঁহার এই চিন্তাধারার প্রামাণ্যরূপে বিশাল "কিতাব্‌ অল্‌-ইবর" লিখিয়া সমাপ্ত করেন। তিউনিস শহরে তাঁহার এই পরবর্তী সাহিত্য জীবনও তাঁহার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ কর্তৃক সন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইতে থাকে— ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে মুসলিম-স্পেন পরিত্যাগ পূর্বক মিশরে আসিয়া উপস্থিত হন।

১ কাতিব্‌-অল্‌-সির্‌র্‌-বল্‌-তবকী-অল্‌-ইন্‌শা।

২ খুত্তব্‌ অল্‌-মজালিম্‌।

মিশর-রাজধানীর জাঁকজমক ও চাকচিক্য যেমন তাঁহাকে মুগ্ধ করে, তেমনি ইব্‌নে-খল্‌দুন অতি শীঘ্রই কাইরোর বিখ্যাত অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত শিক্ষকরূপে বরেণ্য হইলেন। এবং তাহার কিছুকাল পরেই মিশরের নূতন সম্রাট বরকুকের (১৩৮২-১৩৯৯) সহিত তিনি পরিচিত হইলেন। এখানে আসিয়াই খল্‌দুন সাহিত্যসাধনার চরম সুযোগ গ্রহণ করেন। যদিও কিছুকাল তিনি এখানেও রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়েন; এবং কথিত আছে মালিকীয় বিচারপদ্ধতির প্রধান বিচারকরূপে তিনি ছয় বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইলেও ইতিহাসতত্ত্বের পরিপূর্ণরূপদান এখানে আসিয়াই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। মিশরে প্রায় ২৫ বৎসর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যজীবন যাপন করিয়া তাঁহার অমর ইতিহাস-দর্শন (বা মুকদ্দিমহ) ইতিহাসবিদ দার্শনিকদের দান করিয়া তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব-জীবনের শিক্ষা রাজনীতি সমাজসেবা ধর্মনীতি সাহিত্যসাধনা ও সুফীজীবনের সার্থকতা তাঁহাকে নূতন করিয়া ভাবিবার সুযোগ দেয় এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞানদ্ধ সাহিত্যজীবন তাঁহাকে এই অমরগ্রন্থ লিখিতে সার্থকভাবে সাহায্য করে। বস্তুতঃ উত্তর-আফ্রিকা ও মুসলিম-স্পেনের জীবন তাঁহার নিকট কতকটা নিষ্ফল মনে হইলেও, ইহার চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন তিনি মিশরে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাধক-জীবন দ্বারা।

ইব্‌নে-খল্‌দুনের এই বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ ও ইহার তত্ত্বকথা বস্তুতঃ তাঁহার অভিজ্ঞতার চরম নিদর্শন ও সাহিত্য ধর্ম ও সমাজের পরম অভিব্যক্তি। ইহা ইতিহাস হইয়াও দর্শন; ইহা গদ্য হইয়াও কাব্য। ইহা যেমন তাঁহার একক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশ, তেমনি সমাজ ও সমষ্টি জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনাপূর্ণ প্রকৃষ্ট চিত্রের আদর্শ রূপায়ণ।

কোরান বা মহাভারত যেমন বাহ্যিকভাবে প্রাচীন কাহিনীর সমাবেশ, কিন্তু বস্তুতঃ এইসকল গ্রন্থ আমাদের সমাজের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে এবং সেই আদর্শে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনকে গঠিত করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তেমনি ইব্‌নে-খল্‌দুনের এই সার্থক গ্রন্থ যে কোনো একটি বিশ্বসাহিত্যের ন্যায় একাধারে ইতিহাস সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের একত্র সমাবেশ। সাধারণভাবে খল্‌দুনের মূল গ্রন্থটি ইতিহাস (বা তারীখ) বলিয়া অভিহিত হইলেও, ইহার প্রকৃত নাম "কিতাবল-'ইবর"। 'ইবরের মূল অর্থ টি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে অনুধাবন করিতে পারিব। 'ইবর "ইব্‌রহ" শব্দের বহুবচন। এই ক্রিয়া-বিশেষ্য 'ইব্‌রহ মূল ক্রিয়াধাতু 'ই-ব্-র্ হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ অতিক্রম করা, অনুধাবন করা বা অন্তর্প্রবেশ করা। সাহিত্যে ইহার অর্থ রূপক ব্যাখ্যা ('ইবারহ) বা যাহার সাহায্যে বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে ঘটনা বা বিষয় (খবর) অর্থে ব্যবহৃত হইলেও 'ইব্‌রহ-র মূল অর্থ (ঘটনা হইতে প্রাপ্ত) শিক্ষা বা ইঙ্গিত (যেমন কোরানের আয়াৎ)। বস্তুতঃ ইতিহাসের মূল লক্ষ্যও ঘটনার বিবৃতি নহে— ইহার আলেখ্যে মূল-তত্ত্বের অনুধাবন।

ইব্‌নে-খল্‌দুন তাঁহার ইতিহাসের পাঠকগণকে কেবল ঘটনাসমূহের বিন্যাসদ্বারা তাহা হইতে শিক্ষালাভ করাকেই যথেষ্ট মনে করেন নাই; তিনি এইসকল তথ্য হইতে ইহাদের তুলনামূলক বিচার এবং ইহাদের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া, ইহাদের অন্তর্নিহিত কারণ ও মূলতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ঘটনা সমূহের বহির্বিন্যাস হইতে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সন্ধানের প্রতিই তাঁহার সকল সময় লক্ষ্য। ঘটনাসমূহের বিন্যাসকে সেতুরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি যেন পরপারের আলোর সন্ধান পাইতে ইচ্ছুক—

তাই যেমন তিনি করিয়াছেন পাণ্ডিত্য সহকারে প্রত্যেকটি তথ্যের তত্ত্বালোচনা, তেমনি দার্শনিক দৃষ্টি নিয়া তত্ত্বের উর্ধ্বে ইহার গূঢ় রহস্যটি আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

এই রহস্যের পরিচয় জানিতে হইলে যেমন ইতিহাসপাঠককে হইতে হইবে তত্ত্বানুরাগী (নাক্কিদ্), তেমনি ঐতিহাসিককে হইতে হইবে বিশেষজ্ঞ (ফুহূল্) ও নিষ্ঠাবান সৎচরিত্র (অইম্মহ)। কিন্তু সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ হন কেবল ঘটনাসমূহের বর্ণনাকারী (মুকল্লিদান্) ও তদ্রূপ পাঠকরা হন তথ্যান্বেষী (ইব্‌নে-খল্‌দূনের কথায় বলীদ্ বা মূর্খ)। আমাদের দার্শনিক ইতিহাসকারের নিকট তাঁহাদের কোনো মূল্য নাই। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হিসাবে যে দুইজনের নাম তিনি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতই ঐতিহাসিক হইয়াও দার্শনিক। তাঁহারা তথ্যের মধ্যে তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন হইলেন মসুদী (মৃত্যু ৯৫৭), আর অন্যজন বক্‌রী (মৃত্যু ১০৯৪)। মসুদী তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাস মুরূজল্ জহব (বা স্বর্ণ-প্রান্তর) লিখিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। ইব্‌নে-খল্‌দূন বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রশংসায়ই মুখর। আর বকরী ধন্য হইয়াছেন তাঁহার ভৌগোলিক ইতিহাস অল্ মসালিক্ বল্-মমালিক (বা পথ ও রাজ্য) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া।

ইব্‌নে-খল্‌দূনের মতে ইতিহাস মানবসমাজের ব্যাখ্যান, আর ইহার মধ্যেই রহিয়াছে বিশ্বকৃষ্টির অনুধ্যান। এই বিশ্বকৃষ্টির অনুধ্যানেই তিনি তাঁহার মুকদ্দিমহ-য় বিশেষ করিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এবং এই বিশ্বকৃষ্টি অর্থে মানববিকাশের চরিতার্থতাকেই তিনি রূপদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানব-মনের সহজাত গুণ বা অভ্যাসসমূহ ক্রমে ক্রমে তাহাকে পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত করে। কৃষ্টি (বা 'উম্‌রান্) অর্থে তিনি বুঝিয়াছেন জীবনের প্রসারতা। 'উম্‌রানের ধাতুগত অর্থ লক্ষ্য করিলেও ইহা সহজেই অনুমিত হয়। উমর বাংলায়ও বয়স বা জীবন অর্থে ব্যবহার হয়। এই বয়সের অভিজ্ঞতা বা জীবনের প্রসারতারই অন্য নাম কৃষ্টি বা কার্যপরাম্পরার অনুশীলন বা চর্চা।

ইব্‌নে-খল্‌দূনের মতে যে কোনো মানব ও তাহার সমাজের আলোচনা এই বিশ্বের একজন সভ্য হিসাবেই করিতে হইবে। এই যে "সভ্য-তা"-র বিকাশ—ইহা পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান কাল ও পাত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং এই মানব-সভ্যটিকে কেন্দ্র করিয়াই এই বিশ্বের ইতিহাস ও তাহার সভ্যতা (হজারহ) আমাদের নিকট প্রকাশিত। বস্তুতঃ মানব ও বিশ্ব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। স্থিতিশীল প্রকৃতি-প্রসূত অনুবেদ্য জগৎ ('আলমে-জিস্‌মানে-মহস্‌স) যেমন আমাদের দেহ ও মনকে গঠিত করিতে সাহায্য করে, তেমনি ক্রম-পরিবর্তনশীল জগৎ ('আলমে-তক্‌রীন) আমাদের দেহ ও মনকে ক্রমবিকাশের দিকে ধাবিত করে। এবং এই পরিবর্তনশীলতার আবর্তনেই আমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই স্থিতি ও পরিবর্তনশীলতার সম্মিলনেই মানব আকর্ষিত হয় আত্মবুদ্ধির জগতে ('আলমে-'উকূল)। আত্মচিন্তাশীল মানবই ক্রম-উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইয়া আদর্শ মানব, পয়ঘম্বর বা অবতারে রূপান্তর লাভ করে। মানব-মনের ক্রমবিকাশের সাহায্যের জন্য অবতারগণ তাঁহাদের বাণী-দ্বারা আমাদের সেই আদর্শের পথে উন্নীত হইতে প্ররোচিত করেন।

ইব্‌নে-খল্‌দূন সভ্যতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) প্রাকৃত বা পার্থিব সভ্যতা ('উম্‌রান বদ্‌রী) এবং (২) কৃষ্টিসম্পন্ন সভ্যতা ('উম্‌রান্ হজারহ)। প্রাকৃত সভ্যতা দেহ ও মন সম্বন্ধীয়, আর কৃষ্টিসম্পন্ন সভ্যতা আত্মসম্বন্ধীয় বা অধ্যাত্মিক। কিন্তু ইহারা কোনো বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন নহে—একটি অপরটির পরিপূরক

মাত্র। দেহ ও মনে পরিপুষ্ট গ্রাম্য বা প্রাকৃত সভ্যতা, সুখ সমৃদ্ধি ও আনন্দ ভোগের জন্য ধাবিত হয় কৃষ্টিসম্পন্ন শহুরে সভ্যতার দিকে। ইহা বড় বড় শহর বা রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহাকে শিল্প কলা ও ভাস্কর্যে সমুন্নত করিয়া তুলে। এবং এই প্রেরণার মূলে থাকে ধর্ম। এই ধর্ম বা আন্তরিক ঐশী শক্তির প্রচণ্ড তেজেই স্বার্থশূন্য ব্যাপকতা ও নির্ভরশীল পরমার্থতা গড়িয়া উঠে। আবার, এই সভ্যতাকেই পারস্পরিক মঙ্গল বা শান্তির (মস্বালিহ 'আম্ম) পরিপ্রেক্ষিতে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) প্রাকৃত সভ্যতা (মুল্‌ক্ ত্ববী 'ঈ)—ইহার উদ্দেশ্য কেবল নিজ সমৃদ্ধি সাধন ; (২) বিচার ও বুদ্ধি সঞ্জাত নাগরিক সভ্যতা (সিয়াসহ 'অকলিয়)—ইহার উদ্দেশ্য পরস্পরের সুখসমৃদ্ধির সুবিধার্থে সারা বিশ্বের মঙ্গল সাধন ; এবং (৩) আত্ম বা পরমার্থ সুখ লাভার্থ ধর্মীয় বা আদর্শ সভ্যতা (সিয়াসহ দীনিয়)—ইহার উদ্দেশ্য পরম সন্তোষ ও এই উভয় বিশ্ব বা ইহ ও পর জগতের মঙ্গল সাধন। এবং এই আদর্শ সভ্যতাকে লক্ষ্য করিরা ইব্‌নে-খল্‌দুন লিখিয়াছেন,—"বস্তুতঃ এই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কেবল তাহাদের পার্থিব সত্ত্বা নহে, কারণ ইহা বৃথা ও অসার—মৃত্যু ও বিনাশের মধ্য দিয়াই ইহার সমাপ্তি। এবং আল্লা বলিয়াছেন, 'তোমরা কি মনে কর যে অনর্থক তোমাদের এই সৃষ্টি হইয়াছে (এবং তোমরা আর আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে না ?—কোরান ২৩ ; ১১৬)।' বস্তুতঃ এই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য (ইসলাম-) ধর্ম যাহা পর-জীবনে সুখ ও শান্তি প্রদান করিবে। 'এই ভগবৎ-পথের অন্তর্গত স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই (কোরান ৪২ ; ৫৩)'। এই আদর্শ বিধান সকল মানবকে তাহাদের সর্ববিষয়ে-তাহাদের সংচিন্তা ও কর্মধারায়—এই পথ অনুসরণ করিতে প্ররোচিত করে। এমন কি সমাজ-জীবনের ভিত্তি যে রাষ্ট্র, তাহাও ধর্মের নির্দেশেই প্রবর্তিত—যাহাতে সেই আদর্শ বিধানের অনুশাসনে সকলেই চালিত হইতে পারে।"

এই শেষোক্ত সভ্যতা পরমার্থ বিধায়ক। উন্নত দেহ ও মন যখন তাহার যুক্তি ও চিন্তা দ্বারা সকল নীচ কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠিতে পারে, তখন সে সেই আদর্শ সভ্যতার সন্ধান পায়। একটি অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় সে তখন সেই ভগবৎ-পথে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে স্ব-ইচ্ছায় শান্ত ও সমাহিত চিত্তে চালিত হয়।

মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা করিয়া ইব্‌নে-খল্‌দুন কোরান-প্রদর্শিত আদর্শ সভ্যতা বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম-পথকেই সকলের কাম্য বলিয়া উপস্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং ইহা সকল যুক্তি ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই শ্রেষ্ঠ ধর্মপথ কোনো দেশ বা জাতির নিজস্ব সম্পদ নহে। যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই ইতিহাস, অর্থাৎ যাহা আছে বা ঘটিয়াছে তাহার, পর্যালোচনা করিয়া সেই পরম-পথ বা সত্যের সন্ধান পাইতে পারেন। আধুনিক যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক দার্শনিক অর্নল্ড টয়েনবি ও তাঁহার *Civilization on Trial* নামক গ্রন্থের My view of History (বা ইতিহাসের উদ্দেশ্য) নামক অধ্যায়ে অনেকটা ইব্‌নে-খল্‌দুনের ন্যায়ই বলিতেছেন, "In the vision seen by the Prophets of Israel, Judah, and Iran, history is not a cyclic and not a mechanical process. It is the masterful and progressive execution, on the narrow stage of this world, of a divine plan which is revealed to us in this fragmentary glimpse, but which transcends our human powers of vision and understanding in every dimension". এই গ্রন্থেরই অন্য স্থানে টয়েনবি সাহেব বলিয়াছেন, "In each of these civilizations, mankind, I think, is trying to rise above mere humanity—above primitive humanity, that is,—towards some higher kind of spiritual life."

ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন

শ্রীসুকুমার সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকার বিগত সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৭০) শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশের 'বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০' প্রবন্ধে ছাপা বাংলা রচনায় ইংরেজী (অর্থাৎ রোমান) যতিচিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস উদ্ধারের প্রশংসনীয় চেষ্টা দেখলুম। শিশিরবাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছেন।—

১. 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' রচনার সময়ে গোড়ার দিকে রামরাম বসু "যতিচিহ্ন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কী ব্যবহার করবেন তা বুঝতে পারেন নি। পৃ ৯ থেকে দেখা যায় রামরাম বসুর মন এই নিয়ে আরো চিন্তিত। তিনি এখন মধ্যে মধ্যে অনুচ্ছেদের মধ্যের বাক্যগুলিতে দাঁড়ি ব্যবহার করছেন কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিশেষত ছোট ছোট বাক্যে) আগের মতই জায়গা ফাঁক দিয়েছেন।" পৃ ১৪৩

"রামরাম বসু বাংলা যতিচিহ্নের ক্রমবিকাশে এই বিশিষ্ট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি এক বাক্য-এক দাঁড়ি জাতীয় যতিচিহ্নের নিয়ম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তী আঠার বছর বাংলা গদ্যে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন যতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয় নি।" পৃ ১৪৪

২. "ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষা উভয় ভাষার গঠনগত পার্থক্য যতক্ষণ না স্পষ্ট হচ্ছিল এবং বাংলা বাক্যের গঠনপ্রণালীকে যতদিন না লেখকেরা সুষ্ঠুভাবে জেনেছেন ততদিনই যতিচিহ্ন-ব্যবহার যথার্থভাবে বাংলায় দানা বাঁধতে পারছিল না।" পৃ ১৪৫

৩. "বাংলা যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।" পৃ ১৫১

শিশিরবাবু যেসকল প্রমাণপ্রয়োগ ও যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলির উপযোগিতা ও সংগতি যাচাই করলেই তবে সিদ্ধান্তগুলির প্রামাণিকতা স্বীকৃত হবে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করি যে শিশিরবাবু যেসব প্রমাণ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার কয়েকটি (যেমন দিগ্‌দর্শন ১৮১৮ ও রামমোহন গ্রন্থাবলী) মূল গ্রন্থ (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণ) নয়। আরও লক্ষ্য করি যে উনবিংশ শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যে ছাপা আরও অনেক বিশিষ্ট বই তাঁর দেখা উচিত ছিল। সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে এই উপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি।

এখন শিশিরবাবুর যুক্তি ও প্রমাণ পরখ করি।—

শিশিরবাবু বলেছেন (পৃ ১৪২) "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত বইতে যে ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা উল্লেখ করেন।" এখানে ফুটনোটে এই নির্দেশ আছে, "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১ম সং ১৯৩৭ পৃ ৩৩ [তারিণীচরণ মিত্র অনূদিত ঈশ্‌প্‌স্ ফেবলে প্রথম ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।]" এই নির্দেশ সত্ত্বেও, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শিশিরবাবু তারিণীচরণ মিত্র সম্বন্ধে আমার লেখাটুকু ভালো করে পড়েন নি, মূল বই দেখা তো দূরের কথা। এখানে শিশিরবাবু একটি প্রকাণ্ড ভুল করে বসেছেন। তারিণীচরণের রচনা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল, "উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে" নয়।

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' (১৮০১) বিষয়ে শিশিরবাবুর মন্তব্য আগে উদ্ধৃত করেছি। বইটির গোড়ার দিকে ছেদচিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ি নেই, তার স্থানে ছাপায় ফাঁক আছে লক্ষ্য করে শিশিরবাবু ধরে নিয়েছেন, রামরাম দাঁড়ি দেবেন কিনা চিন্তা করছিলেন।

এখানে ছেদচিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে একটা প্রয়োজনীয় কথা শিশিরবাবু এড়িয়ে গেছেন। তা হল সে সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা গদ্য বইয়ে ছেদচিহ্ন ছিল দুটি মাত্র— দাঁড়ি (।) আর কসি (—)। বাইবেলের অনুবাদে (১৮০০-১৮০১) কসিই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, দাঁড়ি কম।

রামরাম বসুর গ্রন্থেও তাই। তবে যে দাঁড়ির স্থানে যে ফাঁক দেখা যায় তা হরফ কম পড়ায় অনুপস্থিত কসির শূন্যস্থান মনে করতে কিছুমাত্র বাধা নেই। "রামরাম বসু যতিচিহ্ন নিয়ে চিন্তা করছিলেন।" শিশিরবাবুর এ মন্তব্য নিরর্থ ও অহেতুক। রামরাম বসু বইটির শেষের অংশে সর্বত্র যে সাধারণ ছেদচিহ্ন স্থানে দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন তাও নয়। শিশিরবাবু বলেছেন (পৃ ১৪৪), "প্রতাপাদিত্যচরিত্র যতই পড়া যায় ততই দেখা যায় যে গ্রন্থের শেষ দিকে দাঁড়িচিহ্ন বেশি ব্যবহার হচ্ছে। যেমন

> লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা (ভুল)। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।"

উদ্ধৃত অংশটি একটু অবধান সহকারে পড়লেই বোঝা যাবে যে প্রথম দাঁড়িচিহ্ন দুটি বাক্যচ্ছেদ-চিহ্ন নয়। আসলে এ দুটি হল প্যারেন্থেসিস চিহ্নের, ব্র্যাকেটের, স্থলাভিষিক্ত। এখনকার মতো করে ছাপলে উদ্ধৃত অংশটি এইরকম হবে

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী— তিনি অদ্যাপিও আছেন— মহারাজাকে সদয় হইয়া···

অথবা

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী (তিনি অদ্যাপিও আছেন) মহারাজাকে সদয় হইয়া···

অথবা

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী, তিনি অদ্যাপিও আছেন, মহারাজাকে সদয় হইয়া···

একেই কি বলব "এক বাক্য-এক দাঁড়ি জাতীয় যতিচিহ্নের নিয়ম প্রতিষ্ঠা" ?

শিশিরবাবু লিখেছেন, "১৮১৮ খৃ. অব্দে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 'নীতিকথা' নামে একটি বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ছাপা হয়। এই বইতে সর্বপ্রথম ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই বছরেই 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিগ্‌দর্শনেও ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। মিশনারী পত্রিকাগুলিতে দাঁড়ির পরিবর্তে ইংরেজি 'ফুলস্টপ' ব্যবহার করা হয়।" পৃ ১৪৪

আশঙ্কা হচ্ছে শিশিরবাবু 'নীতিকথা' দেখেন নি। 'দিগ্‌দর্শন' সম্ভবত দেখেছেন, তবে প্রথম সংস্করণ নয়। তাঁর উদ্ধৃতিটুকু পরবর্তী (১৮১৯ খৃষ্টাব্দের) সংস্করণ থেকে নেওয়া। এ সংস্করণ স্কুল বুক সোসাইটির ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছাপা হয়েছিল। গোড়ার দিকে স্কুল বুক সোসাইটি মায় ফুলস্টপ রোমান অক্ষরের যতিচিহ্ন প্রায় সবই চালাতেন। নীতিকথায়ও তাই দাঁড়ির স্থানে বিন্দু (স্টপ) ছিল। দিগদর্শনের প্রথম সংস্করণে দাঁড়ি ও কসি ছাড়া কোনো যতিচিহ্ন ছিল না। এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি পরে দ্রষ্টব্য।

তাহলে শিশিরবাবু কোথা থেকে পেলেন যে মিশনারী পত্রিকাগুলিতে "দাঁড়ির পরিবর্তে ইংরেজি ফুলস্টপ" ব্যবহৃত হত ?

তার পরেই শিশিরবাবু রামমোহনের প্রসঙ্গ তুলে কিছু বিভ্রান্তিকর উক্তি করেছেন, "রামমোহন রায় ১৮১৯ খৃ. অব্দে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে ইংরেজি যতিচিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন। অতঃপর রামমোহন তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি অবশ্য মিশনারীদের মত 'ফুলস্টপ'কেও বাংলায় গ্রহণ করেন নি। পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত দাঁড়ি গ্রহণ করেন।" পৃ ১৪৪

রামমোহনের কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ শিশিরবাবু দেখেন নি বলে আমার মনে হচ্ছে (—দেখলে 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী' থেকে নজীর তুলতেন না), সুতরাং রামমোহনের লেখায় যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার রায় সরাসরি মেনে নেওয়া যায় না। (শিশিরবাবুর উক্তিতে অসাবধানতার দোষও রয়েছে। এক পুস্তিকায় "প্রথম ব্যবহার" করে "অতঃপর তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু" করার মানে কী ?) আমার হাতের কাছে রামমোহনের তিন খানি বইয়ের প্রথম সংস্করণ রয়েছে, দুখানি ('ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ও 'গোস্বামীর সহিত-বিচার') ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, একখানি ('প্রত্যুত্তর' অর্থাৎ 'কবিতাকারের সহিত বিচার') ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা। তিনটি বইয়েই উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কোনো বিদেশি যতিচিহ্ন নেই, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা অন্য পুস্তিকাতেও নেই।

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা কখনোই ফুলস্টপকে বাংলায় গ্রহণ করেন নি। কেরীর জীবৎকালে প্রকাশিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদের কোনো সংস্করণেই ফুলস্টপ তো দূরের কথা কমা-সেমিকোলন পর্যন্ত নেই।

ছেদচিহ্নের ব্যবহারে রামমোহন মাঝে মাঝে ভুল করেছেন ভেবে তা দেখাবার জন্যে শিশিরবাবু এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে বলছেন যে কমাচিহ্নটি "যে" পদের পরে দেওয়া উচিত ছিল—

> " 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ?' " পৃ ১৪৫

শিশিরবাবুর ধারণা, এখানে ইংরেজির অনুকরণে কমাচিহ্ন সংযোজক-সর্বনাম পদের পূর্বে বসেছে। তাঁর মতে, এখানে "যতি" পড়ে "যে"র পর। " 'যে' পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অক্ষরের (syllable) চেয়ে উচ্চতর pitchএ উচ্চারিত হয়।" শিশিরবাবু এখানে খুবই ভ্রান্ত। 'যে' পদে যে একটু high pitch অনুভূত হয় তা প্রশ্নাত্মক অথবা বিস্ময়সূচক বাক্যের মধ্যবিরামের (অর্থাৎ clauseএর অবসানের) পরে নতুন বাক্যার্ধ (দ্বিতীয় clause) আরম্ভ হচ্ছে বলেই। সুতরাং এই কারণে কমাচিহ্ন ঠিক জায়গায়ই বসেছে, ব্যাকরণের দিক দিয়ে বটে আর উচ্চারণের দিক দিয়েও বটে। সত্য বটে, এখনকার দিনে এমন বাক্যে আমরা সাধারণত 'যে' পদের পরে কমাচিহ্ন দিতে অভ্যস্ত হয়েছি। তার কারণ হল—আধুনিক বাংলায় একটা 'যে' encliticএর সৃষ্টি হয়েছে, যা অনাধুনিক রচনায় দেখা যায় নি। (যেমন, "এ পথে আমি যে গেছি বার বার, ভুলি নি তো এক দিনও"; তুমি যে বললে আজ সিনেমা যাবে!) উচ্চারণে enclitic স্বভাবতই পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখনকার ভাষারীতিতে relative 'যে' আর enclitic 'যে' ঘুলিয়ে গেছে।

শিশিরবাবু যা "ভুল" বলে মনে করেছেন, সে "ভুল" লক্ষ্য করলে অনেক ছাপা বইয়েই পাবেন। এ ব্যবহার বাংলার রীতি অনুযায়ী, ইংরেজির অনুকরণ নয়।

শিশিরবাবু বলেন, "১৮২৯ পর্যন্ত ইংরেজি যতিচিহ্নের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর খুব বেশি পরিচয় ঘটে নি।"—পৃ ১৪৬। 'সাধারণ বাঙালী' বলতে শিশিরবাবু কি বুঝেছেন জানি না। 'বেশি পরিচয়' বলতেই বা কী? তখনকার দিনে যাঁরা বাংলা বই লিখতেন আর যাঁরা সে বই পড়তেন তাঁরা কি 'সাধারণ বাঙালী' নন? তা যদি হয় তবে সাধারণ বাঙালী বলতে বুঝব নিরক্ষর ও সামান্য লিখতে-পড়তে জানা বাঙালী (যে কালের কথা হচ্ছে সে কালে এমন 'সাধারণ বাঙালী'র ছেদচিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়)। তবে তাঁরা যদি 'সাধারণ বাঙালী' হন তবে অবশ্যই বলতে হবে যে 'ইংরেজি' যতিচিহ্নের সঙ্গে তাঁদের খুবই পরিচয় ছিল। প্রমাণ পরে দ্রষ্টব্য।

শিশিরবাবু বলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাগুলির আগে "কোনো লেখাই উচ্চ স্বরে পড়ার জন্য লেখা হয় নি, দ্বিতীয়ত কোনো বক্তা তাঁর বাংলা বক্তৃতা কাগজে ছাপেন নি।"—পৃ ১৪৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভায় সে বক্তৃতা দিতেন তা তিনি উঁচু গলায় পড়তেন অথবা অপর কেউ উচ্চস্বরে পড়ে দিত এবং চীৎকার করে ('উচ্চস্বরে') পড়বার জন্যেই তা লেখা হয়েছিল এমন প্রায়-রোমহর্ষণ অভিনব আবিষ্কারের সূত্র জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে। দ্বিতীয়ত, "কাগজে ছাপেন নি" বলতে কি শিশিরবাবু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ বুঝেছেন? তা হলে বলব, শিশিরবাবু ভ্রমে পড়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের অনেক আগে থেকেই ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে (অথবা দেবার আগে) তা ছাপানোর রীতি কলকাতায় অজানা ছিল না। আমার হাতের কাছেই একটি পুস্তিকা আছে, তার নাম-পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করছি। এর থেকে সব বোঝা যাবে।

"পরমেশ্বরের/উপাসনা বিষয়ে অঙ্কিত ষোড়শ ব্যাখ্যান/শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক/ব্রাহ্মসমাজ/ কলিকাতা/সোমবার ১ মাঘ/মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে/মুদ্রাঙ্কিত হইল।/শকাব্দা ১৭৬১।"

শিশিরবাবু বলতে চান (পৃ ১৪৭), দেবেন্দ্রনাথের লেখায় যে ভাষণ-কলানৈপুণ্য প্রকটিত তা সুষ্ঠু যতিচিহ্ন অবলম্বনেই। এর উত্তরে দুটি কথা বলব। প্রথমত, "সুষ্ঠু" যতিচিহ্ন প্রয়োগ ইতিপূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় দেখা দিয়েছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ছাপা 'ভূগোল' বইটিতে তার প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ছেদচিহ্নের সুব্যবস্থা যে সম্পাদকের করা নয় তাই বা জোর করে বলি কী করে। 'ভূগোল' বইটির প্রমাণে অক্ষয়কুমারের দাবিই তো অগ্রগণ্য হয়।

বেশি বলার প্রয়োজন নেই। শিশিরবাবু যদি একটি বিশিষ্ট ধারণার (পৃ ১৪৬-১৪৭; প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বশবর্তী না হয়ে অতন্দ্র-বুদ্ধিতে পর্যালোচনা করতেন তা হলে ভুলের উপর ভুল চাপিয়ে যেতেন না, তাঁর গবেষণা ফলবতী হত।

ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে ধারাবাহিক ও তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস অনুসরণ আমার সাধ্যমত করছি।

২

বাংলা ছাপা বই পাই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছাপা যে বই পাওয়া গেছে (এবং অনুরূপ যে-সব বইয়ের সন্ধান মিলেছে) তা বিদেশে (পর্তুগালে) ছাপা, রোমান হরফে। এ

বইয়ে (আস্‌সুম্প্‌সাওঁএর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'এ) রোমান হরফে ছাপা বিদেশি গ্রন্থে অপেক্ষিত যতিচিহ্ন সবই ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ছাপায় রোমান হরফের এবং তদনুযায়ী যতিচিহ্নের ব্যবহার এই-ভাবে প্রথম করেছিলেন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয়পাদে পুথির অক্ষর দেখে বাংলা হরফ সৃষ্টি হল। এ হরফের সঙ্গে যে যতিচিহ্ন তৈরি হল তাও পুথিতে যা পাওয়া যায় তাইই, অর্থাৎ এক দাঁড়ি (।), দু দাঁড়ি (॥), কসি (—) এবং এক বা দু দাঁড়ির মধ্যবর্তী কসি (।—।, ॥—॥) কিংবা বিন্দু (।০।, ॥০॥) কিংবা বৃত্ত চিহ্ন (।০।, ॥০॥)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে দু-একখানি বাংলা বই— আইনের অনুবাদ— ছাপা হয়েছিল তাতে এগুলির বাইরে কোনো যতিচিহ্ন নেই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে আর কলকাতায় বিভিন্ন মুদ্রণযন্ত্র থেকে বাংলায় ছাপা যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা ইস্‌তাহার ইত্যাদি বার হত তাতেও নেই।

রোমান ক্যাথলিকদের প্রবর্তিত, তাহার পর লুপ্ত, রোমান হরফে মুদ্রণ একটু বিশেষ কারণে আবার অবলম্বন করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্তানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্ট। তিনি কলেজের কয়েকজন সহকারী শিক্ষকদের দিয়ে ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্ সংস্কৃত আরবী ফারসী হিন্দুস্তানী ব্রজভাখা ও বাংলা এই ছয়টি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে মূল ইংরেজির সঙ্গে একসঙ্গে *Oriental Fabulist* নামে ছাপিয়েছিলেন (১৮০৩, কলকাতা হরকরা প্রেস)। বইটি প্রস্তুত হয়েছিল কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের ব্যবহারের জন্যে। তাঁরা যাতে পরিচিত রোমান হরফের মধ্য দিয়ে এতগুলি বিজাতীয় ভাষায় প্রবেশ পান তাই ছিল গিল্‌ক্রাইষ্টের উদ্দেশ্য। অন্যথা তাঁকে ইংরেজির জন্য রোমান ছাড়া, অন্তত তিনটি হরফ-ছাঁদ নিতে হত— নাগরী আরবী ও বাংলা। গিল্‌ক্রাইস্টের এই বইয়ে রোমান হরফ-সুলভ যতিচিহ্ন প্রায় সবই আছে। (বাংলা অংশ সম্পূর্ণভাবে তারিণীচরণ মিত্রের অনুবাদ।)

এর পরে রোমান হরফে ছাপা বাংলা বইয়ের মধ্যে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তা হল লণ্ডনে ১৮৩৯ সালে ছাপা বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ। লেখকের নাম নেই। প্রকাশক দি ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি। অনুবাদ চমৎকার, যতিচিহ্নের ব্যবহার অতিশয় "সুষ্ঠু"।

রোমান হরফে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের বাংলা হরফের সঙ্গে ব্যবহার প্রথম কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগেই হয়েছিল (১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)। এঁদের পাঠ্যপুস্তকেই কমা-সেমিকোলনের ব্যবহার বাংলা ছাপায় রীতিমত শুরু হয়। প্রথম প্রথম দাঁড়ির বদলে বিন্দু (fullstop) চলত। কিছুকাল পরে (কত কাল পরে তা বলবার মত উপাদান আমার হাতের কাছে নেই, তবে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই) বিন্দুর ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় এবং দাঁড়ি "সুপ্রতিষ্ঠিত" হয়। তবুও বিন্দুর ব্যবহার, সাধারণ গ্রন্থের থেকেও, একেবারে উঠে যায় নি। গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক ইংরেজি থেকে *Persian Tales* পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন 'পারস্য ইতিহাস' নামে (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত, ১৮৩৪)। এ বইটির গদ্য ভূমিকায় কমা-ফুলস্টপ্ আছে, পদ্য অংশেও আছে এবং গদ্যে পদ্যে কোথাও দাঁড়ি নেই।

রামমোহন রায় শেষের দিকে কমা-সেমিকোলন চালিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে, হাতের কাছে প্রমাণ না থাকায়, আমি কিছু বলতে চাই নে। সন্দেহ করি, তাঁর গ্রন্থাবলী সংকলন ও সম্পাদনকারীরা,

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, কমা-সেমিকোলন দিয়েছিলেন। তবে রামমোহন একটি চিহ্ন চালিয়েছিলেন। সে হল উদ্ধৃতিচিহ্ন। (উদাহরণ পরে দ্রষ্টব্য।) বাংলা ছাপায় কমার ব্যবহার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মোটেই অসুলভ নয়।

এখন ছাপা বই থেকে ধারাবাহিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করছি। আমার বক্তব্য হল এই—

কমা, কোলন, সেমিকোলন— মায় ফুলস্টপ পর্যন্ত বিদেশি ছেদচিহ্নগুলি এ দেশের ভাষার বেলায় প্রথমে রোমান হরফে ছাপায় গৃহীত হয়েছিল। তার পর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি তাঁদের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকে তা চালু করলেন। কিছুদিন পরে ফুলস্টপের স্থানে দাঁড়ি এল। সেই থেকে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৮২০-২২ থেকে, বাংলা হরফে কমা কোলন সেমিকোলন ও দাঁড়ি রীতিমত ছেদ চিহ্নরূপে দেখা দেয়। কলকাতার মিশনারিরা অনেকদিন পর্যন্ত (আমার কাছে যে প্রমাণ আছে তাতে ১৮৫৯ পর্যন্ত) ফুলস্টপ ছাড়েন নি। সাধারণ প্রেসে অন্তত ১৮৩৪ পর্যন্ত ফুলস্টপ বজায় ছিল। ১৮৪২ সালেও ফুলস্টপের দেখা মিলে।

দাঁড়িকে parenthesis চিহ্নরূপে ব্যবহার রামরাম বসুর বইয়ে প্রথম দেখেছি। (আগে দ্রষ্টব্য।) রামমোহন রায়ের কোনো কোনো পুস্তিকাতেও আছে। ব্র্যাকেট চিহ্নরূপে "(" ব্যবহার রামমোহনের পুস্তিকায় ও অন্যত্র আছে। উদ্ধৃতিচিহ্ন (" ") রামমোহনের পুস্তিকায় প্রথম পেয়েছি। জিজ্ঞাসাচিহ্ন চতুর্থ দশকের আগেকার কোনো বইয়ে দেখি নি।

অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্নের ব্যবহার দীর্ঘ বাক্যের syntaxএর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন।

১. ১৭৪৩—'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ (*Crepar xastrer orth, bhed*)

মূল রোমানে

G. Ar quí zanibeq?

X. Muctir mulïier tingun: *Axthā* manité; *Axa* manguité: *Coruné*, carzió punió corité.

G. Zanō ni podar thoná?

X. Hoé, zaní.

G. Cahó, deqhi;

বাংলা হরফে

গু(রু)। আর কি জানিবেক ?

শি(ষ্য)। মুক্তির মূল্যের তিন গুণ : আস্থা মানিতে; আশা মাঙ্গিতে; করুণে, কার্য্য পুণ্য করিতে।

গু(রু)। জানো নি পদার থনা ?

শি(ষ্য)। হয়, জানি।

গু(রু)। কহ, দেখি ;

২. ১৭৯৩। 'ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সপ্তদশ আইন' : (পৃষ্ঠাঙ্ক নেই)

৫ ধারা—

তাবের কটকিনা দারাণ ও তালুকদারাণ ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপন ২ শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ক্রটী নাকরে ও যগ্যপি মাল জামীন দিয়া থাকে ও সেই মাল জামিনেও হাজীর থাকিলে তলব মতে টাকা দিতে যাবৎ আপত্য না করে তাবৎ কটকিনা দারাণ ও গয়রহ বাকী-দার দিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না। আর নাচারীতে বাকীদারের সম্পত্য ক্রোক হইলেও কোনো মতে তাহার মাল জামীন জামীন দায়ী হইতে ছাড়ান পাইবেকনা ইতি—

৩. ১৮০০। 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' : (পৃষ্ঠাঙ্ক নেই)

পর্ব ১ ১৮-২১

যেশু খ্রীষ্টের জন্ম ছিল এমত। তাঁহার মাতা মারিয়া যুসফকে বরণ হইয়া তাহাদের সংসর্গের পূর্ব্বে তিনি গর্ভবতি ছিলেন ধর্ম্মাত্মা হইতে। তাহার স্বামী যুসফ প্রকৃতার্থিক হইয়া এবং তাহাকে অপযসিকরাইতে না চাহিয়া গুপ্তে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে চিন্তা করিতে ২ ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে দেখা দিল তাহাকে এবং বলিল দাউদের সন্তান যুসফরে তোমার জায়া মারিয়াকে গ্রহণ করিতে ভাবনা করিও না একারণ যাহা গর্ব্ভেধারণ করিয়াছে তাহা ধর্ম্মাত্মা সে ও পুত্র প্রসব হইবে এবং তুমি রাখিবা তাহার নাম যেশু একারণ তিনি ত্রাণ করিবেন তাঁহার লোকের দিগকে তাঁহাদের পাপ হইতে—

৪. ১৮০১। গোলোক নাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ' : পৃষ্ঠা ৩৭

গৌড়দেশ কৌশাম্বী নামে এক নগর আছে তাহাতে চন্দন দাস নামে বড় ধনী এক বণিক্ বাস করে। সেই বণিক্ বৃদ্ধাবস্থাতে ধনমত্ততা হেতুক কামপীড়িত হইয়া লীলাবতী নামে বণিক্‌পুত্রীকে বিবাহ করিল। সে লীলাবতী কন্দর্পের জয় পতাকার ন্যায় যৌবনবিশিষ্টা হইল। সে বৃদ্ধ স্বামী তাহার সন্তোষের নিমিত্তে হইল না।

৫. ১৮০৩। *Oriental Fabulist* ('তারিণীচরণ মিত্রের 'অষ্টদশ কথা গ্রহস্থ ও সর্পের') : পৃষ্ঠা ১০৩

মূল রোমানে

Ek bishisto Grohost$_1$h$_1$o odek$_1$hilek je ek *Shorp* ek berar tula$_1$e sheete jo ra ho/i/ya pra/e mrityoo bot ho/i/yach/he, ihate tahar du/ya h o il o ; eb o ng tahake g/hure ani/a, ognir niko t ra/hilek ar t a t ka d oo gd/ho k/hawa/ilek.

বাংলা হরফে

এক বিশিষ্ট গ্রহস্থ ও দেখিলেক যে এক সর্প এক বেড়ার তলায় শীতে জরা হইয়া প্রায় মৃত্যু বৎ হইয়াছে, ইহাতে তাহার দয়া হইল ; এবং তাহাকে ঘরে আনিয়া, অগ্নির নিকট রাখিলেক আর টাটকা দুগ্ধ খাওয়াইলেক।

৬. ১৮১৫। হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' : পৃ ১৩৯

অথ চিত্রবিদ্য কথা।—

পূর্ব্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে দুই সখা ছিল তাহারা নিজগুণ গরিমাতে অতিশয় গর্বিত ছিল। এক সময় দেশান্তর দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে ২ কোশলা নগরীতে উপস্থিত হইল। সেই নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা তিনি যোগিনীমৎ গ্রাম হইতে কোশলা নগরীতে আসিতেছিলেন। মূলদেব সেই পরম সুন্দরী রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া কাম পীড়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল।

৭. ১৮১৭। (মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের) 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' : পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

তবে যে ঈশ্বর সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি প্রলয় সে কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র যেমন পট বিস্তার ও সঙ্কোচেতে তদর্পিত বিচিত্র চিত্রের দর্শনাদর্শন মাত্র তেমনি চেতনেশ্বর শক্তির বিস্তার আর সঙ্কোচেতে এ বিচিত্র জগতের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব সেই সৃষ্টি ও প্রলয় হয় সত্য সংকল্পের মনোরাজ্যরূপ এ জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা হয় না। মায়য়া সর্ব্বদাসর্ব্বংসর্ব্বাবস্থমিদং জগৎ। ইত্যাদি পুমাণতঃ এ-বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের মত। এই সকল শাস্ত্র তাৎপর্য্য না জানিয়া আপাতদর্শিরদের যে স্বকপোলকল্পিত বাঙমাত্র কল্পনা সে কেবল কল্পনামাত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা বালভাষিত জ্ঞান করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইয়া হাস্যকরেন॥ ০॥ (এখানে উদ্ধৃতিচিহ্ন রূপে দাঁড়ির ব্যবহার লক্ষণীয়।)

৮. ১৮১৮ এপ্রিল। 'দিগ্‌দর্শন', প্রথম ভাগ : পৃষ্ঠা ১

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমিরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

৯. ১৮১৯ এপ্রিল। ঐ :

আমেরিকার দর্শনবিষয়ে।

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্তা আছে, ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা, এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে, ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা পরস্পর বিভক্ত নয়, কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে। প্রথম দ্বীপ হইতে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল, এক হাজার চারি শত নিরানব্বই ইংলণ্ডীয় সনে, ও আট শত

আটানব্বই বাঙ্গালা সালে, আমেরিকা প্রথম জানা গেল; তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোক কর্ত্তৃক জানা ছিল না। তাহার প্রথম দর্শনের অল্প বিবরণ এখন লিখি, যে হেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে ২ অদ্ভুত কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এই এক।

১০. ১৮১৮ মে। (রামমোহন রায়ের) "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার": পৃষ্ঠা ৩৪

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা" উত্তর ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং মর্দ্দন ও ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃততে নাই এনিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন-বিষয়ে বৃথা মানিয়া থাকে।

১১. ১৮২০। (রামমোহন রায়ের) 'প্রত্যুত্তর' (হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে ছাপা): পৃষ্ঠা ৩৬

বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধকরিবেকনা যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না॥ কবিতাকার ২১ পৃষ্ঠে লিখেন যে জগন্নাথদেবের রথনাচলিলে তাঁহাকে গালিদিতে পারেন। উত্তর। ইহাতে আমাদের হানি লাভ নাই কবিতাকার আপনাদের ধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন যে তাঁহাদের আত্মার অন্যথা হইলে দেবতারো রক্ষা নাই।

(ডবল দাঁড়িতে অনুচ্ছেদের, অর্থাৎ এক একটি প্রসঙ্গের, সমাপ্তি লক্ষণীয়।)

১২. ১৮২০। (রামকমল সেনের) 'হিতোপদেশ' (শ্রীরামপুরে ছাপা, স্কুল বুক সোসাইটির জন্যে): প্রথম গল্প ("এক ভেক আর বৃষ")

কোন প্রান্তর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শরীর বৃষ চরিতেছিল, সেখানে একটা বৃদ্ধ হিংস্র অতিপ্রবীণ ভেক আসিয়া বৃষের দিকে মুখ বিস্তৃত করিয়া আপন অপত্যেরদিগকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, হেরো দেখ, একটা অসম্ভবাকার সাঁড় চরিতেছে, বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেটমোটা কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ইহা অপেক্ষায় এইক্ষণে দ্বিগুণ হইতে পারি. ইহা কহিয়া ভেক দুই চারিবার লম্ফ দিয়া শ্বাস অবরোধ করিয়া আপন উদর স্ফীত করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকালে উদরের চর্ম্ম ফাটিয়া ভেক মরিয়া গেল.

১৩. ১৮২১। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'ন্যায়দর্শন': পৃষ্ঠা ৪৯

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার হয় সামান্য লক্ষণা জ্ঞান লক্ষণা ও যোগজ। সন্নিকর্ষ শব্দে ব্যাপার। প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ঘটাদি বিশেষ্যক যে ঘটত্বাদি প্রকারক জ্ঞান তাহাতে প্রকারীভূত যে ঘটত্বাদি স্বরূপ সামান্য তাহার নাম সামান্য লক্ষণা, অথচ ঘটত্বাদি রূপে সকল ঘটাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত যৎকিঞ্চিদ্‌ঘটাদি বিশেষ্যক যে ঘটত্বাদি প্রকারক জ্ঞান তাহাতে প্রকারীভূত যে ঘটত্বাদি স্বরূপ সামান্য সেই কারণ হয়, এইরূপ কার্য্য কারণ ভাব।

১৪. ১৮৩২-৩৩। 'ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ' (শ্রীরামপুরে ছাপা): "মঙ্গল সমাচার মতিউরচিত" ১পর্ব্ব ১৮-২১

যিশুখ্রীষ্টের জন্ম এমত ছিল তাঁহার মাতা মারিয়া যুসফকে বাগ্‌দত্তা হইয়া তাহাদের সংসর্গের পুর্বে সে ধর্ম্মাত্মাহইতে গর্ভবতী জানা গেল। তাহার স্বামী যুসফ ধার্ম্মিক মানুষ এবং প্রকাশে তাহাকে অপযশস্বিনী করিতে না চাহিয়া তাহাকে গুপ্তে ত্যাগ করিতে মনে করিল। কিন্তু

এতদ্বিষয়ে চিন্তা করণ কালে দেখ ঈশ্বরের দূত তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিল এবং বলিল হে দাউদের সন্তান যুসফ আপন জায়া মারিয়াকে গ্রহণ করিতে ভীত হইও না কেননা যে তাহার গর্ভে ধৃত আছে সে ধর্ম্মাত্মাহইতে হয়। ও সে পুত্র প্রসব করিবে এবং তাহার নাম তুমি যিশু রাখিবা কেননা তিনি আপন দিগকে তাহারদের পাপহইতে উদ্ধার করিবেন।

১৫. ১৮৩৪। 'পারস্য ইতিহাস': ভূমিকা

এই ইতিহাসের যে সকল গুণ তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিলাম. এই ক্ষণে অস্মদাদিকর্তৃক অনুবাদ বিষয়ে পাঠক বর্গের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি. ভাষান্তরে কোন ভাষার অনুবাদ করাতে প্রতি শব্দের অনুবাদের প্রতি যত্ন করিলে স্বরল না হইয়া কর্কশ হয়, বিশেষতঃ পদ্যছন্দে তাহা করাই দুঃসাধ্য: অতএব আমরা সর্ব্বত্র প্রতিশব্দের অনুবাদ না করিয়া স্থল বিশেষে মূলের স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র গ্রহণ করিয়াছি, এবং কোন ২ স্থলে যাহা পাঠ করাতে মনের সন্তোষ বা কোন উপকার নাই, অথচ পাঠেও পাঠকবর্গের বৈরক্তি জন্মে, এমত সকল স্থানে মূলের কিঞ্চিৎ ২ পরিত্যাগও করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়েরা এসকল বিষয়ে দোষাবলোকন করিবেন না.

১৬. ১৮৩৯। *Dharmapustaker Antabhag. The New Testament* (printed for the British and Foreign Bible Society, London). Vol. I: পৃষ্ঠা ২

রোমান হরফে মূল

Jíshu Khríster Janmer brittánta: Tánhár mátá Mariyam námní Yusapher prati bágdattá haile, táháder sanga haoner párbe ai kanyá Pabitra Átmá haite garbhabatí haila. Iháte táhár swāmí Yusaph sajjan, ei janye tāhār kalanka prakāsh karite anichchhā kanyā tāhāke gopan-rūpe parityāg karite manastha karila. Kintu ei bishay maner madhye bhābite bhātite Parameshwarer dūt swapnajoge tāhāke darshan diyā kahila, O he Daūder santān Yusaph, tumi āpan strí Mariyamke swasthāne ánite bhay kario nā; kenanā tāhā garbhastha je se Pabitra Ātmā haite haiyāchhe: ebong se putrake prasab karibe; ār tumi tānhār nām Jeshu (arthāt Trānkartā) rākhibā; kāran tini āpan lokdigke tāhāder pāphaite trān kariben.

[একসেণ্ট (´) চিহ্ন দীর্ঘত্ব সূচক।]

বাংলা হরফে রূপান্তর

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বৃত্তান্ত: তাঁহার মাতা মরিয়ম নাম্নী কন্যা যুসফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে, তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্বে ঐ কন্যা পবিত্র আত্মা হইতে গর্ভবতী হইল. ইহাতে তাহার স্বামী যুসফ সজ্জন, এই জন্যে তাহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা করিল. কিন্তু এই বিষয় মনের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, ওহে দাউদের সন্তান যুসফ, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে স্বস্থানে আনিতে ভয় করিও না: কেননা তাহার

গর্ভস্থ যে সে পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে: এবং সে পুত্রকে প্রসব করিবে; আর তুমি তাঁহার নাম যীশু (অর্থাৎ ত্রাণকর্তা) রাখিবা; কারণ তিনি আপন লোকদিগ্‌কে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

১৭. ১৮৪০। (রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের) 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে অঙ্কিত ষোড়শ ব্যাখ্যান' ("ব্রাহ্ম্য সমাজ কলিকাতা সোমবার ১ মাঘ"): পৃষ্ঠা ১

এই উক্ত শ্রুতি, স্মৃতিতে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে পরমেশ্বরের উপাসনাতে অন্য ২ উপাসনার ন্যায় বহির্ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই কেবল ইন্দ্রিয় দমন, ও অন্তঃকরণের সংযম, পরমেশ্বর প্রতি-পাদক শাস্ত্রের শ্রবণ মনন, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শুচিতা, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, অস্পৃহা, এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়।

১৮. ১৮৪০। (গোবিন্দচন্দ্র সেনের) 'বাঙ্গালার ইতিহাস': আরম্ভ ও প্রথম অনুচ্ছেদ

শ্রীগুরুঃ। / শরণং। / বাঙ্গালা ইতিহাস॥ / প্রথম পরিচ্ছেদ। / হিন্দু রাজ্য। /

ভারতবর্ষের যে প্রদেশ বাঙ্গালাভাষা লিখনে ও কথনে চলিত আছে তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলা যায়, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র উত্তরে এবং পূর্ব্বে অনেক পর্ব্বত ও বন আছে, আর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্ম বহিষ্কৃত অনেক বন্য ও পর্ব্বতীয় জাতিরা বাস করিতেছে ইহাতে প্রায় তিন কোটি মনুষ্য আছে।

১৯. ১৮৪০। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ("প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি। হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত"): পৃষ্ঠা ১৮

গৌড়ীয় সাধুভাষাতে স্ত্রীলিঙ্গ বোধের নিমিত্তে সাধারণ কোন প্রত্যয় নাই, সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণ ও বিশেষ্য শব্দের পরে কখন 'আ' কদাচিৎ 'ঈ' আনী— ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ দ্বারা তদ্বোধ হয়।

২০. ১৮৪১। (অক্ষয়কুমার দত্তের) 'ভূগোল' ("তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মুদ্রাঙ্কিত"): ভূমিকা

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষভাবেই সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকারে কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।

২১. ১৮৪২। (গোবিন্দচন্দ্র সেনের) 'ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস' (Selections of Discourses read at the Meetings of the Society for the Aquisition of General Knowledge, Vol. II. Calcutta Bishop's College Press): পৃ ১০

এতৎ কালে ফিরিঙ্গি নামে বিখ্যাত পরটিউগেল দেশ নিবাসী মনুষ্যেরা গুড়্‌হোপ অর্থাৎ উত্তমাশা নামক অন্তরীপ দ্বারা ভারতবর্ষে আগমনের জলপথ প্রাপ্ত হইয়া মেলেবর প্রদেশে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সেই মেলেবর দেশে এক রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, যে রাজ্য কালক্রমে নানা দিগ্‌দেশ সহযোগে অতিদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত হইল.

২২. ১৮৪৬। (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের) 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' তৃতীয় কাণ্ড প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ : পৃষ্ঠা ২১

দুর্য্যোধনের দলস্থ একজন বীরের নাম অশ্বত্থামা, ইনি পাণ্ডবদের গুরুপুত্র, দুর্য্যোধন যুদ্ধে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলে ও তাহার দল পরাস্ত প্রায় হইলে তাহার সন্তোষের নিমিত্তে অশ্বত্থামা গোপনে পাণ্ডবের শিবিরে গমন করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রকে নিদ্রাবস্থাতে দেখিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদন করেন, তাহাতে দ্রৌপদী নিজ পুত্রের বিলাপ দেখিয়া ঘোরতর শোকে ব্যাকুল হওত, পূর্ণনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সেই ক্রন্দনের শব্দে অর্জ্জুন শিশুহত্যার সংবাদ পাইয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করত তাহার সান্ত্বনার্থে জলন্ত ক্রোধে কহিলেন "হে প্রিয়ে আমি অদ্যই ঐ নরাধম শিশুহন্তার মস্তক ছেদ করিয়া তোমার পদতলস্থ করিব," এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন,...তথাপি প্রাণভয়ে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সে বজ্রস্বরূপ অস্ত্রে অর্জুনের কোন না হওয়াতে অশ্বত্থামা শীঘ্র শক্রহস্তে পড়িলেন।

২৩. ১৮৪৯। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের) 'জীবন চরিত' ("সরউইলিয়ম জোন্স") : প্রথম অনুচ্ছেদ

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০এ সেপ্‌টেম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী অসামান্য গুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্স অতি শৈশব কালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও গাঢ়তর বিদ্যানুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা বিদিত আছে, যে তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যদি কোন বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন পড়িলেই জানিতে পারিবে। এইরূপে পুস্তক পাঠ বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে; এবং তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সাধুভাষায় কমনীয় রচনার কোনো আদর্শ না থাকায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে সাধুভাষায় দীর্ঘ বাক্যের syntax ঠিক হয় নি। সে আদর্শ, সাক্ষাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য আর পরোক্ষ সাধারণ লেখকদের জন্য, মুখ্যত বিদ্যাসাগর এবং গৌণত অক্ষয়কুমার দত্ত ধরে দিয়েছিলেন। (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো লেখক ছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি, আর কৃষ্ণমোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বহুপ্রচারিত ছিল না)। বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্ন ব্যবহার syntax অনুযায়ী বিশ্লেষণ এমনভাবে করেছেন, যাতে মূল ক্রিয়ায় বা কর্তার সঙ্গে দূরান্বিত পদের সম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। এবং এই কারণেই তিনি নীচু ক্লাসের পাঠ্যগুলিতে অজস্রভাবে কমা-সেমিকোলন ব্যবহার করেছিলেন। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমটি, পণ্ডিত শিক্ষকদের জন্যে লেখা, দ্বিতীয়টি নীচু ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্যে।

১৮৫১। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'র 'বিজ্ঞাপন' হইতে :

অতএব, প্রথমেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই একবারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য, পড়িতে আরম্ভ করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বোধ না হওয়াতে, শিক্ষাসমাজের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ছাত্রেরা, প্রথমতঃ, অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঠ করিবেক ; তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক।

১৮৫৬। 'কথামালা': 'বাঘ ও বক'

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই কহে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং, চিরকালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্তু সম্মত হইল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থের দ্বারা রোমান ছেদচিহ্নের ব্যবহার পাকাপোক্ত করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে বহুকাল যাবৎ কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যক্রমনির্ধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিষয়ের পাঠ্যনির্বাচন ও পাঠ্যসম্পাদন ইনিই করতেন। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৮৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠ্য সংস্করণ প্রবোধচন্দ্রিকার পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে আমার উক্তির প্রমাণ দিই।—

শ্রীরামপুর প্রেস দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৫	কলিকাতা ইউনিবর্সিটী ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন প্রেস ১৮৬২
তিনি একদা সর্ব্ববিষয় ভাজন সভ্যজনমধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দধীচির অস্থি বজ্রসারময় ছিল এবং কর্ণের চর্ম্ম অভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় ছিল তাঁহারাও এ ভূতলে বহুকাল রহেন নাই সম্প্রতি তাঁহাদের সে শরীরও নাই ও সে বিভবও নাই ও সে রাজ্যাধিকারো নাই কিন্তু ঐ দধীচির স্বমরণ স্বীকার পূর্ব্বক যে বজ্র নির্ম্মাণার্থে অস্থি দান জনিত কীর্ত্তিমাত্র ও কর্ণের যে অক্ষয় কবচ মাহাত্ম্য চর্ম্ম বর্ম্মের ন্যায় ছিল সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু স্বীকারে যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে।	তিনি একদা সর্ব্ব বিষয় সভ্যজনমধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে দধীচির অস্থি বজ্রসারময় ছিল এবং কর্ণের চর্ম্ম অভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় ছিল; তাঁহারাও এভূতলে বহুকাল রহেন নাই, সম্প্রতি তাঁহাদের সে শরীরও নাই, ও সে বিভবও নাই, ও সে রাজ্যাধিকারো নাই; কিন্তু ঐ দধীচির স্বমরণ স্বীকার পূর্ব্বক বজ্র নির্ম্মাণার্থ অস্থি দান জনিত কীর্ত্তিমাত্র, ও কর্ণের যে অক্ষয় কবচ মাহাত্ম্যে চর্ম্ম বর্ম্মের ন্যায় ছিল, সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু স্বীকারে যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে।

ভারতবর্ষীয় সভা জাতীয়তাবোধের উন্মেষে · ১৮৬২-১৮৬৬

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠাবধি ভারত-শাসনে স্বাধিকার লাভের নিমিত্ত কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তবে তাহা ছিল ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করিয়া। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। সভার অবলম্বিত রীতিপদ্ধতি ছিল এই আদর্শের অনুসারী এবং আন্দোলনাদিও পরিচালিত হইত এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া। সিপাহী-যুদ্ধের পর শাসকজাতি অতি দ্রুত ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। এই নিমিত্ত তাঁহারা যেসব পন্থা অবলম্বন করেন তাহা ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময় হইতে ভারতীয়দের যথার্থ উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাইতে থাকে। ভারতবর্ষীয় সভা তখন ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতের একমাত্র জাতীয় সভা। শুধু বঙ্গদেশের কেন, অন্যান্য প্রদেশের পক্ষেও শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের সমুচিত সমালোচনা করিয়া যথাযথ উপায় অবলম্বনের সন্ধান দেন। বর্তমান আলোচনায় ইহা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

পূর্ববৎসর, ১৮৬১ সনের শেষার্ধে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেন্টে যে তিনটি আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। প্রথমটি— ব্যবস্থা পরিষদ— সম্পর্কে এইরূপ উদ্যোগ দেখি। বড়লাটের শাসন-পরিষদ বড়লাট স্বয়ং ও জঙ্গীলাট সহ সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে থাকিবেন এই সাত জন সদস্য এবং ছয় হইতে বার জন পর্যন্ত মনোনীত সদস্য। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই প্রথম তিন জন ভারতীয় গৃহীত হইলেন যথা— পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী-নরেশ এবং গোয়ালিয়রের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সার্ দিনকর রাও। এই নূতন পরিষদে কোনো জন-প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা দুঃখ প্রকাশ করেন। উক্ত আইনের দ্বিতীয় দফায় বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা পুনঃ প্রবর্তিত হইল। ১৮৩৩ সনের সনন্দে এই দুইটি স্থলের সভা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকটিতে থাকিবেন গবর্নর, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং চার হইতে আট জন পর্যন্ত অতিরিক্ত (বা মনোনীত) সদস্য। উভয় আইন-সভাকেই স্থানীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল। ইহারই মধ্যে পাই 'প্রভিন্সিয়াল অটোনমি' বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের সূচনা। বাংলা দেশেও এবারে সর্বপ্রথম আইন-সভা স্থাপনের আয়োজন হইল। বড়লাটের নির্দেশে ১৮ই জানুয়ারি ১৮৬২ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়— ছোটলাট ও বার জন সদস্য লইয়া। বার জনের মধ্যে থাকিবেন অন্যূন এক তৃতীয়াংশ বেসরকারী মনোনীত সদস্য। আইন সভাগুলি অবিলম্বে প্রবর্তিত হইল। বাংলা দেশে ইহার কার্য শুরু হয় ১ ফেব্রুয়ারি (১৮৬২) হইতে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী চারিজন সদস্য মনোনীত হন যথাক্রমে রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবী আবদুল লতিফ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১ আগস্ট ১৮৬২ তারিখে রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে সদস্য মনোনীত হইলেন রামগোপাল ঘোষ। চারি জনের মধ্যে তিন জন সদস্যই ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এ কারণ সভা-কর্তৃপক্ষ স্বতঃই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় কি প্রাদেশিক উভয় পরিষদেই মনোনীত সদস্যদের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আইন-সভায় উত্থাপিত বিষয়সমূহের আলোচনা বাতিরেকে তাঁহারা কোনোরূপ অভিযোগ বা

প্রশ্ন করিবার অধিকার পাইলেন না। এবারে কিন্তু সংবাদপত্র এবং সাধারণের নিকট আইন-সভার দ্বার উন্মুক্ত হইল। অতঃপর সভার কার্যবিবরণ নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখি। ভারতবর্ষীয় সভা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিনিধিমূলক আইন-সভা গঠনের সপক্ষে যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন এইরূপে তাহার প্রথম ধাপ স্থিরীকৃত হইল।

সভা কর্তৃক পরিচালিত আর-দুইটি আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে হাইকোর্ট আইন এবং সিবিল সার্ভিস আইনের মধ্যে। বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া এক-একটি হাইকোর্ট গঠিত হইল। প্রত্যেকটিতে থাকিবেন সর্বসাকুল্যে পনর জন বিচারপতি। বিচারকদের এক-তৃতীয়াংশ ব্যারিস্টার, এক-তৃতীয়াংশ সিবিল সার্ভিস কর্মী আর বাকি তৃতীয়াংশ গৃহীত হইবেন অন্যূন দশ বৎসরের আইন-ব্যবসায়ী এবং আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মী হইতে। প্রত্যেকটি প্রদেশে ১লা জুলাই ১৮৬২ তারিখ হইতে নবগঠিত হাইকোর্টের কার্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হন রমাপ্রসাদ রায়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিচার-আসনে বসিবার প্রথম সম্মানলাভ করিলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবী শম্ভুনাথ পণ্ডিত। শম্ভুনাথ ভারতবর্ষীয় সভারও একজন প্রধান সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনজন সদস্য এবং এই প্রথম বিচারপতি ভারতবর্ষীয় সভারই সদস্য।

প্রতিটি হাইকোর্টের এলাকা স্থির করার ভার প্রাপ্ত হইলেন বড়লাট স্বয়ং। পরে করদ রাজ্যগুলির খ্রীষ্টানদের বিচার-ক্ষমতাও তিনি হাইকোর্টগুলির উপর অর্পণ করেন।

তৃতীয়, অর্থাৎ সিবিল সার্ভিস-আইন সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত আদৌ গ্রাহ্য হয় নাই। এবারেও স্থির হইল একমাত্র লণ্ডনেই সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হইবে, বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলিকাতায় হইবে না। সভা এই জন্য বিশেষ ব্যথিত হন; ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে এই ধরণের ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে কিরূপ কার্য করিয়াছিল তাহা আমরা কমবেশি অনেকেই অবগত আছি।

হাইকোর্ট প্রসঙ্গে এখানে আর-একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহার জন্য ভারতবর্ষীয় সভা দীর্ঘকাল আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। মফস্বলের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারক্ষমতা ছিল শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের। আবার এইসকল বিচারে জুরি নিযুক্ত হইতেন শুধু ইউরোপীয়েরা। এ হেতু বিচারের নামে অবিচার ও অনাচার হইত সবচেয়ে বেশি। ১৮৬৫ সনে হাইকোর্ট সম্পর্কিত নূতন আইনে এই জুরি (Petty Jury) ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। মফস্বলস্থ ইউরোপীয় অপরাধীদের সরাসরি বিচারের নিমিত্ত এই বৎসর হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য হইতে ভ্রাম্যমাণ বিচারক নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা আবশ্যক-মত নানা স্থানে ঘুরিয়া এই শ্রেণীর অপরাধীদের বিচার করিতেন। বিচার-বৈষম্য দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সভার আন্দোলন সুবিদিত। এই প্রকার ব্যবস্থায় মূল বৈষম্য বিদূরিত হইল না বটে কিন্তু ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার সম্পর্কে খানিকটা ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া সভা কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হন।

নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে ভারতীয় সদস্য গৃহীত হইলেও তাঁহাদের অধিকার নিতান্তই সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষীয় সভা এ ব্যবস্থায় যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা পৌরসভার মাধ্যমে যাহাতে স্বদেশবাসীদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হয় সেই দিকেই বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া

পড়িলেন। কলিকাতা পৌরসভা-কমিশনের স্বায়ত্তশাসন মূলক নির্দেশাবলীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। ১৮৬৩ সনের প্রথম দিকে এই নিমিত্ত একটি আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ হইল। ইহা ১৮৬৩ সনের ষষ্ঠ আইন নামে পরিচিত। পৌরসভায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার সূচনা এই আইনটির মধ্যে নিহিত। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে (বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম) ১২৯ জন "জাস্টিস অব দি পিস" ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পঁচিশ জন থাকিতেন কলিকাতায়। তাঁহারা সকলেই পৌরসভায় যোগদানের অধিকারী। কার্য সুচারুরূপে নির্বাহের নিমিত্ত ছোটলাট আরও পাঁচ জন জাস্টিস মনোনীত করিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে— মৌলবী আবদুল লতিফ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র ও প্যারীচাঁদ মিত্র। নীতিনির্ধারণ, করস্থাপন, অর্থবণ্টন, প্রভৃতি যাবতীয় ভার পৌরসভার উপর অর্পিত হইল। পৌরসভার সদস্যসংখ্যার আধিক্য হেতু কার্য বিলম্বিত হইতেছিল, এ জন্য ছোটলাটের নির্দেশবলে এই আইন সংশোধনান্তর স্থির হয় যে, ছোটলাটের মনোনীত জাস্টিসরাই পৌরসভার সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাবে ভারতীয় জাস্টিসদেরই অধিক সংখ্যায় পৌরসভার সদস্য মনোনীত করিলেন। ১৮৬৬ সনের আইন বলে পুলিশ কমিশনার পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সভাপতি হইবার অধিকারী হন। এই সময় হইতে বিভিন্ন দিকে কলিকাতা পৌরসভা শহরের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে মনযোগী হইলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের দ্বিতীয় ধাপ— মফস্বলের নির্দিষ্ট শহর ও পল্লী অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা স্থাপন। ভারতবর্ষীয় সভা এ বিষয়েও বরাবর অবহিত ছিলেন। ১৮৬৪ সনের তিন আইন দ্বারা স্থির হইল যে, কোনো কোনো শহরে ও পল্লীতে পৌরসভা স্থাপিত হইতে পারিবে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে থাকিবেন সাত জন মনোনীত দেশীয় সদস্য এবং পদাধিকার বলে সদস্য— কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-অধিকর্তা এবং এঞ্জিনিয়ার। ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন সভাপতি। পৌরসভার উপরে নির্দিষ্ট এলাকার যাবতীয় উন্নতির ভার অর্পিত হইল। এই হেতু সভা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতির উপর কর ধার্য করিতে পারিবেন। এবং উন্নয়নকার্যের নিমিত্ত ঋণগ্রহণেরও অধিকার থাকিবে। ভারতবর্ষীয় সভা স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক স্তর হিসাবে এই ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও ইহার কোনো কোনো মৌলিক ত্রুটির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কোনো এলাকায় পাঁচ শতের কম বাড়ি থাকিলে সেখানে পৌরসভা গঠন করা সমীচীন হইবে না। এই মর্মে আইন সংশোধিত হইল না বটে তবে কর্তৃপক্ষ পৌরসভা-স্থাপনকালে এ বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কার্যতঃও তাঁহারা পরে ইহা মানিয়া চলেন।

স্বীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষীয় সভা জনহিতকর বিবিধ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিতে থাকেন। ষষ্ঠ দশকের গোড়াতেই জ্বর-রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় নদীয়া হুগলী ও বারাসত অঞ্চলে। ভারতবর্ষীয় সভা প্রথমাবধি জ্বর-রোগের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যকল্পে বিভিন্ন স্থলে অর্থসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সভার প্রস্তাবে বাংলা সরকার উক্ত অঞ্চলসমূহের আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাঠাইলেন। তাঁহারা এ উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করিয়াও সরকারের হাতে দেন। তাঁহাদের নির্বন্ধাতিশয্যে সরকার একটি অনুসন্ধান-কমিশন গঠন করিলেন, ইহার নাম হয় 'ফিভার কমিশন'। সভার পক্ষে এই কমিশনে

প্রতিনিধিত্ব করেন দিগম্বর মিত্র। আক্রান্ত অঞ্চলসমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কমিশন জ্বর-রোগের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রেলপথ এবং সদর রাস্তা নির্মাণকালে জল নিষ্কাশণের ছোট বড় খালগুলি বহুস্থলে রুদ্ধ করা হইয়াছে, এই জন্য জল জমিয়া জমিয়া 'মায়াজ্‌ম'-এর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জল জমিবার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় জিনিস পচিতে থাকে এবং ইহা হইতে এক রকম দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প উঠে। শ্বাসপ্রশ্বাসে এই বাষ্প গ্রহণ করায় এবং বদ্ধ খাল-বিলের জল পান করিতে বাধ্য হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে জ্বর-রোগ মহামারী রূপে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্র নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এইসকল বিষয়ে কমিশনের সদস্যগণকে অবগত করান। ভারতবর্ষীয় সভা জ্বর-রোগের যেসব কারণ নির্দেশ করেন তাহার ভিত্তিতেই কমিশনের রিপোর্ট রচিত হয়। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কোনো কোনো স্থলে কার্যও আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা আর-একটি বিষয়েও এই সময় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন। ছোটলাট সার্ সিসিল বিডন সরকারী উদ্যোগে একটি কৃষিপ্রদর্শনীর প্রস্তাব করিয়া সভার সাহায্য যাজ্ঞা করেন— ১৮৬৩, ১১ই নবেম্বরের একখানি পত্রে। সভা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ২০শে নবেম্বর এই নিমিত্ত একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া ছোটলাটের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন এবং সর্বপ্রকারে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষিপ্রদর্শনীতে যেসব গবাদি পশু, কৃষিযন্ত্রপাতি এবং কৃষিজাত দ্রব্য আসিবে তাহার উৎকর্ষ বিচারে পারিতোষিক প্রদানের নিমিত্ত সরকারের হাতে পাঁচ শত টাকা দিতে সভাকর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হন। মফস্বলের জমিদার ও প্রজাবর্গের নিকট প্রদর্শনীর মহৎ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণের জন্য দেশীয় ভাষায় ইস্তাহারও তাহারা শীঘ্র জারি করিলেন। ১৮৬৪ সনের ১৮ই জানুয়ারি হইতে পক্ষকালের জন্য কলিকাতার আলিপুরে এই বিখ্যাত কৃষিপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সাফল্যের মূলে ভারতবর্ষীয় সভার সহায়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এরূপ একটি জনহিতকর প্রদর্শনী দৃষ্টে মফস্বলেও ছোটখাট কৃষিপ্রদর্শনী হইতে লাগিল। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কেহ কেহ এই প্রদর্শনী উপলক্ষ করিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে যথোপযুক্ত কৃষিশিক্ষা দানের নিমিত্ত সরকারকে কলেজে কৃষিশিক্ষার শ্রেণী খুলিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-গবেষণাগার স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তখনই বিশেষ কোনো ফল হয় নাই বটে, কিন্তু এই বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি এই সময় হইতেই খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সভার বিশেষ সহায়তায় যে এই বিখ্যাত কৃষিপ্রদর্শনীটি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার স্বীকৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহাকে বাংলা সরকার একটি পদক প্রদান করেন।

ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৬৪ সন হইতে আর-একটি বিষয়েও বাংলা সরকারের সঙ্গে একমত হইয়া কার্য করিতে থাকেন। চড়ক পূজায় বাণফোঁড়ার বীভৎসতা সর্বজনবিদিত। সরকার ইহা নিরোধকল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সভার অভিমত চাহিয়া পাঠান। সভা উত্তরে জানান যে, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপার সরকারের হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত নহে। তথাপি বাণফোঁড়া নিরোধ সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে তাঁহারা এই কারণে একমত যে, ইহা আদৌ ধর্মীয় নীতিসঙ্গত নয়। সভার সভ্যবৃন্দ ইতিপূর্বেই নিজ নিজ এলাকায় জমিদারীতে ইহা বন্ধ করিয়া দিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সহায়তা করিতেও তাহারা প্রস্তুত। সভা শুধু এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত

হইলেন না। বিভিন্ন শহরে ও মফস্বলে সভ্যগণকে বাংলায় ইস্তাহার পাঠাইয়া এ বিষয়ে কর্তব্যসাধনে এবং সরকারী কর্মীদের সাহায্যদানে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানান। এইরূপে জনমত গঠিত হওয়ার ফলেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বাণফোঁড়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা সরকারের পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

জনসাধারণের সর্বপ্রকার হিতসাধনে এবং স্বার্থরক্ষায় ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর সবিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারত সরকারের আয়কর ব্যবস্থা যে সাধারণের কিরূপ তুর্বিষহ হইয়া উঠে, তাহার কথা সভা কর্তৃপক্ষ সরকারকে অবগত করাইতে লাগিলেন। ইহাতে ফলও ফলিল। ১৮৬২-৬৩ সনের বাজেটে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের উপর আয়কর তুলিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তুই-তৃতীয়াংশ করদাতা এতাদৃশ করভার হইতে রেহাই পাইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের করভার মুক্তির নিমিত্ত আন্দোলন করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে পূর্বপরিকল্পনা মতেই ১৮৬৫-৬৬ সনের বাজেটে এই প্রকার আয়কর সম্পূর্ণ রদ করা হইল। বাংলা সরকার তামাকের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করিলে সভা ইহার বিরুদ্ধেও বিশেষ আপত্তি তোলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট এই উদ্দেশ্যে আবেদন করেন। ইহাতেও কাজ হইল। সরকার আর এই কর বসান নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা আর-একটি ব্যাপার লইয়াও ১৮৬৪ সনের প্রথমাবধি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। ছোটলাট বীডন কলিকাতা পৌরসভার নিকট পত্র দ্বারা জানান যে, নিমতলা ও কাশীপুর শ্মশানঘাট কাটা গঙ্গা (টালির নালা) যেখানে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে সেখানে স্থানান্তরিত করিবার মনস্থ করিয়াছেন, কেননা কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধির পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন। পৌরসভা ৭ই মার্চ ১৮৬৪ তারিখের অধিবেশনে এই প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার প্রধান প্রভাবশালী নেতা রামগোপাল ঘোষ উক্ত অধিবেশনে ছোটলাটের প্রস্তাবের বিপক্ষে জোরালো বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হিন্দুদের অশেষ প্রকার ক্ষতি করা হইবে। পৌরসভা এক বাক্যে প্রতিবাদ জানাইলেও ছোটলাট কিন্তু নিরস্ত হইলেন না। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত মর্মে একটি আইনের খসড়াও উপস্থাপিত করেন। হিন্দু সমাজ ছোটলাটের জিদে খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু সামাজিক দিক হইতে নহে, ধর্মসাধনের দিক হইতেও যে উক্ত ব্যবস্থা ক্ষতিকর এ বিষয়েও অনেকে ভাবিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষীয় সভা বেগতিক দেখিয়া এসব যুক্তির ভিত্তিতে বড়লাটের নিকট সরাসরি আবেদনপত্র পাঠান। ইহাতে কাজ হইল। বড়লাটের নির্দেশে উক্ত আইনের খসড়া পরিত্যক্ত হয়, তবে পৌরসভাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব রক্ষার নিমিত্ত ইহাকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর নূতন কর বসাইবারও একটি প্রস্তাব করিলেন পৌরসভা। ইহাতেও কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভা আপত্তি করিলেন। তাঁহারা এই কারণ দেখাইলেন যে, এরূপ করা হইলে ছোটলাট এই শর্তসাপেক্ষে উক্ত আইন তুলিয়া লইয়াছেন বলিয়া সাধারণের ধারণা হইবে। এরূপ ধারণা হইতে দেওয়া কোনোমতেই ঠিক নয়। আবার এক নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উপর এরূপ বিশেষ কর ধার্য হইলে তাহাতে ভেদ-বৈষম্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাহারা আপত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পৌরসভার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থের আঁচ পাইয়া তাঁহারা একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিলেন উক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত। সভাকর্তৃপক্ষ শীঘ্রই ৩৫০০০৲ টাকা তুলিতে সমর্থ হন এবং তিন কিস্তিতে ইহা

পৌরসভার হস্তে অর্পণ করেন। এইরূপে সভার হস্তক্ষেপে একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যার সমাধান হইল।

যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই ভারতবর্ষীয় সভা জনকল্যাণের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। কখনো কখনো তাহাদের কার্যের অযৌক্তিকতা এবং অপকারিতা লক্ষ্য করিয়া প্রতিবাদ ও আপত্তি জানাইয়াছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন। কিন্তু ষষ্ঠ দশকের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের বিরোধী মনোভাব ও মতিগতি ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষ শাসন এবং শোষণে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ মাত্রেরই ঐকমত দেখা যাইতে লাগিল। এ দেশে ও বিলাতে তাঁহারা শাসন সংক্রান্ত এমন কতকগুলি আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইলেন যাহার ফলে ভারতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে থাকে। প্রথমেই 'কুলি' বা চাবাগান সংক্রান্ত শ্রমিক-আইনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজগণ আসাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে চাবাগান খুলিয়াছেন। ইহার জন্য 'কুলি' বা শ্রমিক বিস্তর দরকার। তখন আসাম বাংলার অন্তর্ভুক্ত।

এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল ১৮৬৩ সনের প্রথমে এবং ইহা পরিচিত হয় ১৮৬৩ সনের তিন আইন নামে। মূলতঃ চাবাগানে কুলি-সরবরাহের কার্যকর উপায় অবলম্বনের জন্য সরকার এই আইন পাস করাইয়া লইলেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত আড়কাঠিদের দিয়া বাংলার অন্তর্ভুক্ত এবং নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি হইতে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। শ্রমিকগণকে চাবাগানে কার্য করিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ করা হইত। তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়ারও বিধান ছিল এই আইনে। ভারতবর্ষীয় সভা আইনটির আলোচনাকালে এই মর্মে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয় যাহাতে মনে হইতে পারে আড়কাঠিগণ সরকারেরই নিযুক্ত লোক এবং সরকার চা-করদের পক্ষপাতী। চাবাগানে পৌঁছিবার পর চা-কর ও শ্রমিকদের ভিতরকার সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্ত আইনে কোনো নির্দেশ ছিল না, এ নিমিত্ত সরকার ১৮৬৫ সনে আর-একটি আইন বিধিবদ্ধ করান। এটি হইল শ্রমিকদের পক্ষে খুবই মারাত্মক। যদি কোনো শ্রমিক চুক্তিমত কার্য না করিয়া চাবাগান পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাকে বিনা সরকারী পরোয়ানায় বা পুলিশের সাহায্য ব্যতিরেকেই গ্রেফ্‌তার করিবার ভার চা-কর এবং তাহার কর্মীদের উপর অর্পণ করা হইল। ফলে চা-করের একটি আর্দালি পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তিকে চাবাগান পরিত্যাগী শ্রমিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিত। ইহার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। দ্বিতীয় আইনটির প্রতিবাদে তাঁহারা স্পষ্টতঃই বলেন যে, ইহার দ্বারা একশ্রেণীর লোককে অপর একশ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা হরণের অধিকার দেওয়ায় শাসনের মূলনীতিই লঙ্ঘিত হইয়াছে। এইরূপে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা আইন-বিগর্হিত কার্য। ইহার ফলে চাবাগানের শ্রমিকেরা ক্রীতদাস পরিণত হইতে বাধ্য। সভার কথায় তখন কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। এই বিষয়টি ক্রমে জটিল হইয়া দাড়ায়। এ সময় হইতে চাবাগানের শ্রমিকদের উপর চা-করদেব অত্যাচার-নিপীড়ন খুবই বৃদ্ধি পায়, ইহার প্রতিকারে শ্রমিকদের অক্ষমতা ক্রমে একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইল। পরবর্তীকালে ইহা জাতীয় আন্দোলনে খুবই রসদ যোগায়।

ভারতবাসীদের পুরাপুরি নিরস্ত্র করার দিকে ভারতসরকার বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সিপাহী-যুদ্ধের পর ১৮৬০ সনে তাঁহারা যে অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন তাহাতে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। এ

দশকের মাঝামাঝি এই আইনকে অধিকতর ব্যাপক করিতে প্রয়াসী হইলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হইল যে, বিনা লাইসেন্সে কেহ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় সভা স্বভাবতই ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ দেখাইয়া ভীষণ আপত্তি তুলিলেন। এইরূপ ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থায় ভারতবাসী সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িবে; চোর ডাকাত বন্যজন্তু দুর্বৃত্ত আততায়ী কাহার নিকট হইতে তাহার আত্মরক্ষার আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ কথায়ও কর্তৃপক্ষের মন ভিজিল না। তাঁহারা খালি এই নির্দেশ দিলেন যে, শ্রেণী-বিশেষকে প্রয়োজন হইলে আইনের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া চলিবে। ইহাতেও যে ফল কিরূপ বিষময় হইতে পারে তাহা পরবর্তীকালে সম্যক বুঝা যায়।

উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ (১৮৬৫-৬৬) সম্বন্ধেও সরকারী ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের একটি কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয় সভা অর্থসংগ্রহ এবং দুর্গতদের সর্বপ্রকারে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে সাধারণ সভা আহ্বানের উদ্যোগ করেন। কিন্তু সরকার পক্ষে বলা হইল যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-সময়ের উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডার হইতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

এই টাকা খরচ না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারী সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থায় দুর্গতদের যে বিপদ দেখা দেয় তাহা আজ ইতিহাসের বস্তু। সভার সদস্যগণ অনেকে ব্যক্তিগতভাবে অন্নসত্রাদি খুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদের নানাভাবে সাহায্যদানে লিপ্ত হন।

সিবিল সার্ভিস সম্পর্কে বিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরোধী মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিল এই দশকের প্রথম হইতে। ভারতবর্ষীয় সভা সিবিল সার্ভিসকে শাসনযন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ভাবিয়া ইহাতে স্বদেশীয়দের প্রবেশাধিকার বিষয় বরাবর সচেতন ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নানারূপ কার্যকর প্রস্তাবও করিয়া আসিতেছিলেন। সরকার কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সভার প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনোমোহন ঘোষের সহযোগে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান। পর বৎসরই (১৮৬৩) উভয়ে এই পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু মাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ইহাতে উত্তীর্ণ হন। এই ব্যাপারটিতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল। এতদিন নানা কৌশলে সিবিল সার্ভিসকে তাঁহারা ব্রিটিশজাতির কুক্ষিগত করিয়া রাখিতেই চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় যুবকেরা বিলাত পর্যন্ত গিয়া তাহাদের সাথে বাদ সাধিবেন ইহা হয়তো পূর্বে ভাবিয়া দেখেন নাই। ১৮৬৪ সনের পরীক্ষার পূর্বেই তাঁহারা অকস্মাৎ বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরের রদবদল করিলেন, সংস্কৃতের নম্বর ৫০০ হইতে কমাইয়া ৩৭৫ করেন। এ কারণে এবারেও মনোমোহন ঘোষের পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইল না। ইহার পর আবার তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ১৮৬৫ সন হইতে পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বতম বয়স ২২ হইতে কমিয়া ২১ হইবে। ইহার ফলে মনোমোহনের নিকট এই পরীক্ষার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। এতাদৃশ মৌলিক নিয়ম পরিবর্তন হেতু ভারতবর্ষীয় সভা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহারা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিলেন। সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া সভাপতি রমানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র বক্তৃতা দেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বতম বয়স ২৫ এবং নূনতম বয়স ২১ করা হোক। তাঁহারা ইহাতেই নিরস্ত হইলেন না। বিলাতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটির উপর এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি সম্পর্কে আন্দোলন

পরিচালনার জন্য পরামর্শ দিলেন। সভা পরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অপকৌশল আরও জানিতে পারেন। মনোমোহন ঘোষ বিলাতে এবং এ দেশের সংবাদপত্রে এই অপকৌশলের বর্ণনা দিয়া একপ্রস্ত পত্র লেখেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ব্যর্থতার কারণ শুধু বয়স কমানো নহে অকস্মাৎ বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ধার্য নম্বরের রদবদলও বটে। ভারতবর্ষীয় সভা মনোমোহনের প্রত্যাগমনের পর তাঁহার প্রমুখাৎ সব কথা শুনিয়া এ বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করিবেন বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন (৩১শে জুলাই ১৮৬৬)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশের জাতিবিদ্বেষ বা বৈরিতা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির উল্লেখ করিলাম। ভারতবর্ষীয় সভা প্রথমে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া এবং পরে ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটির মারফত বিলাতে জাতীয় কল্যাণকর বিষয়ের সপক্ষে এবং স্বার্থহানিকর সরকারী ব্যবস্থার প্রতিকূলে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৬২ সন হইতে সোসাইটির কার্যকলাপের বিষয় জানা যায় নাই, হয়তো ইহা তখন উঠিয়াই গিয়াছিল। ১৮৬৫ সনের প্রথমে লণ্ডনপ্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় মিলিয়া লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই সময়ে ব্যারিস্টারী অধ্যয়নরত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ দেশে থাকিতেই ভারতবর্ষীয় সভারও সভ্য হইয়াছিলেন। সোসাইটির সভাপতি হন সুবিখ্যাত দাদাভাই নৌরোজি, তখন তিনি ঐ স্থলে ব্যবসায়কর্মে লিপ্ত ছিলেন। সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার অপকৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই সোসাইটি আন্দোলন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা একটি সভায় মিলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লেখেন যে, এই পরীক্ষা সম্পর্কে নিয়মাদি রদবদল করিতে হইলে ধার্য করার দুই বৎসরের মধ্যে যেন ইহা কাজে লাগানো না হয়। সম্পাদক উমেশচন্দ্র সোসাইটির পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে পত্রালাপ করিতে শুরু করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেও একখানি পত্রে অনুরোধ জানান। ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে কৃষ্ণদাস পাল এক দীর্ঘ পত্রে বিলাতে কার্যপরিচালনা সম্পর্কে আলোচনান্তর ইহাকে অভিনন্দিত করিলেন। সোসাইটি ইহার বিলাতস্থ মুখপাত্ররূপেও অভিনন্দিত হইল।

স্বদেশেও ভারতবর্ষীয় সভা আদর্শানুগ শাখা-সভা বাংলায় ও বাংলার বাহিরে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। আলিগড়ের শাখা-সভার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা সৈয়দ আহমদ খাঁ আলিগড়ে এই শাখা-সভা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তিনি প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে সকল কার্য নিষ্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি একসময় এরূপ কথাও বলেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য থাকিলে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্ভবপর হইত না। ইহার গূঢ়ার্থ হয়তো এই যে, ভারতীয় প্রতিনিধি প্রমুখাৎ এ দেশীয়দের মনোভাব জানিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষ উৎসুক হইতেন। বলা বাহুল্য সৈয়দ আহমদ ঐ সময়ে একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে বৃত ছিলেন। লালা লজপৎ রায় বলিয়াছেন উত্তর-ভারতে সৈয়দ আহমদের নিকটেই তাঁহারা প্রথম জাতীয়তাবাদের পাঠ গ্রহণ করেন। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শাখা-সমিতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদককে ১৭ই মে, ১৮৬৬ তারিখে লিখিত সৈয়দ আহমদের পত্রখানি এই—

"From the enclosed printed proceedings you will have learnt of the formation of the British Indian Association in this district for the North Western provinces.

I am thereby directed to request the favour of your kindly cooperation with and assisting this Association as far as may be in your power, communicating from time to time any Indian subject of moment and importance which you may deem so or they to be laid before the members of your Association.

"In soliciting this cooperation and air from you, the members of this Association desire me to convey their impressions of the advantage such cooperation will yeild.

"I am further instructed to ask the favour of being furnished with a copy of the bye-laws which guide the Association to which you have the honor of being secretary."

সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে, মহারাজা) ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে এইরূপ উদ্যোগকে আন্তরিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানাইয়া সৈয়দ আহমদকে জবাব দিলেন। এইরূপে সভার চারিটি শাখা-সভা (বারাসত, হুগলি, শেরপুর-ময়মনসিংহ, আলিগড়) বিভিন্ন স্থলে স্থাপিত হইল।

ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপে শিক্ষিত সাধারণের মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মিল, তাঁহারা আত্মসম্বিত যেন খানিকটা ফিরিয়া পাইলেন। রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে এই সভা যে ভারতবর্ষের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে মনীষী রাজনারায়ণ বসুও বলিয়া গিয়াছেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ একে একে ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তখনকার দিনে সরকারী কর্মীরাও রাজনৈতিক সভাসমিতির সদস্য হইতে পারিতেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভার সদস্য হইলেন ১৮৬২-৬৩ সনে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারও এই দশকের মাঝামাঝি সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৮৬৬ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পনর বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষীয় সভা স্বদেশবাসীদের সর্ববিধ কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সফলকামও হন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তথাপি ভগ্নোদ্যম না হইয়া প্রবল আগ্রহে হিতকর্ম সাধন করিয়া যাইতে থাকেন। সহযোগিতা ও সংঘাত এই দুইয়ের মাধ্যমেই আমাদের ভিতরে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তখন সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতবাসীদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা জাতীয়তার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেকটি কার্যই পরিচালনা করিতে অগ্রসর হন। সভার পঞ্চদশবার্ষিক অধিবেশন হইল ১৮৬৭ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে। এই দিনে কিশোরীচাঁদ মিত্র সভার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন তাহা এখনও আমাদের প্রনিধানযোগ্য। ইহার কিয়দংশ এই—

"The Association owes its origin to a far-reaching foresight which is this that the time would come when India must be represented by her most advanced children, when the light that would illuminate her darkness must come from within and not from without. This object of those who have established this Association was to build up a distinct and well organised national party, which

would stand for the self-government and represent the wants and wishes of various people of this country. I, therefore, rejoice to see that the seed planted fifteen years ago has germinated and developed into a stately tree which has already commenced to shoot out magnificent foliage and to bear goodly fruit."

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন প্রতিষ্ঠাতারা। পনর বৎসর যাবৎ অবিরাম চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে এই দিকে জনচিত্ত জাগ্রত হয়। এবং এমন একটি জাতীয় দলের উদ্ভব হইতেছিল যাহারা কালে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবেন। শক্তি ভিতর হইতেই আসিবে। ধার-করা ক্ষমতায় স্বদেশের সত্যিকার কল্যাণসাধন সম্ভব নহে। ভারতবর্ষীয় সভা জাতীয়তার ভিত্তিতে বিবিধ কার্যের মধ্যে দিয়া এই ভাবনাকে রূপ দান করিতে অগ্রসর হইলেন।

সংশোধন

কার্তিক-পৌষ ১৩৭০ সংখ্যা॥ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-লিখিত "ভারতীয় মূর্তি ও বিমূর্তবাদ" প্রবন্ধ: পৃ ১৩৪ ছত্র ১৩—মিকেলাঞ্জেলোর 'দিবা-রাত্রি' উল্লেখ বর্জনীয়; পৃ ১৩৬এর সম্মুখীন মিকেলাঞ্জেলো-কৃত 'রাত্রি' 'দিন' অতিভঙ্গ মূর্তি রূপে গণনীয়।

শান্তিনিকেতন

ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন

এখন কিছুদিনের জন্য আশ্রমের বাইরে আছি, কিন্তু আমার মন সারাক্ষণ পড়ে আছে সেই আশ্রমেই। আর এ কথাও নিশ্চিত জানি যে, সেই উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে, সেই দিগন্তপ্রসার উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন পৃথিবীর শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই মানুষের আশান্ত আত্মার জন্য শান্তির নীড় রচিত হয়ে আছে। কোনো রাত্রিতে হয়তো চারিদিকের শান্ত দৃশ্যপটের উপর শুভ্র শান্তির মতো জ্যোৎস্নার আলো ঝরে পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলেও দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, এখানে সেখানে শুধু চোখে পড়ে সাঁওতালদের এক-একটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম আর তার চারদিকে কয়েক খণ্ড শস্যক্ষেত, সেই অঞ্চলের অধিদেবতার অঙ্গুলি-সংকেতের মতো দূরদিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকে একগুচ্ছ তালগাছ— তারা যেন বাইরের নির্বিচার কৌতূহলকে দমন করবার জন্যই উদ্যত হয়ে আছে। আশ্রমে বাস করতে করতে প্রতিষ্ঠাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারলে এ কথাও অনুভব করা যায়, আশ্রমের নিশ্চল শান্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনের পরিপূর্ণ প্রশান্তি থেকেই জাত। এ মানসিক প্রশান্তি কবিকেও বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায়, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, যখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে ছাত্রেরা এসে মৌন প্রার্থনার জন্য সমবেত হয় তখন এক অতি আশ্চর্য শান্ত এবং সুন্দর নীরবতা সমস্ত আশ্রমটিকে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। দিনের সেই প্রথম প্রহরে, পূর্বাচলে আলো ফুটবার অনেক আগে সেই নীরবতা এমন গভীর হয়ে ওঠে, যেন মনে হয় সূর্যোদয়ের প্রাত্যহিক মহিমা দেখবার জন্য সময় নিস্পন্দ হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

মনে হতে পারে, যে এই আশ্রমের শিক্ষা ছাত্রদের চার পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিষয়ে-বিরাগী করে তুলতে পারে, তার ফলে আধুনিক জগতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই যে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয় তার পক্ষে এখানকার ছাত্রেরা অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। আমার কিন্তু মনে হয় আধুনিক জগতের পক্ষে অত্যাবশক যে মানসিক প্রশান্তি সেটা আমরা এখানেই অর্জন করতে পারি। নানাপ্রকার চিত্ত-বিক্ষেপের মধ্যেও জীবনকে সমন্বিত করে একটি নিশ্চল লক্ষ্যের দিকে আমাদের যে যাত্রা, সে যাত্রাপথে এই মানসিক প্রশান্তি আমাদের পরম পাথেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই শিক্ষারীতির পরীক্ষানিরীক্ষা কি পরিমাণ সফল হবে সে কথা বলা কঠিন। তবু এ কথা নিশ্চিত যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক রীতির অপেক্ষাকৃত সুস্থ দিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এই শিক্ষার আদর্শ অতি মহান্। এই আদর্শের প্রকৃত রূপ কি এবং কি উপায়ে ছাত্র ও শিক্ষকেরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই আদর্শসিদ্ধির সাধনা করছে সে কথা আরও বিশদ করে বলছি।

প্রথমে শান্তিনিকেতন ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দস্যু-অধ্যুষিত একটি নির্জন স্থান। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানে এসে উপস্থিত হন। এই জায়গাটি তাঁর এত ভালো লেগে গেল যে গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। শূন্য প্রান্তরের মধ্যে মাত্র তিনটি গাছ। মাঝে-মাঝে এখানে এসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করতেন।

গাছ তিনটি এখনও বেঁচে আছে, আর তাদের সামনে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে নির্জন প্রান্তর। একটি পাথরের ফলক দেখে মহর্ষির সাধনার এই পীঠস্থানটিকে চেনা যায়। ঈশ্বর-চিন্তায় রত মহর্ষির মনকে পরিপূর্ণ করে যে-মন্ত্র উদ্গত হয়েছিল সে-মন্ত্রটি এই ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে—

তিনি আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।

মহর্ষিস্মরণ অথবা অন্যান্য আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিসভা উপলক্ষ্যে ছাত্রেরা এই গাছের তলায় সমবেত হয়। এখানে অনুষ্ঠিত শেষ যে সভাটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম সেটির কথা মনে পড়ছে। গাছ তিনটি তখন গুচ্ছগুচ্ছ সাদা ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। অতি প্রত্যুষেই ছেলেরা তার নীচে সমবেত হয়েছিল। ঘন সমাচ্ছন্ন শাখার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছেলেদের নানা বর্ণের শালের উপর পড়ছিল। উপরে সাদা রঙের ফুল আর নীচে নানারঙা শাল মিলে বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। আর ছেলেরা উপাসনা আরম্ভের জন্য নীরবে অপেক্ষা করছিল।

ঘরের বাইরে সভার অনুষ্ঠান এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। শুধু বর্ষাকাল ছাড়া এখানে ক্লাসগুলো গাছের তলায় বা বারান্দায় হয়। ছেলেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যাবেলা কোনো-না-কোনো প্রকার বিনোদনের আয়োজন করে। কোনোদিন হয় সার্কাস, কোনোদিন আবার ছেলেদের নিজেদেরই রচিত কোনো নাটক। তাতে অধ্যাপকদেরও নিমন্ত্রণ থাকে। আমার আমেরিকা-যাত্রার ঠিক আগে ছোটো ছেলেরা লাদাম নামে এক অলীক বীরকে আবিষ্কার করেছিল। লাদামের কাহিনী কিছুদিনের জন্য তাদের মনকে জুড়ে বসেছিল। তাঁর শৌর্যবীর্যের নানা ঘটনা নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছিল, কোনো-কোনো কাহিনী আবার নাটকের আকারে অধ্যাপকদের নিকট পরিবেশিতও হয়েছিল। সে কাহিনীগুলিকে অবশ্য কোনো ক্রমেই অনুকরণযোগ্য বলা চলে না। ছোটো ছেলেদের ছাত্রাবাসের আশেপাশে যত গাছ ছিল, কাছাকাছি যত টিলা ছিল, সবই লাদামের যুদ্ধক্ষেত্র এবং জয়ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। আমাকে একটা পিঁপড়ের ঢিবি দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে এটা লাদামের দুর্গ এবং পিঁপড়েরা হচ্ছে তার অগণিত সৈন্য। আমার সঙ্গে তাঁর শেষ পরিচয়ের পর তাঁর এই বেপরোয়া এবং পরিণামহীন অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছে কিনা জানি না। কিন্তু যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন তার বন্ধু এবং আবিষ্কর্তারা তাঁর কীর্তিকাহিনী তাঁর চেহারা এবং চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা করতে ক্লান্তি বোধ করে নি। হয়তো এখনও তাঁর প্রেতাত্মা ছাত্রাবাসের আনাচে-কানাচে আর আলোছায়ায়-বোনা শালবীথিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যে আদর্শ নিয়ে এ বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে তার পক্ষে বিদ্যালয়ের একদিকের এই-যে বিশেষত্ব সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে খবরগুলি শিশুরা সুবিধেমত ভুলে যায়, পরীক্ষাপাসের চিন্তাও যেগুলিকে ধরে রাখতে পারে না, সেগুলি তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার নামই শিক্ষা নয়। শিশুর প্রবণতা অনুযায়ী তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। শিশুর বয়স যত কম থাকে তার সৃজনীশক্তির প্রকাশ তত বেশি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার রাহু যখন তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে থাকে তখন সে তার সহজাত সৃজনীশক্তি হারিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী বনে যায়। শিশুর মনে যখন কোনো কল্পনার উদয় হয় এবং সে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে

নিশ্চিত একটি সজীবতা থাকে। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রকৃত সৃষ্টির আনন্দে পরিপূর্ণ। অতি-অভ্যাসের অসাড়তায় নিতান্ত জড়পিণ্ড না ব'নে গেলে এই শিশুদের সার্কাস দেখে আনন্দ পাবে না এমন লোক বিরল।

ছেলেরা নিজেদের চরিত্র নিজেরাই গঠন করবে— এই আদর্শটি বিদ্যালয়ের আরও একটি বিধানের মধ্যে দেখা যায়। সেটি হল ছাত্রদের প্রবর্তিত বিচারসভা। এই সভায় ছাত্রদের ছোটো-খাটো অপরাধের শাস্তিবিধানের জন্য ছাত্রেরাই আইন-কানুন তৈরি করে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ নিয়মশৃঙ্খলা এই বিচার-সভার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। মাঝে-মাঝে ন্যায়বিচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, এরকম প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু তবু অপরাধীর দণ্ডবিধান সম্পর্কে ছাত্রদের মনে কোনো অভিযোগ নেই। এ বিষয়ে তো বটেই অন্যসব বিষয়েও স্বায়ত্তশাসনকে পরায়ত্ত সুশাসনের চেয়ে ভালো মনে করা হয়। বিদ্যালয়-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য যে-সব বিষয় আছে, সে-সব বিষয়ের সবগুলি সম্বন্ধেই দৃষ্টি রাখার জন্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ছাত্রসম্মিলনী। একবার ছাত্রেরা স্থির করল যে, রান্নাবাড়া কাপড় কাচা, জলতোলা বাজার-করা ইত্যাদি আশ্রমের সবরকম কায়িক পরিশ্রমের কাজ তারা অধ্যাপকদের সহায়তায় নিজেরাই করবে। এ প্রয়াস যদিও এক মাসের বেশি সময় চালানো সম্ভব হয় নি, তবু সেই একমাস ভারি বোঝার কাজ করার জন্য কোনো ভৃত্য রাখা হয় নি। সে-সময়টা ছিল বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরমের সময়। ছেলেরা তবু ট্রোজানদের মতো অমানুষিক পরিশ্রম করেছে।

ছেলেদের লেখা গল্প কবিতা এবং অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রত্যেক মাসে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অধিকাংশই বাংলায়। যারা ছবি আঁকতে পারে, তারা এগুলিতে প্রসঙ্গ অনুযায়ী ছবি এঁকে দেয়। মাঝে-মাঝে পত্রিকাপ্রকাশ বিলম্বিত হয়, মাসের পর মাস আর এদের দেখাই মেলে না। কিন্তু পত্রিকার জন্মবার্ষিকী ঘুরে আসতেই তারা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার পর ঘটা করে উৎসব প্রতিপালিত হয়। উৎসবের জন্য ছাত্রাবাসের কোনো-একটি গৃহকে ব্যবহার করা হয়। গৃহটি গাছের তাজা ডালপালা দিয়ে সাজানো হয়। পদ্ম ফোটার সময়ে যদি উৎসব হয় তাহলে সভায় জায়গাটি পদ্মের কুঁড়ি আর ফোটা ফুলে ভরে যায়। একজন অধ্যাপককে সভাপতি মনোনীত করা হয়, তাঁর বসার জন্য তৈরি হয় বিশেষ রকমের আসন। তাঁর মাথার উপর ডিমোক্লিসের অসির মতো ফুলের মালার লহর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে দেখায় যেন মে-কুইনের মতো। বলির পাঁঠার মতো তাঁর গলায় মালাও দুলতে থাকে।

বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা পত্রিকার উৎকর্ষ নিয়ে ততটা নয়, যতটা কিনা পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সাজসজ্জার ঘটা এবং মালা তৈরির কারিগরিতে। উৎসবের সময়টা যদি গ্রীষ্মকালে পড়ে তবে সভার শেষে একটু-আধটু জলযোগের আয়োজনও হয়। জলযোগ হয় বরফ-দেওয়া শরবৎ দিয়ে। সভার কার্যসূচীতে থাকে সম্পাদকের বাৎসরিক প্রতিবেদন, আর ছাত্রদের স্বরচিত গল্প কবিতা ও অন্যান্য রচনা। প্রসঙ্গ অনুযায়ী পত্রিকায় যে-সব ছবি আঁকা হয়, সেগুলি দিয়ে মাঝে-মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়। সভার শেষে সভাপতি অথবা কবি স্বয়ং যদি উপস্থিত থাকেন তবে তিনি, যে-লেখাগুলো পড়া হয় সেগুলি নিয়ে সমালোচনা করেন, বুঝিয়ে দেন কি করলে লেখাগুলো আরও ভালো হতে পারত। কখনও কখনও রচনা বা ছবি-আঁকার প্রতিযোগিতাও হয়। এভাবে

ছেলেরা নিজেরা ভাবতে শেখে এবং রচনা লিখতে উৎসাহিত হয়। এমন দু-একজন ছাত্র আছেন যাঁরা হাতের লেখা পত্রিকায় ছবি এঁকে এঁকেই জাত-চিত্রশিল্পীরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

মাঝে-মাঝে আনন্দ করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থাও আছে। কখনও বিদ্যালয়ের সব ছেলেরা শুধু এক বেলার জন্য বাইরে চলে যায়। আবার যখন কয়েকদিনের জন্য কোনো ইতিহাসবিশ্রুত স্থানে যাওয়া হয় তখন বিশেষ কয়েকজন ছেলে দু-তিন জন অধ্যাপকের সঙ্গে মিলে সেখানে যায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা চলে যাই আশ্রমের কাছাকাছি কোনো জায়গায়। খাবারের অয়োজন সঙ্গেই থাকে। কোনো নদীর ধারে বা গাছের তলায় রান্নার ব্যবস্থা হয়। খোলা হাওয়ায় গান আর খেলা-ধুলোর মধ্য দিয়েই সারাদিন কেটে যায়। অধ্যাপকেরা অবশ্য গল্পও বলেন। বিশেষ করে জ্যোৎস্না-রাত্রে ছেলেরা মিলে অধ্যাপকদের সঙ্গে অনেক দূরে দূরে বেড়াতে চলে যায়। এভাবে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের যোগাযোগ দৃঢ় এবং গভীর হয়ে ওঠে। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রাবাসেই থাকেন ব'লে তাদের কাজে সাহায্য করতে পারেন এবং ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকে।

ফুটবলই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। বাড়িগুলোর চারদিকে প্রচুর খোলা জায়গা, বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের জন্য আলাদা খেলার মাঠ করতে জায়গার অকুলান হয় না। বেড়ানোটা ছেলেদের তত প্রিয় নয়। তবে যখন বর্ষার দিনে হঠাৎ প্রচণ্ড ধারাপাতে চারিদিকের সমস্ত অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়, তখনকার কথা অবশ্য আলাদা। তখন অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে ছেলেরা বেড়াতে যেতেই ভালোবাসে, ভালোবাসে চুপচুপে-ভিজে হয়ে ফিরতে। এরকম প্রচণ্ড বর্ষণের সম্ভাবনা হলেই ক্লাস ছুটি হয়ে যায়; ছেলেদের মনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কারণ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলেই, তার সঙ্গে বয়ে আনে ধারাজলে স্নানেরও সম্ভাবনা।

অনুবাদ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

পত্রাবলী সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পর্ব

শ্রীনগর, কাশ্মীর। ১২ই অক্টোবর ১৯১৫

বলতে গেলে এখন আমি কাশ্মীরেই আছি, তবে এখনও তার তোরণপথে ভিতরে প্রবেশ করি নি। পৌরসম্বর্ধনা ও বন্ধুসুলভ অভিনন্দনের প্রেতলোকে অবস্থান করছি, স্বর্গ এখনও আমার সামনে। মনে হচ্ছে, নিজের খুব কাছে চলে আসছি। আমার মধ্যে যে অনাহূত ব্যক্তিটি তার খেলার সামগ্রী নিয়ে সাজাতে গোছাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, সে এখন অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহের মত চুপচাপ থাকবে আশা করছি। ফুলের মধ্যে আমি ফুটে উঠছি, ঘাসের মধ্যে আমি ছড়িয়ে আছি, জলের মধ্যে আমি বয়ে চলেছি, আকাশে আমি তারা হয়ে ফুটছি— আর সর্বকালের মানুষের জীবনধারার মধ্যে আমি যোগ রেখে চলেছি, এটা বোধ করা ক্রমশঃ আরো সহজ হয়ে আসছে।

সকালবেলা, নৌকোর ডেকে বসে যখন সামনে পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে নীলাভ রক্তবর্ণের মহিমা দেখি, প্রাতঃসূর্যের মুকুট ধারণ করে তাদের যে অপূর্ব শোভা হয় তা দেখে আমার মন বলে, আমি অনন্ত, আমিই আনন্দরূপম্। আমার সর্বাঙ্গ রক্তমাংসে গড়া নয়, সে যে আনন্দে গড়া। যে পৃথিবীতে সর্বদা চলাফেরা করি, সেখানে নিজেকেই শুধু বড় করে দেখি। তার সবটাই আমাদের নিজেদের সৃষ্টি, তাই সেখানে আমাদের আত্মার উপবাসদশা ঘোচেনা। সত্যকে জানা মানে সত্য হওয়া। তা ছাড়া আর পথ নেই। শুধু নিজেকে নিয়ে আত্মরত হয়ে যতদিন থাকি ততদিন সত্যকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"এসো এসো, বাইরে বেরিয়ে এসো"— আত্মার এই ক্রন্দন অহরহ চলছে। ডিমের কঠিন আবরণের মধ্যে পক্ষিশাবকের কান্নাও এরই অনুরূপ। সত্যই যে কেবল আমাদের স্বাধীনতা দেয়, তাই নয়, স্বাধীনতাও আমাদের সত্যকেই দেয়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন, আমাদের জীবনকে 'অহং'এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে, তবে সত্য আপনা থেকেই আবির্ভূত হবে।

অবশেষে এখন আমি বুঝতে পারছি— আমার মধ্যে এতকাল যে অধীরতা ছিল তা এরই জন্য। আমাকে অভ্যাসের জড়তা থেকে, 'অহং'এর এই খণ্ডিত জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নির্জনতার।

কাশ্মীরে এসেই স্পষ্টভাবে আমি জানতে পারলাম, আমি কি চাই। দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলে আবার হয়তো এই বোধটিকে হারিয়ে ফেলব। কিন্তু প্রতিদিনের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে এই যে মাঝে মাঝে সরে আসা, এতেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তিতে পৌঁছে দেয়,— সেই শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতমে। মুক্তির পথে প্রথম আসেন শান্তম্; যে শান্তি আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে চিত্তে জাগ্রত হন, তিনি সেই শান্তম্। তার পরের ধাপে শিবম্ আসেন। তিনি হলেন পরম মঙ্গল, আত্মবিলোপের পরে প্রাণের যে সক্রিয় অবস্থা হয় সেটি তখন জেগে ওঠে। তার পরে আসেন অদ্বৈতম্; তিনি

হলেন অসীম প্রেম— যাকে পাবার ফলে সর্বজীবের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে ঐক্যের বোধ মানবহৃদয়ে জাগে।

অবশ্য এই বিভাগটি কেবল একটি ন্যায়সম্মত বিভাগ। আলোর রশ্মির মতো এই ধাপগুলি একসঙ্গেও আসতে পারে অথবা অবস্থাবিশেষে তার পরিবর্তনও হতে পারে এবং তাদের ক্রমও বদল হয়। যেমন শিবম্ হয়তো শান্তমের আগে এলেন। কিন্তু এই কথাটি আমাদের জানতেই হবে যে, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'এ পৌঁছবার জন্যই আমাদের বাঁচা আর তারই জন্য আমাদের জীবনের সব সংগ্রাম।

শিলাইদা, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমি আবার নিজের মধ্যেই ফিরে এসেছি। প্রতিবারই যেন নূতন করে নিজেকে আবিষ্কার করি। শহরে ভিড়ের মধ্যে আমরা জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলি। অল্পদিনের মধ্যেই ওখানে সব-কিছু আমাকে ক্লান্ত করে ফেলে। তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্তরের যা সত্য তা সেখানে হারিয়ে যায়। আমাদের হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে প্রিয়তম আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তাঁর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। আমাদের জানতেই হবে যে হৃদয়ের গভীরেই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ লুকানো রয়েছে। আমাদের অন্তরের কৃপণতা দূর করার জন্য এই খবরটি জানা নেহাৎ দরকার।

শিলাইদা, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

সত্যকে সহজে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমার যে কবিতাটি আছে, আপনি তার ইংরেজি অনুবাদটি জানেন। গত রাতে *Gardener* গ্রন্থটিতে অন্য কবিতার সঙ্গে এটি পড়তে গিয়ে এর অর্ধ-সমিল রূপ দেখে কেমন অদ্ভুতরকম সামঞ্জস্যহীন মনে হল। সব মেয়েরা যেখানে শাড়ি পরে এসেছে, সেখানে একটি মেয়ে যদি আঁটসাঁট পোশাকে যায়, তাকে যেমন বেখাপ্পা দেখায়, এও ঠিক তেমনি। তাই আমি এর ছন্দের ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলার কাজে লেগে গেছি, যদিও পুরোনো ছন্দকে সম্পূর্ণ বর্জন করা খুবই কঠিন।

কবিতাটি হল—

মনেরে আজ কহ যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।· ·

শিলাইদা, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

আপনি কোথায় আছেন? রিপোর্ট লেখার সাত-হাত জলের তলায় নাকি? সূর্যের আলোয় ভেসে উঠে আবার কোনদিন অস্তিত্বের খোলা হাওয়ায় পাল তুলে উড়ে বেড়াবেন?

এখানে আমার কাজ আছে বটে, কিন্তু সেটা একরকম খেলাই। তাতে অফিসের নামগন্ধও নেই। তাতে আনন্দের সঙ্গে বিষাদও মেশানো আছে। অনেকটা ছবি-আঁকার মতো।

পিয়রসন অসুখ বাধিয়ে এসে এখন আবার আমার দলে ভিড়েছে।

শান্তিনিকেতন, ৯ই জুলাই ১৯১৭

ফিজি যাবার পরে এই প্রথম আপনি আপনার চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আপনার পিঠে ও পায়ে আঘাত পেয়েছেন জেনে আমরা খুবই উদ্বেগে আছি।

সন্তোষ মিত্রের অধিনায়কত্বে ছেলেরা কৃষিবিদ্যা খুব ভালো করে শিখছে। নেপালবাবুর রাস্তা তৈরির কাজ খুব আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হল, হঠাৎ একদিন সেটা থেমে গিয়ে চরম ব্যর্থতায় শেষ হল। আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে তেমন বিপর্যয় কিছু ঘটবে না। শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ আমাদের স্কুলের কাজে যোগ দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা সকলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমাদের পুরোনো ছাত্র গোরা কলকাতার ফুটবল মাঠের নামজাদা খেলোয়াড়। সে এখানে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে পেয়ে আমাদের স্কুল সমৃদ্ধ হবে।

এ বছরের বর্ষাকালটাও আমাদের অনেক ছাত্রের মতো ছুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করল না। তার আগেই নেমে পড়ল। আর সেই থেকেই তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে যাচ্ছে। আমি দোতলার জানালার ধারে আমার কুঁড়েমির আসনটি দখল করে বসে আছি। তার এক দিকে আকাশে মেঘের শ্যামসমারোহ, অন্য দিকে ধরণীতে ঘন সবুজের দিগন্তজোড়া বিস্তার।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমার বেপরোয়া পৃথিবীতে জীবনের দিনগুলি দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছি। তখনও আমার যৌবনের স্বর্গোদ্যানে প্রয়োজনীয়তার পদক্ষেপ ঘটে নি। অস্তিত্বের নগ্ন আনন্দকে ভেঙে চুরে দিয়ে শৌখিন ভদ্র আবরণের আমদানি তখনও হয় নি। আমার মনের সেই হৃতস্বর্গে ফিরে যাবার প্রতীক্ষা করছি। আমি ভুলে যেতে চাই যে, কারোর কোনো প্রয়োজনে আমি লাগতে পারি। আমি জানতে চাই যে, আমার জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য একটিই—সেটি সর্বকালে এবং সর্বদেশে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই— তা হল আমি যা আছি, তা সম্পূর্ণ হতে দেওয়া।

আমি কি কবি নই? তা ছাড়া অন্য কিছু হবার আমার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি রাস্তার ধারের একটা সরাইখানার মতো— কবি-পথিককে তার অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে রাত কাটাতে দিচ্ছি। কিন্তু এই সরাইখানার মালিকের কাজ কিছুই লোভনীয় নয়। এখন সেই কাজে অবসর নেবার আমার সময় এসে গেছে। যাই বলুন আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। আমার মধ্যে অন্যান্য যে অসংখ্য বাসিন্দা আছে তাদের প্রতি এখন আমার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটতে বাধ্য।

শিলাইদা, ২০শে জুলাই ১৯১৭

সঙ্গের চিঠিখানি পিয়রসনের। সে যে তার গোপন আবাস ছেড়ে বেরিয়েছে আর শরীরে মনে সুস্থ বোধ করছে, তাতেই আমি খুশি হয়েছি।

প্রায় দেড় বছর বিচ্ছেদের পর আমি আবার আমার পদ্মায় ফিরে এসে নতুন করে তাকে আমার প্রেম নিবেদন করছি। সে তার সদা-পরিবর্তনশীলতায় এখনও অপরিবর্তিত। যে পাড়ে শিলাইদা রয়েছে, সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথে চলেছে। পাবনার প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, সে বেশি দিন একজায়গায় স্থির থাকতে পারে না।

আজকের দিনটি বড়ো সুন্দর। দু-এক পশলা বৃষ্টির পর রোদ উঠছে—যেন একটি ছোটো ছেলে খালি গায়ে সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠল—তার সারা গায়ে রোদ ঝিলমিল করছে।

। এর পরের চিঠিগুলি পিয়রসনকে লেখা।

কলকাতা, ৬ই মার্চ ১৯১৮

আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের সব লোককেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আমাদের ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ নিজেরা যে ধুলো ওড়ান, তার আড়ালে আমাদের স্পষ্ট দেখতে পান না। প্রতিটি সৎকর্মের প্রযত্নে, প্রতি পদে আমাদের হীনতার অপমান সইতে হয়।

চলতি প্রথাই শুরুতে সহজ মনে হয়। কিন্তু এই সস্তা প্রণালী শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না। সত্যি বলতে জোর খাটানোটা মূর্খতা মাত্র। কারণ দিশা না পেয়ে জোর শেষে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ঠিক এই ভুলই আমাদের শাসকরাও করেন। তাঁরা যে আমাদের জানেন না, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সজাগ, তবুও তাঁরা আমাদের জানতেই চান না। আর তার ফলে শাসক আর শাসিতের মধ্যে যে দুর্নীতিপরায়ণ মধ্যস্থ ব্যক্তিরা কাঁটাঝোপের মতো গজিয়ে ওঠেন, তাঁরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন, যা শুধু শোচনীয় কেন, কম ইতরও নয়।

এইমাত্র থাডানির চিঠি পেলাম। ব্রিটিশ বন্দরগুলিতে শুধু ভারতীয় প্রজাদের যে অপমান আর হয়রানি সহ্য করতে হয়, তার বিরুদ্ধে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই অপমানের ফলে সেই সব প্রজারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকতে লজ্জা বোধ করে। এরকম ঘৃণ্য আচরণ আমাদের দেশের লোকদের স্মৃতির গভীরে জেগে থাকছে, মানবসমাজের উপর এই যে অযথা অবজ্ঞার ভার চাপানো হচ্ছে, স্বয়ং ইতিহাসবিধাতাও একে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

শান্তিনিকেতন, ১০ই মার্চ ১৯১৮

আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন যে আপনার মনে জেগেছে তা আপনার চিঠি পড়েই আমি আন্দাজ করতে পারছি। সব মানুষের জন্য এক পথ নয়; কারণ আমাদের সকলেরই প্রকৃতি এবং অভ্যাস বিভিন্ন কিন্তু মহামনীষীরা সকলে এই একটি বিষয়ে একমত যে, অধ্যাত্ম-মুক্তি পেতে হলে নিজেকে ভুলতে হবে। বুদ্ধ এবং যিশু দুজনেই বলেছেন, আত্মবিলুপ্তি নঙর্থক নয়। এর ভাবাত্মক (positive) দিকটা হল প্রেম।

আমরা শুধু তাকেই ভালোবাসতে পারি, যা আমাদের কাছে গভীরভাবে বাস্তব। বেশির ভাগ লোকেরই অনুভূতি নিজের সম্বন্ধে যতটা তীব্র, অন্যের সম্পর্কে ততটা নয়। আত্মপ্রীতির গণ্ডির বাইরে তাঁরা যেতে পারেন না। এ ছাড়া অন্যদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—তাঁদের মধ্যে কেউ ভালোবাসেন কোনো বিশেষ লোককে, কেউ-বা ভালোবাসেন কোনো বিশেষ ভাবধারাকে।

সাধারণতঃ মেয়েদের এর প্রথম পর্যায়ে ফেলা হয়, আর পুরুষদের স্থান হল দ্বিতীয় পর্যায়ে। ভারতবর্ষে আমরা স্বীকার করি যে, এই ভাগটি যথার্থ। তাই এ দেশের শিক্ষাগুরুরা পুরুষ ও নারীর জন্য দুই ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ঊর্ধ্বায়িত করে আদর্শের

জগতেই মুক্তিলাভ করে। একটি নারী তার স্বামীর সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন-কিছু পায়, যা সব অক্ষমতার উর্ধ্বে। স্বামীভক্তির মধ্য দিয়েই সে অসীমের স্পর্শ পায়, আর এ ভাবে আত্মপরতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। তার ভালোবাসার প্রখর আলোকে পতিপুত্রের মধ্যেই সে পরম সত্যের সন্ধান পায়। সে সত্য দিব্য ও ঐশ্বরিক। জীবনধারণের প্রয়োজনে পুরুষের স্বভাব মেয়েদের তুলনায় খানিকটা নিরাসক্ত। তাই সে শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা ও সৃজনতত্ত্বলোকে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। সত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জানতে পারলে মানুষ যে অখণ্ড আনন্দ লাভ করে, তার জন্য সবই ত্যাগ করা যায়।

কিন্তু মনে রাখা চাই, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভালোবাসা এবং ভাবধারার প্রতি ভালোবাসা—দুইই প্রচণ্ড 'অহং'-বুদ্ধিপ্রণোদিত হতে পারে। তাই তার ফলে মুক্তি পাবার চেয়ে বন্ধনে জড়াবার সম্ভাবনাই অধিক।

সেবার মধ্য দিয়ে প্রতিক্ষণে যে আত্মত্যাগ করা হয়, তাতেই বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক কি ভাবকেন্দ্রিকই হোক, আমাদের কোনো ভালোবাসা যেন শুধুমাত্র তার সৌন্দর্যের এবং সত্যের দিকটাতেই দৃষ্টি না রাখে, বরং জীবনের কাজের মধ্যে রূপ দিয়ে যেন তাকে সার্থক করে। সত্যের যে আদর্শ আমাদের মনে আছে, তার মূর্তি গড়তে পারি কেবল আমাদের জীবন দিয়ে। কিন্তু যে ভাবকে প্রকাশ করতে হবে, তার প্রতি একটা অনমনীয় বিরোধের ভাব অন্যান্য বস্তুর মতো জীবনের মধ্যেও থাকে। সর্বদা সৃজনকার্যে রত থাকলে প্রতিপদে সেই বিরোধের ভাবটি ধরা পড়ে এবং প্রতি আঘাতে তাকে কেটেকুটে গড়ে তুলতে পারি।

আশ্রমের চারপাশে যে সাঁওতালমেয়েরা আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দৈহিক স্বাস্থ্য তাদের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। তার কারণ, তারা কাজের মধ্যেই সক্রিয়ভাবে তাকে গড়ে তুলেছে। জীবনের কর্মতানে বাঁধা হয়ে তাদের শরীরের গঠন ও গতিবিধি সুসমঞ্জস হয়েছে। যে জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করে, তা হল তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা। সর্বক্ষণ ধুলোর মধ্যে থেকেও তা ক্লিন্ন হয় না। আমাদের মেয়েরা নানারকম দামী প্রসাধনের প্রলেপে সাজিয়ে তাদের স্বাস্থ্যহীন দেহকে কৃত্রিম চাকচিক্য দেয়। কিন্তু পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহের সাবলীল গতির মধ্যেই যে স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে—তা তারা পাবে কোথায়?

আমাদের আধ্যাত্মিক দেহ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অতি সাবধানে সবরকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আত্মার শুচিতাও রক্ষা করতে পারি না, তাকে সৌন্দর্যও দিতে পারি না। কিন্তু সংসারের ধুলোবালি-উত্তাপের মধ্যে থেকেই তার অন্তরতম সত্যকে সতেজরূপে দীপ্যমান করতে পারি।

এবার একটু থেমে গিয়ে ভেবে দেখি আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দেওয়া হল কি? তার উত্তর হয়তো দিতে পারি নি, কারণ আপনি আমার কাছে কি চেয়েছেন তা ঠিক করে বোঝা মুশ্‌কিল। আপনি নৈর্ব্যক্তিক কর্ম ও নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের কথা বলেছেন। তার পরে জানতে চেয়েছেন, আমার মতে এর কোন্‌টি শ্রেয়তর। সূর্য আর তার আলো যেমন—তেমনি এ দুটিও আমার চোখে সমান। কারণ প্রেমের প্রকাশ হয় কার্যে। ভালোবাসা যেখানে নিষ্ক্রিয়, তার জগৎ সেখানে মৃত।

শান্তিনিকেতন, ৬ই অক্টোবর ১৯১৮

আশ্রমে এই বছরকার এই শেষ পর্যায়ে আমি সারা সকাল স্কুলের ক্লাস নিচ্ছি আর বাকি দিনটা স্কুলপাঠ্য বই লিখে কাটাচ্ছি। আমার যে প্রকৃতি তাতে এ ধরণের কাজ আমার উপযোগী নয় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু তবু আমি এ কাজের মধ্যে উৎসাহ ও বিরাম— দুইই খুঁজে পেয়েছি। মনের নিজস্ব একটা ভার রয়েছে— কাজের প্রবাহে তাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে তবে সেটা হাল্‌কা হয়। সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পারি এমন কোনো চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে পারলেও তা হয়। কিন্তু চিন্তাধারা নির্ভরযোগ্য নয়, তারা তো সময়ের তালিকা ধরে চলবে না— তাদের জন্যে অপেক্ষায় থেকে কেবল দিনগুলি ভারাক্রান্ত হবে।

আজকাল আমার মনের এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমি আর ভাবের প্রেরণা আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। তাই আমি এমন কাজের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছি যা খামখেয়ালী নয়, যার প্রতিদিনের নিয়মিত সরবরাহ ব্যাহত হয় না। সে যাই হোক্‌, পড়ানোটা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর বলে আমার মনে হয় না। কারণ জীবনে জীবন যোগ করার কাজ কখনও নিষ্প্রাণ হতে পারে না। আর আমি তো ছাত্রদের সজীব প্রাণী হিসেবেই দেখি।

দুঃখের বিষয়, কবিরা বেশি দিনের জন্য পাগলামি থেকে বিরতি পায় না। নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকলেই তারা একেবারে আর সবরকম কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আছে ঘূর্ণির বেগ, ভবঘুরে ভাব তাদের রক্তে। এখনই সেই পলাতক জীবনের ডাক আমি পেয়ে গেছি— সে এক ধরণের কুঁড়েমির নেশা। একটি দুরন্ত স্কুল-পালানো মনোভাব আমার ভিতরকার স্কুলমাস্টারটিকে প্রায় প্রলুব্ধ করে এনেছে।

দু-এক দিনের মধ্যেই এই জায়গা ছেড়ে যাব। বাইরে থেকে দেখতে গেলে তার কারণ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসছে কিছুদিন ধরে। কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি, আসল কারণটি হল অকারণ। সেই আমার চির-অতিথি, কাজ-পালানো বৃত্তি, সেই আমাকে ডাক দিয়েছে। বিধিবদ্ধ সব কাজের গণ্ডি ভেঙে সে আমাকে কেবলই টেনে নিয়ে যায়। ইচ্ছা হয়, এমন-একটা কল্পলোক যদি খুঁজে পাই, যেটা কেবল ছুটি দিয়ে ভরা। সেটা কল্পনাপ্রবণ লোকদের 'পদ্মসেবীর রাজ্য' নয়— যেখানে সপ্তাহের সব দিনগুলিই রবিবার। সে এমন জায়গা যেখানে রবিবারের দরকারই হয় না। সেখানে বিরাম কাজেরই অঙ্গ, কর্তব্য খেলার ছল— যেন বৃষ্টি-ভরা মেঘ, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না যে তার কোনো উদ্দেশ্য আছে।

শান্তিনিকেতন, ১১ই ডিসেম্বর ১৯১৮

কাল সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার আহ্বান এলেও আমি সেখানে যাব না, এ কথা কি সত্যি? আমি লিখেছি যে, কোনো নিমন্ত্রণে যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে সেটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অনুচিত। দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্য নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব, এই একান্ত আশা আমার আছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। ন্যায়ের জন্য

দুঃখভোগ— তাও আমাদের বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু নামের ভেদে প্রতিবেশীর সঙ্গে ক্ষুদ্র কলহ -বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়।

আত্মপরভেদ হল মায়া। সেই মোহ কেটে গেলে সৃষ্টির বুকের মধ্য থেকে যে দুঃখের হলাহল নিয়ত ফেনিয়ে উঠে অপার আনন্দ-সমুদ্রে মিশে যায়— সেই দুঃখের স্বাদ পাই আমরা নিজ নিজ জীবনের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে।

আমরা যখন নিজেদের অনন্তের মধ্যে না দেখতে পাই, নিজের দুঃখকে একান্তই নিজের বলে জানি— তখন জীবনকে ঠিকভাবে দেখতে পাই না; তাই তার ভার দুর্বহ হয়ে ওঠে। বুদ্ধের উপদেশটির সত্যতা ক্রমশঃ আমার কাছে খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটি হল এই— সমস্ত দুঃখের মূলে আছে আত্মসচেতনতা। দুঃখের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মুক্তি পেতে যদি চাই, তবে সর্বানুভূতির অনুশীলন প্রয়োজন।

দুঃখের পথেই আমাদের মুক্তি আসবে। বেদনার চাবি দিয়ে আনন্দের সিংহদ্বার উন্মোচন করব। আমাদের হৃদয় একটি উৎসের মতো— একক জীবনের সংকীর্ণপথে যখন চলে তখন সন্দেহে ভয়ে বেদনায় পরিপূর্ণ থাকে। তখন তার পথ অন্ধকার, পথের শেষ জানা নেই। কিন্তু যখন খোলা জায়গায় সমস্তর বুকের মধ্যে এসে পড়ে তখন তার পথ হয় আলোয় ঝলমলে, আর সে মুক্তির আনন্দে গান গেয়ে ওঠে।

—

সি. এফ. এণ্ডরুজ -লিখিত ভূমিকা

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে যখন আমরা ফিজি থেকে ফিরলাম, কবির দূরপ্রাচ্যে যাবার বাসনা তখন আরও প্রবল হয়ে উঠল। সেই যাত্রায় তিনি পিয়রসন, শিল্পী মুকুল দে আর আমাকে তাঁর সঙ্গী করে নিলেন। তোষা-মারু জাহাজে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। বঙ্গোপ-সাগরে আমাদের জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছিল। সেবার অতি কষ্টে সেই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। চীনে আমরা খুব অল্পদিনই ছিলাম। কারণ জাপানের লোকেরা তাঁদের দেশে কবির আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এশিয়ার জন্য সম্মান নিয়ে এসেছেন বলে প্রথম দিকে তাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

জাপানে গিয়ে তিনি তার চার দিকে দেখলেন, কঠোর সাম্রাজ্যবাদ উদগ্র হয়ে উঠেছে। খুব জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে তিনি পূর্বপশ্চিমের সত্যিকার মিলনের তাঁর যে আদর্শ সেটি তাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ তখন কার্যকর হল না — কারণ যুদ্ধের সময়ে এ রকম শান্তিকামী শিক্ষা খুব ক্ষতিকর হবে বলে জাপানীরা মনে করলেন। ভারতীয় কবিকে পরাজিত জাতির মুখপাত্র বলে তাঁদের ধারণা হল। সেজন্য যতখানি দ্রুত তাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল ততখানি তাড়াতাড়ি তা নিবে গেল। শেষপর্যন্ত তাঁকে প্রায় কোণ-ঠেসা করে রাখা হয়েছিল— যে উদ্দেশ্য নিয়ে দূরপ্রাচ্যে গেলেন, তা অপূর্ণই রয়ে গেল। এই সময়েই তিনি THE SONG OF THE DEFEATED কবিতাটি লেখেন, যার আরম্ভ—

My Master bids me, while I stand
at the wayside, to sing the song of defeat.
For that is the bride whom He woos in secret.[১]

এবারকার গ্রীষ্মের সময়টা জাপানে বৃথাই নৈরাশ্যের মধ্যে কাটল। সেখানে সামরিকতার আদর্শ তখন সর্বোচ্চ চূড়ায় বিরাজ করছে। যুদ্ধের আগে কবির মন যেরূপ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল আবার সেই অবস্থা ফিরে এল। কবির সমস্ত অন্তপ্রকৃতি সেই যুগের দুর্দম আক্রমণশীল (aggressive) মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল। *Nationalism* বইখানার প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এই সময়ে জাপানেই লেখা হয়েছিল। সেখানা পড়লে কবির সে সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। এই ভাষণগুলি জাপানে দেওয়া হয় কিন্তু ইউরোপে সেগুলো আবার প্রকাশিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে রোমাঁ রোলাঁ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সেগুলি আবার ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি আবার একবার জাপানে যান তখন যুদ্ধের সময়কার এই বিরুদ্ধ মনোভাব অনেকটা দূর হয়ে গেছে। তখন তিনি চীনে এবং জাপানে এমন একদল লোক পেলেন যাঁরা তাঁর বিশ্বজনীন বাণী শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ছিলেন।

জাপান থেকে কবি আমেরিকায় গেলেন—সঙ্গে গেলেন পিয়রসন ও মুকুল দে। আমি আশ্রমে ফিরে এলাম। আমেরিকায় তাঁর দিনগুলি কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, সেখানে তাঁর অনেক নতুন বন্ধু হল। তাঁদের কাছে খুব সমাদরও তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর এই যাত্রাটি সবরকমেই সার্থক হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে চীনে জাপানে কেবল স্টীমারে কয়েকদিন থেকেই তিনি দেশে ফিরলেন।

তিনি আশ্রমে ফেরার অল্প পরেই আমাকে আবার ফিজি যেতে হল। সেবার যাবার কারণ ছিল, ভারতীয়দের চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে যে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হল, তা বিধিবদ্ধ করা। ১৯১৭ আর ১৯১৮ এই দুটি বছর কবি শান্তিনিকেতনেই স্থিরভাবে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ কিভাবে প্রশস্ত করবেন তারই পরিকল্পনা তখন তাঁর মনের মধ্যে চলছিল। এর পরের অধ্যায়গুলির মূল বিষয়ই হবে তাই। কারণ ক্রমশঃ এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

১৯১৮র গোড়ার দিকে ফিজি থেকে ফিরে আমি আশ্রমে এলাম। তার পর থেকে আমি সর্বদা কবির সঙ্গেই থেকেছি—তাই আর চিঠিপত্র পাবার কারণ ঘটে নি। কিন্তু ইংলণ্ডে পিয়রসনের কাছে তিনি এই সময়ে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি দেখলে তাঁর এই সময়কার চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসম্পর্ক থাকে।

অনুবাদ শ্রীমলিনা রায়

---

১ আমার প্রভুর গোপন আহ্বানের সুরে সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি, কণ্ঠে নিয়েছি হারমানার গান। সেই বেদনার গানে তিনিও এই ধুলায় আপনি এসেছেন নেমে।

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা ৯। পনর টাকা।

ভারতে শক্তিসাধনা। শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী। এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা ১২। সাত টাকা।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'দুর্গা' নামে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেন, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য আমাদিগের পূজিতা দুর্গা কি রাত্রি না মহাদেবের ভগিনী না ব্রহ্মবিদ্যা না অগ্নিজিহ্বাই" ? আজ প্রায় একশ বৎসর পরে আধুনিক পণ্ডিতও সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। এই দেবী পৃথিবীমাতা না পর্বতকন্যা, পৌরাণিক না লৌকিক— এর কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমান হিন্দু সমাজে পূজিতা দেবী নানা বিভিন্ন উৎসজাত ধ্যানলব্ধ কল্পনার সমন্বয়। এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দেখানোর চেষ্টার ত্রুটি গ্রন্থকার করেন নি ; কিন্তু বোধহয় সম্পূর্ণ সম্ভব নয় বলেই শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রে পুরাণে কাব্যে সংগীতে তার বর্ণনা করেই নিরস্ত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে দেবীর উৎস সন্ধান করেছেন, যতদূর মনে হয়, সে যুগে এই অনুসন্ধিৎসা সমসাময়িক ধর্মান্দোলন থেকেই জাগ্রত হয়েছিল। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও লোকধর্মের পার্থক্য নিয়ে সেকালের ধর্মনেতারা চিন্তা করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি সত্য সত্যই এই প্রেরণাবশেই দুর্গার প্রাচীনতম উল্লেখের সন্ধান করে থাকেন বেদে এবং মহাভারতে, তবে আধুনিক গবেষণা যে তার থেকে আলাদা তা স্বীকার করতেই হবে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের গবেষণানিষ্ঠা আজও অনুকরণযোগ্য। নির্মোহ নিরাসক্তিই একালের জ্ঞানসাধনার বৈশিষ্ট্য যদি বিষয়টি ধর্মসম্পর্কীয়ও হয়। অসুরনিধন কাহিনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেছেন "শ্রীশ্রীসত্যদেব এই অসুরনিধন কাহিনীকে সাধনসমররূপে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু সে ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই।"

এই ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিই লেখকের মূল অভিপ্রায়। সে বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তথ্যসন্ধানী ঐতিহাসিকের মতই। কিন্তু বর্তমান বিষয়টি যেমন জটিল তেমনই শ্রমসাধ্য। সংস্কৃত বেদ পুরাণ কাব্য মন্থন করে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর পদ্ধতিকে কিছু সরল করে নিয়েছেন, কারণ আর্যসভ্যতাকেই তিনি দেবীরূপের একমাত্র উৎস বলে মেনে নিয়েছেন। বস্তুত গ্রন্থকার আর্য-অনার্য ভেদের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।—পৃ ১০ দ্রষ্টব্য। অথচ ভারতীয় সভ্যতা যে অবিমিশ্র নয়, এ সম্বন্ধেও গ্রন্থকার সম্পূর্ণই অবহিত। তিনি বলেছেন—

'গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতেই উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু আর্যপ্রভাব দেখা দিয়াছে ; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ বৈদিক আর্যপ্রভাব বলিতে পারি না— একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দুপ্রভাব।'

'কিছু কিছু আর্যপ্রভাব' আসবার আগে তা হলে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি কি ছিল ? আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির ভেদের সংজ্ঞা লেখকের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অবৈদিক লোকসমাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ হয় তো সেইজন্যই অনাবশ্যক মনে হয়েছে। এই পদ্ধতি কি সকলে স্বীকার করে নেবেন ?

আসল কথা, আমাদের মনে হয় যে-সব বিষয় একটি জাতির সমগ্র মানসজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা, সেই-সব বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সেই জাতির আরও নানা উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকে। বিশেষত ভারতবর্ষের ধর্মচেতনা অন্যনিরপেক্ষ নয়। আমাদের আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তাভাবনা, দৈনন্দিন জীবনাচরণ, সমাজগঠন— এক কথায় সমগ্র জীবনবোধের সঙ্গে ধর্মসাধনার যোগ। অতএব দেবী যদি আমাদের ধর্মানুভূতির মধ্যে অতি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকেন, তবে স্বভাবতই ভারতীয় জাতি-প্রকৃতির উপাদানগুলি যথাসম্ভব পরীক্ষা করা দরকার। এজন্য ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের অনুসন্ধানের সহায়ক হবে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের গ্রন্থে তার চিহ্ন আছে, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা সংশয়ের স্তর অতিক্রম করে যেতে পারে নি। তিনি লিখেছেন—

'আজকাল আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সন্ধান পাইতেছি বটে ; কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল তিব্বত ভূটান কামরূপ এবং বাঙলাদেশ— হিমালয় পর্বত-সংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয়-সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তন্ত্রবর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীও আমাদের অনুমানের পরিপোষক বলিয়া মনে হয়।'— পৃ ১২

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বাণিজ্যের সূত্রে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষভাগে চীনদেশে 'সিন' রাজবংশ রাজত্ব করে। 'সিন' শব্দ থেকেই ভারতীয় ভাষায় চীন শব্দের উদ্‌ভব। কালিদাস লিখেছেন 'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য'। সুতরাং লেখক যখন ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলকে চীন বলে অনুমান করতে চান, তখন স্বভাবতই অধিকতর তথ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয়। চীনাচার বলতে যে তান্ত্রিক পদ্ধতি বোঝায়, তার যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারাই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ঐতিহাসিকেরা এমন অনুমানও করেছেন চীনাচার চীনদেশের তাও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত।

'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থটির অবশ্যস্বীকার্য বিশেষত্ব সংস্কৃত ও পরবর্তী ভারতীয় ভাষায় দেবীকল্পনার বিবরণাত্মক ইতিহাস। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত তার চেয়ে অধিকতর শাস্ত্রীয় উল্লেখের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। তবে ভাণ্ডারকর যে মূলসূত্রটি অবলম্বন করেছিলেন—

They are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions, but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.'[১]

অধ্যাপক দাশগুপ্তের অবলম্বিত সূত্র তার থেকে আলাদা নয়। ভাণ্ডারকর দেবীকল্পনায় তিনটি প্রধান উপাদানের কথা বলেছিলেন, শিবপত্নী উমা, হৈমবতী ও পার্বতী, অরণ্যবাসিনী দেবীশক্তি।

১ *Vaisnavism, Saivaism etc.* (1913) p. 144.

অধ্যাপক দাশগুপ্ত দেবীর বিবর্তনে ছয়টি ধারা লক্ষ করেছেন, পৃথিবী দেবী, পার্বতী উমা, দক্ষতনয়া সতী, দুর্গা, চণ্ডিকা এবং কালীদেবী। এদের প্রতিটি সম্বন্ধেই গ্রন্থকারের আলোচনা অতিশয় সুষ্ঠু। আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক নতুন চিন্তার খোরাকও তিনি দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, দেবীর বিভিন্ন রূপের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যে-সব ক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর স্বীকৃতিও খুব স্পষ্ট।

'দেবীর বিচিত্র ইতিহাস' নামে পঁচাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ অধ্যায়টি গ্রন্থকারের চিন্তাশক্তি ও শ্রমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পরবর্তী তেরোটি অধ্যায়ে তিনি সংস্কৃত ও উত্তর-ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যে দেবীর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, দেবী বলতে শক্তিদেবীকে বোঝায় এবং সেদিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীরা লেখকের মূল বক্তব্যের চমৎকার দৃষ্টান্তস্থল হয়েছে—

'ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলা দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে যে সকল দেবী আত্মগোপন করিয়া ছিলেন তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে— প্রথমত উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া; দ্বিতীয়ত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া। ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ বিশেষ দেবীর নিজস্ব শক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাহার সহিত এই দেবীগণের অভিন্নতা সম্পাদন করিয়া।'— পৃ ১৭১

সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে যে-সব দেবী আত্মগোপন করে ছিলেন, তাদের সঙ্গে পৌরাণিক মহাদেবীর যোগসাধন কিভাবে করা হয়েছে, গ্রন্থকার তার বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবী যে মূলত বাঙলাদেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী, কাহিনী বিশ্লেষণ করে লেখক এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা দেখিয়েছেন। এতে-অন্তত এটা বুঝতে পারি যে ভারতীয় শক্তিসাধনার ধারায় একটি দেবীই যে বিবর্তিত হয়ে এসেছেন তা নয়, বস্তুত বিভিন্ন যুগে প্রয়োজন মতো দেবীকে গড়ে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।' বাঙলার শক্তিদেবতা স্বর্গের অলৌকিক মহিমা এবং দার্শনিক তত্ত্বের আবরণ ত্যাগ করে মানবীয় কল্পনাতেই দেখা দিয়েছেন, গ্রন্থকার তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে দেবীর আলোচনাপ্রসঙ্গেও তিনি দেবীর মানবীকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পদসংকলন থেকেই তিনি এই বিবরণ উদ্ধার করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশের এগুলি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এইসব সংকলনে এবং অনুরূপ অন্যান্য সংকলনে রাধাকৃষ্ণের যে টুকরো টুকরো চিত্র পাই, এর পিছনে ধর্মচেতনার বিশেষ কোনো ইঙ্গিত নেই। আমাদের মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের রাধাকাহিনীতে মূলে এ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মঙ্গলকাব্যের দেবীকে যেমন পৌরাণিক মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করে দার্শনিক এবং ধর্মীয় মর্যাদা দেবার চেষ্টা হয়েছে, বৈষ্ণবকাব্যের দেবীকেও তেমনি দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে উচ্চতর ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য রচনার কাহিনী তারই একটি সমান্তরাল দৃষ্টান্ত।

বাঙলা শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে দেবীর রূপ শুধু মাধুর্যময় নয়, বাঙালি সংসারের হৃদয়রসে অভিষিক্ত। আগমনী-বিজয়ার গান ছাড়াও 'ভক্তের আকুতি' বা 'মা কি ও কেমন' (এই নামকরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত শাক্ত পদাবলীর) পর্যায়ের গানগুলিতে ভক্তহৃদয়ের প্রত্যক্ষ বেদনা রূপ লাভ করেছে। স্বভাবতই সেখানে বাঙালি সমাজজীবনের কিছু ছায়াপাত হয়েছে। কবির কণ্ঠেও ভাষা পেয়েছে শক্তিদেবীর একটা অতি ঘনিষ্ঠ রূপ।[২] অবশ্য এই যুগের শাক্তসংগীতে পৌরাণিক প্রভাব একটু বেশি পড়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেও পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকের ধ্বংসলীলার অধিষ্ঠাত্রীকে পৌরাণিক কালিকার সঙ্গে যুক্ত করে নেবার প্রবণতা থেকেই এসেছে। তা ছাড়া যা থাকে, সেটা দেবীর একটি অপূর্ব স্নেহকোমল রূপ, যা অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে বৈষ্ণবপ্রভাবজাত। মঙ্গলকাব্যের দেবীর আলোচনার মতই এই আলোচনাটিও উৎকৃষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সাহিত্যের পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে তিনি যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা ও বাস্তব পটভূমি বিশ্লেষণে তেমনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার আলোচনার ধারা সম্পূর্ণতার জন্য উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টেনে এনেছেন। আধুনিকপূর্ব সাহিত্যে শক্তিদেবী জীবনবোধের কেন্দ্রীয় বিগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন, আধুনিক যুগের সাহিত্যে তাঁর সেই স্থান নেই। রূপকার্থে ছাড়া সাহিত্যে শক্তিদেবীর কল্পনা বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি বলেই মনে হয়। আমাদের স্বদেশচেতনামূলক সংগীতগুলি এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আলোচিত হয়েছে।

অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই গ্রন্থখানি এই বিষয়ের একটি সুসম্বদ্ধ আলোচনা। উত্তর-ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য আলোচনার দ্বারাই বিশেষ করে সম্পূর্ণতা এসেছে। দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষার সঙ্গে অপরিচয় হেতু তিনি তাদের আলোচনা করেন নি বটে কিন্তু পাঠকদের সেই প্রত্যাশা অবশ্যই থাকবে।

শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তীর 'ভারতে শক্তিসাধনা গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে রচিত নয়। সংস্কৃত বেদ পুরাণ কাব্য এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি শক্তিসাধনার নানা বীজ সংগ্রহ করেছেন এবং এ বিষয়ে পূর্বোক্ত গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের মিলও আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে এই শ্রেণীর উপাদান অধিকতর পরিমাণে সংগৃহীত হলেও এতে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা নেই। শক্তিসাধনার মূল যে বেদ প্রভৃতি আর্যশাস্ত্রেই নিহিত— এই পূর্বকল্পিত সূত্রটি ছাড়া শক্তিসাধনার ঐতিহাসিক প্রকৃতি বা শ্রেণীসম্বন্ধ নির্ণয়ের বিশেষ প্রয়াস এতে দেখা গেল না। কিন্তু গ্রন্থখানি বহু তথ্যের সংকলন— এটাই এর বৈশিষ্ট্য।

ভবতোষ দত্ত

কবিকণ্ঠ। শ্রীসন্তোষকুমার দে ও শ্রীকল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। বিচিত্রা প্রকাশনী, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, এখনো ব্যাপকভাবে চলছে। কিন্তু শ্রীসন্তোষকুমার দে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও কৌতূহলাত্মক দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, সে হল ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের সংগীত আবৃত্তি ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর এ দেশে ও বিদেশে নানা সময়ে যে-ভাবে রেকর্ডীকৃত হয়েছে তার একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রচনা। আমাদের

---

২ গ্রন্থকার লিখেছেন, শাক্তসংগীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ (পৃ ২০৬)। গানের বিশিষ্ট একটি সুর সৃষ্টি করা তাঁর কৃতিত্ব হলেও শাক্তপদ রচনার তিনিই প্রথম কবি কিনা সন্দেহ। কারণ রামপ্রসাদের সমসাময়িক কালেই একাধিক শাক্তপদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল। প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারিতে মুহুরিগিরি করতেন বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন (পৃ ২২৯)। কিন্তু রামপ্রসাদের আদি জীবনীকার ঈশ্বর গুপ্ত স্পষ্টতই বলেছেন রামপ্রসাদ কলকাতায় মুহুরিগিরি করতেন।

দেশে এ ধরণের বইয়ের আদর হবে কিনা জানি না, তবে এ রকম বই পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত হলে যথেষ্ট আদর হত। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থান থেকে এই বইয়ের উপাদান সংগ্রহে যে দুরূহ শ্রম, ঐকান্তিক চেষ্টা ও দুর্লভ নিষ্ঠার পরিচয় মেলে, তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। এই ধরণের গবেষণা যত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

বইটি পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রজীবনী-রচনার দিক থেকে এই বইয়ের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার্য। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁদের এই বইয়ের সহায়তা অবশ্যই নিতে হবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচকের কাছেও এই বইয়ের নানা তথ্য দামী বলে প্রতীয়মান হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি— হিন্দুস্থান রেকর্ডে (H 342) রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' কাব্য থেকে দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি আবৃত্তি-দুটির সূচনায় কয়েকটি কথা বলে নিয়ে তারপর মূল কবিতা আবৃত্তি করেন। সূচনায় ব্যক্ত ঐ কথাগুলি কোথাও বিধৃত হয়ে নেই। ঐ কবিতা দুটি হল, 'বীরপুরুষ' ও 'লুকোচুরি'। এদের ভূমিকা স্বরূপ কবি যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, সম্পাদক সেগুলি সযত্নে চয়ণ করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে পাশ্চাত্যদেশ যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল এবং আজও জানায়, তার বহু দৃষ্টান্ত এই বইয়ে আছে। তার মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বেছে নিচ্ছি।— ১৯২১ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রেকর্ডখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবীন্দ্রানুরাগী বৈজ্ঞানিকেরা সেই ভাঙাচোরা রেকর্ডকে বহু কষ্টে আবার তার পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনেন। পূর্ব-জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৯ সালে পণ্ডিত নেহরুকে ঐ রেকর্ডখানি পাঠিয়ে দেন।

বইখানির আরও দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আমাদের দেশে প্রথমে বাজত ফনোগ্রাফ যন্ত্রে মোম লাগিয়ে তৈরি করা রেকর্ড (cylindrical wax record)। সেই মোমের রেকর্ড লুপ্ত হল, এল ডিস্ক রেকর্ড। বাংলা দেশে প্রথম এইচ বসু (হেমেন্দ্রমোহন বসু) অ্যাডিসনের ফনোগ্রাফ আনিয়ে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গান রেকর্ড করান, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও কয়েকখানি গান ছিল। এই ধরণের রেকর্ড করাবার ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অপর বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের রেকর্ড ও রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড উভয়ের নির্ভরযোগ্য পঞ্জী-সংকলন। আশা করব, কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য চিত্রসমৃদ্ধ এই বইখানির যথোচিত সমাদর হবে।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই—
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই ॥
বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহারা নাচে—
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে,
সারাদিন বিরামহীন ফিরি যে তাই ॥
আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান,
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।
কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে
স্বপ্নপ্রদোষে— আমি তারে যে চাই ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গা মা II পা না -র্সা । র্সা -নর্রা র্সা I র্সা -ণা -ধা । -পা -পা -রা I
আ মি কী গা ন্ গা ০০ ব যে ০ ০ ০ ০ ০

I রা রপা মগা । রা -া -া I { পা -ণা ণা । ণা -া ণধা I
ভে বেং নাং পা ০ ই মে ঘ্ লা আ ০ কাং

I ধর্সা -ণর্সণা -া । -ধা -পা -া I পা ধা ণা । ধা -পা ধা I
শেং ০০০ ০ ০ ০ ০ উ ত লা বা ০ তা

I পা -া -া । -া -া -া } I পা না না । র্সা -া -া II
সে ০ ০ ০ ০ ০ খুঁ জে বে ড়া ০ ই

II { মা পা পা । পনা -া না I না -া -া । না -া -পা I
ব নে র গাং ০ ছে গা ০ ০ ছে ০ ০

I পা না র্সা । র্সর্রা -া -র্সনা I র্সা -া -া । -া -া -মা I
জে গে ছে ভাং ০ ০০ ষা ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা পা । ধা ণা -ণধা I পা -া -ধা । ধা ধণা -ণধা I
ভা ষা হা রা না ০ চে ০ ০ ম নং ০

I ধপা পা ধা । ধণা -া -ণধা I পা -া -া । -া -া -া } I
ও দে র কা ০ ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

I র্জ্জা -া র্জ্জা । র্জ্জর্রা র্জ্জা -র্মা I র্রা র্রা র্সা । র্সা -র্রা -না I
চ ন্ চ লং তা র্ রা গি ণী ষা ০ ০

I র্সা -া -া । -া -া -া I র্সা র্সা -র্রা । র্সা -র্রা -ার্স I
চে ০ ০ ০ ০ ০ সা রা ০ দি ০ ন্

I র্সা র্সা র্সণা । ণধা -র্সা -ণা I ধা ণা ধা । পা -া -া I
বি রা ম হী ০ ন্ ফি রি যে তা ০ ই

I মা পা -র্সা । র্সা -নর্রা র্রর্সা I ণর্সা -ণা -ধা । -পাধ -মপা -রা I
কী গা ন্ গা ০০ ব যে ০ ০ ০ ০ ০

[ণা ধা মা]
I রা রপা মগা । রা -া -া I { মা পা পা । পা -ণা ণা I
ভে বেং নাং পা ০ ই আ মা র অ ঙ্ গে

I ধা ধা মা । পা -ণা ণা I পধা ধা মা । পা -া -া I
সু র ত র ঙ্ গে ডে কে ছে বা ০ ন্

I পণা ধা ণা । ণা ধা ণা I ধা ণা ধা । ধর্সা -ণর্সণা -ধণা } I
র সে র প্লা ব নে ডু বি য়া যাং ০০০ ই

I গা মা পা । পা পা ধা I না র্সা নর্সর্রা । নর্সা পা ধা I
কী ক থা র য়ে ছে আ মা রং ম নে র

I না -া না । র্সা -া -া I পা -া ধা । না -া না I
ছা ॰ য়া তে ॰ ॰ স্ব প্ ন প্র ॰ দো

I র্সা -া -া । -া র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা । র্রর্মা -র্জ্ঞর্মর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞা I
ষে ॰ ॰ ॰ আ॰ মি তা রে যে॰ চা॰ ॰॰॰ ॰ই

I র্রা সা -পা । পর্সা -নর্রা র্রর্সা I ণর্সা -ণা -ধা । -পাধ -মপা -রা I
কী গা ন্ গা॰ ॰॰ ব যে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I রা রপা মগা । রা -া -া II II
ভে বে॰ না॰ পা ॰ ই

সম্পাদকের নিবেদন

সংস্কৃতি বা কালচার কথাটির প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের সকলের ধারণা হয়তো তেমন স্পষ্ট নয়। এইজন্যেই সংস্কৃতির অভিমান নিয়ে অনেক সময়ে অনেককে অনেক কথা বলতে শোনা যায়। নিজের মনকে ও সমাজকে সংস্কার করার উপযোগী আবহাওয়া ও মনোভাব গড়ে তুলবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারলে তবেই তাকে সম্ভবত সংস্কৃতি বলা যায়। ধনের ঐশ্বর্য নয়, মনের ঐশ্বর্য যতই বাড়িয়ে তোলা যাবে ততই সংস্কৃতির কাছাকাছি আসা যাবে। যুগে-যুগে কালে-কালে সর্ব-দেশের মনীষী এই কাজ করে গিয়েছেন বলেই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কিছুকাল আগে পরিণত-বয়সে কবি রবর্ট ফ্রস্ট মারা গিয়েছেন। ফ্রস্ট সম্বন্ধে শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধ প্রকাশ করে আমরা পরলোকগত কবিকে স্মরণ করলাম। এবং সেইসঙ্গে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র -কৃত ফ্রস্টের একটি কবিতার অনুবাদও প্রকাশ করা হল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু সেই মূল ভাষাটির চর্চার ব্যবস্থা বর্তমানকালে সম্যক্ ভাবে হচ্ছে কি না—এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এক সময়ে টোলে-চতুষ্পাঠীতে এই ভাষা শিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, এখন সে ব্যবস্থা অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে। এইজন্যে সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের রচনাটি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখার উপায় ও উপকরণ রূপে গণ্য করা যায়।

শ্রীসুকুমার সেনের 'ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন' প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত যতিচিহ্ন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'রাগদর্পণরচয়িতা ফকীরুল্লাহ্' ও শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'ইব্নে-খল্দুন্ ও তাঁহার ইতিহাস-দর্শন' স্বল্প-আলোচিত দুইটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে বলে আশা করা যায়।

স্বীকৃতি

রবর্ট ফ্রস্ট্রের চিত্রটি দিয়েছেন ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১ · ১৮৮৬ শক

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতকে উদ্বোধনসঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ই ভাদ্র ১৩২১

রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এই অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। 'সম্পাদকের নিবেদন' দ্রষ্টব্য

রামেন্দ্রসুন্দর-প্রসঙ্গ

সাহিত্য-পরিষদের সংস্রবে আমার রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমি যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন সাহিত্যানুরাগী, দেশহিতৈষী, সুবিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি আমি তাহার পূর্বে তেমন ধারা অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম।

তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল— সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তাশীলতা। তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ, সুমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্য এখনও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

তিনি যাহা কিছু বলিতেন বা লিখিতেন, তাহা তাঁহার অকৃত্রিম হৃদয় হইতে বাহির হইত এবং তাহা সকলই সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার অমায়িক সরল স্বভাব সকলেরই প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নহে, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের আদর্শস্থানীয়।

তাঁহার বিষয়ে আমি কত আর বলিব? তিনি যাওয়াতে আমাদের দেশের সাহিত্যগগনের একটি মহোজ্জ্বল তারকা অস্তমিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার প্রীতির বন্ধন আমি যেরূপ প্রগাঢ়রূপে অনুভব করিতাম, তাঁহার অবর্তমানে সে স্থানটি আর কিছুর দ্বারা পূরণ হইবার নহে। তাহা হৃদয়ের বস্তু, মুখে বা লেখনীতে প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েকদিন পূর্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূলপত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাই মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত -সংকলিত 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থ (১৩২৭) থেকে গৃহীত

১৩ এপ্রিল (১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩০ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' পদবী ত্যাগ করে তদানীন্তন ভাইসরয়কে পত্র দেন। এর কয়েকদিন পরে ৬ জুন তারিখে রামেন্দ্রসুন্দর পরলোকগমন করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৯১ সাল। আমি কটকে থাকি। জানুআরি মাসের প্রথম সপ্তাহে, বোধ হয় ৪ঠা, বুধবার কলিকাতায় প্রথেরো (Prothero) সাহেবের বাড়ীতে রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রথম দেখি। আমি সেবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। প্রথেরো সাহেব প্রধান পরীক্ষক। তিনি ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে মাদ্রাসা কলেজের সম্মুখের বাড়ীতে থাকিতেন। সে বাড়ী মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপালের জন্য গবর্মেণ্ট ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমি মাদ্রাসা কলেজে দুই বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে বাড়ীটি আমার জানা ছিল। গাড়ী-বারান্দার উপরের ঘরে প্রথেরো সাহেব বসিয়া ছিলেন। আমি উপরে উঠিয়া দেখি, পেণ্টুল-চাপকান-পরা, কপাট-বক্ষ, সংহতপেশী, সপাট-পাণ্ডুর-মুখমণ্ডল, অপরিস্ফুট-গুম্ফ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ক্ষণমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নামিয়া গেলেন। প্রথেরো সাহেবের সহিত দুই-চারিটা কথার পর আমিও চলিয়া আসিলাম। পথে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কে? ইহাঁকে ত বাঙ্গালী মনে হইতেছে না! তৎকালে প্রবেশিকা-পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের চারিজন মাত্র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাঁদের নাম জানিতাম। বুঝিলাম, তাহাঁদের মধ্যে ইনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাহাঁর সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় তিনবারের অধিক হয় নাই, কিন্তু পত্র-ব্যবহার অনেক হইয়াছিল।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিষৎপত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি আমার নাম সদস্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন। পত্রিকায় দেখি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের যত্ন হইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০১ বঙ্গাব্দের পরিষৎপত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিচার্য বিষয় তিনটি—(১) বিজ্ঞানে পরিভাষার প্রয়োজন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা নির্মাণ-বিধি। এই তিন বিষয়ে তাহাঁর আলোচনা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী, কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নবীনের অনুরাগী। তাহাঁর ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল; বাগ্‌রীতি প্রসন্ন। পরে তাহাঁর নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তাহাঁর হস্তাক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহাঁর চিন্তাপ্রবাহ দ্রুত প্রধাবিত হইত; তাহাঁর লেখনী অনুসরণে অসমর্থ হইয়া বাংলা সকোণ অক্ষরকে তরঙ্গে পরিণত করিত। এতদ্দ্বারা তাহাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য প্রমাণিত হয়। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধ রচনাকালে তাহাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর, রিপন কলেজে কিমিতি ও ভূতবিদ্যার শিক্ষক। তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, আমি কটক কলেজে থাকি।

এই প্রবন্ধে তাহাঁর যে বিচার-ক্রম ও ভাষা-বিন্যাস দেখিতে পাই, তাহা পরবর্তীকালে রচিত তাহাঁর যাবতীয় গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিদ্যমান। আমার দৃষ্টিতে তাহাঁর রচনার দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল—(১) পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই প্রাচীনপন্থী, কদাচিৎ নবীনের প্রতি স্নেহশীল; মনে হয়, যেন দুইটি বিপরীত শক্তি তাহাঁর মনের মধ্যে কাজ করিত। (২) তাহাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তিনি পুনরুক্তি করিতেন। তাহাঁর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে সাহিত্য-পরিষৎ-

পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল। একবার তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য অঙ্কিত হয় না।" এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি মনে করি, তাঁহার অনুসৃত পন্থায় পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্কিত হয় না। পাঠক একপ্রকার আবছায়া পান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে প্রকৃত তথ্য বলিতে পারেন না।

তাঁহার "যজ্ঞকথা" পড়িলে তাঁহার পাণ্ডিত্য সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। পাঠক বুঝিতে পারেন না, বৈদিক যজ্ঞকর্মের তুল্য দুরবগাহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে না পারিলে সে রত্ন উদ্‌ধৃত হইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করিবার সময় তাঁহাকে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইয়াছিল। সে অল্পদিনের পরিশ্রমসাধ্য নয়। আমি এক এক সময় ভাবি, তিনি কবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন, কবে অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত করিলেন? এফ্-এ পড়িবার সময় তাঁহাকে সংস্কৃত কাব্য পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় রঘুবংশের প্রথম চারি সর্গ ও ভট্টির দুই সর্গ মাত্র পড়িয়া থাকিবেন। এতৎসত্ত্বেও আমি বলিব, তাঁহার "যজ্ঞকথা" আরও অল্প কথায় বলিতে পারা যাইত।

তাঁহার "বিচিত্র জগৎ" বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। কঠিন বিষয় এত সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করা অল্প সাধনার ফল নয়। একই ভাব, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেন, তথাপি মনে হয় যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। আমি তাঁহাকে ব্যথ্যাতৃশ্রেষ্ঠ মনে করি।

তাঁহার "জিজ্ঞাসা"র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু এই বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণকে তিন ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগ, যাঁহারা বিজ্ঞানের একটি শাখা লইয়া থাকেন এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সেই শাখায় গবেষণা নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন। ইহাঁরা নিম্নশ্রেণীর হইলেও, ইহাঁরা না থাকিলে অন্য দুইশ্রেণীর উদ্‌ভব হইতে পারিত না। যাঁহারা হাইড্রোজেন বম্ নির্মাণ করিতেছেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীর। এইরূপ, যাঁহারা প্রকৃতির এক এক দিক্ পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য সামান্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সমবেত কর্মেই বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ, যাঁহারা সংগৃহীত তথ্য বর্গে বর্গে সাজাইয়া বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাঁহারা লোকরঞ্জন ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করেন। ইহাঁদের দৃষ্টি সর্বদিকে থাকে বলিয়াই বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারে যোগ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ পাঠককে রচনায় প্রলুব্ধ করিতে হইবে। লেখক নিজেকে প্রশ্ন করিবেন, অপরে কেন তাঁহার রচনা পাঠ করিবে? সাধারণ পাঠক উদাসীন। ইহাঁরা মধ্যম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। ইংলণ্ডে হাক্সলেকে এই শ্রেণীতে বসাইতে পারা যায়। বঙ্গদেশে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন।

তৃতীয় ভাগ, যাঁহারা সমগ্র বিজ্ঞান-বৃক্ষের যাবতীয় শাখা অবলোকন করিয়া এক সূত্র অন্বেষণ করেন,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ ১৯১৯

অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়া দেন। ইহাঁরাই প্রকৃত দার্শনিক। ইহাঁরা সংখ্যায় অত্যল্প। ডারবিনের 'পরিণামবাদে' আমাদের চিন্তাধারায় এক শৃঙ্খলা আনিয়া দিয়াছে। আমরা সদ্‌বস্তুর পরিণামী উৎপত্তিক্রম স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত 'মাধ্যাকর্ষণ' এক্ষণে আরও প্রসারিত হইতেছে বটে, কিন্তু মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে জীব ও অ-জীবের একটা পার্থক্য-লক্ষণ ক্ষীণ হইয়াছে ; মনে হয় যেন অ-জীবেরও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রকারগণের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের অতীত আমাদের দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যাহা আমাদের দেশে ছিল, যাহা এখনও আছে, তাহার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দর অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। তাহাতে হস্তার্পণ করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) তিনি 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের পরিভাষার গুণে সে বিদ্যার এত উন্নতি হইতে পারিয়াছে। তৎকালে জ্ঞাত ৭০টা মূল পদার্থের সংস্কৃত-মূলক দেশীয় নাম সৃষ্টি করিলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা সুসাধ্য হইবে না। তথাপি তিনি ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজী নামের ইতিহাস সঙ্কলন ও সংস্কৃত নাম উপন্যাস করিয়াছিলেন। তাহাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের কেহ কেহ অতিশয় কুতূহলী হইয়াছিলেন। তিনি ক্লোরিনের নাম 'হরিণ' রাখিয়াছিলেন ; অক্সিজেনের নাম 'দহন বায়ু', অক্সাইড 'দগ্ধ'। অতএব Chlorous anhydride 'দগ্ধ হরিণ'। ডক্টর পি. সি. রায় স্বদেশী নামের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্রদের জন্য "সরল রসায়ন" লিখিয়াছিলাম। তাহাতে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি ইংরেজী নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ডক্টর রায় প্রবাসী পত্রিকায় সে পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ?"

স্বদেশী ভাষার এতবড় অনুরাগী হইয়াও তিনি 'দগ্ধ হরিণ' শুনিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। পরে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই বুঝিয়াছিলেন, সে পরিভাষা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাহাঁর "শব্দকথা"র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, কাগজ কলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পরিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অনুবাদকের হাতে।" এখানে তিনি নিজমত প্রত্যাখ্যান করিয়া উদাসীন হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। পরিভাষা নির্মাণ গ্রন্থকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে পাঁচজন গ্রন্থকার পাঁচপ্রকার পরিভাষা করিয়া বসিবেন। পরিভাষার ঐক্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়জ্ঞান ভাষাজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান একাধারে সকল গ্রন্থকারের কিম্বা অনুবাদকের থাকে না। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত এক সংসদ নিযুক্ত করিয়াছেন। উচিত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ভারত পূর্বের ন্যায় প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত নয়। সকল রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া পরিভাষা-সমিতি গঠন না করিলে সর্বভারতীয় পরিভাষা নির্মিত হইবে না।

তৎকালে স্বদেশী ভাষায় বিদেশী নামের অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ইউরেনস গ্রহকে ইন্দ্র বলা হইবে কি বরুণ বলা হইবে, এইরূপ চিন্তায় কয়েকজন বিদ্বান্ অধীর হইয়াছিলেন। তাহাঁরা

"স্বয়ংবহযন্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া টীকা-সমন্বিত একটি বৃহত্তর প্রবন্ধ লেখা চলে-না কি? চলিলে diagram সহ পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিতে পারি। পরিষৎ-পত্রিকা এতকাল প্রাচীন সাহিত্য লইয়া মগ্ন আছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিতেছেন।"

'স্বয়ংবহ' নাম আমার রচিত নয়, সিদ্ধান্তের। সাধারণ স্বয়ংবহ যন্ত্রে perpetual motion নাই। ইহাকে automatic clock বলিতে পারি, যদিও জানি ঘড়ী স্বয়ংবহ নহে। পশ্চিমদেশের বিদ্বানেরা বুঝিতে পারেন নাই; আমাদের প্রাচীনেরা সদাগতির কল্পনায় ভ্রান্ত হইয়াছিলেন— এই বলিয়া তাঁহারা উপহাস করিয়াছেন। ১৩১৫ চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমার স্বয়ংবহ-প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরকে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয় না। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পরিষদের উন্নতি ও উত্তরোত্তর গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে কত যত্ন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়, পরিষদের তুল্য প্রিয় সামগ্রী তাঁহার আর কিছু ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র মনে করিতেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৫) বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের নির্বন্ধে সাহিত্যসম্মেলন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল,— সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখাপতি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখাপতি, শ্রীযদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখাপতি এবং আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি মনোনীত হইয়াছিলাম। মহাসমারোহে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এক বৃহৎ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং দুইটিই আমাকে করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত বাংলা ভাষা পঠন ও পাঠন প্রবর্তিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা করা হউক। দ্বিতীয় প্রস্তাব, পঞ্জিকাসংস্কার সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির স্থাপিত হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা প্রেরণ সোজা কথা, কিন্তু জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সোজা কথা নয়।

সে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর পীড়িত। বর্ধমান যাইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি হইতে সম্মত হইয়াছিলাম। সম্মেলনের পর তিনি আমায় কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন (১৩২২।৪ বৈশাখ)—

"একই দিনে আপনার দুইখানি চিঠি পাইয়া বুঝিলাম, আপনি টোপ গিলিয়াছেন। এতকাল নির্জনে তপোবনে লুকাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন লোক-সমাজে ধরা দিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাকে ঠিক ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তুলনা করিবার দরকার নাই; তবে বুদ্ধিমান্ লোকে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা আপনার কাজ করাইয়া লইয়াছিল, আপনিও যখন ধরা দিয়াছেন, তখন আপনার দ্বারাও আমাদের কাজ করাইয়া লইব, তাহার ভরসা হইতেছে।

"সাহিত্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত এবার খুবই ভাল হইয়াছিল, সহস্রমুখে একবাক্যে তাহা শুনিতেছি। কাজের দিকের খবর অন্যে বড় একটা দেন নাই। আপনি যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম, আপনি উহার শাদা-কাল দুইটা দিকই দেখিয়াছেন। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। বলিতে গেলে বোধহয় এক দিস্তা কাগজে কুলাইবে না।"

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা আমার অভিভাষণের বিষয় ছিল। বিষয়টি তাঁহার প্রিয়, কিন্তু তাঁহার কল্পিত পথ হইতে আমি কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে গিয়াছিলাম। বোধহয়, সেই কারণেই লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে এক দিস্তা কাগজ লাগিবে।

বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ১৩২২।১৬ ভাদ্র তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"মান-মন্দির সম্পর্কে আপনার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই পড়িয়াছি। বেধালয়ের আবশ্যকতা এবং পঞ্জিকা-সংস্কারের উপযোগিতা আপনি যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে যদি কেহ না বুঝে, তাহা হইলে গত্যন্তর নাই। ··কলিকাতার হাওয়া বেধকর্মের উপযোগী নহে। শীতকালের আকাশে মোটা মোটা তারাগুলাও দেখা যায় না। মফঃস্বলে স্থান মিলিতে পারে, কিন্তু লোক মিলিবে না।·· পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, উভয় মত জ্যোতিষিক গণনার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারেন এবং তদনুসারে গণকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ লোক ত দেখিতেছি না। কালেজের অধ্যাপকদের মধ্যে এক আপনি আছেন, তদ্‌ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না। ··আমাদের অধ্যাপক ভ্রাতারা যে সময়টা তারকা-পর্যবেক্ষণে নিয়োগ করিবেন, সে সময় মানের বহি লিখিলে বেশী কাজে আসিবে। এ সঙ্কল্প বিষয়ে আমার অধিক ভরসা নাই। আপনি নিজে কর্মী, আপনি স্বয়ং যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে আশা আছে।"

পুনশ্চ ১৩২২।৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আপনার মান-মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। ··কিন্তু জিনিসটা আদৌ গড়িয়া উঠিবে কিনা, সন্দেহ। কাশিমবাজারের মহারাজা মাসিক ব্যয় দিবেন কিন্তু মন্দির ও যন্ত্রাদির জন্য ব্যয় সম্বন্ধে আমার ঘোর সংশয় আছে। বর্ধমান বা অন্য কেহ খরচ দিলেও উহা আদায় করিয়া জিনিসটা গড়িয়া লইবার উদ্‌যোগী লোকের অভাব। আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। বড়লোকে টাকা দেন, কিন্তু কেহ উদ্‌যোগ করিয়া হাত পাতিয়া না লইলে টাকা আদায় হয় না। ··অভাব কেবল মানুষের। কর্মী মানুষ নাই, এবং কর্মে প্রেরণের জন্য পিছনে যে বাতিক থাকা আবশ্যক, সেই বাতিকও কাহারও নাই। ঔদাসীন্যে কত কাজ যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ব্যথা পাইতেছি মাত্র।"

রামেন্দ্রসুন্দরের অনুমানই ঠিক হইল। প্রস্তাবিত মান-মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিবার লোক পাওয়া গেল না। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমায় তিনখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষের অভাব। তদবধি ৪০ বৎসর হইয়া গেল, কিন্তু উদ্‌যোগী মানুষের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

১৩২২ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর বর্ধমান-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পূর্বেও দুই বৎসর যাইতে পারেন নাই। ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত হয়। তিনি আর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তিনি পরে যে সকল পত্র লিখিতেন, সে সকল পত্র তাঁহার অস্বাস্থ্যের বিবরণে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাঁহার সরস চিত্ত কখনও রসহীন হইত না। একবার লিখিলেন, "আমি কয়েক দিন শয্যাগত ছিলাম। আমার হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুগণ আমাকে স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মুখভঙ্গী ও মাথানাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা আমার যকৃতে বিস্ফোটক আশঙ্কা করিয়া শস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি সম্মত হইলাম না। যদি অকালে যম-সদনে যাইতে হয়, অক্ষত দেহেই যাইব। গতকল্য অপরাহ্ণে এক হোমিওপাথিক ডাক্তার-বন্ধু আসিলেন। তিনি একবিন্দু জলপান করাইয়া গেলেন আর আমি আজ সকালে বিছানায় বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি।"

আর একবার লিখিলেন, তাঁহার পত্নীর বস্ত্রাঞ্চলে কেরোসিন দীপের অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল; কোন ক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৯১৪।২ আগষ্ট তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন (তখন তিনি ভাল ছিলেন), " · · আরও ভাল হইবার আশায় কলেজে দেড় মাসের ছুটি লইয়া গঙ্গায় নৌকাযাত্রা করি। আশা ছিল, গ্রীষ্মের অবকাশটা জড়াইয়া চারিমাস গঙ্গাবাসে সুস্থ হইব। মার্‌চ্ মাসটা নৌকাতেই গঙ্গাবক্ষে কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু গঙ্গামাতা বক্ষে স্থান দিলেন না। একদিন রাত্রিকালে মাঝ-গঙ্গায় কালনার নিকটে নৌকায় আগুন লাগিল। মাঝিরা আগুন নিভাইতে পারিল না। সস্ত্রীক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। জল ঘটনাক্রমে অল্প ছিল, কাজেই গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না। নতুবা এতদিন চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইতাম। নৌকাখানার সমস্ত উপরের অংশ আমার জিনিসপত্র সমেত পুড়িয়া গেল। নিকটে নির্জন চড়া, সেখানে আশ্রয় লইলাম। ঘটনাটা কালনার নিকটে। কালনার দুইটি ভদ্রলোক ডিঙ্গি করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। গোলমাল ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া সে রাত্রি আশ্রয় দিলেন। পরদিন ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসি।

"এই ঘটনা অবলম্বনে দিব্য একখানি নবেল হইতে পারে। আপনার নবেল লিখিবার ক্ষমতা আছে কি না, সে পরিচয় এখনও পাই নাই। আর সকল সাহিত্যেই ত ধরা দিয়াছেন; আমি মসলা দিলাম, একবার নবেল লিখিবার চেষ্টা করিতে পারেন।"

তাঁহার এইরূপ পুনঃপুনঃ বিপৎপাতের সংবাদে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাঁহার বর্তমান দুঃসময় আর কতদিন চলিবে। ফল-জ্যোতিষ ইহার উত্তর দিতে পারে। তখন আমার নিকটে পণ্ডিত ঘনশ্যাম মিশ্র নামে এক নিপুণ ফল-জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ওড়িয়া-অক্ষরে লিখিত "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" পড়িয়া আমায় শুনাইতেন। আমি নিজে ফল-জ্যোতিষ শিক্ষা করি নাই। প্রয়োজন হইলে মিশ্র-মহাশয়কে দিয়া গণাইতাম। আর সে প্রয়োজনের হেতুও ঘটিয়াছিল। সাধারণ লোকে জ্যোতিষের গণিত-ভাগ ও ফল-ভাগ অভিন্ন মনে করে। আমি গণিত-জ্যোতিষ চর্চা করি; লোকে মনে করিত, আমি ফল-জ্যোতিষও জানি। সেই ভ্রম এখনও চলিতেছে। বিজ্ঞলোকে আমার নিকটে তাঁহাদের কোষ্ঠী পাঠাইয়া দেন।

আমি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলাম, "আপনি আমাদের ভাগ্যের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ পান না, কোষ্ঠী-গণনায় বিশ্বাস করেন না। আমিও করি না। কিন্তু দেখিয়াছি, কোন কোন ঘটনা মিলিয়া যায়; বিশেষতঃ অগ্নিদাহ, জলডুবি ইত্যাদি। তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকুজী পাঠাইবেন।"

দিনকয়েক পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পার্সেল পাইলাম। পোষ্টকার্ডে রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষক লিখিতেছেন— আপনার পত্র মা [রামেন্দ্রসুন্দরের পত্নী] দেখিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশে আমি এই পত্র লিখিতেছি ও কোষ্ঠী পাঠাইতেছি। আপনি কোষ্ঠীখানা উত্তমরূপে দেখিয়া জানাইবেন, উপস্থিত রোগ হইতে কোন ভয় আছে কি না।"

আমি মিশ্র-মহাশয়কে কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল ও রাশিচক্র তুলিয়া দিলাম। তিনি ফল বিচার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা অবিকল লিখিয়া লইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষকের নামে পাঠাইলাম। তাহাতে ছিল, ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার অজীর্ণ-জনিত পীড়া হইবে এবং উপস্থিত রোগ হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই।

দৈবক্রমে আমার পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে পড়িয়াছিল। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন (১৩২১। ৪ আশ্বিন)—

"কোষ্ঠীর ফল দিন-তারিখ ধরিয়া যতটা দিয়াছেন, তাহাতে কোষ্ঠী-গণনায় প্রায় বিশ্বাস হইবার উপক্রম হইয়াছে। · · অজীর্ণ-রোগে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তারিখটা অত্যন্ত মিলিয়াছে। এ অবস্থা কত দিন টিকিবে, তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ, সেটা শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই বলেন নাই। যাহা হউক, কৌতূহলটা যখন জাগাইয়া দিলেন, তখন পরিণামটা সম্বন্ধে কোষ্ঠী কি বলেন এবং কর্মভোগ কতদিন চলিবে, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।"

পুনশ্চ ১৩৩১। ২৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমার কোষ্ঠীখানি লইয়া আপনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে কোষ্ঠীর ফলাফলের সহিত কতদূর আমার অবস্থা মিলিল, তাহা জ্ঞাপন করা কর্তব্য বোধ করিতেছি। আপনার ইহা কাজে লাগিতে পারে।

"সাধারণ ফল :—

'সুন্দর, প্রিয়ংবদ, ধর্মরত, বিদ্বান্, শৌর্য-বীর্যে খ্যাতিমান্'— ইত্যাদি বিষয়ের বিচার-ভার আপনাদের উপর। শৌর্য-বীর্যের বিশেষ পরীক্ষা কখনও হয় নাই। জর্মনির সহিত লড়াইয়ে যদি সরকার বাহাদুর ঠেলিয়া পাঠান, তাহা হইলে পরীক্ষা হইতে পারে।"

ইত্যাদি-ক্রমে তিনি কোষ্ঠী-গণনার ফল কতদূর সত্য হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার জন্ম-কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল উদ্ধৃত করিলাম এবং সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গণিয়া তাৎকালিক গ্রহস্থিতি দিলাম। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

জন্মকাল : ১৭৮৬।৩।৪।৫৩।৩৩ ॥

ভাদ্রস্য পঞ্চম দিবসে শনিবারে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ রাত্রৌ সপ্তত্রিংশৎ পলাধিক একবিংশতি দণ্ডাভ্যন্তরে শুভ কর্কটলগ্নে (লগ্ন স্ফুট রাশ্যাদি ৩।০।২১।১৬) ॥

তাৎকালিক স্ফুটগ্রহা :—

র ৪।৫।১৯, চ ১১।১৪।২৯, ম ১।১।১, বু ৫।৩।১৩, বৃ ৬।২৮।৫৬, শু ৪।১৬।১৭, শ ৫।৩২।৩২, রা ৬।২২।১৯, কে ০।২২।৩৯।

ইহার পর তিনি কয়েক বৎসর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। ১৩২১। ৫ ফাল্গুন তারিখের পত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন—

"আপনার শব্দকোষ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' পড়িলাম। শব্দকোষে আপনাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না, ইহা আমার দুর্ভাগ্য। যাহা হউক, আপনি যাহা খাড়া করিয়া দিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বাংলা কোষ রচনার পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকিল। · · এ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বাংলা অভিধান এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে প্রস্তুত করেন নাই। আপনার পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ গৌরবান্বিত হইল। আমার এই আনন্দ যে, আমি না থাকিলে হয় ত পরিষদের সহিত আপনার গ্রন্থের এই সম্পর্কটুকু ঘটিত না।"

কি উপায়ে জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারিবে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারিবে, এই চিন্তা অনেকের মনে জাগিয়াছিল। এক্ষণে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ সে চিন্তা করিতেছেন এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রে যথাসাধ্য বিজ্ঞানপ্রচারে যত্নবান্ আছেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে

লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অনুরাগী হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্যেরা উদাসীন থাকিতেন। তৎকালে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যল্প শিক্ষিতের শ্রদ্ধা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ও আমি বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কেহ কেহ দয়া করিয়া পড়িতেন, কেহ বা পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল তথ্য প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম। এ বিষয়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, সে-সব কথা এখানে উত্থাপন করিব না। মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যা পাঠ্য ছিল। কিন্তু ছাত্রদিগকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইত, শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রবেশিকা-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িতে হইত। Blaudford's *Physical Geography* বইখানি ভাল, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের মত পড়ান হইত। তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা কলেজে পড়িত, তাহারা ইংরেজীতে শিখিত, বাংলায় পড়িবে কেন? অতএব যদি দেশে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে লোক-রঞ্জন ভাষায় বিজ্ঞানের স্থূল তথ্য বুঝাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক নয়, কোন একটা শাখার আদ্যন্ত নয়, তাহার সারমর্ম পারিভাষিক শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে ফল হইতে পারে। কিন্তু কোন উদ্‌যোগী প্রকাশক ছিলেন না।

একদিন রামেন্দ্রসুন্দর আমায় লিখিলেন, "বাংলায় এক এক বিষয়ের ছোট ছোট বই লিখিতে হইবে কোন বই ১৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, দাম আট আনা। পাইকপাড়ার রাজা মহাশয় অরুণচন্দ্র সিংহ সে-সব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রেস আছে। এখন বই লিখিয়া যোগাইতে পারিলে হয়। এই নিমিত্ত এক সম্পাদক-সংসদ করিতে হইবে। আপনি প্রধান। আপনি, আমি ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূ-বিদ্যার শিক্ষক), এই তিনজনে মিলিয়া পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাদের মনোনীত হইলে রাজা-বাহাদুরের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।"

আমি লিখিলাম, "আমি দূরে থাকি, আপনারা দুইজনে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া, যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজন মনে করেন, আমার নিকটে পাঠাইবেন।" তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমার নিকট হইতে দুইখানি বই চাহিলেন। একখানি বিজ্ঞানের ভূমিকা, অপরখানি জ্যোতির্বিদ্যা। প্রথম খানি অন্য প্রয়োজনে আমি ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা সেইখানাই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। হেমবাবু ভূ-বিদ্যা সম্বন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে লিখিবেন। অপর কৃতবিদ্য লেখকও আহ্বান করা হইবে। তাঁহারা এই সংসদের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন। দুই-তিন পরিচ্ছেদ লিখিয়া সংসদের সম্মতি পাইলে অপর পরিচ্ছেদ লিখিবেন। তাঁহারা দুইশত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

যে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রস্তাব করেন, সে সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শরীর ভগ্ন হইতেছিল। মন নানা হিতকর কর্মের প্রতি ধাবিত হইত। কিন্তু শরীরে কুলাইল না। আমার নিকটে আর পত্র আসিল না।

ভাস্করাচার্য কয়েকটি জ্যোতিষিক যন্ত্র বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, সকল যন্ত্র অপেক্ষা ধী-যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। রামেন্দ্রসুন্দর ধী-যন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যে-কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয়েক-বৎসর তাহার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার আসন শূন্য রহিয়া গিয়াছে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১১ সংখ্যা ৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন। রাজশাহী অধিবেশন ১৩১৫ মাঘ (১৯০৯)

উপবিষ্ট : বাম থেকে দক্ষিণে ॥ ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, নিখিলনাথ রায়, শরৎকুমার রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দণ্ডায়মান : বাম থেকে দক্ষিণে ॥ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, —, যোগেশচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, —, রমণীমোহন ঘোষ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রজসুন্দর সান্যাল, শশধর রায়, —, শ্রীগোবিন্দ রায়, রামচন্দ্র রায়, —, —, —, কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল, —, সুরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তভায়া

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

রথীন্দ্রনাথ রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি তাৎপর্য পূর্ণ। কারণ এই সম্মিলনের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতি চর্চার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস জড়িত আছে। এমন কি জাতীয় জীবনের মূল অভিপ্রায়গুলিও এই সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশ ও জাতির এক সামগ্রিক স্বরূপ বাঙালি মনীষীর চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক সংহতি এই সম্মিলনকে কেন্দ্র করে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করেছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস বা আকস্মিক উত্তেজনা থেকেও এর উদ্ভব হয় নি। এই সম্মিলনের জন্মলগ্নে আছে জাতীয় সংকটমুক্তির এক উদ্বেল প্রত্যাশা, সারস্বত সংহতি রক্ষার এক দুরূহ সংকল্প।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের চেয়ে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় যে কোনো অংশে কম মারাত্মক নয়, একথা সে দিনের দেশনায়কেরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ এর প্রয়োজনীতার কথা একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। কবি ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

> যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি—সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।
>
> ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন তাহার উল্‌টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে. তাহার সন্দেহ নাই।
>
> এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িণী বাণী স্বেচ্ছা সমাগত সেবকদের অর্ঘ্য লাভ করিতেছেন।[১]

১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর আগে তিনবার এই সম্মিলনের চেষ্টা করা হয়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে ও রংপুর-শাখা-পরিষদের উদ্যোগে রংপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের যে আয়োজন করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তৃতীয়বার সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বরিশালে। ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন হবে স্থির হয়েছিল। এই রাজনৈতিক সম্মিলনীর সঙ্গে একটি সাহিত্য-সম্মিলনীরও ব্যবস্থা করা হল। সাহিত্য-

---

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২), 'আত্মশক্তি'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।

সম্মিলনীর উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেবের আদেশে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেট মিঃ কেম্প সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে শোভাযাত্রা ভেঙে দিলেন, স্বেচ্ছাসেবকদের উপরেও পুলিশের অত্যাচার চলল। বলাবাহুল্য উদ্যোক্তারা সাহিত্য-সম্মিলনও বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। দেবকুমার লিখেছেন—

> সেদিন সন্ধ্যার পরে পুনরায় সাহিত্য-সম্মিলনের নির্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বসতি-বজরায় কর্তব্য-নির্ণয়ার্থ সমাগত সাহিত্যিকগণের আর এক বৈঠক হইল। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া বহুবিধ বাদানুবাদের পর সেখানেও স্থির হইল— বর্তমান এই অশান্তি, উদ্বেগ ও বিরক্তির অবস্থায় বরিশালে আর কোনরূপ অধিবেশন হওয়া একটুও বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি 'অকারণ' সমগ্র বঙ্গ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ ও প্রতিনিধিগণকে পুনঃ পুনঃ এভাবে কষ্ট ও লাঞ্ছনা দিতেছেন সেই 'অবিবেচক' এমার্সনের কাছে আবার করুণা ভিক্ষা করিতে যাওয়া, এক্ষেত্রে কোনক্রমেই পৌরুষ ও আত্মমর্যাদার অনুকূল নহে।[২]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সাহিত্য-পরিষদকে সচেতন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষ ভাবে আহ্বান' করেছেন—

> এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।[৩]

পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণীতেও সাহিত্য-সম্মিলনীর উদ্ভব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেই শুধু তিনি নেতৃত্ব করেন নি, সাহিত্য-সম্মিলনীর পরিকল্পনাটিকেও তিনি সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ—

> জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গ বিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্ট ভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলন সাধন এবং বাংলার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই প্রবন্ধে তিনি ওই প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।[৪]

---

২. দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্বিতীয় সংস্করণ), দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪১।

৩. অবস্থা ও ব্যবস্থা (১৩১২), 'আত্মশক্তি'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড

৪. পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬), পৃ ২২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২

পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে তিনবার প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল। তিনবারই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হল। অবশেষে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ "ভূম্যধিকারী ও সাহিত্যসেবী" মণিমোহন সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে ১৩১৪ সালের ১৭-১৮ কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি মনোনীত হন রবীন্দ্রনাথ। তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রধানত তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এই সম্মিলিন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে তৎকালীন বাংলাদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কেরা সম্মিলিত হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ মনীষীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করে সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য উদার আহ্বান জানান। জাতীয় জাগরণের সেই উদ্বেলিত মুহূর্তে চিন্তানায়ক রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—

> বাংলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙালির নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙালি কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।[৫]

রামেন্দ্রসুন্দরের এই ভাষণের মধ্যেই বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় ও উজ্জ্বল প্রত্যাশার বাণী ঝংকৃত হয়েছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদই ছিল সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণকেন্দ্র। পরিষদের অধিনায়করাই তাই দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর নেতৃত্ব করে এসেছেন। সাহিত্য-পরিষদের "উদ্দেশ্য ও কার্যের অনুকূল" প্রস্তাবগুলি সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভব, যার জন্য কলিকাতার বাইরেও বহু শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হয়েছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনও "সেই সমস্ত কার্য সাধনের জন্য" সকলকে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস সংকলন ও জাতীয় কীর্তিকলাপ সংরক্ষণের জন্য একটি "সারস্বত-ভবন" স্থাপনের প্রস্তাবও এই অধিবেশনেই গৃহীত হয়েছিল। ১৩১৩ সালে কলিকাতায় যে-শিল্পপ্রদর্শনী হয়, সেখানেই এই "প্রস্তাবের উৎপত্তি"। "ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীক্ষেত্রে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে" রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-সম্মিলন' নামে যে প্রবন্ধ

---

৫. কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করেন রামেন্দ্রসুন্দর।—তাঁর এই ভাষণটি 'মাতৃমন্দির' নামে 'উপাসনা' পত্রিকায় (১৩১৫, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'সাহিত্য-সম্মিলন' শিরোনামায় মুদ্রিত হয়েছে।

পাঠ করেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে তিনি সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলনীকে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন—

> যে-প্রদেশে সাহিত্য-পরিষদের সাংবাৎসরিক অধিবেশন হইবে, প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা ইতিহাস প্রাকৃতসাহিত্য লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুররূপে সফল হইবে। সেখানকার প্রাচীন দেবালয় দিঘি ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোকপ্রচলিত যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা কর্তব্য হইবে।[৬]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয় রাজশাহীতে (১৮-১৯ মাঘ ১৩১৫)। এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই অধিবেশনকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। রাজশাহী-অধিবাসী সাহিত্যানুরাগীরাও এই সম্মিলনকে নানাভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেন। কিশোরীমোহন চৌধুরী, শশধর রায়, ব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীগোবিন্দ রায়, ভুবনমোহন মৈত্রেয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগদানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ মনীষী প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মিলনকে গৌরবান্বিত করেছেন।

সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর অভিভাষণে, বাংলা সাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হতে পারে— এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জাপানে ও পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের তুলনায় আমাদের দেশ যে কত পশ্চাৎপদ, একথা ভেবে তিনি বেদনা প্রকাশ করেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে আচার্য রায় বলেছেন—

> সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কতপ্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দোয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছু বাকি নাই? এ দেশের সোঁদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে?[৭]

---

৬. 'সাহিত্য-সম্মিলন', : সাহিত্য, পরিশিষ্ট।

৭. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজশাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্মিলনে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে 'বিজ্ঞান-শাখা' বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কিত এত বিস্তৃত আলোচনা হয় নি। সম্মিলনীতে আঠারটি প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হয়, তার মধ্যে একটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। বাকি সতেরটির মধ্যে দশটি প্রবন্ধই বিজ্ঞানবিষয়ক। এ সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> দেখা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই অধিক সংখ্যক। কেহ কেহ সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞানের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারেন না। আমরা বাগ্‌-বিতণ্ডা করিতে নারাজ, কিন্তু সাহিত্য যদি সমাজের মঙ্গলের প্রধান হেতু হয়, তবে তাহা লইয়া আর ক্রীড়া করা চলে না। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ সাহিত্য। যে সাহিত্য আলোচনায় এ উদ্দেশ্য অধিকতররূপে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই সর্বাগ্রে আলোচ্য। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই, ভগবান এ জাতিকে উত্তরোত্তর রসিক হইতে সাধকে পরিণত করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।[৮]

এই অধিবেশনে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার প্রথমটিই হল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কিত। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সমিতিও এই উপলক্ষে গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সভ্যদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত শব্দ যথাযোগ্যরূপে ব্যবহার করার জন্য লেখকদের অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য "ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ উপবিভাগে প্রচলিত বাংলার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযোগে রূপভেদ সংকলনের ভারগ্রহণের" জন্য শাখা-পরিষদ ও অন্যান্য সাহিত্য সমিতিকে অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর আর-একটি আকর্ষণ ছিল কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের সংগীত। তিনি সম্মিলনীর বিভিন্ন অধিবেশনে স্বরচিত চারখানি গান গেয়েছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় ভাগলপুরে (১-৩ ফাল্গুন ১৩১৬)। এই প্রথম বাংলাদেশের বাইরে সম্মিলনীর আয়োজন করা হল। সম্মিলনীর উদ্যোগ-আয়োজন করেছিলেন ভাগলপুরের পরিষৎ-শাখা। তৎকালীন পরিষৎ-সভাপতি সারদাচরণ মিত্রকে এই সম্মিলনীর সভাপতি-পদে বরণ করা হয়। সম্মিলনীর জন্য 'ভাগলপুর ইনস্টিটিউটে' বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়। সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ঐদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ সংগীতসাধক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে একটি সংগীত-বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। তিনি একখানি কীর্তন গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও একখানি স্বরচিত গান গেয়েছিলেন। স্থানীয় নাট্যসমাজ সাধারণের তৃপ্তির জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটক অভিনয় করেন। এই সম্মিলনীতে প্রাচীন চিত্র, মূর্তি, পুঁথি, পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

৮. বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের (দ্বিতীয় বর্ষ) কার্যবিবরণীতে সম্পাদকদ্বয় শশধর রায় ও ব্রজসুন্দর সান্যালের বিবৃতি।

সভাপতি তাঁর অভিভাষণে ভাগলপুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘকালব্যাপী সংযোগের কথা উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—

> বর্তমানে হিন্দী অনেক পরিমাণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার অভাব পূরণ করিতে পারে, হিন্দী সহজেও শিক্ষা করা যায়, সুতরাং সহজে আর্যাবর্তের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা যথাসময়ে কি অবয়ব ধারণ করিবে তাহা এখন বলা যায় না।[৯]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাংলাভাষা সম্পর্কে সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> প্যারিসের একাডেমি অব লিটারেচার (Academy of Literature) যেরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতে পাই না। নেপোলিয়ান তাঁহার রাজত্বকালে একাডেমি অব লিটারেচার সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত। যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে কুরুচির বিচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক বিস্তার হয়,…তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক।[১০]

রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো লিখিত ভাষণ পড়েন নি, তিনি সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন। পরিষৎ তথা সম্মিলনীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়, তার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

> সহযোগিতার দ্বারা সৃষ্টিকার্যের উন্নতি কখনো হয় না—হয়ও নাই। কিন্তু নির্মাণ কার্যে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। নির্মাণ কার্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্যলাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, কিন্তু সকলেই যে কাজে শক্তি নিয়োজিত করে, তা থেকে খুব বড় একটা ফল লাভ করা যায়। এই নির্মাণ কার্যই সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র।[১১]

এই অধিবেশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব 'রমেশ-ভবন' সম্পর্কিত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হয়। ঐ বছরেই ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংকল্পিত 'সারস্বতভবন'কে "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপে" "রমেশ সারস্বত ভবন" নামকরণের প্রস্তাব করেন। এই সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যদুনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। যদুনাথ সরকারের "মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ। মুসলমান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গবেষকের গবেষণা-পদ্ধতির ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এই প্রবন্ধ থেকে বহু সংকেত পাওয়া যায়।

ভাগলপুর অধিবেশনেই ময়মনসিংহ শাখা-পরিষৎ থেকে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্তকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শাখা-পরিষদের অনুরোধে সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের জন্য ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ জানান। ১৩১৮ সালের ১-৩ বৈশাখ অধিবেশনের সময় ধার্য হয়। এই

৯. তৃতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্যবিবরণী, পৃ ২২।

১০. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

১১. তৃতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্যবিবরণী, পৃ ২১।

সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। কার্য-নির্বাহক সমিতির সম্পাদক ছিলেন ময়মনসিংহের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী কেদারনাথ মজুমদার।

সভাপতির ভাষণে আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রধানত তাঁর উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার কথাই সহজ ও সরস ভাষায় আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণের মধ্যে "কবিতা ও বিজ্ঞান" অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বৈজ্ঞানিকের পন্থা' ও 'কবিত্ব-সাধনা'র ঐক্যকে তিনি যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তার ভাব-গভীরতা ও সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য—

> কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনায় ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।[১২]

সম্মিলনীর অনুমোদিত প্রবন্ধাবলীকে বিষয়ানুসারে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস। বিষয়গৌরবে কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য: ময়মনসিংহের সাহিত্যচর্চা (কেদারনাথ মজুমদার), আধুনিক নাট্যসাহিত্য (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত), পারসী ও আরবীভাষায় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ (মহম্মদ শাহিদুল্লাহ), পৌণ্ড্রবর্ধন (কৈলাসচন্দ্র সিংহ), অন্ন-সংস্থান (রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়), আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন (পঞ্চানন নিয়োগী), পূর্বময়মনসিংহের ভাষা (চন্দ্রকিশোর তরফদার), দেশীয় কল (যোগেশচন্দ্র রায়)।

ময়মনসিংহ অধিবেশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে "স্থানীয় ও অন্য জেলা হইতে আগত" কয়েকজন মহিলা এতে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, 'ভারত-মহিলা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা সরযুবালা দত্ত দ্বিতীয় দিনের বৈকালিক অধিবেশনে 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গনারী' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে মহিলার প্রবন্ধপাঠ সম্মিলনের ইতিহাসে একটি নূতন ঘটনা। সভাপতির অনুরোধে সকলে দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ শুনেছিলেন।

ভাগলপুরেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ময়মনসিংহ অধিবেশনের প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল বিস্তৃততর ও পূর্ণতর। প্রদর্শনীর তিনটি বিভাগ ছিল: ১. ঐতিহাসিক চিত্রবিভাগ, ২. প্রাচীন গ্রন্থবিভাগ, ৩. ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ বিভাগ। সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের রাত্রিতে "প্রথমে য়ুরোপীয় ও জমিদারগণকে ও পরে নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে" বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে তাঁর

---

১২. চতুর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্যবিবরণী, সভাপতির অভিভাষণ। পরে এই অভিভাষণটি জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

আবিষ্কৃত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া বুঝিয়ে দেন। চতুর্থ অধিবেশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব "দরিদ্র-সাহিত্যিক সংস্থান-ভাণ্ডার স্থাপন।"

ময়মনসিংহ অধিবেশন পর্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কোনো স্বতন্ত্র শাখা ছিল না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে চুঁচুড়ায় পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১৯-২১ ফাল্গুন ১৩১৮)। এই অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানেই বিজ্ঞান-শাখার জন্য স্বতন্ত্র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শাখা-অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> চুঁচুড়াতে সাহিত্য-সম্মিলনীর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে এক পৃথক বৈজ্ঞানিক বৈঠকের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সম্মিলনে পঠনার্থ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হয়, সময়াভাবে তাহাদের অনেকগুলি পঠিত হইতে পারে না এবং যেগুলি পঠিত হয়, তাহাদের কোনোটির আলোচনা সম্ভবপর হয় না। সুধীগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্মিলনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যেভাবে এতদিন সম্মিলনে কার্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহাতে যে এই আদান-প্রদান ব্যাপার আশানুরূপ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।[১৩]

ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রামে (৯-১০ চৈত্র ১৩১৯)। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। সভামণ্ডপের সম্মুখে এক 'সাহিত্য-প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে সংরক্ষিত হয়েছিল নানাধরণের পুরনো পুঁথি। সান্ধ্যসম্মিলনীতে অভিনীত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' নাটক। দ্বিতীয় দিনে বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে একখানি বিজ্ঞান-বিষয়ক মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আচার্য রায়কে সভাপতি করে একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। আলোচ্য অধিবেশনে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুকে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মানবতত্ত্বালোচনার জন্য চট্টগ্রাম থেকে উপকরণ সংগ্রহ ও বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম শাখা-পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর সপ্তম অধিবেশনটি একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মিলনী মূলত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে পরিচালিত হলেও অধিবেশনগুলি হচ্ছিল বাইরে। সপ্তম অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। পরিচালকমণ্ডলী এ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন—

> বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন একে একে ছয় বৎসর বাংলার পাঁচটি জেলায় ও বেহারের একটি জেলায় অধিবেশন করিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৩২০ সালে অপর কোথায়ও হইতে নিমন্ত্রণ না পাওয়ায় ইহার পরিচালক সমিতিতে কথা উঠে যে, তবে এ বৎসর কলিকাতাতেই অধিবেশন হউক।[১৪]

---

১৩. পরিষদের বিংশবার্ষিক বিবরণ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষৎ-পরিচয়, পৃ ২৩,

১৪. সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্য-বিবরণী।

কলকাতা টাউন হলে তিনদিনব্যাপী অধিবেশন হয় (২৭-২৯ চৈত্র ১৩২০)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মূল সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনের শাখা-সমিতির সম্প্রসারণ ঘটে। চুঁচুড়ার অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখা প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এবার বিজ্ঞান-শাখার সঙ্গে অপর তিনটি শাখাও প্রবর্তিত হল—সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন। শাখা-সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সাহিত্য), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (ইতিহাস), ড. প্রসন্নকুমার রায় (দর্শন) ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বিজ্ঞান)। লর্ড কারমাইকেল এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

মূল সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অভিভাষণে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও ইয়োরোপীয়ন বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—

> অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর হিত-পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন; ফিরিয়া আসিয়া তাহার লোকপূজ্য পিতার নিকটে দীক্ষিত হউন; দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্যসভ্যতার যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন; তাহা হইলে তাঁহার পৈত্রিক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর তাহার স্বোপার্জিত প্রতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে।[১৫]

এই বছর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: (ক) রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ করার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের 'বিপুল আনন্দ প্রকাশ', (খ) কবিকে পুরস্কৃত করার জন্য সুইডিস একাডেমিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, (গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট উপাধি দেওয়ার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। প্রস্তাবক ছিলেন কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন।

অষ্টম অধিবেশন হয় বর্ধমানে (২০-২২ চৈত্র, ১৩২১)। সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার ও যোগেশচন্দ্র রায় যথাক্রমে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। শাস্ত্রীমহাশয় বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে আলোচনা করেন। "আমাদের বর্তমান দুরবস্থার" তিনি দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন—

> বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত অভাব কি? উহা কি কেবল প্রতিভার অভাব? না প্রতিভার জন্য উপযুক্ত শব্দ উপকরণ এবং পরিবেশ ঘটনার অভাব? ইহার উত্তরে নিঃসঙ্কোচে বলিব আমাদের ভাষায় প্রকৃত বাক্যশক্তি এখনও সুসিদ্ধ হয় নাই; আমাদের ভাষা মনুষ্য মনের সমস্ত ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য ঋজুশক্তি লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় অভাব এই যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতসাহিত্যের আদর্শজ্ঞান আদবেই নাই। এই দুইটির অভাবের মধ্যে আমাদের বর্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ নিহিত রহিয়াছে।[১৬]

১৫. অভিভাষণ, ভারতী, বৈশাখ ১৩২১। এই সাহিত্য সম্মিলন সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে (প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড)।

১৬. সভাপতির অভিভাষণ, অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, কার্যবিবরণী।

বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে 'বাংলা সাহিত্যের অভাব ও নিরাকরণের উপায়' সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'মুসলমান কবির বাংলা কাব্য', রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'নব-নাগরিক সাহিত্য', শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও অন্তরায়'— সাহিত্যশাখায় পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দর্শন শাখার সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অভিভাষণের মধ্যে সাহিত্য-সম্মিলনের 'দ্বিবিধ কর্মক্ষেত্রে'র কথা উল্লেখ করেছেন—'বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের সংযোগ ও সহায়তায় জ্ঞানবৃদ্ধি' এবং 'সাধারণের মধ্যে সাহিত্যচর্চার রুচি ও প্রবৃত্তির প্রসার'। আলোচ্য সম্মিলনের ইতিহাস অধিবেশনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস শাখার যে তেইশটি প্রবন্ধ গৃহীত হয়েছিল বিষয় বৈচিত্র্যে ও মননশীলতায় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছিল: (১) স্থানবর্ণনা-বিষয়ক, (২) জীবনী-বিষয়ক, (৩) আলোচনা-বিষয়ক, (৪) ঐতিহাসিক ও (৫) অর্থনীতি-বিষয়ক। ইতিহাস-শাখার সভাপতি আচার্য যদুনাথ সরকার ইতিহাসচর্চার চরম ফলশ্রুতি সম্পর্কে বলেছেন—

> ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথপ্রদর্শক মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাসচর্চার চরম লাভ।[১৭]

বিজ্ঞান-শাখায় কৃষি রসায়ন, চিকিৎসা-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, তড়িৎ, সংখ্যাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হয়। এর মধ্যে মেঘনাদ সাহার 'পঞ্জিকার সংস্কার' ও দেবপ্রসাদ ঘোষের 'স্থিতি ও গতি' উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর অভিভাষণে দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞান দর্শনের 'কৃত্রিম কলহে'র অবসানই তাঁর মতে বিজ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ পথ—

> ইদানিং দর্শন হইতে বিজ্ঞান পৃথক করা হইয়াছে। প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশপথে আধুনিক বিজ্ঞান নিম্ন সোপান হইয়াছে। দর্শন উচ্চে রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের, বিজ্ঞান ও ধর্মের কৃত্রিম কলহ সৃষ্টি হইয়াছে। আজিকালির অধিকাংশ বিজ্ঞানসেবী ধূলাকাদা লইয়া খেলা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কদাচিৎ কেহ খেলাঘর ছাড়িয়া দূরদর্শী হন, প্রকৃতি বিকৃতি ছাড়িয়া মূল প্রকৃতি দর্শন করেন; ভাগ্যবান কেহ বা ইহারও উর্ধ্বে প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-মিলন প্রত্যক্ষ করেন।[১৮]

বর্ধমান অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গৃহীত প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য ও বিষয়বৈচিত্র্য। শতাধিক

১৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৯।
১৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

প্রবন্ধ এখানে গৃহীত হয়েছিল। এর থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালীর মননচর্চা ও গবেষণাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯]

নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যশোহরে (৮-৯ বৈশাখ ১৩২৩)। প্রথমে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তখন শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সর্বসম্মতিক্রমে সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মূল সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। অষ্টম ও নবম অধিবেশনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তখন পর্যন্তও সাহিত্য শাখার জন্য স্বতন্ত্র সভাপতি ছিলেন না, মূল সভাপতিই সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করতেন। দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখায় যথাক্রমে প্রমথনাথ তর্কভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও প্রমথনাথ বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্ত কর্মী ও সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুতে অধিবেশনের উপরে একটি শোকের ছায়া বিস্তৃত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও মতবিরোধের জন্য যশোহর অধিবেশন তেমন সার্থক হতে পারেনি। যশোহর অধিবেশন থেকেই সম্মিলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বাঁকিপুরে (৯-১১ পৌষ ১৩২৩)। এই অধিবেশনেই প্রথম সাহিত্য শাখার জন্য স্বতন্ত্র সভাপতি নির্বাচিত হন। মূল সভাপতি ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শশধর রায় যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাতৃভাষার উপর সুগভীর অনুরাগ এক আবেগদীপ্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

> দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব— আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব— আমার মাকে এমনভাবে সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মার সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্যজ্ঞান করিবে।[২০]

সাহিত্য-শাখার সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ 'বাংলার গীতিকবিতা' সম্পর্কে এক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। ইতিহাস শাখার সভাপতি বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শশধর রায় বাঙালির জাতিতত্ত্ব ও সুপ্রজননতত্ত্ব সম্পর্কে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এই অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেস্টারি করার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষৎ থেকে সম্মিলনকে স্বতন্ত্র করার প্রস্তাবে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যথিত হন।[২১]

১৯. প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'চুট্‌কি' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে বর্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিদের অভিভাষণগুলির অম্লমধুর সমালোচনা করেন।

২০. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণটির নাম ছিল 'বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ' পরে প্রবন্ধটি তাঁর "জাতীয় সাহিত্য" গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

২১, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকিপুরে সম্মিলনকে রেজেস্টারি করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সম্মিলনের সভাপতি মাননীয়

ঢাকায় অনুষ্ঠিত একাদশ অধিবেশন (৩০ চৈত্র ১৩২৪, ১ বৈশাখ ১৩২৫) উদ্বোধন করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন—

> সাধক ভেদে যেমন জননীর মূর্তি ভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্মের অনুকূল মূর্তি।[২২]

অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শশাঙ্কমোহন সেন, দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ, রামপ্রাণ গুপ্ত, দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। মূল সভাপতি তাঁর অভিভাষণে পূর্ববর্তী অধিবেশনের সভাপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিধ্বনি করে সর্বশেষে বলেছেন—

> রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজি বা হিন্দী কিংবা হয়ত উভয়েই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সময় প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাংলারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজি অথবা হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-অভাব, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাংলাতেই প্রচার করিব।[২৩]

দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ায় (৬-৮ বৈশাখ, ১৩২৬)। মূল সভাপতি ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সাহিত্য), যদুনাথ মজুমদার (দর্শন), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইতিহাস) ও গিরিশচন্দ্র বসু (বিজ্ঞান)। সভাপতি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলতে পারে। তাঁর মতে, ইংরেজি ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারে না—"যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য।" দেখা যাচ্ছে, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষণে মাতৃভাষা সম্পর্কে যেটুকু দ্বিধার ভাব ছিল, আশুতোষের ভাষণে তাও নেই।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের উদ্যোগে মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর ত্রয়োদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১-৩ বৈশাখ ১৩২৯)। মাঝখানে তিন বছর কোনো অধিবেশন হয় নি। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। সাহিত্য শাখার সভাপতি ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলিকে কেমনভাবে 'খাঁটি সাহিত্যের' কাজে লাগিয়ে সমাজের মঙ্গলসাধন করা যায়,—এ বিষয়ে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বিদেশী শিক্ষার দোষ সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমতি অনুসারে পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তৎলিখিত নিবেদনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করায় রামেন্দ্রবাবু বিশেষ ব্যথিত হন। একমাত্র সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীত্ব গুণে এবং রামেন্দ্র-ব্যোমকেশের প্রাণপাত পরিশ্রমে যে সম্মিলন আজ সফলতা লাভ করিয়াছে, যাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী কর্মকুশলতায় দেশের সাহিত্য ও সাহিত্য-সমাজ উপকৃত, তাহাকে পরিষৎ হইতে স্বতন্ত্র করার সংবাদে রামেন্দ্রবাবু প্রাণে যে ব্যথা পাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?"—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত "আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর" (১ম সং) পৃ ১৯৬।

২২. একাদশ অধিবেশনের কার্যবিবরণী, পৃ ৪।

২৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৭

নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনের (৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০) প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন: "গত তেরটি অধিবেশনই জেলার সদর সহরে হইয়াছে, কিন্তু এই অধিবেশন একটি পল্লীতে অনুষ্ঠিত হইল।··· এখানকার অধিবেশনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি এই স্থানের সহিত বিজড়িত।"[২৪]

এই অধিবেশনকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দনামূলক অনেকগুলি কবিতাও এখানে পঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন বিজয়চাঁদ মহতাব, বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন অমৃতলাল বসু (সাহিত্য), পঞ্চানন তর্করত্ন (দর্শন), নরেন্দ্রনাথ লাহা (ইতিহাস), জগদানন্দ রায় (বিজ্ঞান)।

এই অধিবেশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও বঙ্কিমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ইতিহাস শাখার সভাপতি যখন তাঁর অভিভাষণ পড়ছিলেন, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সমবেত জনমণ্ডলী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। সভাপতির অনুরোধে তিনি মৌখিক ভাষণে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশে, বাংলা সাহিত্যে— নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রথম বের হয়েছিল, তখন আমি যুবা বা তার চাইতে কম বয়সের; আমি প্রাণের সেই স্বাদ পেয়েছিলুম। বাংলা ভাষা এখন অনেক অনেক পরিপূর্ণ; তখন নিতান্ত স্বল্প পরিসর ছিল। একলাই তিনি একশো ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, সমালোচনা প্রভৃতি সকল দিকে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যে কত বড় কৃতিত্ব, এখন ভালো করে তা উপলব্ধি করা কঠিন।[২৫]

এই অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্মৃতিসমিতির হাতে বঙ্কিম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের বৈঠকখানা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের সূতিকাগৃহ দান করায় তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

'নৈহাটির দেখাদেখি' খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অধিবাসীরা পরের বছর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে অধিবেশন আহ্বান করেন (৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১)। এই সভার মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিভিন্ন শাখার সভাপতি ছিলেন— জলধর সেন (সাহিত্য), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (দর্শন), রমাপ্রসাদ চন্দ (ইতিহাস), বনওয়ারীলাল চৌধুরী (বিজ্ঞান)। সাহিত্যশাখায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শিবরতন মিত্রের 'রাজর্ষি রামমোহন রায়ের রচনারীতি' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য শাখার সভাপতি জলধর সেনের প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে কবি বায়রনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কারণ ঐ দিনেই (৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল) একশো বছর আগে বায়রনের মৃত্যু হয়।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে মুন্সীগঞ্জে (ঢাকা) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (২৭-২৮ চৈত্র, ১৩৩১)। এই সম্মিলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল সাহিত্য-শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ। অভিভাষণে শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত একটি মৌলিক

---

২৪. চতুর্দশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্যবিবরণী (১ম খণ্ড), পৃ ৯৫

২৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১০১-১০২। রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণ বিদ্যাদিত্য জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক অনুলিখিত হয়।

প্রশ্নের উপরে আলোকপাত করেছেন। নবীন সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে শরৎচন্দ্র সেদিন যা বলেছেন তা শরৎসাহিত্যের একটি মূলসূত্রও বটে—

> সমাজ জিনিসটাকে আমি জানি, কিন্তু দেবতা বলে জানি নে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালোবাসার বেলায়।...পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোনো সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্যসাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।[২৬]

অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে সিউড়িতে সপ্তদশ অধিবেশন হয় (২০-২১ চৈত্র ১৩৩২)। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনের চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। অষ্টাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার মাজুতে (১৬-১৭ চৈত্র ১৩৩৫)। মাঝখানের তিন বছর কোনো অধিবেশন হয় নি। অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে যে কিছু ভাঁটা পড়েছিল, এই ব্যাপার থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সম্মিলনে যোগ দিতে পারেন নি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখায় যথাক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও একেন্দ্রনাথ ঘোষ। মূল-সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেন আবেগদীপ্ত উচ্ছ্বসিত ভাষণে বাংলার সুবিপুল লোকসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন—

> এই বাংলাদেশের কত স্থানে কত বিরাট দীঘি, ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, স্তূপ ও মন্দিরাদি আছে, কত প্রবাদ ও গীতিকথা আছে...এই বিপুল উপকরণ কালে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, আমরা পশ্চিমমুখী দৃষ্টি কবে পূর্বমুখে ফিরাইয়া আনিব।[২৭]

সাহিত্য-শাখার সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নবীনপন্থী সাহিত্যিকদের ও চলতি ভাষার স্বপক্ষে রায় দেন। ইতিহাস-শাখার সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদার "বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস চর্চা" প্রবন্ধে ঐতিহাসিকের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আলোচ্য বিষয় ছিল "দর্শনের দৃষ্টি"। বিজ্ঞানশাখার সভাপতির প্রবন্ধটির নাম ছিল "বাংলার প্রাণীসজ্ঘ সম্পর্কে কয়েকটি কথা"। ভারতচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও তাঁর রচনাবলীর "একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ" প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঊনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুরে (১৯-২১ মাঘ ১৩৩৬)। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বড়োদা থেকে আমন্ত্রণ আসার জন্য কবি এই সম্মিলনে যোগ দিতে পারেন নি, বড়োদা থেকে একটি ভাষণ পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্থানে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন

---

২৬. শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি "সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি" নামে মাসিক বসুমতীতে (চৈত্র ১৩৩১) মুদ্রিত হয়। পরে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়।

২৭. অষ্টাদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্যবিবরণী, পৃ ৫২

স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনিই কবির এই ভাষণটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।[২৮] সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর অভিভাষণে বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর স্থান কতখানি, তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন কামিনী রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। এই অধিবেশনে রামমোহন ও বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীকে রেজেস্টারি করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। এর প্রায় দেড় বছর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীকে রেজেস্টারি করা হয় (১৮ আষাঢ় ১৩৩৮)।

ভবানীপুর অধিবেশনের পর দীর্ঘ সাত বছর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর কোনো অধিবেশন হয় নি। এই অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনের দ্বিতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর প্রাণপ্রবাহও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দীর্ঘ সাত বছর পর মূলত হরিহর শেঠের আগ্রহাতিশয্যে চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর বিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (৯-১১ ফাল্গুন ১৩৪৩)। চন্দননগরে হরিহর শেঠের গঙ্গাতীরের বাসভবনে (জাহ্নবী নিবাস) তিনদিন ব্যাপী সম্মিলনের কাজ চলে, এখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বজরায় চন্দননগরে আসেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের চন্দননগরের স্মৃতিকথা আলোচনা করেন। আর্ট সম্পর্কে সমুচ্চ ভাবাদর্শও কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

> সাহিত্যকে নির্মল করার আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের থাকে। আমি নির্মলতাকে সংকীর্ণতা বলছি না, নীরসের কথাও বলছি না। কবি হয়ে আমি তা পারি নে। পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায়ও আছেন, যাঁরা ছবি, রঙ্ প্রভৃতিকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করেন। আমি এই মনোভাবের নিন্দা করি। বিধাতা আমাদের যে কত সৌন্দর্য ও রসের অধিকারী করেছেন, সেটা যদি আমরা স্বীকার না করি, তবে তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। স্বীকার যদি আমরা করি, সৌন্দর্য ও রসের বিধাতা আনন্দিত হন।[২৯]

আলোচ্য অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ছাড়া আরও আটটি শাখার অধিবেশন হয়েছিল। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো অধিবেশনে শাখাসমিতির এত বিস্তৃতি ও সংখ্যাধিক্য ছিল না। বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভাপতি ছিলেন: প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্য), মহেন্দ্রনাথ সরকার (দর্শন), যদুনাথ সরকার (ইতিহাস), প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (বিজ্ঞান), অনুরূপা দেবী (কথাসাহিত্য), মানকুমারী বসু (কাব্যসাহিত্য), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সংবাদ-সাহিত্য), অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সুকুমার কলা), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শিশু-সাহিত্য), রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (অর্থনীতি), সুন্দরীমোহন দাস (চিকিৎসাবিদ্যা) ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (বানান-সমস্যা)। সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরী লেখকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছিলেন: "সমাজের দোহাই দিয়ে লেখকদের স্বাধীনতা খর্ব করে তাঁদের বড় লেখক করা যায় না।" ইতিহাস-শাখার সভাপতি যদুনাথ সরকারের অভিভাষণটিও ('ভারতে ফরাসী প্রভাব') বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বা অন্তিমপর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্মিলন হল কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ অধিবেশন (২৯ মাঘ, ১-২ ফাল্গুন, ১৩৪৪)। শরৎচন্দ্রের মূল সভাপতি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি 'সংশয়াপন্ন পীড়িত হওয়ায়' প্রমথ চৌধুরীকে মূল সভাপতি নির্বাচন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতে

---

২৮. রবীনাথের ভাষণটির নাম 'পঞ্চাশোর্ধম'। ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বিচিত্রায় প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৯. সম্মিলনের কার্যবিবরণী। দ্রষ্টব্য: হরিহর শেঠ সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর' (১৯৬১) পৃ ১৩০।

না পারলেও শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন (১৫ মাঘ ১৩৩৪): "কৃষ্ণনগরে আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ সফলতা কামনা করি।"[৩০] নদীয়ার মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের নাটমন্দির ও তৎসংলগ্ন সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ব্যবহার করতে দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতিকে সাহায্য করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে দ্বিজেন্দ্রলালের কন্যা মায়া দেবী কবির ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিয়ে "জননী বঙ্গভাষা" গান করেন।

সম্মিলনের ছাব্বিশ দিন আগে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় (২ মাঘ ১৩৪৪)। সম্মিলনীতে শুধু শোক প্রস্তাবই গৃহীত হয় নি, মূল সভাপতি প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্রের প্রশস্তি দিয়েই তাঁর ভাষণ শুরু করেন। 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগরের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন, ভাষার জন্য যে তিনি 'কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী'— এ কথাও তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ-চতুর পরিহাস-রসিকতার সুরে যা বলেছেন, তাতে তাঁর মনোলোক উদ্ভাসিত হয়েছে—

> আর একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। লোকে বলে— আমার লেখায় রস নেই, কিন্তু বীরবলের লেখায় রসিকতা আছে! অর্থাৎ আমার লেখা পড়ে পাঠকের চোখে জল আসে না, কিন্তু ঠোঁটে হাসি ফোটে। এই গুণও এই কৃষ্ণনগরের গুণ। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনার নাম "হাসির গান"। সেকালে বোধহয় কৃষ্ণনগরের হাওয়ায় ইলেক্‌ট্রিসিটি ছিল।[৩১]

সাহিত্য-শাখার সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্তের অভিভাষণটি তীক্ষ্ণতায় ও মননশীলতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর অভিভাষণটির নাম 'সাহিত্য'। সাহিত্যকে তিনি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—কাব্য ও কাব্যেতর। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনা কখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে ওঠে, এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য—

> বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি— লেখকদের ক্ষমতায় এ সকলই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু সে লেখা তখনই হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যখন তার সাহিত্যিক রূপ ও ভঙ্গি বক্তব্যকে প্রকাশের প্রয়োজনে ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, অলংকারসজ্জার মত বহিরঙ্গ নয়— যাকে বাদ দিলেও বক্তব্যের বুদ্ধিগম্যতার কোনো ক্ষতি হত না।···জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাকে সাহিত্যিক পথে চালাতে সাবধানতার কত প্রয়োজন, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'।[৩২]

অতুলচন্দ্রের মতে কাব্যেতর সাহিত্যে বাঙালির দৈন্যের কারণ তার সাহিত্যশক্তির অভাব নয়, 'মননবৃত্তির আলস্য'।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বাবিংশ অধিবেশন হয় কুমিল্লায় (২৫-২৬ চৈত্র ১৩৩৫)। মূল সভাপতি ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণটি তৎকালীন সাংস্কৃতিক সংকটকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে—

> বাংলা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয় তাহার জন্য যথার্থ হিতকামী বঙ্গসন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনর্থ হইবে। আমার মনে

---

৩০. একবিংশতি অধিবেশনের কার্যবিবরণী, পৃ ৫।

৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ১১৫।

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ১২৫।

হয়, উপস্থিতক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণছায়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে আশা করি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।[৩৩]

আচার্য সুনীতিকুমারের আশংকা নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছিল!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর চরিত্র ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল। যে আদর্শ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই সম্মিলন শুরু হয়েছিল তার আগুন ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর জন্মলগ্নে ছিল বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রাণচাঞ্চল্য। কারণ বঙ্গভঙ্গ রোধ করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের এক সামগ্রিক জাগরণ ঘটেছিল। জীবনের সব দিকেই তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন—

The *Swadeshi* movement did not come into birth with the agitation for the reversal of the Partition of Bengal. It was synchronous with the national awakening which the political movement in Bengal had created. The human mind is not divided into watertight compartments, but is a living organism; and when a new impulse is felt in one particular direction, it affects the whole organism and is manifest throughout the entire sphere of human activities.[৩৪]

সাংস্কৃতিক সংহতিরক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ভাবাদর্শ জাগিয়ে তোলাই এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য-পরিষদের নেতৃত্বেই এই সম্মিলন পরিচালিত হয়েছে। তাই পরিষদের কার্যবিধি ও উদ্দেশ্য সম্মিলনেও গৃহীত হয়েছে।

যশোহরে অনুষ্ঠিত নবম অধিবেশনেই প্রথম একটি ফাটল লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্বিরোধ ও মতানৈক্য এই সম্মিলনকে অনেকখানি দুর্বল করে ফেলেছিল। বাঁকিপুর অধিবেশনে যখন এই সম্মিলনকে রেজেস্টারি করার প্রস্তাব ওঠে, তখন রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পরিষদ্‌নেতা মর্মাহত হয়েছিলেন। সাহিত্যপরিষৎ থেকে সম্মিলন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফীর অকালমৃত্যুর পর থেকে পরিষৎ ও সম্মিলন—এই দুয়ের মধ্যে সংযোগসূত্র ক্ষীণতর হল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মৌলিক চরিত্র নষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে সাধারণ সাহিত্যসভায় পরিণত হল। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত চিন্তানায়কও চন্দনগর অধিবেশনে আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "বিজ্ঞানকে ব্যাসকূটের পরব্যোম হইতে পৃথিবীলোকে অবতারণ করিবার জন্য আজ রামেন্দ্রসুন্দর কোথায়? 'After life's fitful fever' তিনি তো অনেক বর্ষ 'স্বর্গলোকে বিশালে' শান্তিসুখ উপভোগ করিলেন, এখন নামিয়া আসুন।" বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ পরিণতির ছবিই হীরেন্দ্রনাথকে শঙ্কাতুর করেছিল। তাই এই সংকট-মুহূর্তে তিনি সম্মিলনের প্রাণপুরুষ রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করেছেন।

---

৩৩. বিবিধপ্রসঙ্গ, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ ১৪১।

৩৪. *A Nation In Making*, (1963), Page 183.

স্বদেশী আন্দোলনের আগুন নিভে এলো, নিস্তেজ হয়ে এলো তার কর্মচঞ্চল মুহূর্তের প্রবল উন্মাদনা। সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের কারো কারো মৃত্যু হল, কেউ কেউ বা কর্মান্তরে সরে গেলেন। উদ্যোগে, আয়োজনে ও কর্মতৎপরতায় শৈথিল্য দেখা দিল। সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির জায়গায় দেখা দিল প্রথানুগত্য। সম্মিলনের সভাপতিদের সুচিন্তিত অভিভাষণ, প্রবন্ধকারদের গবেষণামূলক রচনা বাঙালির মননচর্চার উজ্জ্বল পরিচয় দেয়। কিন্তু বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে তার আবেদন কতটুকু? সঙ্গে সঙ্গে সে মননচর্চা কতখানি রসের দ্বারা সঞ্জীবিত, কতখানিই বা নীরস পাণ্ডিত্য,—এ প্রশ্ন জাগাও অস্বাভাবিক নয়। কৃষ্ণনগরের অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

> বাঙালির এই মানসিক আলস্যের মূল কারণ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি। এ শিক্ষা আমাদের মনকে সচল ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করছে না, তৈরি বিদ্যার চাপে তাকে পিষে মারছে। এ শিক্ষাপদ্ধতিকে দূর করে বাঙালির বুদ্ধিকে মুক্ত ও ঔৎসুক্যকের স্ফূর্তির উপযোগী শিক্ষা আনতে পারলে তবেই বাঙালি জ্ঞানের জগতে আসন পাবে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান দর্শন অর্থনীতি ইতিহাসের অভাবের জন্য সাহিত্যশাখার সভাপতিকে শোক করতে হবে না। তার এক কারণ এগুলি তখন সাহিত্যের শাখা থাকবে না, প্রতিটি পরিণত হবে এক একটি মহাদ্রুমে। কে জানে অদূর ভবিষ্যৎ না সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।[৩৫]

বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয় বা পণ্ডিতব্যক্তিদের সম্মিলন কোনো দেশের সাহিত্যকেই বাঁচাতে পারে নি। পণ্ডিত সমাজের বাইরেও যে রসজ্ঞ সমাজ আছে, তাঁরাই চিরকাল সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহকে সজীব রেখেছেন। সাহিত্য-সম্মিলন শেষ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের সম্মিলনেই পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশবরেণ্য মনীষী এতে প্রাণরস সিঞ্চন করেছিলেন। এই সম্মিলনীর মধ্যে ত্রিশ বছর ব্যাপী বাঙালির মননচর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণবোধ, আদর্শবাদ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র চর্চার প্রতি কৌতূহল সম্মিলনের অধিবেশনগুলিকে গৌরবান্বিত করেছিল। সাহিত্য যে অলস মনের রস-রোমন্থন নয়, দেশ জাতি ও সমাজ সৃষ্টিতে যে এর দায়িত্ব কতখানি অধিবেশনগুলিতে সেই বাণীমন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে। "গল্প-কবিতা ও নাটক নিয়েই বাংলা-সাহিত্যের পোনের আনা আয়োজন, অর্থাৎ শক্তির আয়োজন নয়, ভোজের আয়োজন" একদা রবীন্দ্রনাথকে এই আক্ষেপোক্তি করতে হয়েছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সেই শক্তির আয়োজনকেই ষোড়শোপচারে সাজিয়ে তুলেছিল।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন' আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এর উপকরণগুলিও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ গবেষকেরা এর ভিতর থেকে এমন বহু তথ্য পাবেন যা কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বিংশশতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পক্ষে এই সম্মিলন থেকে বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে। জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের যে সৃষ্টিমুখর

---

৩৫. একবিংশ সম্মিলনীর কার্য-বিবরণী, পৃ ১২৮-১২৯

উদ্দীপনা সেদিন এই মিলনকে সার্থক করে তুলেছিল, তা বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যের অক্ষয়সম্পদ। কবিকণ্ঠের উদার আহ্বান তাকেই বাণীমূর্তি দিয়েছিল—

> আমাদের অদ্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থায়ী যোগের আনন্দে যদি পরিণত হয়, তবে যে চিরন্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্‌ঘাটিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য বহনপূর্বক এবক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তুলিবে।[৩৬]

৩৬. 'সাহিত্য-পরিষৎ' (১৩১৩), বহরমপুরে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য লিখিত। পরবর্তীকালে 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এক শতাব্দীর কাব্য

সুনীলচন্দ্র সরকার

সাল তারিখের উপর খুব একটা গুরুত্ব আরোপ না ক'রে, সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক ন্যায্যতার চেয়ে সহজে বোঝা ও মনে রাখার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৫০ ও ১৯৫০ এই দুটি সাল বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং এর মধ্যকার এক শ বছরের কাব্যের সমস্যা সন্ধান ও সিদ্ধির আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। পৃথিবীর কাব্য সম্বন্ধে লিখতে হলে, লেখক যিনিই হোন-না কেন তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নানা রকমে সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এজ্‌রা পাউণ্ড এলিয়ট্ প্রভৃতি যাঁরা বিশ্বসাহিত্য চর্চার প্রবর্তক, তাঁদেরও অনেক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল সামান্য বা কিছুই না, আবার অনেক প্রধান সাহিত্য তাঁদের জানতে হয়েছিল অনুবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদ পাঠ ক'রে কাব্য সম্বন্ধে বিচার যে একেবারে অসম্ভব তা বলতে চাই না। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ও বিচিত্ররসগ্রাহী সুপরিণত ভাবমানসের অধিকারী ছাড়া অপরের পক্ষে এ কাজ যে বিঘ্নব্যর্থতার সম্ভাবনায় পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

তবু নিজেদের সাহিত্যে কাব্যের বোধ ও রুচির বিস্তার ও নতুন সৃষ্টির সুবিধার জন্য এ কাজ একান্ত আবশ্যক। আজকের এই 'এক-জগৎ' চেতনার দিনে কোনো কাব্যই আর সংকীর্ণ দেশকালে নিজেকে আবদ্ধ রেখে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে না। আধুনিক বাংলা কাব্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কত দেশের কত কাব্যের ঢেউ এসে তার মধ্যে ভাঙছে। কবিরা এইসব বিচিত্র প্রভাব ও প্রেরণা থেকে করছেন সচেতন নির্বাচন, কখনো বা নিজেরা কিছু না জেনেই চালিত হচ্ছেন এইগুলির দ্বারা। পৃথিবী জুড়ে কাব্যের যে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট চলেছে তার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা লাভ করলে সচেতন ও অচেতন দু রকম কবিরই লাভ, কারণ তার দ্বারা একরোখা একদেশদর্শিতা, উগ্র মতবাদিতা (dogmatism) বা দলীয়তার নিরসন সম্ভব, আবার ধারণার অস্পষ্টতা বা ভ্রান্তির জন্যে উৎসাহের যে প্রচুর অপচয় হতে দেখা যায় তাও অনেকটা এড়ানো যেতে পারে। তা ছাড়া কাব্যপাঠকদের রুচি ও প্রত্যাশা এই রকমের আলোচনার দ্বারা সুস্থ ও সজাগ হয়ে উঠলে তার ফলে ভালো কাব্যের প্রকাশ ও প্রচারসম্ভাবনা বাড়ে।

দুটি যুগসন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করার সপক্ষে কিছু যুক্তিপ্রমাণ হাজির করা যায়। একটি হল ১৮৫০ সাল। এই সময় ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড দু'দেশেই রোম্যান্টিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা নূতন সাহিত্যরচনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করল। থিওফিল্ গোতিয়ে'র (Theofil Gautier) যুগান্তরকারী উপন্যাস মাদামেয়েজেল দ্' মোপ্যাঁ, যার মধ্যে 'Art for art's sake'—'শিল্পসৃষ্টি শুধু তার নিজস্ব আনন্দের জন্যে'—এই বাণী উচ্চারিত হল, তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৫ সালে। ভিক্টর হুগোর ব্যাপক প্রভাবের মধ্য থেকে ও নূতন শিল্পগোষ্ঠী গ'ড়ে তুলতে এই বই বিশেষ সাহায্য করেছিল, কিন্তু এই নূতন মতবাদের যথার্থ রূপটি প্রকাশ হল ১৮৫২ সালে গোতিয়ে'র Emaux et Camées নামে কবিতাসংকলন প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে। এরই মধ্যে আছে তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা L' Art যা হল এই নূতন আর্টের "মূলনীতি"র ব্যাখ্যান। ইয়োরোপে আধুনিক

কাব্যযুগের সর্বজনস্বীকৃত নেতা বোদ্‌লেয়রও গোতিয়ে'র প্রভাব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর যুগান্তরকারী Fel ur d' Mal প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে।

ইংল্যাণ্ডেও দেখি ১৮৫০এই টেনিসনের *In Memoriam*-এর প্রকাশ এবং তাঁর পোয়েট্‌ লরিয়েট পদলাভ। অর্থাৎ ভিক্টোরিয়্যান-রীতির প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গেই প্রির‍্যাফেলাইট্‌ স্কুলের উদ্ভব। ১৮৫০ সালেই প্রির‍্যাফেলাইটদের প্রধান প্রবক্তা ডি. জি. রসেটির *First Poems* প্রকাশিত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড, যিনি কালচেতনায় এই দু পক্ষের চেয়েই অগ্রসর, তাঁর প্রথম কবিতার সংকলনও প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে।

আর-একটি তারিখ যা মেনে নিতে অসুবিধা নেই সে হল ১৯০০ সাল। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হল আর্থার সাইমন্‌স্‌এর *Symbolist Movement in Literature*, এবং এই বইয়ের প্রভাব সম্বন্ধে ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট অনেকের সাক্ষ্য আছে। ইয়েট্‌স্‌এর মতে 'Then in 1900 everybody got down off his stilts,' ঐ ১৯০০ সালে ইংল্যাণ্ডের কবিরা সকলেই কৃত্রিম অবলম্বন ছেড়ে সরাসরি মাটির উপর নেমে দাঁড়াল।

১৯৫০ সালটার তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। ওটা শুধু সুবিধার জন্য নেওয়া। তবে ওরই আগে ইয়েট্‌স্‌ এলিয়ট্‌ রবীন্দ্রনাথ নীরব হয়ে গেছেন, অডেন স্পেণ্ডার ম্যাজ্‌ বার্কার ডাইল্যান টমাস প্রভৃতির নূতনত্বেরও অবসান ঘটেছে, এবং দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর সৈনিক কবিরা তাঁদের New Apocalypse আদর্শের ঘোষণা করেছেন— যা রোমাণ্টিকতা ও মিস্টিক মনোভাবের একটা নূতন সংস্করণ। সিড্‌নি কিয়েজ্‌ (Sidney Keyes)— যিনি অতি অল্প বয়সে নিহত হন এবং যাঁর *Collected Poems* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে তাঁর কাব্যরচনার উদ্দেশ্য 'শ্রোতাদের কাছে সসীমের সঙ্গে অসীমের নিরন্তর মিলনের একটা আভাস এনে দেওয়া···যা চিরন্তন তার সঙ্গে এই বস্তুজগতের গাঢ় সম্বন্ধটি ফুটিয়ে তোলা।' অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ এই এক শ বছরে কাব্য অনেক নূতন আবিষ্কার ও সৃষ্টির পর একটি পূর্ণবৃত্ত আবর্তন করে আবার যেন যাত্রারম্ভের অনুরূপ এক ভূমিতে এসে দাঁড়াল।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও আর্টের জগতে দেখা যায় শিল্পীরা কোনো-না-কোনো মতবাদ আশ্রয় করে স্কুল বা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চাইছেন, এমনকি গ্রাহক পাঠক সমাজে নিজেদের কর্মসূচীও প্রচার করছেন। আমাদের দেশের বৈষ্ণবকাব্যের রচয়িতারা, বা বাউলদের মত লোকসংগীতের উদ্ভাবকরা নিজের নিজের সাম্প্রদায়িক আদর্শ ও রচনারীতি মেনেছেন, কিন্তু সে কোনো একটা বুদ্ধিসাধ্য বিবৃতির ব্যাপার নয়, আজীবন সাধনার বিষয়। এবং তা কোনো বিশেষ স্থানকালের ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াজাত নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় বিভিন্ন স্কুলের প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু সে প্রভাব ব্যক্তিগত। গোষ্ঠীগঠনের চেষ্টা যে একেবারে হয় নি তা নয়, কিন্তু তা সফল হয় নি।

যেসব 'ইজম্‌' বা মতবাদের উদ্ভব হয়েছে এই এক শ বছরে তা থেকে মোটামুটি ওদেশের কবিরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ও কেমন করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মতবাদ ও তার প্রয়োগের মধ্যে প্রায়ই থাকে অনেক ব্যবধান,

অসামঞ্জস্য, আর একই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেও থাকে অনেক ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য, এমনকি বৈপরীত্য। যে কবি নিজেকে এক গোষ্ঠীর অনুবর্তী বলে ঘোষণা করেছেন, পরে দেখা গেছে তিনি মোটেই তা নন। তা ছাড়া এক মতবাদ থেকে অন্য মতবাদে বিচরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই সাধারণভাবে এক-একটি যুগের জীবন ও শিল্পের সমস্যা আলোচনা ক'রে সেই ভূমিকায় এই মতবাদগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করতে পারলে তবেই নূতন সৃষ্টির রহস্য খানিকটা বোঝা যাবে।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বহির্জীবনের দ্রুত রূপান্তর আর চিন্তাজগতেরও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। মিল, বেন্থাম, কোঁৎএর চিন্তাজগৎ মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ঘাতপ্রতিঘাত সংঘটন ও সঞ্চালনগুলিকে লক্ষ্যসীমার মধ্যে রেখে সেই ভিত্তিতেই গঠিত। এঁদের উপযোগবাদ (utilitarianism), ও ইতিবাদ ((positivism)- মূলক চিন্তাধারায় বাস্তব সত্যের প্রতি একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখা যায়। অপর দিকে ডারুইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলের বিবর্তনবাদমূলক চিন্তায় মানুষের জীবন ও তার সভ্যতার পরিণতি সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকসূত্র আবিষ্কারের দাবী জনচিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। এমন একটা সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মানুষ এই রকমের নিস্পৃহ নৈর্ব্যক্তিক তথ্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চিন্তার বলে নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই বুদ্ধির সতর্ক নিপুণ ও পরিপূর্ণ ব্যবহারই তখন সব চেয়ে হিতকর ও প্রয়োজনীয় কাজ বলে সকলেরই মনে হয়েছিল। কাব্যের পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল এই বুদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে কেমন করে একটা আপস রফা করা যায়। রোম্যাণ্টিক কাব্য বুদ্ধিকে মননকে একটা স্থান যে দেয় নি তা নয়—কিন্তু সে হল কোনো একটা আদর্শ ভাব কল্পনা বা প্রেরণার অনুবর্তীভাবে। স্বাধীনসন্ধানী নিত্যবিশ্লেষণশীল যুক্তিগ্রন্থন-নিপুণ ব্যাবহারিক বুদ্ধিকে ঐ কাব্য মেনে নিতে পারে নি। এখন দেখা গেল এই বুদ্ধির দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে যে কাব্যসৃষ্টি সম্ভব তাতে আর জনচিত্তের সায় পাওয়া যাবে না। কাজেই হয় একে কাব্যের মধ্যে একটা স্থান দিয়েও কাব্যপ্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার দুরূহ সাধন করতে হবে, নয় এমন একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে হবে যেখানে এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণ বিচার নিজের থেকেই খানিকটা উদার ও অনুকূল হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল লোকজীবনের অভিজ্ঞতার দ্রুতবিস্তার। লোকশিক্ষার বিস্তৃতি, কয়েকজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তির জীবন থেকে চোখ ফিরিয়ে জনসাধারণের বিচিত্র জীবনের দিকে মানুষের দৃষ্টিক্ষেপ, জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আবিষ্কার এবং তার ফলে মানুষের প্রত্যক্ষ জগৎ-চেতনার ব্যাপ্তি—এইসমস্ত কিছুর ফলে যে নূতন জগৎ তৈরি হয়ে উঠল তাকেও অস্বীকার করা কবির পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন এই বৃহৎ বাস্তবসত্যের দিকে পিছন ফিরে কল্পনাপ্রস্থান করতে গেলে আর তা কোনো মতেই জনচিত্তের সমর্থন পাবে না। কাব্যের পাঠক আগে ছিল প্রধানতঃ শিক্ষিত সংস্কৃতির অধিকারী গোষ্ঠী বা সমাজের লোক; তাদের কাছে আশা করা যেত বিশেষ প্রস্তুতি, কাব্যের ঐতিহ্য ও কলাকৌশলের সঙ্গে একটা মোটামুট পরিচয়। জনশিক্ষার বহুল বিস্তারের দিনে সে রকম গোষ্ঠীরও আর অস্তিত্ব রইল না,

সে রকম পূর্বপ্রস্তুতিও আর কবি দাবী করতে পারলেন না। কাজেই বিষয়বিস্তৃতির দ্বারা নূতন জগৎ, নূতন জীবনরীতি, শিল্পান্বিত গ্রাম প্রান্তর নগরের নূতন চিত্রকে, আর বিশেষতঃ আধুনিক সভ্যতার নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরোধ বিপ্লবকে কেমন ক'রে কাব্যের পরিসীমার মধ্যে গ্রহণ করা যায় এই হল দ্বিতীয় সমস্যা।

নূতন পাঠকদের প্রকৃতি ও প্রস্তুতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাই থেকেই তৃতীয় সমস্যাটির উদ্ভব। এই-সব পাঠকের মানসিক গঠন, তাদের নিজেদের মানসিক শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে কবিকে তাঁর কাব্য রচনা করতে হবে। যাতে বুদ্ধির শুষ্কতা, বাস্তব সত্যের প্রতিচিত্রণের কাঠিন্য—এসবকে রসজীর্ণ ক'রে আনন্দের সঞ্চার করা যায়। কারণ বুদ্ধি ও বাস্তবের সমস্ত দাবী মিটিয়েও শিল্পের আনন্দে বিষয়বস্তুকে উত্তীর্ণ ক'রে না দিতে পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ। কাজেই দেখা যায় নূতন কবিরা প্রায় সকলেই কাব্যশিল্পের রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত। নূতন যুগের অনেক কবিতা এই শিল্পচিন্তাকে কেন্দ্র করেই রচিত। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। ১. লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্পের স্তরে নেমে এসে। ২. সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মানসযন্ত্রের ক্রিয়া কৌশল বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে নানা নূতন সমন্বয়ের দ্বারা কাজে লাগিয়ে। ৩. সাধারণ লোককে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ক'রে একেবারে নিরালা নিজস্ব 'প্রাইভেট' কাব্যজগতে প্রবেশ করে, এবং কেনো একটি ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর তৃপ্তির জন্যই বা শুধু নিজের জন্যই কাব্য রচনা করে। এই শেষের ক্ষেত্রে কবির সাধনা হল কোনো নূতন আভ্যন্তর নিয়ন্ত্রণ বা সমন্বয়কৌশলের সাহায্যে নূতন কাব্য-অভিজ্ঞতা লাভ, নূতন আর্ট সৃষ্টি। তাঁর আশা যে তাঁর নবাবিষ্কৃত পথে সত্যকার মূল্যবান্ কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বুঝলে পরে আসবে অনেক সাধক একে একে, এবং ক্রমে এই আর্ট পাবে অনেকের স্বীকৃতি।

কাজেই তিনটি দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করা হবে। যথা—

১. কাব্যের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধন। বিভিন্ন মতবাদ গঠন। ২. আধুনিক বাস্তবচেতনার সমান্তরাল বিষয়বিস্তৃতি। কাব্যবস্তু ও উপাদানের সম্প্রসারণ। ৩, নূতন পরিস্থিতি ও পাঠকের কথা মনে রেখে কবিমানস প্রয়োগের শৈল্পিক নিমন্ত্রণ। নূতন শিল্পরীতি, নূতন রস আবিষ্কার।

মতবাদ, বাস্তবজগৎ ও কাব্যশিল্প

আলোচ্য এক শ বছর ধ'রে কবিরা নূতন কাব্যসৃষ্টির যে এক্স্পেরিমেণ্ট করেছেন, দেখা যাবে তার সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করেছে উল্লিখিত তিনটি সমস্যার একই সঙ্গে সমাধানের কৃতিত্বের উপর। যেসব কবি শুধু একটিমাত্র সমস্যার মীমাংসায় তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের দান সাময়িক একটা চমকের সৃষ্টি করে থাকলেও আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আধুনিক বাস্তববোধ ও যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে একটা আপসের চেষ্টায় যে মতবাদ ও গোষ্ঠীগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল সেগুলি নানা বদল বৈচিত্র্য ও প্রভাবের হ্রাসবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এই শতবর্ষের বিভিন্ন যুগের কবিকেই থেকে থেকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ভর করেছে তিনি আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতা-প্রসারকে কতটা ধারণ করতে পেরেছেন এবং তাঁর বক্তব্যকে কি পরিমাণে আধুনিক মনের পক্ষে গ্রহণীয় কাব্যরসাস্বাদে উত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছেন তার উপর। প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী কাব্যকৃতিকেই আমাদের এই তিনটি সূত্র দিয়েই যাচাই ক'রে

নিতে হবে। আর-একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঐ তিনটি সূত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে একটি আর-একটির সঙ্গে যুক্ত। থিয়োরি দিয়ে বাস্তববুদ্ধির কাছে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলা যায়, অভিজ্ঞতার জগতে তার স্থান নির্দেশ করে কেমনভাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে তা পাঠকদের শিখিয়ে দেওয়া যায়, সেই বিশেষ ধরণের কাব্যের পক্ষে অনুকূল মনোভঙ্গির সৃষ্টি করবার দলবদ্ধ চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু থিয়োরির প্রয়োগ সত্যকার কাব্যের আনন্দের মধ্যে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে না পারলে সবই ব্যর্থ। নূতন বিষয়েরও একটা চমক আছে, কিন্তু সেও অস্থায়ী। কেমন ক'রে তা স্থায়ী কাব্যরসের প্রসাদলাভ করবে এই হল সমস্যা। আর্টের কলাকৌশলের যে অভিনবত্ব তাও যতক্ষণ-না কোনো সত্য অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে ততক্ষণ চিরত্ব-বর লাভ করে না।

মতবাদ— নান্দনিকতা

প্রধান মতবাদ হল একদিকে কাব্যে নন্দনবাদ বা এস্‌থেটিসিজ্‌ম্, অন্যদিকে বাস্তববাদ বা রিয়্যালিজ্‌ম্। এই দুটি মতবাদই নানা নামে কিছু কিছু রূপান্তর স্বীকার ক'রে বার বার আবির্ভূত হয়েছে। এই দুই আত্যন্তিকতার বিরোধ মীমাংসা করবার জন্যে আবার নানা নূতনভাবে ও রূপে প্রয়োগ করবার চেষ্টা হয়েছে প্রতীকবাদ বা সিম্বলিজ্‌ম্। এই তিন রকমের মতবাদের অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস অনুসরণ করলেই এই শতবর্ষের কাব্যিক সন্ধান ও পরীক্ষার গূঢ়তত্ত্ব অনেক পরিমাণে বোঝা যেতে পারে।

এস্‌থেটেসিজ্‌ম্-এর ব্যাখ্যা করতে গেলে মনে রাখতে হবে সুন্দরের সাধনা কিছু নূতন কথা নয়। এই যুগের অনেক আগেই অনেক কবি সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ও স্মরণীয় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গ্রীক সৌন্দর্যপূজা ইয়োরোপীয় সাহিত্যকে যুগের পর যুগ প্রভাবিত করেছে এবং একেবারে সাম্প্রতিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদেরও অনেককে দেখা যাবে হেলেনিস্‌ম্-এর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। কালিদাসের সৌন্দর্যসাধনা পৃথিবীবিখ্যাত। রোম্যান্টিক কবি মাত্রেই সৌন্দর্যের প্রতি সংবেদনশীল, তবু বিশেষ ক'রে এই প্রসঙ্গে নাম করা যায় ইংলণ্ডের এড্‌মণ্ড্ স্পেন্সর, কীট্‌স্, টেনিসন; জার্মানির গ্যেটে; ফ্রান্সের হিউগো। এঁরা যেভাবে সুন্দরকে দেখেছেন ও চেয়েছেন তার থেকে এই নূতন নন্দনবাদীদের তফাত কোথায়?

রোমান্টিক ও মরমী কবির 'সুন্দর'এর মধ্যে একটা অলৌকিকতা, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অঙ্গীকার আছে, আছে আকস্মিক আবির্ভাব অন্তর্ধানের বিস্ময়। সে দাবী করে অতীন্দ্রিয়চেতনা কল্পনা হৃদয়াবেগ বা আদর্শ ভাবনার বলে বাস্তবচেতনার নিম্নভূমি থেকে হঠাৎ উন্নয়ন, কিম্বা সেখানেই মায়ালোকের সাময়িক উদ্ভাসনকে মেনে নেওয়া। সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে এই লোকোত্তরকে গ্রহণ করতে না পারলেও পাঠককে অন্ততঃ স্বেচ্ছায় অনাস্থা অবিশ্বাসের সাময়িক অপসারণে— willing suspension of disbeliefএ— রাজি থাকতে হবে। শেলি কীট্‌স্-এর মত শক্তিমান কবির এ দাবী সূক্ষ্ম মানসিকতা ও রুচির অধিকারী এক শ্রেণীর পাঠক মেনে নিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান কবির এই ধরণের প্রয়াস অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে। আধুনিক ইতিবাদী চিন্তার কাছে এই দাবী, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদের দ্বারা ভাবলোকে উত্তীর্ণ হবার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। এইখানেই নন্দনবাদের নূতন

আপসের চেষ্টা। সুন্দরের ধ্যান সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও, শিল্পের রাজ্যে এমন-এক ধরণের সৌন্দর্যের উদ্ভাবন ও বহুল বিস্তার সম্ভব যার সম্ভোগ কিছুটা জ্ঞান ও রুচির অনুশীলনের দ্বারা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। শিক্ষার দ্বারা শিল্পের রসাস্বাদন-ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন করা যায়, শিল্পের মূল্যায়নেও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। এই শিল্পবোধ ও শিল্পবিচারবুদ্ধি বাস্তববোধ ও বিজ্ঞানবুদ্ধির সগোত্র, শুধু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র আলাদা। তা ছাড়া বাস্তববোধের যা প্রধান সহায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি ও ব্যবহার তা এই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও আছে। কাজেই এ কথা বলা যায় যে নন্দনবাদ উল্লিখিত প্রথম সমস্যাটির একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান উপস্থিত করল।

এটা লক্ষণীয় যে টেনিসন তাঁর রোমান্টিক ভূমিকা ত্যাগ না করেও সুন্দর-তত্ত্বকে একটা শৌখিন সাংস্কৃতিক চর্চার ভূমিতে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন, কাব্যজগৎকে আকাশে তুলে ধরার মত যথেষ্ট ভাববাষ্পচাপ তাঁর আয়ত্তে ছিল না বলেই হয়তো। কিংবা হয়তো যুগচিত্তপরিবর্তনের সঙ্গে সেই তাঁর সামঞ্জস্যরক্ষার চেষ্টা। কিন্তু এস্থিট্‌দের সমস্তরে এসেও কাব্যের পক্ষে উচ্চ আদর্শ, অসাধারণ প্রেরণা ও আবেগ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির দাবী তিনি ত্যাগ করেন নি। হিউগোর সৌন্দর্যসন্ধানও শেষের দিকে এমন-একটা সূক্ষ্ম ভাব ও ইন্দ্রিয়বোধের মণিজালিকা রচনা করতে তৎপর হয়েছিল যে তার মধ্যেই এস্থিট্‌দের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত ছিল; কিন্তু আতিশয্যদোষে সাধারণ রুচির পক্ষে তা প্রায় অবাস্তব, এমনকি কৃত্রিম বলেও মনে হতে আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণ বুদ্ধি ও প্রাত্যহিক চৈতন্যের কাছে সে যেন একটা সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের চ্যালেঞ্জ। যেমন, ধরা যাক, তাঁর June Nights কবিতায় স্বচ্ছ ঘুমের মধ্য দিয়ে দেখা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যরূপ: 'মনে হল যেন ম্লান উষা তার নিজস্ব লগ্নটির অপেক্ষায় আকাশের গভীরতলে সারারাত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরছে।'

নান্দনিক (এস্থিট্) দলের প্রথম স্পষ্ট ঘোষণাপত্র হিসাবে ধরা যায় থিয়োফিল্ গোতিয়ে'র উপন্যাস মাদামযজেল দ' মোপ্যাঁর মুখবন্ধটিকে। সেখানে তিনি দাবী করলেন 'সব কিছু জিনিস সেই পরিমাণে সুন্দর, নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে তা যে পরিমাণে দূরে।'[৪] এর থেকেই হ'ল Art for arts' sake বা 'আর্টের জন্যই আর্ট' মতবাদের উদ্ভব। ঐ উপন্যাসের নায়িকা স্ত্রী ও পুরুষ দু রকম বেশে একটি পুরুষ ও একটি নারীর প্রেম আকর্ষণ করলেন। শেষে দুজনের কাছেই নিজের সত্য পরিচয় জানিয়ে অনুরোধ করলেন তাঁর প্রতি ভালোবাসাকে আশ্রয় ক'রে তাঁরা দুজন যেন পরস্পর মিলিত হন। এ কাহিনী নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শুধু তুলে ধরতে চেয়েছে প্রেমের একটি রহস্যকে। লেখক এই রসের জগতে মানতে রাজি আছেন শুধু রসের বিচার, অন্য কোনো বিচার নয়। আর্ট এ ক্ষেত্রে বিচারের ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির ভালোমন্দ প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিচারের বশ্যতা স্বীকার করতেও রাজি নয়। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এই হল আধুনিক যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে আর্টের আপসের একটা প্রধান প্রয়াস। এই আর্ট শুধু বিচারসহতার গুণেই নয়, তার ইন্দ্রিয়ভোগ্যতার আদর্শের জন্যেও আধুনিক মনের কাছে রোমান্টিক কবিতার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হল। গোতিয়ে'র যে L' Art কবিতার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে তার মধ্যেই আর্টএর নূতন আদর্শটিকে

৪ 'Les choses sont belles en proportion inverse de leur utilité.'

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'শুধু দৃঢ় সবল আর্টই চিরত্ব পায়'। 'তোমার অস্পষ্ট স্বপ্নকে বাঁধো কঠিন প্রস্তরবন্ধনে।' এই কবিতাতেই আছে শক্ত সমর্থ আর্টের সেই বিখ্যাত জয়গান :

সবই নশ্বর, শুধু দৃঢ় আর্ট
আয়ু পায় সীমাহীন,
বেঁচে আছে ঐ 'বাস্ট'
কালনিশ্বাসে প্রাচীন নগরী লীন।

কিন্তু এই নূতন মতবাদের দুর্বলতা ও এর ভিতরকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে দেরি হল না। নৈতিক বিচার নিরপেক্ষতার অজুহাতে একদল নান্দনিক শুরু করলেন কাব্যে বাসনা-কামনা-রিপু-উত্তেজনার সাধন। তীব্র অভিজ্ঞতা কখনো তাঁদের হাতে পেল একধরণের অস্বাভাবিক আকর্ষণীয়তা— যাকে 'সুন্দর' বলে দাবী করা অসম্ভব নয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে রইল কুৎসিত বীভৎস, কিন্তু তীব্র আস্বাদনময়। পাপ গ্লানি সংশয় ভয় হতাশা ঘৃণা সবই এই পথ দিয়ে প্রবেশ পেল কাব্যে। শুরু হল যাকে বলা হয় 'কৃষ্ণা ভিনাসে'র আরাধনা। এর থেকে শুভ্রা ভিনাস পূজার পথটি আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় তার সৌন্দর্যভোগ ইন্দ্রিয়বিলাসের আদিম সারল্যে, তার প্রাণস্পন্দনের পেগ্যান সুস্থতায়। এই দ্বিতীয় পথেও কামনা ও কাম প্রবেশলাভ করে নি তা নয়। কিন্তু তা রইল সুন্দরের সৌষম্যশাসনে নিয়ন্ত্রিত।

'শুভ্রা ভিনাস'

এই শুভ্রা ভিনাস সাধনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে গোতিয়ে'র নিজেরই কাব্যে। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর Emaux et Camées গ্রন্থের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্যামিও বা এনামেলে আঁকা ছবির মত এক-একটি কবিতায় এক-একটি দৃশ্য জীবনাংশ বা চরিত্রের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে —তার মধ্যে আছে পরিসীমার দৃঢ়তা, স্পষ্ট পরিকল্পনা, অথচ উপভোগ করবার মত সৌন্দর্য। গোতিয়ে'র নিজেরই প্রস্তাবিত কাব্যরীতির (L' Art) সার্থক উদাহরণ এইসব কবিতা। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের নামের তাৎপর্য ও তাঁর ঐ কবিতার একটি লাইনেই বলা হয়েছে— ছন্দ, মার্বল্, ওনিক্স্, এনামেল— 'যা কিছু শিল্পীর চেষ্টাকে বিদ্রোহব্যাহত করে, তার মধ্য দিয়েই শিল্পকৃতি হয়ে ওঠে সুন্দরতর'। গোতিয়ে'র একটি কবিতার কিছু কিছু অংশ তুলে দিলে তাঁর এই শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যাবে। কবিতাটির নাম A une robe rose অর্থাৎ 'একটি লাল বা গোলাপী পরিচ্ছদের উদ্দেশে'। এটিও ঐ Emaux et Camées -এর অন্তর্ভুক্ত।

'কি ভালো লাগে তোমার ঐ বেশ যা তোমার বিবস্ত্রতাকে এত সুন্দর প্রকাশ করে, তোমার বর্তুল বক্ষকে তোলে জাগিয়ে, ফুটিয়ে দেয় তোমার পেগ্যান বাহুর নগ্নতাকে।

'কোথা থেকে পেলে এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ যা মনে হয় যেন তোমারই মাংস দিয়ে তৈরি, এক জীবন্ত বুনুনি যা তার উজ্জ্বল রক্তিমা মিশিয়ে একাকার করে দিচ্ছে তোমার দেহচর্মের সঙ্গে!

'বর্ণের ঐ গোপন উদ্ভাসনগুলি কি উষার আরক্তিমা থেকে নেওয়া, না ভিনাসের শঙ্খ থেকে'?

'যদি খুলে ফেলে দাও এই আবরণ তাহলে তুমিই হবে সেই সত্য (রিয়্যালিটি) যার স্বপ্ন দেখে আর্ট।

'আর তোমার পোশাকের ঐ লাল ভাঁজগুলি আমার অতৃপ্ত কামনার ওষ্ঠাধর; তোমার শরীর থেকে তুমি তাদের একটু সরিয়ে রেখেছ। কিন্তু তারা একটি চুম্বনের নিরবচ্ছিন্ন বয়নে তোমার ঐ বেশ রচনা করে দিয়েছে।'

বিখ্যাত কবি বোদ্‌লেয়র নিজেকে গোতিয়ে'র মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলে স্বীকার করেন। তিনিই কৃষ্ণা ভিনাস সাধনার প্রধান প্রবর্তক। তাঁর একটি কবিতার কিছু উদ্ধৃতি থেকেই এই নূতন ধারার আভাস পাওয়া যাবে।

'হে দেবী অদ্ভুত-উদ্ভবা, রাত্রির মত তুমি কৃষ্ণা, কস্তুরি ও হাভানা তামাকের মিশ্রিত গন্ধে সুবাসিতা, যেন কোনো ঐন্দ্রজালিক বৈদ্যের তুমি সৃষ্টি, এই শূন্য প্রান্তরের তুমি ফাউস্ট; ইবনি-উরু হে ডাইনি, কালো মধ্যরাত্রির হে শিশু! তোমার ঐ ওষ্ঠাধর, যেখানে প্রেম পেতেছ তার রাজাসন, তাকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি নিষ্ঠার চেয়ে, আফিঙের চেয়ে, বার্গাণ্ডির চেয়ে; যখন আমার কামনারা ক্যারাভানের মত যাত্রা করে তোমার দিকে, তখন তোমার চোখ দুটিই হয়ে ওঠে জলাধার যার মধ্যে আমার সমস্ত দুঃখদুর্দশা মেটায় তাদের পিপাসা।'

কিন্তু নন্দনবাদের এই দুটি ধারার কোনোটিই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা রক্ষা ক'রে টিকে থাকতে পারল না। এদের সঙ্গে দেখা গেল এই যুগের অন্য দুটি প্রধান মতবাদ, যথা বাস্তববাদ (রিয়্যালিজম্) ও প্রতীকবাদের (সিম্বলিজম্) নানাধরণের সমন্বয় বা সংমিশ্রণ। তার ফলে এমন অনেক কবির আবির্ভাব হল যাঁদের একাধিক মতবাদ ও রচনাভঙ্গীর বাহক ও দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কবি হয়তো নিজেকে বিশেষ মতবাদের অনুবর্তী বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের কবি ও সমালোচকরা তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদের প্রভাব ও প্রকাশ।

এই মিশ্রণের তত্ত্ব ভালো করে অনুধাবন করলে এই যুগের সব কটি মতবাদের নিহিতার্থ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যাবে।

'পারন্যাসিয়্যানিজম্'

গোতিয়ে কাব্যকে চিত্রধর্মী করে তুলেছিলেন। তাঁর 'ক্যামিও'— বা পাথরে খোদাই করা ডিজাইন— কাব্যের নামকরণই তার প্রমাণ। কিন্তু এই বাইরের দৃশ্য, মূর্তি, রূপচিত্রণের দাবী ক্রমশ কাব্যকে ভারী ক'রে তুলল বস্তুর ভিড়ে, পুঙ্খ বা ডিটেল-এর আতিশয্যে করল ভাবের, আনন্দ আকৃতির কণ্ঠরোধ। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই পার্ন্যাসিয়ন (Parnassian) কবিগোষ্ঠীর মধ্যে। এই দলের নেতা ফরাসী কবি লে কোঁৎ দ' লিল্‌(Le comte de L 'Isle)এর কবিতায় ছবি আঁকার কারুকার্য ছাড়িয়েও কিছুটা কবিসুলভ সৌষম্য বা সৌন্দর্যভোগের ভাবানুভূতির স্ফুরণ আছে। তাঁর 'দুপুর' (Noon) কবিতায় নীল নিস্তরঙ্গ আকাশ থেকে রুপালি রৌদ্রবৃষ্টি, ছায়াহীন প্রান্তর, দূর কৃষ্ণ বনরেখা, সাদা গোরুর জাবরকাটা ও অন্তর্লীন স্বপ্ন ইত্যাদির বর্ণনার পর মানুষের প্রতি ডাক: 'মানুষ! হাসিকান্নার মোহ ভেঙে, এই চিরব্যস্ত জগৎকে ভুলে যাওয়ার পিপাসায়, ক্ষমা করা বা অভিশাপ দেওয়ার ক্রিয়াকৌশল ভুলে গিয়ে যদি এক শেষ

বৈরাগীর আনন্দের আস্বাদ পেতে চাও, তবে এসো এইখানে। সূর্য শোনাবে তোমায় উদাত্ত বাণী।' এই কবিসুলভ আইডিয়া বা কল্পনার আস্ফুরণই কবিতাটিকে বাঁচিয়েছে। এই স্কুলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হেরেদিয়ার (Heredia) ঈগল কবিতায় কেমন ক'রে ঈগলটি বিদ্যুতের আগুনে ঝলসে মরল তার বর্ণনার সঙ্গে একটা উদাত্ত প্রেরণার আভাস আছে। ইংলণ্ডে এই মতের অনুবর্তীদের মধ্যে প্রধানতঃ জেম্‌স্‌ ইলোরি ফ্লেকারের কবিতায় কিছুটা কবিকল্পনার পাখা-নাড়া আছে। কিন্তু এই কবিদেরই অন্য কবিতায় এবং এই দলের অন্যান্য কবির কবিতায় বস্তুতথ্যভার প্রায়ই কাব্যপ্রাণকে তার সহজ স্ফূর্তি দেয় নি। এর থেকে বোঝা গেল ছবি হলেই হয় না। একে তো ফটোগ্রাফ স্কেচ ইত্যাদি থেকে সত্যকার ছবি অনেকটা উচ্চস্তরের শিল্প। তারপর কবিতায় ছবি আঁকতে গেলে তার সঙ্গে থাকা চাই কিছুটা কবিপ্রাণ, কবিচিত্তের স্পন্দন। কেমন ক'রে এই স্পন্দনটি সংক্রমিত করা যায়— এই হল যুগব্যাপী সমস্যা। দেখা গেল সমস্যাটি সহজ নয়, তাই নন্দনবাদের এই ধারাটি কখনো সৃষ্টির প্রাচুর্য আনতে পারে নি। কিন্তু এই পথের একটা স্থায়ী মূল্য আছে, তাই একেবারে সম্প্রতিককাল পর্যন্ত ইয়োরোপ-আমেরিকায় তো বটেই, আমাদের দেশেও অনেক কবি এর দাবী মেনেছেন ও কাব্যে চিত্রসৃষ্টির পরীক্ষা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলার কয়েকজন কবির কৃতিত্ব স্মরণীয়। 'পাল্কীর গান' ধরণের কবিতায় যে চমৎকার চিত্রপরম্পরা সত্যেন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন তার উচিত মূল্য আমাদের রসিক সমাজ দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। অনেক আধুনিক সমালোচক তাঁর মধ্যে ছন্দের শিল্পকৌশল ছাড়া আর কোনো কাব্যসিদ্ধি দেখতেই পান নি। কিন্তু শুধু দেখার আনন্দেই দেখতে পারা এবং এইভাবে দেখা দৃশ্যগুলিকে জীবনের রসে সঞ্জীবিত রাখতে পারা একটি আকাঙ্ক্ষনীয় সিদ্ধি যার অনুসরণ বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড্‌ টমাস, ডেভিস্‌, টার্নার এবং আমেরিকার অনেক আধুনিক কবি— রবর্ট ফ্রস্টও— করেছেন। রবার্ট ব্রীজেস্‌-এর সাধনাও ছিল তাই। সত্যেন দত্তের এই ধরণের কবিতাগুলিকে এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে একটা সম্মানের আসন দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনেই এই পাশ্চাত্ত্য নান্দনিক আদর্শের পরিচয় লাভ করেছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধির দৃষ্টান্ত 'ছবি ও গান'এর মধ্যেই পাওয়া যায়। কাব্যের নামকরণেই ফরাসী কবিদের কাব্যে চিত্র ও সংগীতের শিল্পায়ন সাধনার প্রভাব দেখা যায় বলে অনুমান করি। 'ঐ জানালার কাছে, বসে আছে' 'একটি মেয়ে একেলা পথ দিয়ে চলেছে'— ইত্যাদির নিরভিমান বিষয় নির্বাচন অসম্ভব হত যদি না মনে থাকত ঐরকম কোনো নান্দনিক আদর্শ। সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ মতবাদ বা আদর্শকে বহুভাবে অতিক্রম করেছেন এবং অনেক নূতন ও মহৎ প্রস্থানপথ খুলে দিয়েছেন। সে আলোচনা এখানে নয়। কিন্তু এইটেই লক্ষণীয় যে সমসাময়িক সব রকমের কাব্যরীতির এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের সার্থক নিদর্শন তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। পারন্যাসিয়নদের ধরণের ছবির ঠাস বুননের নমুনা— রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব যে রীতিকে কখনো খুব প্রশ্রয় দেয় নি— তাও পাওয়া যায় তাঁর চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতায়। যথা—

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে।..

কৌতূহলের বিষয় এই যে লে কোঁৎ দ' লিলের যে কবিতাটির উল্লেখ আমরা করেছি তারও নাম মধ্যাহ্ন (Noon), চৈতালিতে এই ধরণের চিত্রময় কবিতা আরো কয়েকটি আছে। এবং এর চরমোৎকর্ষ ঘটেছে অনেক পরে তাঁর গদ্যকবিতায়, প্রধানত: 'পুনশ্চে'। সেখানে কবিদৃষ্টির মধ্যেই এমন একটা ব্যাপ্তি ও চিরন্তনতার বিভূতিসঞ্চার হয়েছে যার ফলে ছবিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে যেন অসীমের পটে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সমস্ত কবিসাধনার ঈপ্সিত ফল কবি পুনশ্চ থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর শেষবয়সের অনেক কবিতায় বিচিত্রভাবে মেলে ধরেছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় যাঁরা এই পথে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করতে পারি বুদ্ধদেব বসু, অশোকবিজয় রাহা ও অমিয় চক্রবর্তীর। তরুণতর অনেক কবির কবিতায়ও এই রীতির সফল প্রয়োগ দেখা গিয়েছে; তাতে একটা সম্ভাবনার আশ্বাস আছে।

তীব্রতা—'দীপ্ত মুহূর্ত'

বোদলেয়র কৃষ্ণা ভিনাস-সাধকদের অগ্রণী এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু যে নান্দনিক রীতির আলোচনা এতক্ষণ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রেও তাঁর দান একান্ত মৌলিক ও দূরক্রিয়াশীল। কাব্যে শুধু চক্ষুর ব্যবহার না করে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকেও ভোগৈশ্বর্য হিসাবে কাজে লাগানো, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সাক্ষ্যের মধ্যে পরস্পর তুলনীয়তা আবিষ্কার ক'রে একটিকে আর-একটির স্থলাভিষিক্ত করার ক্ষমতা—যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন correspondence, এবং এই সবের সমন্বয়ে অভিজ্ঞতার একটি সুতীক্ষ্ণ মুহূর্তের আস্বাদন কাব্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা—এই হল বোদলেয়ারের এই দানের বিশেষত্ব। শুধু চোখে দেখার 'সুন্দর' নয়, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধির বেদনা হল এই সাধনার লক্ষ্য। এই সাধনার প্রভাবেই পরবর্তী কবিদের মধ্যে 'সুন্দর'এর জায়গায় আরাধনা চলল আস্বাদনতীব্রতার (intensity), দীপ্ত মুহূর্তের—যাকে পরে Walter Paterই প্রথম চিনে নিয়ে নাম দিয়েছিলেন 'gem-like flame'—আরাধনা শুরু হল সংগীতমগ্নতার, চিন্তাভারহীন শুদ্ধ স্বরবিস্তারের, 'বিশুদ্ধ কাব্য' বা pure poetryর। তাই আপাতদৃষ্টিতে যে-সব কবির প্রেরণা ও রীতি সম্পূর্ণ আলাদা তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন যে তাঁরা বোদলেয়ারের কাছে ঋণী। সমালোচকদের মধ্যে বরাবর এ বিষয়ে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা থেকেই গেছে। ভের্লেন আর ম্যালার্মে এই দুই বিখ্যাত কবির একজন কাব্যের সংগীতরূপ-সাধক, দ্বিতীয় জন আইডিয়ার স্বরূপসাধক। বোদলেয়র নান্দনিক রীতির যে বিস্ফারণ ঘটিয়েছেন ব'লে দেখানো হয়েছে তা গ্রহণ করলে তবে ঐ দুই কবিই কিভাবে তাঁর উত্তরসাধক হলেন তা বোঝা সম্ভব। নন্দনবাদের এই ধারাটি ইংলণ্ডের ওয়ালটার পেটারের রচনায় একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের মর্যাদালাভ করে বিংশ শতকের কাব্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। কবি ইয়েট্‌স্‌ও এই প্রভাবের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। একেবারে সাম্প্রতিক অনেক ইংরাজ ও মার্কিন কবির মধ্যেও এর প্রভাব স্পষ্ট। আধুনিক বাংলা কাব্যে এ পথের পথিক আছেন একাধিক, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী।

আগে দেখানো হয়েছে গোতিয়ে-প্রবর্তিত ধারাটির যেন একটি মাধ্যাকর্ষণ-ঝোঁক দেখা দিয়েছিল বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে। বোদলেয়র-প্রবর্তিত এই ধারাটির তেমনি একটি স্বাভাবিক ঊর্ধ্বচাপ দেখা গেল

প্রতীকধর্মিতার দিকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্যতাকে অতিক্রম ক'রে কাব্য পাখা মেলল ইন্দ্রিয়াতীত কোনো উপলব্ধির দিকে। তাই ভের্লেন, ম্যালার্মে, এমনকি র‍্যাঁবোর মধ্যেও সিম্বলিজ্‌ম্‌এর পদসঞ্চার লক্ষ্য করেছেন সমালোচকরা এবং ইংলণ্ডে পেটার তো প্রতীকবাদী দলের নেতা। কিন্তু এ কথা পরে। এখানে বোদলেয়রের এই দানের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে তাঁর দু'টি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ দেওয়া হল—

সন্ধ্যারাগ

Harmonic du soir

১

এই এল সেই লগ্ন : বোঁটায় কাঁপন ধরা
ফুলরা যখন ওবে স্বরভিধূপের মত !
সাঁঝের হাওয়ায় ঘোরে আওয়াজ ও গন্ধ যত,
হায় বিষণ্ণ ওয়াল্‌ট্‌জ্‌, আলসে মাথা টলোমল করা।

২

ফুলরা এখন ওবে স্বরভিধূপের মত,
বেহালা কাঁপছে যেন হৃদয় বেদনা ভরা ;
হায় বিষণ্ণ ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ মাথা টলোমল করা,
করুণ আকাশ ক্রসের যেন অঙ্গন দূরায়ত।

৩

বেহালা কাঁপছে যেন হৃদয় বেদনা ভরা
কোমল সে, ভরে শূন্যের বিরাট রিক্ত ক্ষত,
আকাশ করুণ ক্রসের অঙ্গন দূরায়ত,
নিজের জমাট রক্তে দেখ সূর্যের ডুবে মরা।

৪

হৃদয় সে ভরে শূন্যের বিরাট রিক্ত ক্ষত,
শেষানি কুড়োয় ভাস্বর অতীতের ফেলাছড়া ;
নিজের জমাট রক্তে সূর্যের ডুবে মরা ;
তোমার স্মৃতিটি চিত্তে জ্বলে পূজার ঘটের মত।

এই কবিতার ইমেজগুলি, যথা বোঁটা কাঁপা ধূপশিখার মত ফুল, হাওয়ার ভার্টিগো, আর্তহৃদয়ের মত বেহালা, ক্রসের অঙ্গনের মত আকাশ, সূর্যের রক্তাক্ত মৃত্যু, অতীতের কিছু উজ্জ্বল উদ্‌বৃত্তসঞ্চয়, আর এইসমস্ত ট্র্যাজিক সিম্বল পেরিয়ে একটি মাত্র আশ্বাস প্রিয়ের স্মৃতি— যা অন্ধকারে উজ্জ্বল ঘটের মত জ্বলছে—এগুলি

পরবর্তী বহু কবির ইমেজ রচনা -কৌশলকে প্রভাবিত করেছে। এগুলিতে দেখা যাবে দৃষ্টি শ্রবণ ঘ্রাণ স্পর্শ সব ইন্দ্রিয়ের বোধৈশ্বর্যের নমুনা আছে, এবং সে সমস্তকে একটি তীব্র ঐক্যে গ্রথিত করেছে একটা ট্র্যাজিক হৃদয়াবেগ। ইন্দ্রিয়কল্পগুলি 'সুন্দর'এর সীমানা পেরোয় নি, কিন্তু তার এলাকার মধ্যেই স্থান পেয়েছে ক্রুস-স্মৃতির নিদারুণতা। আবার কবিতার বিভিন্ন স্ট্যান্‌জায় পুরোনো পংক্তির প্রত্যাবর্তন সংগীতরচনার টেক্‌নিকে তৈরি। ভের্লেনের সংগীতময় কবিতা, কাব্যে সংগীত টেকনিকের আবির্ভাব—এলিয়টের মধ্যে, ইয়েট্‌স্‌-এর মধ্যে যে টেকনিকের উল্লেখযোগ্য ও সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই— এ সবেরই মূল এখানে। অবশ্য আরো পিছিয়ে গ্যেটের দিকে চাওয়া যায়, কিন্তু তার মানে শুধু এই যে সব সূচনারই পূর্বতর সূচনা থাকে। আলোর ইমেজে শেলী ছিলেন যাদুকর, বোদলেয়রের ফুল ধূপ তার চেয়ে আরো একটু নিম্নজগতের, কিন্তু প্রত্যক্ষ হৃদয়ানুভবের জিনিস, এর থেকে এসে যখন পৌঁছোই রবীন্দ্রনাথের 'চাঁপাকোরকের শিখা জ্বলে' ইত্যাদিতে, তখন পরস্পরের ভেদটা চিনে-ও কাব্যগতির ধারাবাহিক ক্রমটা বুঝতে পারা দরকার। রবীন্দ্রনাথের 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল' তাঁর অজান্তে হয়তো পরোক্ষপ্রভাবে বোদলেয়র ইমেজকে পুনর্জীবিত করছে। তাঁর 'ঘনযামিনীর মাঝে তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে' বোদলেয়ারের পূজার ঘটের মতই একটি সিম্বল। কাজেই বোদলেয়রকে কেমন ক'রে প্রতীকী ধারারও জনক বলে দাবী করা হয় তা এই থেকেই বোঝা যায়।

আর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কল্পের পারস্পরিকতা, অর্থাৎ একটির জায়গায় আর-একটির ব্যবহার ব্যাপারে বোদলেয়রের মৌলিকদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। যে কবিতাটিতে তিনি এই ভাবতত্ত্বের প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন তার অনুবাদ দেওয়া হল—

অন্যোন্য মিল (Correspondences)

প্রকৃতি মন্দির এক। জীবন্ত প্রাচীর স্তম্ভ তার
পার হয়ে যেতে দেয় মাঝে মাঝে গূঢ়মিশ্রবাণী,
প্রতীক-অরণ্য! তাতে পথ খোঁজে মানুষ সন্ধানী;
প্রতীকরা চেয়ে দেখে, ভাব করে প্রাচীন চেনার।
দীর্ঘতান বহু প্রতিধ্বনি যেন মিশে একপাকে
আলোছায়াসুবিশাল কোনো ঐক্যে হয় ভরপুর,
রহস্যে গভীর; ঠিক্ সেইভাবে বর্ণ গন্ধ সুর
এ ওকে আপন মানে, সাড়া দেয় পরস্পর-ডাকে।
কোনো কোনো গন্ধ আছে শিশুমাংস সমান সুস্মিত,
'ওবো'র সমান মিষ্ট, প্রান্তরের মতন শ্যামল,
আছে জাতখোয়া গন্ধ সবিলাস জয়োল্লাসস্ফীত
যেমন অ্যাম্বার, কিম্বা বেন্‌জয়েন, অথবা গুগ্‌গল!
অসীম যা কিছু এরা তারি মত দূরব্যাপ্তিময়,
মন আর ইন্দ্রিয়ের আনন্দের গায় এরা জয়।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বোদলেয়র পড়ে না থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে প্রথম প্রবাসী তখন ইংরাজ কবি জর্জ মুর বোদলেয়রের কবিতার কাব্যানুবাদের সংকলন প্রকাশ করেছেন। ইংরাজ কবিসমাজ তখন বোদলেয়র-সচেতন হয়ে উঠেছেন, যদিও কিছুটা মধ্যস্থব্যবহিতভাবে। সুইনবার্ন অবশ্য বোদলেয়র ভক্ত হয়ে উঠে তাঁর কৃষ্ণারীতির সাধনায় সিদ্ধি খুঁজে একধরণের তিক্ত খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, এমন কি বোদলেয়রের মৃত্যুতে একটি দীর্ঘ শোককবিতাও তাঁর উদ্দেশে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবমণ্ডলের দ্বারা নিশ্চয় প্রভাবিত, বোদলেয়রের রীতি ভাব টেকনিক তাঁর গ্রহণশীল কবিচিত্তের মধ্যে আপনিই উড়ে এসে পড়েছিল উড়ন্তবীজের মত, যদিও তাই থেকে কিছু নষ্ট হয়ে যা উত্তরকালে পূর্ণ গৌরবে জীবিত হয়েছিল তা রবীন্দ্রজগতেরই নিজস্ব, বোদলেয়রের নয়। 'প্রভাতসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি নামে একটি কবিতা আছে, দ্বিতীয় বিলাতপ্রবাসের পর ফিরে এসে দার্জিলিংএ বসে এটি লেখা। জীবনস্মৃতিতে এই কবিতা তেমন লোকস্বীকৃতি পায় নি বলে একটু আক্ষেপের সুর আছে। আর, এর মধ্যে যে জগৎএর সমস্ত সৃষ্টিরূপ ও তত্ত্বের প্রকাশরহস্যকে ধরবার একটা চেষ্টা আছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কল্প হৃদয়াবেগের আলোড়ন থেকে আন্তর ঐক্যকে ছিনিয়ে নেবার আগ্রহ আছে তা কবি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রতিধ্বনি নামও বোদলেয়রের 'দীর্ঘতান প্রতিধ্বনি' স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতায় অনেক পংক্তি আছে যা স্মৃতি-উদ্রেচক। যথা—

সংগীত, সৌরভ, শোভা জগতে যা কিছু আছে
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।

এবং প্রতিধ্বনি কবিতাটির ভাবেও এই Correspondences কবিতার অনুরণন আছে। তফাত এই যে, প্রতীকের মধ্যে দিয়ে বোদলেয়র যে রহস্যলোকে পৌছোতে চাইছেন সেও ইন্দ্রিয়, অন্ততঃ সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং হৃদয়সাযুজ্যের দ্বারা প্রাপণীয় হবে—এই হল বোদলেয়রের অভিপ্রায়। বাইরের আপাত-বিকাশকে ডিঙিয়ে পৌছোতে হবে পিছনে, বা ভিতরে; কিন্তু সেই 'পিছন' বা 'ভিতর' এমন কোনো 'অতিক্রমী' (transcendental) তত্ত্ব নয় যার ভজনার জন্যে মানুষের সূক্ষ্ম পরিশীলিত ইন্দ্রিয় ও হৃদয়ানুভূতির অতিরিক্ত কিছু দরকার হবে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কিন্তু এই প্রথম ভূমিকে আত্মসাৎ ক'রে ক্রমেই এগিয়েছে অনেক গভীরে জীবনদেবতার চৈত্যচৈতন্যে, অনেক বিস্তারে : বিশ্বমানব বিশ্বদেবতার রাজ্যে। এই প্রতীকীরীতির কথা পরে আবার বলতে হবে।

'কৃষ্ণা ভিনাস'

কিন্তু নান্দনিক রীতির কৃষ্ণা সাধনার মূলটিও ছিল বোদলেয়রের মধ্যে, এবং তার বৃত্তান্ত এখানে দেওয়া দরকার। এ রীতিটি এত সুপরিচিত যে খুব বুঝিয়ে বলার দরকার রাখে না। এ হল সৌন্দর্যের একটা দুঃসাহসিক সমাজের অনুমোদনহীন ভজনা, আকাঙ্ক্ষা কামোত্তেজনা হৃদয়োদ্বেগ ও প্যাশনের মধ্য দিয়ে 'সুন্দরে'র অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সর্বেন্দ্রিয়তৃপ্তির, প্রাণতৃষ্ণা-শান্তির পথ খোঁজা। এই পথের পথিক বোদলেয়রের পরে অনেকেই হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষার তীব্র কশায় নেমে গেছেন নান্দনিকের সুন্দরলোক থেকে বস্তুবাদীর শ্রীহীন রূঢ় সত্যে, বা স্বভাববাদের (naturalism) অপেক্ষাকৃত শান্ত আত্মসন্তুষ্ট জীবসত্যচেতনায় বায়োলজিকাল নিয়মতন্ত্রের উপলব্ধিতে। ইংলণ্ডের প্রির‍্যাফেলাইট্‌দের

মধ্যে এক ডি. জি. রসেটির মধ্যেই কামনা ও 'সুন্দর' বোধের একটা সমন্বয় দেখা যায়, কাজেই তিনি শুভ্র নান্দনিকতার একটি ভালো দৃষ্টান্ত, যদিও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। কারণ তাঁর কাব্য বোদলেয়রের সমসাময়িক, এবং তিনি ঐ কবির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। কিন্তু রসেটির কাব্যের প্রাণ একটু মিস্টিক আবেদন, সেখানেই নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তক হয়েও তিনি আমাদের বিবৃত অর্থে আধুনিকতার সীমারেখার পিছনে। ঐ প্রির‍্যাফেলাইট স্কুলের সুইনবার্ন বোদ্‌লেয়ারের স্যাটানিজ্‌ম্‌ ও ভোগোত্তেজনার সাধনায় সুখ্যাতি কুখ্যাতি সমানভাবে অর্জন করেছিলেন। মুর প্রমুখ অনেক কবি উনিশ শতকের শেষে কাব্যকে ক'রে তুলেছিলেন অতিমাত্রায় সেক্‌স্‌-সচেতন। আমাদের দেশে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের কবিতায় এই ভাবের একটা স্বাধীন প্রকাশ, কিন্তু সেখানেও কামনা সৌন্দর্যবোধ বা বৃহত্তর কোনো সত্যবোধের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' এই ধরণের সার্থক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। কিন্তু পূর্ণ বোদলেয়রি সাধনা শুরু হল মোহিতলাল, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ প্রভৃতি কবির কবিতায়। এখনো আধুনিক বাংলা কাব্যে এই রীতির চলন মোটেই কম নয়।

এই প্রসঙ্গে নগ্না রূপজীবিনীর গায়ের জড়োয়া গয়না অন্ধকার ঘরের অগ্নিকুণ্ডের অনিশ্চিত আলোয় জ্ব'লে জ্বলে ওঠার যে চিত্র বোদলেয়র তাঁর একটি কবিতায় এঁকেছেন তা মনে পড়ে। এই বিপরীত সাধনার তীব্রতা আছে আরো অনেক কবিতায় যার মধ্যে অমৃতের সঙ্গে মেশানো হয়েছে বিষ। যথা—

তোমাকে ভালোবাসি—
    উচ্চচূড় যেন বা যামিনী,
ওগো দুঃখের ঘট!
    হে দীঘল নীরব কামিনী।
তোমাকে ভালোবাসি
    ও আমার রাতের রতন,
নিঠুর মনোহরা!
    তত—করো যত পলায়ন,
পৃথক্ করো যত
    বাঁকা হেসে বাড়িয়ে দূরতা
আমার দু'টি বাহু
    আর ওই নীল অমেয়তা।

এর পরে এই উচ্ছ্বাসের চরমস্পর্শ বর্ণনা করা হয়েছে যে ইমেজের দ্বারা তা হচ্ছে শবদেহের উপর কৃমিকীটের আক্রমণ—তার কাব্যানুবাদ আর আমরা দিলুম না। কিন্তু সেই বীভৎসের মধ্য দিয়ে বোদলেয়র খুঁজছেন অভিজ্ঞতার সারাৎসার। বাস্তবের রূঢ়সত্যকে সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'রে তারপর তা ভেদ ক'রে তীব্রতর নিত্যতর মহত্তর সত্যে পৌঁছোবার প্রয়াস। এই গ্রহণের ভঙ্গীর দ্বারা বোদলেয়র রিয়্যালিজ্‌ম্‌এর প্রবর্তক, আর অতিক্রমণের দ্বারা প্রতীকবাদের।

তাঁর অনুসরণে জর্জ মুর (George Moore) ১৮৭৮ ও ১৮৮১ সালে দু'টি ইংরাজি কবিতার সংকলন প্রকাশ করলেন, নাম *Flowers of Passion* ও *Pagan Poems*। এর মধ্যে বোদলেয়রের অনেক

কবিতার অনুবাদ আছে, আর মৌলিক কবিতাগুলিও বোদলেয়র প্রভাবিত। কামপ্রেরণার একটা অমার্জিত বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই কবিতায়, যথা—

I am filled with carnivorous lust : like a tiger,
I crouch and feed on my beautiful prey.

কাব্যে বাস্তবরূঢ়তার একটা পরিমাণ আছে, তার বেশি নিতে চাইলে তা আর স্বাঙ্গীকৃত হয় না, তাতে কাব্যস্বাস্থ্যের হানি—এমনকি কাব্যের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। কাজেই এই অতিবাস্তব ধারাটি থেকে থেকেই আত্মপ্রকাশ করে কাব্যে চিত্রে, কিন্তু স্থায়ী হয় না। বাংলা কাব্যেও এই ধারার কিছু কিছু স্পর্শ লেগেছে বুদ্ধদেবে, জীবনানন্দের কোনো কোনো ইমেজে, তাঁর 'পাতাল-সৌন্দর্য অনুভবে'। সুখের বিষয় এঁরা কাব্যপ্রাণকে অপঘাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী তরুণতর বাঙালী কবিদের ক্ষেত্রে সবসময় একথা খাটে না।

অবক্ষয়বাদ

এই অতিবাস্তবতা ও অতিরিক্ত বাস্তব-নিরপেক্ষতার মধ্যে এমন কোনো অভিজ্ঞতার জগৎ আছে কি না যা বাস্তব ও অতিবাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে সেতুর কাজ করতে পারবে—এই হল কবিদের সন্ধানের লক্ষ্য। 'আর্টের জন্যই আর্ট' আন্দোলনের আরম্ভে যেমন আমরা দেখেছি গোতিয়ে'র একটি উপন্যাস, তেমনি আর দু'টি ফরাসী উপন্যাসেই সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায় ঐ নন্দনবাদ থেকেই উদ্ভূত দুটি সুপরিচিত মতবাদের। এর একটি হল প্রতীকবাদ, আর একটি decadentism বা অবক্ষয়বাদ। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় Huysman-এর উপন্যাস *A Rebours* ; তার নায়ক Des Esseintes ইন্দ্রিয়-বিলাসকে একটা সূক্ষ্ম ও সাধনাসাপেক্ষ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে হল অবক্ষয়বাদের মূর্তরূপ। সে অতিশিক্ষিত শিল্পবিৎ মার্জিতরুচি কিন্তু ভোগজীবনের অতিরিক্ত কোনো আদর্শে আস্থাহীন। সবেতেই সে ঈষৎ-বিরক্ত, ইতরজগতের একঘেয়েমি ও ennui থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তার চাই আর্টের উত্তেজনা। তাই তার পোশাক তৈরি করানো, জুতো পায়ে ফিট করা, ঘর সাজানো সবই সে করে যেন চার্চ-এর সব মহৎ অনুষ্ঠানের সমান গাম্ভীর্যে। তার শোক অনুষ্ঠানেও বহু অর্থব্যয়ে ও শিল্পবুদ্ধির সাহায্যে আয়োজিত বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি। দীর্ঘ শীর্ণ দেহ, যক্ষ্মায় বাঁকা শিরদাঁড়া, অত্যন্ত উচ্চরুচি-সম্পন্ন বেশে সজ্জিত সে সংসারের মধ্য দিয়ে চলে ইতরস্পর্শ বাঁচিয়ে—যেন কোন্ অজানা দেবীর মন্দিরের আত্মনিবেদিত পূজারী। একে সেই কৃষ্ণা ভিনাস সাধনার উত্তরসাধক বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই আদর্শ থেকে যে অবক্ষয়বাদের জন্ম হল তার মেজাজ উনিশ শতকের শেষদিকে সমস্ত উচ্চ জীবনাদর্শের দীপ্তিনাশ ও ব্যাপক আশাভঙ্গের অনুভূতির সঙ্গে বেশ মিলে গেল। নিছক 'শিল্পের জন্যই শিল্প'বাদের যে বন্ধ্যাত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার থেকে শিল্পভোগের রসটিকে উদ্ধার করে দিয়ে কবিরা কাব্যের আবেদনকে শক্তিমান্ ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ এক ধরণের আপস হল স্থূল ও সূক্ষ্মের, বাস্তবসত্য ও তার চেয়ে বেশি কিছুর। এই আপসের ফলে প্রথম নূতনত্বের উত্তেজনায় কোনো কোনো কবি কিছু স্মরণযোগ্য কবিতা লিখলেন। কিন্তু হতাশা-অবসাদ মেশানো এই 'সুন্দর' ও প্রেমের বিলাস স্থায়ী হল না। এ পথের কবিদের আত্মনাট্যীকরণের (self-dramatisation) পদ্ধতিটা প্রথমে যে চমক

এনেছিল, পরে তা হারাল। সমঝদার লোকেরা এঁদের গুণের তারিফ করল। কিন্তু বুঝল এঁরা দায়িত্বহীন, এঁদের প্রেরণা ক্ষণস্থায়ী, তার কোনো ধারাবাহ নেই। এইসব কবিদের বর্ণনা করতে গিয়ে ইয়েট্স্ বলেছিলেন, 'এই যুগের এই হ্যাম্‌লেট্‌দের কেউ কেউ গেলেন পাগল হয়ে, অনেকে মদ ধরলেন —সুস্থ লোকের মত স্ফূর্তির জন্যে নয়— নির্জনে, এঁরা সকলেই দুঃসাহসী এবং অনেক সময় দোষের জন্য নয় গুণের জন্যই— যে পাপ কখনো করেন নি তার জন্যেই— এঁদের লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর। সকলেই কিন্তু সৌজন্যের অধিকারী।' এক কবিদের মধ্যে আর্নেস্ট ডাউসনের কিছু কবিতা স্মরণযোগ্য। তাঁর মধ্যে কবিতা রচনার এই নূতন recipe বা তৈরির উপায়টি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা—

Wine and woman and song,
Three things garnish our way ;
Yet is day over long,
... ...
Unto us they belong,
Us the bitter and gay,
Wine and woman and song,

প্রেমে বিশ্বাসভঙ্গ করার মুহূর্তে পূর্বপ্রণয়িনীকে মনে পড়ে কবির চোখে এল জল। কিন্তু কি তিনি করবেন, জগৎই যে এই রকম। তাই ডাউসনের এই দীর্ঘশ্বাস-ভরা বাণী যা সেই যুগে লোকের মুখে মুখে ফিরত

I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

কবির বেঁচে থাকা মানে শুধু ক্লান্তভাবে অপেক্ষা করা যবনিকাপাতের জন্যে।

With pale, indifferent eyes, we sit and wait
For the dropt curtain and the closing gate :
This is the end of all the songs man sings.

এই কবির কাব্যে ফুটে উঠেছে শুধু ইন্দ্রিয়বিনোদনের মধ্য দিয়ে যে সম্ভোগ তার সীমাবদ্ধতা। উচ্চতর প্রেরণা এর সঙ্গে যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়তার সূক্ষ্মতা তার প্রতিবেদনশীলতা হারায়। তখন আবার খোঁজ পড়ে প্রাথমিক সভ্যতার কৌমার্য-শুচিতার। কোনো একটি অমৃতপ্রলেপে ইন্দ্রিয়ের এই পাপমুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখছেন—

Upon the eyes, the lips, the feet
On all the passages of sense,
The atoning oil is spread with sweet
Renewal of lost innocence.

এই পর্যায়ের আর-একটি শক্তিমান কবি হলেন লিওনেল জন্‌সন (Lionel Johnson), তাঁর The

Dark Angel কবিতাটি কৃষ্ণা-ভিনাস সাধনার একটি আদর্শ স্তবগান। এর ভীষণ মধুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেই তাঁর আত্মার মুক্তি এ কথা কবি জানেন, কিন্তু এই banquet of a foul delight— গর্হিত আনন্দের ভোজ থেকে কবি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছেন না। অপর একটি কবিতায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন পৃথিবীর যা কিছু ভালো উদার মহৎ সুন্দর সব শেষ হয়ে গেছে। কারণ এসেছে মানুষের সভ্যতায় হেমন্তের বিষণ্ণতা, সন্ধ্যার অস্পষ্টতা।

অবক্ষয়বাদের এই মেজাজ, এই সুরের অনুরণন পরে অনেক কবির মধ্যেই দেখা যায়। তবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও কামনাপূরণের পথ ছেড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী জগতের, মানুষের জীবনের ও সভ্যতার সত্য অনুসন্ধানের পথে চালিত হয়। বিশেষত যেসব কবি দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাব্যে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই অবক্ষয়-অবসাদকে একটা কঠোর সহানুভূতির সংস্পর্শে তীক্ষ্ণ অনুভূতিময় ক'রে তোলেন। এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই অবক্ষয়চেতনার গ্লানি ও ভবিষ্যৎশূন্যতার হাত থেকে মুক্তি পান। এর দুটি মহৎ দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের দুটি প্রধান কবি: টি. এস. এলিয়ট ও ডাব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স্। এলিয়টের যুগজীর্ণ আলফ্রেড প্রুফ্‌রক্, সুইনি ইত্যাদির চরিত্রে, Hollow Men ও Waste Land-এর নানা কাললাঞ্ছিত হতশ্রী জীবনদৃশ্যের ফিরে ফিরে আসা ইমেজে এই অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট—এবং এরই অসহ্য দৈন্য ও একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই এলিয়টের কাব্যযাত্রাপথের গন্তব্য— তা সে Still point-এর পরমানির্বৃতিতেই হোক, আর ক্যাথলিক অনুষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত ইতিধর্মী ভাবানুভূতিতেই হোক। ইয়েট্‌স্ অবক্ষয়বাদের ক্লান্তি ও অন্ধ পথহীনতাকে আসতে দেখেই কেল্টিক্ রিভাইভ্যালের প্রাথমিক স্বপ্নঘোর কাটিয়ে, তাঁর আদিযুগের প্রতীকী সৌন্দর্যসাধনার অঙ্গন পেরিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন কঠোর রিয়্যালিটির রাজ্যে। অবসাদের নৈরাশ্যের সুর আছে তাঁর কিছু কবিতায়, তার মধ্যে তাঁর যুগসংকটচেতনার অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্ভুত আত্মনিয়ন্ত্রণ-নৈপুণ্যের দ্বারা তিনি এই সংকট পার হয়ে পৌঁছলেন তাঁর কবিস্বভাবের উপযুক্ত রাজ্যে— যা দুঃখবেদনায় ট্র্যাজিক, কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ ও দৃষ্টিনাশের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত।

ফরাসী তিনজন কবি— যাঁরা এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লালসা ও শিল্পান্বেষণের পথকে বৃহত্তর জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রশস্ততর করে তুলেছিলেন— এই প্রসঙ্গে তাঁদের দানের কিছুটা বিবরণ দেওয়া দরকার। এঁরা হলেন কোরবিএয়ার (Tristan Corbiere), লাফোর্গ (Jules Laforgue) ও র‍্যাঁবো (Arthur Rimbaud)। এঁদের সকলেরই কাব্য আগে উল্লিখিত উপন্যাস A Rebours প্রকাশ হবার আগেই প্রকাশিত।

কোরবিএয়রের তীব্র শ্লেষাত্মক সুর এলিয়টকে প্রভাবিত করে এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কোরবিএয়র পুরোনোকালের নাবিকদের মধ্যে তবু এক ধরণের সুস্থ বর্বর জীবন দেখে তাদের নীতিভ্রষ্টতাকে সমর্থন জানিয়েছেন—, 'come ; this open cynic has his original grace,' কিন্তু নবীনযুগের নাস্তিকদের এই প্যাগান বলিষ্ঠতাও নেই, তারা ভ্রষ্ট, অসমর্থ, দুর্বল। অবক্ষয়ের সুরটি মর্মান্তিকভাবে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর এই সব লাইনে :

'আমি— সমস্ত আহ্লাদ-উত্তেজনা-বিরহিত একটি ক্লীব হৃদয়— আমার কাছে কী আছে এই স্বাধীনতার মূল্য। সব সময় আমি একা। সব সময় স্বাধীন।

আমার আদর্শ একটা ফাঁপা স্বপ্ন; আমার দিগন্ত— যা অভাবিত তাই, আর ঘরে ফেরার মন কেমন আমাকে পেয়ে বসেছে— যে ঘর কখনো আমি দেখি নি।

শোনো— জীবন হচ্ছে একটি মেয়ে যে তার নিজের খেয়াল মেটাতে আমাকে আশ্রয় করেছিল···তাই আমার কাজ হল তাকে ছিন্ন ভিন্ন করা আর বিনা কামনায় তার সতীত্ব নাশ করা।'

লা ফোর্গের প্রধান দান নিজের কাব্যে একটি আত্ম-প্রত্যয়শীল আত্মবিদ্রূপকারী ব্যক্তিত্বের চেহারা ফুটিয়ে তোলা। এই জীবন যৌবন প্রেমে ও নিজের সামর্থে হৃতবিশ্বাস লোকটিই কবিতাগুলিতে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে। কবি নিজেকেই হয়তো এই চরিত্রের মধ্যে নাট্যীকৃত করেছেন! আধুনিক শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের নানা সূক্ষ্ম দ্বিধা, মতিস্থির ক'রে কাজ করবার সময়, ভাবী যাত্রাপথে দৃঢ় পদক্ষেপের মুহূর্তে হঠাৎ দৌর্বল্যের আক্রমণে তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন লা ফোর্গ চমৎকার ফুটিয়েছেন। এঁর কাছে এলিয়টের ঋণ সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে র‍্যাঁবোর কাব্যেরও বর্ণনা করা উচিত। কিন্তু তিনি ইয়েট্‌স্ এলিয়টের মত, এবং তাঁদের যুগের অনেক আগেই, এই অবক্ষয় চেতনা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ রচনা করেছিলেন। নৈরাশ্যের গুহায় তিনি হতোদ্যম হয়ে বসে থাকেন নি। সভ্যতার গ্লানি তিনি পান করেছিলেন কড়া বিষ মেশানো মদের মত— তার জ্বালাযন্ত্রণার যে প্রখরতা তিনি ফুটিয়েছেন তাঁর কবিতায় তার মধ্যে সাধারণ অবক্ষয়চেতনার ঝিমোনি ও আত্মসন্তুষ্টি বা আলস্যের প্রশ্রয় নেই। তার মধ্যে আছে জ্বলন্ত বিদ্রোহ, বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণের তাগিদ। তাই কেবলি তাঁকে বাঁধ ভাঙবার, সমস্ত চেনা পল্লী থেকে অচেনা পল্লীর দিকে বেরিয়ে পড়বার প্রয়াস করতে হয়েছে। এই অতিক্রমণের পূর্বাভাসও আছে বোদলেয়রে। এই অতিক্রমণ-পথে র‍্যাঁবো যেতে চেয়েছেন কোনো অলৌকিক জগতে নয়, আমাদের এই চেনা জগতেরই স্বাস্থ্য সৌন্দর্য কল্যাণের যে যুগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার নব আবির্ভাবে। কাজেই র‍্যাঁবোকে অবক্ষয়বাদী না বলে কিছু পরিমাণে বলা যায় প্রতীকবাদী, এবং এক ধরণের নতুন বাস্তবসত্যবাদের প্রবর্তক হিসাবেও তাঁকে গ্রহণ করা যায়। এ কথা পরে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

বাংলার আধুনিক কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে অবক্ষয়ের মেজাজ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ ধ্বংস বিপ্লবে সাক্ষাৎঅভিজ্ঞতা তেমন না থাকায় তাঁর চেতনা উনিশ শতকের শতাব্দী শেষের কবিদের চেতনার মত, তাতে র‍্যাবো বা পরবর্তী অনেক যুদ্ধ-কবির বিপ্লবাত্মক আক্রম নেই। জীবনানন্দের কবিজীবন অনেক পরিমাণে ইয়েট্‌স্-এলিয়ট মিশিয়ে যেন তৈরি। এক ধরণের কাব্যিক ছায়ালোক রচনায় Shadowy Waters রচয়িতা ইয়েট্‌স্-এর সঙ্গে তিনি তুলনীয়, এই অবক্ষয়গ্রস্ত জগতে কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন আরো মোহময় ভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সেখানে ইন্দ্রিয়বোধ ও এক ধরণের সুন্দরানুভূতির যে দৃষ্টান্ত জীবনানন্দের কাব্যে পাই তার মর্যাদার স্থান পাওয়া উচিত পৃথিবীর কাব্যে। আবার, পরবর্তী যুগে তিনি অনেকটা এলিয়টি বিদ্রূপ তিক্ততার পথে অগ্রসর মুক্তির দিকে।

যন্ত্রণার পীড়নে হৃদয়ের তীব্র নিষ্ক্রামণ কৌশল র‍্যাঁবোর কাব্যে যেমন তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। এই উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স্ক কবি-যুবক একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মত ভিতরের লাভা নিঃসরণের দ্বারা জীর্ণ-সভ্যতাকে ফাটিয়ে কাঁপিয়ে একটা নূতন আরম্ভের সূত্রপাত ক'রে গেছেন। জীবনানন্দের এই তীব্র প্রবেগ না থাকলেও তাঁর শেষের কাব্যে তুষের আগুনের মত একটা শ্লথ বিপ্লবজ্বালার আভাস পাওয়া যায়।

মুক্তির দিকে তিনি হয়েছিলেন অগ্রসর, কিন্তু মুক্তির কোনো-একটা নূতন রূপ, নূতন উদ্‌ঘাটন তিনি আনতে পারেন নি।

অবক্ষয়ের ক্লৈব্য ও অসামর্থ্য আর নূতন সত্য সন্ধানের উদ্যোগের মাঝামাঝি অনিশ্চয় ভূমিতে দোলায়মান একটি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও আবেগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় র‍্যাবোর এই কবিতাটিতে—

খোয়ানো-হৃদয়

Le Coeur Voli

অসুখী হৃদয় নৌকা হালে
নাল ভাঙে কড়া তামাকে ঢাকা,
ওরা ঝোলের আঁজলা তাতেই ঢালে
অসুখী হৃদয় রসায় হালে,
মাঝিমাল্লার ঠাট্টাগালে
দলীয় হাসির হল্লা-হাঁকা
হৃদয় আমার রসায় হালে
অসুখী, দা-কাটা তামাকে ঢাকা।

২

বস্তিপাড়ার খিস্তিখেউড়ে
ওরা জাত তার করেছে নষ্ট,
ন্যাংটা চিত্র দাঁড়ের দেউড়ে
এঁকে গাঁজলায় খিস্তি খেউড়ে;
ডাক দিই, ওরে বেদিয়া ঢেউরে!
নে হৃদয়, ধুয়ে দে ক'রে পষ্ট,
বস্তিপাড়ার খিস্তি খেউড়ে
ওরা জাত তার করেছে নষ্ট।

৩

খইনি চিবোনো ফুরোলে ওদের
ও খোয়া হৃদয় বল্ কি করি?
মদের ঢেঁকুর তুলবেই ফের
খইনি চিবোনো ফুরোলে ওদের;
ব্যথা শুরু হবে পেট মোচড়ের
যদি পাপ ফের হৃদয়ে ধরি,
খইনি-চিবোনো ফুরোলে ওদের
ও খোয়া হৃদয় বল্ কি করি?

প্রতীকবাদ

প্রতীকবাদের কথা আগেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকজন সমালোচক সাহিত্যিক ও কবির দান ভালো করে বুঝে না দেখলে এর রূপ এবং রূপান্তরের ব্যাপারটি অস্পষ্ট থেকে যাবে।

ইংলণ্ডে ওয়াল্‌টার পেটার ১৮৭৩ সালে রিনায় সেন্‌স্ আর্ট ও কাব্যের উপর আরো আগে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। এর মধ্যেই আছে তাঁর সেইসব মত ও ভাবধারা যা ইংলণ্ডে আর্টের জন্যই আর্ট আন্দোলনের হয়েছিল উৎস। কিন্তু তাঁর লেখা একটু তলিয়ে বুঝে দেখলেই দেখা যাবে এ বিষয়ে তিনি গোতিয়ের মন্ত্রশিষ্য নন। বোদলেয়রের কিছুটা প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে এবং তাঁর সুন্দরের সংজ্ঞা নির্ধারণে 'একটা অপূর্বতার চমক'-এর উল্লেখও এই প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তবু এ কথা ঠিক যে তাঁর থিয়োরিতে তাঁর মৌলিকদান অনেকটা ছিল। নান্দনিক হিসাবে শুরু করলেও তিনি 'সুন্দর'এর আইডিয়ার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, বরং সদ্যোজাত অভিজ্ঞতার নানা রকম গুণ বা আস্বাদ কাব্যিক রসসম্ভোগের আসরে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম অনুসারীরা প্রায় সকলেই এই নৈতিক শিকলমুক্ত মুহূর্ত সম্ভোগের একটা আতিশয্যময় ও বিপজ্জনক পথ ধরেই এগোতে চেয়েছিলেন এবং সেইজন্যে তাঁদের সকলেরই ভাগ্যে ঘটেছিল সাহিত্যিক অপঘাত। এই প্রসঙ্গে নাম করা যায় ডাউসন, লিওনেল জন্‌সন, অস্কার ওয়াইল্‌ড্, জন ডেভিডসন প্রভৃতির। মনে হয়, এঁদের অনেকেই পেটারকে গুরু বলে স্বীকার করলেও সুইন্‌বার্নের আকাঙ্ক্ষামদমত্ততার দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পেটারের প্রভাব অনেক বিশুদ্ধতরভাবে পড়েছিল ইয়েট্‌স্‌এর প্রতীকী রচনায়। এবং বিংশ শতকের প্রথম থেকে কাব্যের নতুন নতুন পথ সন্ধানের যে চেষ্টা চলেছে আজ পর্যন্ত, তার মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নন্দনবাদ, প্রতীকবাদ— এই দুরকম গণ্ডীই পেরিয়ে পেটার-বর্ণিত অভিজ্ঞতার নানাভাবে অন্বেষণ ও উদ্‌ঘাটন। এই অভিজ্ঞতা একটা আভ্যন্তর ব্যাপার (phenomenon) যা ভোক্তার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও মনকে একেবারে সরাসরি আঘাত ক'রে উদ্দীপ্ত করে। স্মৃতি বা কল্পনার মধ্যস্থতা এর মধ্যে নেই যেমন আছে রোমান্টিক কাব্যে। কাজেই এই অভিজ্ঞতাকে রিয়্যাল বলতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আবার অতিবাস্তবতার কঠিনতা অগভীরতা অনুর্বরতা দোষেও এ দুষ্ট নয়, কারণ এর মধ্যে মিশেছে মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধের সমস্ত সম্পদ্, আর তারই সহজাত হৃদয়াবেগ। সত্য ও সুন্দরের মিলনের এ একটা সার্থক পরীক্ষা ; কাব্যিক আবেদনের জন্য শুধু আর 'সুন্দর'এর চকিত আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অভিজ্ঞতার অন্য নানা চারিত্রকে কাজে লাগানো যাবে, যথা, দীপ্তি, তীব্রতা (intensity), কোমলতা, সূক্ষ্মতা, বেগবত্তা, উচ্চতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য, রহস্যময়তা ইত্যাদি। এর ফলে চিন্তন ও বিজ্ঞানের গ্রহীতব্য উপাদান ও চিত্তকে উদ্ভাসিত ক'রে কাব্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে। এই অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার বৈচিত্র্য ও এর ঐশ্বর্যের তিনি ইঙ্গিত করেছেন, এবং তারই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে শিল্পগ্রাহ্য হবার যোগ্য অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অনির্বচনীয় এই অভিজ্ঞতা-মুহূর্ততা যাকে থিওরিতে বাঁধা যায় না। পেটারের নিজের ভাষায় : 'With this sense of the splendour of our experience and of its awful brevity, gathering all we are into one desperate effort to see and touch, we shall hardly have time to make theories about the things we see and touch.' এই মুহূর্তকেই যদি জীবনে দীর্ঘস্থায়ী

ও স্বাভাবিক ক'রে তোলা যেত, তবে তাই হত পরম সার্থকতা। সেই জীবনই হত একটা নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসৃষ্টি। পেটারের ভাষায়: 'To burn always with this hard, gem-like flame, to maintain this ecstasy, is success in life.··· While all melts under our feet, we may well grasp at any exquisite passion, or any contribution to knowledge that seems by a lifted horizon to set the spirit free for a moment, or any stirring of the senses, strange dyes, strange colours, and curious odours, or work of the artists' hands, or the face of one's friends.'

ফ্রান্সে ১৮৮৬ সালে Symbolisme নাম ও মতবাদের সূচনা হয়। বোদলেয়র এর কাব্যের এক দিকের সঙ্গে এই নূতন ধারা যুক্ত, কিন্তু বোদলেয়র তখন মৃত। এর প্রধান বাহক ও মুখপাত্র হলেন ভের্লেন, ভিলিয়ার দ' লিলে আদম ও ম্যালার্মে। এঁদের দান স্বীকার করবার আগে এ কথা জানতেই হবে যে এই মতবাদের যা প্রধান প্রতিপাদ্য ও সাধনা তার সুস্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত পেটার ইংলণ্ডে বেশ কয়েক বৎসর আগেই দিয়েছিলেন। তাঁকে যারা অনুসরণ করেছিল তারা তাঁর মতকে নিজেদের মনোমত ক'রে অন্য রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে দোষ পেটারের নয়।

ভের্লেনের সাধনা কাব্যকে বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থবিবর্জিত ক'রে সংগীতের পর্যায়ে তোলা, pure poetry বা শুদ্ধ কবিতা লেখা। অকারণ সুখদুঃখের দীর্ঘশ্বাসের মত ভারহীন তাঁর গীতিকবিতাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তার অনেক তুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের রাশি রাশি কবিতায়, গানে। তাঁর নানাভাবে প্রকাশিত 'কি জানি পরান কি যে চায়' 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার', 'পরান কেন ডুখায় রে' প্রভৃতি লিরিক দীর্ঘশ্বাসে। ভের্লেনের চারটি লাইন এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে:

হৃদয় ভরে অশ্রু ঝরে
বৃষ্টি-ধোয়া পল্লী যেন,
হায় গো কে এই বিষাদ-শরে
হৃদয় আমার বিদ্ধ করে!

গোতিয়ে'র মত ভের্লেনও Art Poetique বা কাব্যশিল্পের উপর একটি কবিতা লেখেন। গোতিয়ে চেয়েছিলেন রেখার দৃঢ়তা স্পষ্টতা, ভের্লেন চাইলেন অস্পষ্ট ভাবের, রূপের রহস্যময়তা। সংগীতময়তাই তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য, অন্য-সব কিছুই, তা সে এপিগ্রামই হোক, আর উইট্ হোক, কাব্যের উপাদান হিসাবে অবস্তু। আর বাগ্মিতা, ওজস্বিনী বাণী বা eloquence একেবারেই চলবে না, চিরকালের জন্য তার ঘাড় মট্‌কে কাব্য থেকে বিদায় করে দিতে হবে। 'Take eloquence and wring its neck'।

ঊর্ধতম শ্রেষ্ঠতম সত্য, 'the highest noblest reality'কে পাবার জন্যই এই সাধনা যা ভের্লেন সংগীতময়তার মধ্য দিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিল্পশক্তি থাকলেও ঐ ঊর্ধতম সত্যের উপলব্ধির ভাগ কম ছিল। কাজেই তাঁর দান অল্পেই নিঃশেষিত হয়ে গেল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপর্যাপ্ত দান সম্ভব হয়েছিল শুধু তাঁর অন্তর্জীবনের অতুলনীয় সমৃদ্ধিলাভের জন্য।

আর-এক রকমের এক্‌স্‌পিরিমেণ্ট করলেন আর-একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি— ম্যালার্মে। তাঁর মতবাদ

ও কাব্যরীতির প্রভাব ছড়িয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্তু সেগুলি এতই সূক্ষ্ম ও অনন্য যে তার অনুসরণে অন্যান্য কবিদের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ না ক'রে উপায় নেই। অনেক ক্ষেত্রে ম্যালার্মের উক্তির ভাষ্য হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। পেটারের কল্পিত নানারকমের কাব্যপ্রয়াণের মধ্যে একরকম হচ্ছে অন্তর্ঘন অভিজ্ঞতার রাজ্যে প্রবেশ। সেই চিদ্‌ঘন দেশে—যেখানে গেলে সাক্ষাৎ মেলে প্লেটো-বর্ণিত Real Ideaর—যা শুধু চিন্তনীয় নয়, অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যবস্তু, তা ছাড়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপের, গূঢ় হৃদয়গ্রাহ্য ভাব ও অনুভূতির—অর্থাৎ সব মিলে যেখানে একটি গূঢ় অতিপ্রত্যক্ষ সত্যের চেয়েও সত্যতর অন্তর্জগতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার দেখা পেটার পান নি। অন্তর্লোকের আকস্মিক স্ফুরণ ও নিমেষ-দীপ্তিই তিনি জানতেন, যদিও তার স্থায়ীরূপ যে সাধনার বিষয় তার উল্লেখ তিনি করেছেন। ম্যালার্মে তাঁর সাধনাবলে এই আভ্যন্তর প্রত্যক্ষতায় পৌছেছিলেন। সেখানে অন্তর্মগ্ন রসবিলাসের আনন্দে যা দেখেছেন সরাসরি উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে। ভাষ্য নয়, বাক্যের ভণিতা নয়, প্রতিটি শব্দের ক্রিস্ট্যালে ধরে দিতে চেয়েছেন অন্তর্লোকের ভাবচিন্তা ইন্দ্রিয়বোধের স্বরূপ। Au Reborisএর নায়ক des Esseintesএর নামে লেখা কবিতায় ঐ রিয়্যাল আইডিয়া ও তার মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের উদ্ভাসের রহস্য তিনি বলেছেন। এই তাঁর সত্য ও সুন্দরের সমাধান। অন্তরের অন্তরতম গভীরে এমন এক জায়গা আছে যেখানে স্বভাবতই truth ও beauty, সত্য ও সুন্দর একার্থবাচক। এই জগৎকে প্রকাশ করতে হলে ভাষার কঠিন ঘনতা একান্ত দরকার। বুদ্ধিগ্রাহ্যতার জন্য যে বিস্তার তা রসঘনতাকে নষ্ট করতে বাধ্য। তাই ম্যালার্মের ব্যাকরণবিরহিত শব্দ, কাঠিন্য ও ঘনত্ব, তাঁর concentration ও condensation, বুদ্ধিমানসের পক্ষে তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা—মোটেই আকস্মিক কিম্বা অবাঞ্ছিতভাবে উপস্থিত বলে দোষ ধরা যায় না। এগুলি তাঁর বিশিষ্ট কাব্য-অভিজ্ঞতার গত্যন্তরহীনভাবে আবশ্যক বাইরের রূপ।

এই অন্তর্জগতের আর-একটি বিশেষত্ব হল এই যে সেখানে এক আইডিয়ার সঙ্গে অন্য অনেক আইডিয়ার একটা মিল ও সামঞ্জস্যের প্রবহমানতা আছে। যে কোনো অর্থবিন্দুকে ঘিরে একটা অনন্তবিস্তারী অর্থ-মণ্ডল আছে। এই অন্যোন্যতা মনে করিয়ে দেয় বোদলেয়রের correspondance. তাই কাব্যে স্পষ্ট নির্দিষ্ট অর্থের বিরোধী ছিলেন ম্যালার্মে। ভের্লেনের মতই তিনি চেয়েছিলেন অনতিনির্দিষ্টের স্বাধীনতা। তাঁর একটি সনেটে আছে :

অতিশয় রুক্ষ স্পষ্ট ভাষে
সাহিত্যের রসবাষ্প নাশে।

নীচে তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতার কাব্যানুবাদ দেওয়া হল। এর মধ্যে দেখা যাবে যে এমনভাবে কবিতাটির ভাষাবিন্যাস যাতে একাধিক অর্থ বহন করতে পারে। বন্ধনদশা যার ঘটেছে সে ঐ 'সুন্দর দিন'ও হতে পারে, পুরাকালের একটি রাজহাঁসও হতে পারে, আবার অমল উজ্জ্বল কোনো আত্মাও হতে পারে।

এই কুমারী—এই জীবন্ত

এই কুমারী, এই জীবন্ত—সুন্দর দিন এই
ছিঁড়বে কি ওর মদমত্ত পাখার এক ঝড়ে
তুষার কঠিন হ্রদ—যার বুকে স্বচ্ছ নড়ে
উড়ন ঝাঁকের গ্লেসিয়ার যার ভাগ্যে উড়ন নেই ?

রাজহাঁস এক পুরাকালের ভাবছে : এ তো সে-ই,
রূপে রাজা, হতাশ, তবু মুক্তি খুঁজেই চলে :
থাকতে হবে যে দেশে তার গুণ গায়নি ব'লে
উষর শীতের একঘেয়েমি ঝকমকালো যেই।
সমস্ত ঘাড় ঝাড়বে তার এই সাদার যন্ত্রণা
আকাশ যা দেয় পাখিকে— সে নেবার পাত্র না ;
কিন্তু, 'না' মানে না করাল মাটি জোর ধরেছে পাখা।
অমল আত্মা আলোর সাজা পায় এ কারাবাস,
অবহেলার শীতল স্বপ্নে নিথর হয়ে থাকা—
যা মেনেছে অহেতুক ওর নির্বাসনে হাঁস।

এই কবিতায় মূল ফরাসীর মিল, শব্দসজ্জা ও পরম্পরা যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। শেষের তিন লাইনে লক্ষ্য বস্তু অমল আত্মাও হতে পারে, হাঁসও হতে পারে যাকে করা হয়েছে একেবারে শেষ ব্যবহৃত শব্দ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ম্যালার্মের ভক্ত ছিলেন বলে বলেছেন। তাঁর কাব্যে কিন্তু কোথাও ম্যালার্মের শব্দঘনত্বের শৈল্পিক ব্যবহার নেই। যে অন্তর্লোক ম্যালার্মের সম্পদ, তারও কোনো আভাস সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে নেই। ভ্যালেরি যিনি ম্যালার্মের শিষ্য হিসাবে প্রসিদ্ধ— তাঁর অন্তর্মুখিতা আছে, ঘনত্ব আছে— কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের ভোগৈশ্বর্যের যে পসরা ম্যালার্মে খুলে ধরেছিলেন কিছুটা তা অন্ততঃ ভ্যালেরিতে পাই নি। বরং তা আছে ইয়েট্‌স্ যে তরুণ ইংরেজ কবিদের চিন্তাঘনতার প্রশংসা করেছিলেন তাঁর আধুনিক কাব্যসংকলনের ভূমিকায়— সেই সিসিল ডে লুইস, চার্ল্‌স্ ম্যাজ, জর্জ বার্কার ইত্যাদির স্বল্প কবিতায়। ম্যালার্মে ও তাঁর আবিষ্কৃত রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় পদার্পণ করেছিলেন মাত্র, তাই তাঁর কাব্য অপ্রচুর, কিন্তু নিঃসংশয়ভাবে নূতন এবং অপূর্ব আস্বাদময়। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কাব্যের মন্দ্রঘনত্ব, যার মধ্যে 'সৎ'এর আস্বাদ, যা সৎ চিৎ ও আনন্দ বা সত্য শিব ও সুন্দর, ইংরাজি ভাষায় Truth, Good and Beautiful-এর সমন্বয়ের ফল— তার গুরুত্ব অবশ্য অনেক ব্যাপক ও গম্ভীর সম্ভাবনাময়। কিন্তু তা হলেও স্বীকার করতে হবে ম্যালার্মের বিশিষ্ট আবিষ্কার ও সিদ্ধির তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো কবির কাব্যে নেই। ভের্লেনের অভাব, এমনকি বোদলেয়রের অভাবও বাংলা সাহিত্যে অনুভব করি না। কিন্তু ম্যালার্মের আস্বাদঘনতার মত কিছুর জন্যে আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। জানি না, রবীন্দ্রনাথ ম্যালার্মের এই বিশিষ্ট দান লক্ষ্য করেন নি কেন। অমিয় চক্রবর্তীর কিছু কবিতায় এই সরাসরি প্রত্যক্ষতা ও অন্তর্ঘনতা আছে।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত Villiers de L' isle Adam-এর Axel নাটকই প্রতীকবাদ ব্যাখ্যানের প্রধান বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এর নায়ক কাউণ্ট অ্যাক্সিল থাকতেন একটি পুরোনো গম্বুজ-ওয়ালা দুর্গে। এই দুর্গে অনেক গুপ্তধন সঞ্চিত ছিল। কাউণ্ট সে ধন উপেক্ষা ক'রে ধ্যানসাধনায় মগ্ন। ইতিমধ্যে এক কনভেণ্টের একটি তরুণী দৈবে এই গুপ্তধন-রহস্য ভেদ ক'রে কোনো ছলে ঐ দুর্গে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে। সে যখন মধ্যরাত্রে ঐ ধন আবিষ্কার করেছে তখন কাউণ্ট এসে উপস্থিত।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গুলি করল, তাতে কাউন্ট সামান্য আহত হওয়ায় ছুরি মারতে গেল। তার হাতের ছুরি ছিনিয়ে নিতে গিয়ে দুজনের চোখে চোখ মিলল, তারা পরস্পরকে চিনল চিরকালের ভালোবাসার ধন হিসাবে। তারা প্রথম আনন্দের উত্তেজনায় ঠিক করল ঐ টাকার সাহায্যে ঘুরে আসবে কাশ্মীর, বাংলা প্রভৃতি দেশে। কিন্তু পাছে তাদের মিলনমুহূর্তের এই উচ্চতান অনুভূতি, এই ক্লাইম্যাক্‌স্‌ প্রত্যহের ম্লানস্পর্শে কোনো ভাবে নীচে নেমে আসে, নষ্ট হয়, এই ভয়ে সেই রাত্রেই তারা করল আত্মহত্যা।

অবক্ষয়ের গ্লানিমুক্ত আদর্শপ্রেরণা, সৌন্দর্যচেতনা, বাস্তবাতীত কোনো সত্যের ভাবনা Villiers de L' Isle Adam-এর মধ্যে অতি চমৎকার ভাবে ফুটেছিল। বোদলেয়রের আত্মিক দিকটার তিনি প্রধান ও প্রথম আবিষ্কারক, ভাগ্‌নার'এর সংগীতের তিনি ছিলেন সত্যকার সমঝদার। শুভ নন্দনবাদ, নন্দনবাদ থেকে অকৃত্রিম ঊর্ধ্বায়নের প্রেরণাকে সংহত করা প্রতীকবাদ—এ সব এরই উৎস হয়ে রইল তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই নাটক। এর ঐ 'টাওয়ার' একটি প্রতীক হিসাবে পরবর্তী কবিরা অনেকেই ব্যবহার করেছেন, এবং ইয়েট্‌স্‌-এর শেষদিকের কাব্যে এই 'টাওয়ার' প্রতীকের বাহুল্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। ইয়েট্‌স্‌ যে Axel-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন।

ইংলণ্ডে এই সিম্বলিজ্‌ম্‌এর একটা স্পষ্ট রূপের ব্যাপক প্রচারের কৃতিত্ব আর্থার সাইমন্‌স্‌ (Arthur Symons)এর। তাঁর Symbolist Movement in Literature প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। ইয়েট্‌স্‌কে এই বই উৎসর্গ ক'রে তিনি বলেন যে ইয়েট্‌স্‌ই সেই ইংরাজ কবিদের মধ্যে প্রধান যাঁরা হয়তো নিজের অজান্তেই এই প্রতীকবাদের ধারক। সাইমন্‌স্‌ ম্যালার্মে, ভের্লেন প্রভৃতি কবির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন র‍্যাঁবো কবিকে ভূমিকা দিয়েছিলেন দ্রষ্টার। ম্যালার্মে বাইরের জীবনকে গুরুত্ব দেন নি, কবিতা আত্মিক অভিজ্ঞতার ফল বলে তিনি মনে করতেন। কাজেই ইতর লোকের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে poetic ambiguityর মধ্যে এর স্থান করে দেওয়া উচিত, এই ছিল তাঁর মত। সাইমন্‌স্‌ এই symbolismএর মূল কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: 'Here then in this revolt against exteriority, against rhetoric, against a materialistic tradition, in this endeavour to disengage the ultimate essence, the soul of whatever exists and can be realized by the consciousness; in this dutiful waiting upon every symbol by which the soul of things can be made visible; literature, bowed down by so many burdens, may at last attain liberty, and its authentic speech.'

ইয়েট্‌স্‌ এই বইএর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত, কিন্তু পেটারের মতবাদ থেকে সাইমন্‌স্‌-এর যে প্রভেদ তিনি দেখেছিলেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাইমন্‌স্‌-এর উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে পেটারের রচনার আগে উদ্ধৃত অংশ তুলনা করলে দেখা যাবে সাইমন্‌স্‌ বা তাঁর গৃহীত মতবাদ পেটারের কাছে কতটা ঋণী।

এলিয়ট্‌ও এই বই পড়ার ফলে ভের্লেন, লা ফোর্গ, কোর্‌বিএয়রের পরিচয়ে উৎসুক হন। সিম্বলিজ্‌ম্‌ যে এই বইএর প্রভাবে ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করল তা নয়, তবে কাব্যসমস্যা সমাধানের যে

সব ইঙ্গিত এর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল তা ব্যাপক ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছরের কাব্যকে প্রেরণা দিয়েছিল। ইয়েট্স্ ইংরাজ কবিদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'Then in 1900 everybody got down off his stilts.' ভিক্টোরিয়ান্ কৃত্রিমতা, ভাষাস্ফীতি, অলংকারবহুলতা ইত্যাদি দোষ থেকে এই মুক্তি যদি সত্যই ১৯০০ সাল থেকেই হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে সাইমন্স্‌এর এই বইএর প্রভাব বেশ খানিকটা ছিল তা মেনে নিতে বাধা নেই।

বাস্তবের দাবী ও সত্যবোধ

কিন্তু এইসব মতবাদ বিংশ শতকের কবিদের সৃষ্টি-চেতনাকে প্রভাবিত করলেও কোনো বিশেষ মতের বশবর্তিতা ক্রমেই একটা নিয়ম না হয়ে ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াল। বরং কবিদের মধ্যে যথেচ্ছ এক্স্‌পিরিমেণ্ট ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চা দেখা গেল। কাব্যের নূতন উৎস বা শক্তিশালী প্রকাশকৌশল আবিষ্কার যার তার কাজ নয়। কিন্তু অল্পস্বল্প রীতিবদল বা টেক্‌নিকের অভিনবত্ব কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী অনেক কবির পক্ষেই সম্ভব। কাজেই প্রথম যেসব নূতনত্বের চমক এসে আসর জমালো তার মধ্যে প্রধান ছিল: ছন্দের চটুলতা, মিলের দুঃসাহসিকতা, বা ছন্দমিল দুইই বাদ দিয়ে গদ্যছন্দের প্রবর্তন; কবির ভাষা ও বাচনভঙ্গীতে নূতন অন্তরঙ্গতা বা গণতান্ত্রিক হৃদ্যতা বা নিকটতার ভাব, বা নিজেকে নিয়েই শ্লেষবিদ্রূপের অভিনয়— যা ফরাসী কবি কোর্‌বিএয়ের (Corbiere), লা ফোর্গ (La Forgue)-এর মধ্য দিয়ে এসে টি. এস. এলিয়টের কাব্যকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের কাব্যে এই ধরণের নূতন কণ্ঠধ্বনি আমরা যতীন সেনগুপ্তের কবিতায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের, বিষ্ণু দের কবিতায় পেয়েছি। এঁদের কাব্যে এই নূতন ভঙ্গীর সঙ্গে সত্যকার নূতন অনুভূতিও ছিল। কিন্তু স্বদেশ ও বিদেশের অনেক নূতন কবি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুধু ভঙ্গী-সর্বস্বতা দিয়ে। আর তা ছাড়া এল বিষয়বৈচিত্র্য। নূতন যুগের কলকারখানা, ডাইনামো, এয়ারোপ্লেন, শ্রমিক নাবিক সৈনিক প্রভৃতির জীবন ইত্যাদি স্থান পেতে লাগল কাব্যে। এই ধরণের 'বাস্তবে'র প্রবেশপথ ভালো ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দিল পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ। নিদারুণ যন্ত্রণা বেদনা ক্রোধের তীব্র আস্বাদনযুক্ত হয়ে কাব্যভুক্ত হল এমন সব উগ্র অনাবৃত দৃশ্য ও ঘটনা যা নিয়ে কবিতা লেখবার কথা আগে কোনো কবি ভাবতেই পারতেন না।

এইসব নূতনত্বের চমৎকারিত্ব অল্প দিনেই কেটে গেল। কিন্তু এই সবের মধ্য দিয়ে সত্যকার একটা সন্ধানও চলে এসেছে, এবং কৃতী কবিরা এমন কিছু নূতন কাব্যসিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছেন ও সেই পথে স্বীকারযোগ্য সিদ্ধিলাভ করেছেন যাকে বলা যায় বিশ্বকাব্যের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের দান। এই দানের মৌলিকত্ব আছে, যদিও সে মৌলিকত্ব পূর্বতন কাব্যধারার সঙ্গে যোগরহিত নয়। সত্যকার মৌলিক নূতন পূর্বাপর ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার এই দানকে দুভাগে ভাগ করে দেখতে পারা যায়, যদিও এই শ্রেণীবিভাগও উঠছে এক মূল তত্ত্বের থেকে। সেই সত্ত্ব হল কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে সত্যের উদ্বোধন, সত্যার্থসন্ধান, সত্যবোধের সাধনা। কীট্‌সের সত্য ও সুন্দর সম্বন্ধে কাব্যিক উক্তিটি সকলেই জানেন। গোতিয়ে যখন নন্দনবাদের প্রবর্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন তখন জ্যেষ্ঠ কবি ভিক্টর হিউগো তাঁকে একটি কবিতায় অভিনন্দন জানিয়ে তার মধ্যে লিখেছিলেন 'Va chercher le vrai, toi qui sus trouver le beau'—'Go to seek

truth, you who know how to find beauty.' উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তই এই সন্ধান নানা শাখাপথে ঘোরাঘুরি করে বিশ শতক থেকে হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ, দৃঢ়নিষ্ঠ। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শুধু বাহ্য উপাদান নিয়ে যে বাস্তববাদ তার স্থান রোমাঞ্চ উপন্যাসে থাকতে পারে, কাব্যে নেই। এমনকি স্বভাববাদের ইন্দ্রিয়বোধপরতা, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, অবচেতনের উর্ধোৎক্ষেপ ইত্যাদিকেও কাব্যে স্থান পেতে হলে কিছুটা আন্তর চেতনার রসে আগে তাদের অভিষিক্ত হতে হবে। এই হল এক দিক্। আবার, অপর দিকে এ কথাটাও কবিদের আর অজানা রইল না যে বাইরের জগতে যে জীবনলীলা চলেছে, প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট যে দৃশ্যপরম্পরার উদয় লয় হচ্ছে তাকে অস্বীকার করে অন্তরগহনে আশ্রয় নেবার যুগ এ নয়। এ যুগ এসেছে একটা কঠিন বাস্তব স্বীকৃতির—একটা আবশ্যিক চেতনাবিস্ফারণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে। কবিকে তা মেনে নিতেই হবে—শুধু 'কিছু নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজনের দ্বারা নয়, সংকীর্ণ ব্যক্তিচেতনাকে গোষ্ঠী-চেতনা জাতীয় চেতনা মানবচেতনায় ক্রমশঃ বৃহত্তর পরিধিতে উত্তীর্ণ করে। অন্তরে থাকা চাই সত্যবোধের রস বা দীপ্তি, আর তার বাহন বা ক্ষেত্র রূপে চাই জগৎ-সত্যের ব্যাপক ব্যক্তিগত অনুভূতি বা চেতনা। এই সত্যবোধ আর এই চেতনার বিস্তৃতি লাভের চেষ্টাই বিশ শতকের প্রতিটি সার্থক কবির মধ্যে দেখা যায়। ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও রিল্‌কে—এই শতাব্দীর প্রথম দিক্‌কার এই তিন প্রধান কবির কাব্যসমস্যা সমাধানের ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ইয়েট্‌স্ ও তাঁর শৈল্পিক সমাধান

ইয়েট্‌স্‌এর নিজেরই উক্তি থেকে দেখা যায় তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানচেষ্টা চলেছে যেন দুই পরস্পরবিরোধী দিকে। ১৮৯৯ সালে ও তিনি খুঁজছেন এমন কোনো ভিতরকার সত্য যা বস্তুতন্ত্রবাদের আক্রমণকে থামিয়ে দিতে পারবে, অনুভূতি ও কল্পনার মধ্য দিয়ে এনে দেবে নিত্যের পরিচয়। তিনি চেয়েছেন মানুষের 'নগ্ন মন'কে আবিষ্কার করতে, বিশ্বব্যাপারের মধ্যকার 'essential form' বা সারাৎসার রূপটিকে ধরতে। কবিতা 'criticism of life' নয়, তার কাজই হল এই অন্তর লোকের পথ দিয়ে নিত্যসত্যের আবিষ্কার-অভিযান।

কিন্তু ১৯০৮ সালে আইরিশ নাট্যকার কবি সিঙ্‌ (Synge) কাব্যের মধ্যে উচ্চ ভাব সম্পদ্ কল্পনা আবেগ ইত্যাদি ছাড়াও 'strong things of life' বা জীবনের শক্ত টেক্‌সই বস্তুরও আসন দাবী করলেন, কবিতাকে টিকতে হলে তারও গঠনসৌকর্যের জন্য দরকার 'timber' এই মত প্রকাশ করলেন। এই মতের দ্বারা ইয়েট্‌স্ যে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন তাতে সন্দেহ নেই। দেশ-কালের অবস্থাপরিবর্তন ও ক্রমশ তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে এই কথা মানতে বাধ্য করল যে বাইরের জগতের বাস্তব সত্যকেও যোগ্য স্থান দিতে হবে। ১৯২৮ সালে ইয়েট্‌স্ যা বললেন তা সেই প্রথম যুগের symbolismএর রহস্যের Shadowy Watersএর. কেল্‌টিক্ রূপকথার কবির পক্ষে একেবারে অপ্রত্যাশিত—

"We should ascend out of common life, the thoughts of the newspapers, of the market-place, of men, of science, but only so far as we can carry the normal, passionate, reasoning self, the personality as a whole."

এই হল পরবর্তীযুগের ইয়েট্‌স্‌এর সাধনা, এবং এই দুরূহ সাধনায় তিনি অনন্যসাধারণ সিদ্ধিলাভ

করেছেন। নিজের কবিস্বভাবকে বদলে ফেলে তিনি যেন এক জন্মান্তর লাভ করেছেন। তাঁর এই সাধনার দুটি অঙ্গ—

১. বাইরের বিস্তৃত বিচিত্র জগৎ-সত্যকে কোনো arbitrary বা স্বৈচ্ছিক মতবাদ দৃষ্টিভঙ্গী রুচি ইত্যাদির দ্বারা খণ্ডিত আহত বিকৃত বা রূপান্তরিত না করে তার সত্য মূল্যেই তাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা, কবিচিত্তে তাকে স্বাঙ্গীকৃত করবার চেষ্টা। রোমান্টিক কবিরা ইচ্ছানুযায়ী বাইরের সত্যকে রূপান্তরিত বা অন্তত রহস্যাচ্ছন্ন করে নিতেন। দার্শনিক কবিদের চেষ্টা ছিল শুধু বুদ্ধির দ্বারা বস্তু গ্রহণ, তার ফলে উপকরণসম্ভার জড় হয়ে হয় কাব্যের পতন হত বস্তুরাজ্যের রিয়্যালিস্‌মে, নয় বস্তুর মূল সূত্র আবিষ্কারের ঝোঁক পৌঁছতে গিয়ে অনেকটা গাণিতিক abstractionএর নীরস লোকে। ইয়েট্‌স্‌এর এই সাধনা যে আধুনিক কাব্যের একটি বিশেষ অভিসারপথ উন্মুক্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে তিনি কাব্যের মধ্যে আবাহন করে নিতে পেরেছেন সমসাময়িক জীবন্ত নরনারী, ঐতিহাসিক সামাজিক ঘটনা, বিজ্ঞান-বিপ্লব ইত্যাদি। স্থানিক সাময়িক ব্যক্তিক (individual) সত্যকে অবলুপ্ত বা অবচ্ছায়াময় না করেও তাকে টিপিক্যাল ও ইউনিভার্সালের পর্যায়ে উন্নীত করে কাব্যের সামগ্রী করে তোলার এই দক্ষতা ইয়েট্‌স্‌এর বিশেষত্ব। এইটিই তাঁর মহত্তম দান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চিরন্তন মানব ও তার ইতিহাসের স্থান প্রশস্ততর, কিন্তু সমসাময়িক মানুষ ব্যক্তিচরিত্র বিশিষ্ট ঘটনার প্রবেশ সেখানে প্রায় নিষিদ্ধ।

২. বাইরের এই তথ্য ও সত্য গ্রহণের জন্য ইয়েট্‌স্ কাজে লাগিয়েছেন একধরণের সজাগ ও চিরতৎপর, বস্তুনিষ্ঠ অথচ আবেগময় চিন্তাক্ষমতাকে। একে তিনি নাম দিয়েছেন passionate thought। আইরিশ কবি A. E. তাঁর মধ্যে এই চিন্তা-ক্ষমতা লক্ষ্য করে তাঁর সাধুবাদ করেছেন এবং আধুনিক কবির পক্ষে যে এই রকমের চিন্তাক্ষমতাকে কর্মক্ষম রাখা বিশেষ দরকার তাও বলেছেন। 'We must keep our thought athletic'। ইয়েট্‌স্ নানা সিম্বল্‌এর সাহায্যে জগৎকে সাধ্যায়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এইসব সিম্বল কোনো রহস্যলোকের ব্যাপার নয়, তারা এই জগৎকে গণনাযোগ্য করবার পক্ষে উপযোগী এক ধরণের বীজগণিতের প্রতীক। লুইস্ ম্যাক্‌নিস্ একেই বলেছেন ইয়েট্‌স্ এর Symbolic algebra. ইয়েট্‌স্‌এর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় তিনি যেন এক দৈবাদেশের মত অন্তরের মধ্যে কেবলি এই বাণী শুনেছেন 'hammer your thoughts into a unity' এবং তার ফলেই একধরণের প্রত্যক্ষ বস্তুসংস্পর্শজনিত চিন্তার দ্বারা তাঁর এই জগৎসত্য-আয়ত্তের চেষ্টা। আয়র্লণ্ডের অন্তর্বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপার ইয়েট্‌স্‌এর মনে এই স্বতঃজাগ্রত চিন্তার বাঁধ মুক্ত করে দিয়েছিল এবং এই চিন্তার মধ্যে কোনো কৃত্রিম প্রয়াস না থাকায় একে তিনি তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ক্রিয়া হতে দেন নি। তাই তার চিন্তা বরাবর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশেরই বাহন হয়ে থেকেছে, তাঁর কাব্যকে স্বভাবভ্রষ্ট করে নি। তাই তাঁর কবিতায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখা যায় তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতি আবেগ রূপকল্প ও তারই সঙ্গে স্বতঃ-উৎসারিত চিন্তাধারা। বৈজ্ঞানিক রোমান্স রচনায় এক ধরণের চিন্তা যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, পৃথিবী ও মানুষের ভবিতব্যচিন্তাও তেমনি মূলতঃ সত্যনিষ্ঠ থেকেও একটা সমস্তমনকে-প্লাবিত করা রসস্রোতের সৃষ্টি করতে পারে। ইয়েট্‌স্ এই ইতিহাসরসস্রষ্টা কবিদের মধ্যেই অগ্রণী। এজ্‌রা পাউণ্ড এই ধারার প্রধান প্রবর্তক হলেও তাঁর কাব্য বহু রূপকল্পের অনেকটা অস্বাঙ্গীকৃত সমাহার। তাঁর মনে কোনো একটি সংশ্লেষণীক্ষমতার চর্যা ও ক্রমপরিণতি ঘটলে তিনি শুধু টেক্‌নিকে নয়, কাব্যসৃষ্টিতেও মহৎ সিদ্ধি

লাভ করতেন কিন্তু তা তাঁর কপালে ঘটে নি। ইয়েট্‌স্ তাঁর নিজস্ব এই ক্ষমতাটির বিষয়ে নিজেই অনেক কবিতায় লিখেছেন, তার মধ্যে একটি কবিতার অনুবাদ এখানে দেওয়া হল

এক বিঘে ঘাস মাঠ : An Acre of Grass

লাগে ছবি আর বই, সবুজ
যেন এক বিঘে ঘাস মাঠ
খোলা হাওয়া আর পায়চারির,
যখন কমে শরীরের আঁট।
এই ভাঙাবাড়ী ; রাত ; সাড়া
কিছু নেই ইঁদুরের ছাড়া।
আজ এসে জীবনের প্রান্তে
থেমেছে লোভের হট্টগোল,
এখন কল্পনা এলোমেলো
কিম্বা মনের মামুলি কল
হাড় কানি যার পথ্য
বলো কি দেবে আমাকে সত্য ?
আজ বরং আমাকে বানাক
এই বুড়ো মানুষের ঝোঁক
হয় টাইমন, নয় লীয়র
আর না হয় উইলি ব্লেক—
জোর ঘা মেরে কাঁপিয়ে দেয়াল
যারা নিল সত্যের সওয়াল।
দাও মাইকেল এঞ্জেলোর
সেই মন যা মেঘকে ফাঁড়তে,
কিম্বা ক্ষণের খেয়ালে মেতে
পারে করবের শব নাড়তে,
করে লোক উপেক্ষা গুঁড়ো—
দাও সে ঈগলমানস বুড়োর।

এই ঝোঁকই তাঁর মনে জাগায় passionate thought। এই আবেগের দ্বারা যতক্ষণ-না তাঁর কল্পনা, তাঁর ইন্দ্রিয় সব তৈরি হয়ে ওঠে একটা বিমূর্ত মননধারা অনুসরণ করবার জন্য— 'Until imagination, ear and eye, can be content with argument and deal in abstract things' (Tower)— ততক্ষণ তাঁর কবিতা রচনার চেষ্টাই হবে বৃথা। এই ধরণের প্রেরণাই তাঁকে চিরন্তনের শিল্পরাজ্যে স্থান দেবে— 'gather me into the artifice of eternity' (Sailing to Byzantium).

এই চিন্তা-কল্পনা বা জীবন্ত চিন্তা যেমন ইয়েট্‌স্‌এর একটা বিশিষ্ট দান, তেমনি তাঁর whole-manism, মানবসমগ্রতা-প্রকাশের টেক্‌নিক্‌টি উল্লেখযোগ্য। একই কবিতার বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলি symphony সংগীতের বিভিন্ন movementএর মত সাজিয়ে তার প্রত্যেক স্তরে একরকমের দৃষ্টি ভঙ্গী বা পূর্ণ সত্তার এক-একটি বিশেষ স্তরের প্রতিক্রিয়া গেঁথে তার দ্বারা একটি বিচিত্র অথচ সুসমঞ্জস প্রতিক্রিয়া প্যাটার্ন গড়ে তোলা। তাঁর Tower, Meditations in time of Civil war, Vacillation প্রভৃতি কবিতা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথে এই ধরণের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট খুব অল্পই আছে, তাও তাঁর শেষের দিকের রচনায়। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।

পত্রপুটের ৫নং কবিতার শেষের কয় লাইন এই প্রসঙ্গে তুলে দেওয়া গেল :

কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারিদিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এ-ও এসেছে হাটের ছবি ভরতি করতে।

ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল,—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

এলিয়ট্‌এর সমাধান

এলিয়ট আধুনিক কাব্যসৃষ্টির প্রধান প্রকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'amalgamation of disparate experience,' বা 'বিবাদী অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের'। ইয়েট্‌স্‌এর অভিজ্ঞতা-উপাদানগুলি ইতি-বাচক, অর্থাৎ কবি সেগুলিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং তার পর তাদের সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। দুঃখ বীভৎসতাও যতক্ষণ না শিল্পগ্রাহ্য হয়েছে বা অন্তরের স্বীকৃতি পেয়েছে ততক্ষণ তাকে নেন নি। তাঁর সাধনা হৃদয়বুদ্ধিকে ব্যাপকতর ক'রে যা বিরোধী তারও মধ্যে কিছু সত্য বা দীপ্তি আবিষ্কার করা। তাই চরম সর্বনাশের মধ্যেও যে মুহূর্তে তিনি বলতে পারলেন 'A terrible beauty is born,' সে মুহূর্তে হল কবির জন্ম। ইয়েট্‌স্‌এর মূল মন্ত্র এই যে গ্রীকদের ট্র্যাজিক কোরাসও নাচত গাইত। এক ধরণের কবি-আনন্দের সায় না পেলে কোনো অভিজ্ঞতাই কাব্যগ্রাহ্য নয়, এই তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। এবং অনুরূপ সিদ্ধিও তিনি লাভ করেছেন। এলিয়টের অভিজ্ঞতা-উপাদানগুলি কিন্তু নেতিবাচক। তারা শুধু একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা মুহূর্তকে অসহ্যতার চরমের দিকেই ঠেলে নিয়ে চলে। তারা একই বিবর্ণ বিমর্ষ লোকের অধিবাসী, বিভিন্ন চৈতন্যস্তরের নয়। শুধু তাদের মধ্যে কণ্ঠস্বরের তারতম্য আছে। চরিত্রগত বিশেষ পরিস্থিতির অনুরূপ প্রকাশভঙ্গী আছে। একই শোকের আসরে যেন বিভিন্ন

মানুষের নানা কণ্ঠের শোকোচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রকাশ যা হয়তো বিদ্রূপোক্তি, রহস্যোক্তি, অর্থহীন হাসি বা আকৃতি, আবার গভীর বিলাপ পর্যন্ত নানা ধ্বনি ফুটিয়ে তোলে। এর সঙ্গে আছে ঐ রকম বিচিত্র রূপকল্প, তারও উদ্দেশ্য ও সজ্জা ঐ এক টেকনিকে। এজন্য পাউণ্ডের ইমেজিস্‌ম্‌এর প্রভাব ইয়েট্‌স্‌ ও এলিয়ট দুজনের মধ্যেই দেখা যায়। তবে ইয়েট্‌স্‌ তাঁর ইমেজ্‌কে বিস্তারিত করে খানিকটা চিন্তা বা অনুভূতির দ্বারা জারিত ক'রে পাঠকের রসচিত্তের সামনে উপস্থিত করেছেন। এলিয়ট্‌ আপাত অসম্বদ্ধভাবে অপ্রত্যাশিত এবং অনেকক্ষেত্রে বিরোধী চিত্রকল্প, ভাব-আকৃতি সাজিয়েছেন অনেকটা যেন স্যুর-রিয়্যালিস্টদের স্বপ্নোন্মাদের ভঙ্গীতে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। অতি নিপুণ সংগীতশিল্পীর চরম প্রতিভার স্বাক্ষর আছে এই প্রতিক্রিয়াপরম্পরা—যাকে তিনি নাম দিয়েছেন Objective correlative—রচনায়। এই প্রতিফলক প্যাটার্নের প্রতিটি টুকরোই হয়তো অপ্রিয়, ক্লান্তিকর, উদ্বেগজনক বা শুধুই অর্থহীনতার উৎকণ্ঠায় ভরা— তারা সুন্দরও নয়, তাদের নিজস্ব কোনো কাব্যগ্রাহ্যতাও নেই। কিন্তু তা আছে ঐ গ্রাহকচিত্তে— শিল্পীর চৈতন্যে, যার মধ্যে ঐ সমস্ত কিছু মিলে একটা তীব্র অপূর্ব বিপ্লবের ঢেউ জাগাচ্ছে। কোনোদিকের সীমা-প্রাচীর ভেঙে নূতন কোনো উপলব্ধির রাজ্যে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত এই ঢেউএর ক্ষান্তি নেই। আমরা আগেই বোদলেয়র ও র‍্যাঁবোর কবিতায় যা দেখেছি, এলিয়টের কাব্যেরও সেই পথ— কোনো তীব্র সংঘাতপরম্পরা সৃষ্টির দ্বারা কোনো গভীরতর উপলব্ধি ভূমিতে উত্তরণ। এলিয়টের Rhapsody On a Windy Nightএ অনেক বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত কৌতূহলোদ্দীপক ছবি ও আবেগের টুক্‌রোর পর যখন রাত্রের ল্যাম্প্‌টা বলল 'নাও, ঘুমোও, জীবনের জন্য প্রস্তুত হও' তখন এই সামান্য কথাটাই পূর্বচিত্রপরম্পরার ফলে হয়ে উঠল এক নিদারুণ আয়রনির ছবি। কবিতাটি শেষ হল কবির স্বগত মন্তব্যে—'The last twist of the knife.' তখন বোঝা গেল আপাত-অর্থহীন সাধারণ কতকগুলো ঘটনার ভিড় হঠাৎ মর্মচ্ছেদী ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে। এইখানে এলিয়টের অদ্ভুত সাফল্যকে ইয়েট্‌স্‌ বা রবীন্দ্রনাথ কেউই যোগ্য মর্যাদা দেন নি। ইতিবাদী মনের সাক্ষ্যগ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে তাঁরা নেতিপরম্পরার মধ্য দিয়ে যে অনুভূতিঘনতার চরমে পৌঁছনো যায় তার রসগ্রহণে অক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের Journey of the Magi কবিতাটির অনুবাদ করেছেন, কারণ এর মধ্যেকার উদ্বেগের নাটকীয় দৃশ্যসজ্জা আস্তিক্যগুণান্বিত। ঐ একইভাবে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর শিশুতীর্থ। তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতা ('ভগবান তুমি যুগে যুগে') মেজাজের দিক দিয়ে এলিয়টের মতন হলেও তারও স্বরক্ষেপ ব্যক্তিগত লিরিকের, নাটকীয় সমাহারের নয়। লীয়র উন্মাদ ও জ্ঞানী সমাজে অপাংক্তেয় হতে পারে, কিন্তু King Lear নাটক বা তার স্রষ্টা Shakespeareএর চৈতন্যের মধ্যে যে Lear তা মহৎকাব্যের রসঘন মূর্তি এ কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন না এ কথা ভাবতে অনিচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সে শেক্‌স্‌পীয়রমাতালদের উগ্র ভাবালুতা তাঁকে এক ধরণের মহৎ নাট্যগুণান্বিত কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন করেছিল।

সমসাময়িক বিচিত্র বিরোধী জীবনকে কল্পনা ও মেরুদণ্ডের মধ্যে অনুভব করা বোধের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা এলিয়ট্‌ সমন্বিত করেছেন। তারই প্রতিকল্প উপস্থিত করেছেন তাঁর Objective correlativeএর সাহায্যে। যার সাহায্যে পাঠক পেয়েছেন ক্রমসম্প্রসারিতচেতনা যা সেই গ্রীক দ্রষ্টা টাইরেসিয়স্‌এর ত্রিকালদর্শী চেতনার মত। এলিয়টের নাট্যিক কাব্যের কেন্দ্রে আছে এই টাইরেসিয়াসের

চেতনা। শুধু এই ব্যাপ্তিই এলিয়টের কাব্যসিদ্ধি নয়, তা ছাড়া আগেই যা বলেছি— 'বাহ্য'কে অতিক্রম করে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছনো। স্থিরবিন্দুতে গিয়ে আশ্রয়লাভ। এলিয়ট নির্বৃতির কবি। ইয়েটস্ গ্রীক কোরাসের নৃত্যপরতা থেকে ইঙ্গিত নিয়েছেন। কিন্তু এলিয়ট তাঁর কাব্যে গ্রীক ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ আকৃতিকে স্থান দিয়ে উপার্জন করেছেন গ্রীক নাট্যকাব্যের কাম্য ক্যাথার্সিস। এলিয়ট অল্প লিখেছেন, কিন্তু তার মধ্যেই বেদনার মধ্য দিয়ে রসাবতরণের যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন তাকে স্বীকার করতে হবে। বাংলা সাহিত্য এইদিকে এখনো যথেষ্ট অপরিণত। এলিয়টের এই কবিচিত্তকে বুঝলে তখন বিশ শতকের সমাজজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার (নীচে দেওয়া) এইসব চিত্রকে শুধুই আর তুচ্ছ ও বিরক্তিকর মনে হবে না। একটা মহত্তর ভাবজগতের মধ্যে আপনিই তারা স্থান গ্রহণ করবে। যথা—

রূপসী যখন অবোধ খেলায় মাতে, আর
আবার একলা, পায়চারি করে ঘরে,
সে চুল সামলায় যেন যান্ত্রিক হাতে, আর
গ্রামাফোনটায় অন্য রেকর্ড ভরে।

—The Waste Land

রিল্‌কের শিল্পকৃতি

রবীন্দ্রনাথ জগতের 'কু'টাকে সম্পূর্ণ আবৃত-করা আত্মসাৎ-করা এক শাশ্বত লোকের আবাহক। তাঁর অভিজ্ঞতার রাজ্যে sexটা রূপান্তরিত হয় মনের, হৃদয়ের, আদর্শবুদ্ধির বা অন্তরতম সত্তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায়— প্রীতি, করুণা, সহানুভূতি, সহাস্তিত্ববোধ, প্রেম প্রভৃতি ভাবে। কামকে যেখানে স্পষ্ট চোখে তিনি দেখেছেন, মহৎ কাব্যায়নের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন, সেখানে তার প্রাকৃত অদম্যতা ও উদ্বেগকে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বা বুদ্ধের মত ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেছেন, যার ফলে বিষও অমৃত হয়ে উঠেছে। শ্যামা, চণ্ডালিকা এই দুটি হল তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু এ হল সেক্স্‌এর রূপান্তর বা অতিক্রমণের দৃষ্টান্ত। সেক্স্‌এর দেহসম্ভোগকে একটা নির্দোষ ভোগানুভূতির মধ্যে অনুভব ক'রে তার মধ্য থেকে ঊর্ধ্বতর সৌন্দর্য, এমনকি আত্মিক মহিমার মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে কই মনে পড়ছে না। তার কারণ, যদিও তাঁর দেহবোধ, রূপচেতনা, বস্তুজগতের নানা আকার প্রকারের প্রতি প্রতিক্রিয়া অতি শুদ্ধ, বিচিত্র ও ব্যাপক, তবু এ সবই একটা মহত্তর মানসিক-আত্মিক চেতনার তরঙ্গ ও উর্বোৎক্ষেপের মধ্যে কেবলি নিজেদের 'সাধারণ বাস্তবতা' হারিয়ে ফেলে। তাঁর প্রেম বৈরাগ্যের রঙে রঙীন। কিন্তু সহজ ইন্দ্রিয়ভোগ ও দেহচেতনাকে, বস্তুজগতের সমস্ত সাধারণ অভিজ্ঞতাকে একটা আত্মিক ঐক্য ও পবিত্রতার মধ্যে রক্ষা ক'রে তাই থেকে অবাধে ঊর্ধ্ব সৌন্দর্যলোকে আত্মচেতনার লোকে উঠতে পারার কৃতিত্ব রিল্‌কের। যুক্তি বা থিওরির দ্বারা তিনি যদি এই অবিড়ম্বিত অব্যবহিত সম্ভোগের কথা বলতে যেতেন, আজকের যুগে কেউ সেই অসার এপিকিউরিয়্যানিস্‌ম্‌এ কর্ণপাত করত না। কিন্তু গ্রীক শিল্পীদের মত নিষ্কম্প প্রত্যক্ষ রূপায়ণের দ্বারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই অভিজ্ঞতার জগৎ— যাকে বলা যায় দেবতাসুলভ অনুভূতির জগৎ। ইয়েট্‌স্‌এর রিভ্ পাদ্রী হয়েও কামুক, তার এবং সেই Crazy Jane মেয়েটির প্রতিপাদ্য থিসিস্ হচ্ছে যে যৌনকামনা ও মাটির মানুষের অন্যান্য বাসনার মধ্যে কিছুটা

দেব-প্রেরণা মিশে আছে। কিন্তু রিল্‌কের monk চোখের সামনে তুলে ধরেছেন কেমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অবিভাজ্য অনুভবের মধ্য দিয়ে মর্ত্য ও অমর্ত্য এক হয়ে মিশেছে, একই আনন্দচৈতন্য উঁচু হয়ে উঠেছে একটা গাছের মত, একটা আকাশস্পর্শী টাওয়ারের মত; সেতু রচিত হয়েছে অবচেতনের সঙ্গে অধিচেতনের। রিল্‌কের অভিজ্ঞতার পরিধি ছোট, অনেকটা ব্যক্তিগত, কিন্তু ঊর্ধ্বায়নের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতা। গ্রীক ভাস্করের শিল্পচেতনা, কীট্‌স্‌এর সৌন্দর্যপ্রেরণা রিল্‌কের মধ্যে রূপ নিয়েছে আধুনিক বাস্তবতার দাবী মিটিয়ে, আত্মার 'আন্তর সত্যে'র ক্ষুধা মিটিয়ে। তাঁর ছোট দুটি কবিতা উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক।

১

যখন হৃদয়-আহা— সুন্দরবিরহিত, ক্লিষ্ট
রূঢ় আশাভঙ্গে, আর কোনো নবতর সন্ধান
মেনে নিতে অক্ষম— তখন, তখনি যদি তাকে উদ্দিষ্ট
উচ্ছল মধুরিমা নিয়ে আসে জাগবার আহ্বান,
হৃদয় কি করবে? কি ক'রে মানিয়ে নেবে তাকে উদ্দিষ্ট
সেই সুখ, হাতে গালে সে মধুর স্পর্শের বিনিময়!
গুপ্ত ব্যথাই যার এতদিন ছিল বৈশিষ্ট্য
প্রেম-বিস্ময় আজ তাকেও করছে দেখ বাঙ্‌-ময়।

২

দেখ দেবতারা কেমন দূরদিগ্‌দিগন্ত ভরে অনুভব করে।
কত সূক্ষ্ম, কী বিরতিহীন তাদের সেই অনুভব;
তাদের অনুভূতির লালশিখার কাছে আমাদের
তপ্ত শ্বেত শিখাও ঠাণ্ডা,
দেখ দেবতারা দূরদিগ্‌দিগন্ত ভরে জ্বলছে।

ইয়েট্‌স্ এলিয়ট ও রিল্‌কে— এঁদের সমাধানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমাধানের মিল অমিল কিছু কিছু বলা হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও একটা 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র মর্ত্যপ্রীতি ও বাস্তবচেতনা এত প্রবল ও স্পষ্ট যে তার দ্বারাই বিশেষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলেন ইয়েট্‌স্। আর সেই কথাই আরো নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন এজ্‌রা পাউণ্ড। তিনি রবীন্দ্রনাথে দেখেছেন একটা saner stillness, তাঁর মধ্যে তিনি দেখছেন মানবতাবাদের পূর্ণস্ফুরণ। দান্তের মত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশেছে একটা জীবনবোধ। 'In the work of Tagore the source of the charm is in the subtle underflow'। 'It is nothing else than his sense of life.' আবার— 'Briefly, I find in those poems a sort of ultimate common sense.'

শেষজীবনে রোগভোগ ও পৃথিবীর সভ্যতাসঙ্কটের ফলে দুঃসহ অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক নিগূঢ়তর সত্যের উপলব্ধি হয়—তার ইতিহাস দেখা যাবে প্রান্তিক থেকে তাঁর পরবর্তী সব কাব্যরচনায়। সে আলোচনার জন্য অন্য প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যসৃষ্টি

লীলা মজুমদার

গল্প-বিদ্যার প্রথম পাঠ দিচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পের নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। কতকাল ধরে দিদিমা ঠাকুমারা নাতিনাতনিদের কানে কানে এই গল্প বলে ঘুম পাড়িয়েছেন। এরি মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ভরে দিয়েছেন গল্পরচনার আর শিল্পসৃষ্টির প্রথম ও প্রধান পাঠ।

আগে পরিবেশটির বর্ণনা দিই। দুঃখিনী দুয়োরানীর দুঃখ ঘুচোবার আশায়, তাঁর পেয়ারের বাঁদর গিয়ে রাজাকে বলে এসেছে দুয়োরানীর সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে, কিন্তু গুণে দেখা যাচ্ছে ছেলের বিয়ের আগে তার মুখ দেখলে রাজার চোখ অন্ধ হবে। সেদিন থেকেই দুয়োরানীর দুঃখও ঘুচেছে।

আজ বাঁদর বর নিয়ে যাচ্ছে শোভাযাত্রা করে, তার বিয়ে দিতে। ছেলেই নেই তো বর এল কোত্থেকে? ক্ষীরের তৈরি পুতুলকে বরের চেলীর জোড়, সোনার টোপর, জরির জুতো পরিয়ে, জয়ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ষষ্ঠীতলা দিয়ে বাঁদর নিয়ে চলেছে। সেদিনের মতো সেইখানেই তাঁবু পড়ল। এদিকে বাঁদরের হুকুমে সারাদিন ষষ্ঠীঠাকরুণের ভোগ বন্ধ। সব ঘুমে নিঝুম, এমন সময় খিদের জ্বালা সইতে না পেরে, পালকি থেকে ক্ষীরের বরটি বের করে, বেড়ালদের সঙ্গে ভাগ করে, ষষ্ঠীঠাকরুন উপোস ভাঙলেন। আর বাঁদরও অমনি এসে তাঁকে ধরেছে!

লজ্জায় মরে গিয়ে মা ষষ্ঠী বললেন, 'বাছা, চুপ কর্, · ·ঐ বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ, সেটিকে নিয়ে বিয়ে দি'গে যা।' বাঁদর দেখলে বটতলা ভোঁ ভাঁ, একটা ছেলেরো টিকির দেখা নেই। বললে—'আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীর দাস ঘেটের বাছাদের দেখতে পাব।' ষষ্ঠীঠাকরুণ বাঁদরের চোখে হাত বুলোলেন, অমনি বাঁদরের দিব্যচক্ষু হল।

দিব্যচক্ষু যেই-না হওয়া বাঁদর দেখলে—"ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে, ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল।" বাঁদর দেখলে "সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য— সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশাল নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সরবন, তেপান্তর মাঠ, তার পরে আম কাঁঠালের বাগান; গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে গোলচোখ বোয়াল মাছ, কচু-বনে মশার ঝাঁক; আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসিপিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন—।" তার পরে যেই-না সবচাইতে চাঁদপানা মুখ দেখে ছেলে ছিনিয়ে নিয়েছে বাঁদর, অমনি কোথায় বা কি, ভেল্কিফাঁকি! কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুন, কোথায় কে, বটতলায় দিঘির ধারে ছেলেকোলে সে একলা দাঁড়িয়ে।

সৃষ্টিরহস্যের শুরুতেই এই চোখ-ফোটানোর পালা। বন্ধ চোখে পৃথিবীর বুকে প্রাণের খেলাই দেখা যায় না তো গল্পের দানা বাঁধবে কি করে? বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার আদিপর্বে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "যোগ-সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্য

প্রকার— চোখ খুলেই রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জরখোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনালোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে।”

এই দেখতে-জানার পুরস্কার সব সময় কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। অবনীন্দ্রনাথকেই বা কে দিয়েছিল হাতি-চতুর্দোলা শাল-দোশালা? তবে সুখের কথা যে সত্যিকার শিল্পীদের যেখানে বাসভুমি, সেখানে রাজার মুকুটের কোনো আদর নেই। বাংলা ভাষায় অবনীন্দ্রনাথের মতো গল্প বলতে পেরেছেন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যায়; কিন্তু খেতাব দেয় নি কেউ তাঁদের। জীবনকালে উঁচুদরের শিল্পী বলেই লোকে অবনীন্দ্রনাথকে জানত, সাহিত্যিক বলে তেমন নামডাক হয় নি, তেমন কোনো সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিও তাঁর উপরে পড়ে নি। তখন সাহিত্যজগতের সূর্য রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে দাঁড়ালে অপর সমস্ত প্রতিভা নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা হল, অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর রবিকাকার পরম ভক্ত ও শিষ্য, অথচ তাঁর লেখার উপরে রবীন্দ্রনাথের এতটুকু প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে হয়তো এইটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রভাব যে ভক্তকে তার স্বকীয়তা হারাতে দেন নি। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্নধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে। তারপরে বসে থাকা— বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে, নিজের আসন নিজে বিছিয়ে; চুপটি করে নয়, সজাগ হয়ে।”

দুনিয়াকে দেখা ও নিজের মনকে বোঝা, এই দুটি খুঁটির জোরে শিল্পীরা হয়ে থাকেন কালজয়ী, নইলে ক'খানিই বা বই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত “শকুন্তলা”; তার পরের বছর ‘ক্ষীরের পুতুল’; ১৯০৯ সালে ‘রাজকাহিনী’; ১৯১৫তে ‘ভুতপত্‌রীর দেশ’; ১৯১৬তে ‘নালক’; তিন বছর বাদে ‘পথে-বিপথে’; ১৯২১ সালে ‘খাতাঞ্চির খাতা’। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হল ‘বুড়ো-আংলা’ আর ‘ঘরোয়া’; তিন বছর পরে ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’; তারও দু বছর বাদে ‘আপন কথা’; ১৯৪৭এ ‘আলোর ফুলকি’ আর ১৯৫৪ সালে বেরুল ‘মাসি’ আর ‘একে-তিন-তিনে-এক’; ১৯৫৬তে ‘মারুতির পুঁথি,’ আরো দু বছর বাদে ‘রং-বেরং’; তার পরের বছর ‘চাঁইবুড়োর পুঁথি’ ১৯৬০ সালে ‘কিশোর সঞ্চয়ন’।

তারিখগুলি হল পুস্তকাকারে প্রকাশ হবার তারিখ, লেখা হয়েছিল তারো আগে। ‘আলোর ফুলকি’ ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯১৯ সালে। ‘বুড়ো-আংলা’, ‘ভুতপত্‌রীর দেশ’, ‘খাতাঞ্চির খাতা’ ইত্যাদি ছোটদের মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল বহুকাল আগে। এত বই রচয়িতা নিজেও চোখে দেখে যান নি।

এসব ছাড়া কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বই ইত্যাদিও আছে। ভারত-শিল্প, বাংলার ব্রত, প্রিয়দর্শিকা, চিত্রাক্ষর, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, সহজ চিত্রশিক্ষা, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারতশিল্পে মূর্তি, শিল্পায়ন ইত্যাদি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সব নিয়ে বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশখানি বই।

এ যেন কবিগুরুর কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশে একটি পাথরের ঢিবি। কিন্তু সে পাথর এতই ঝকঝকে, তার ভিতর থেকে এমনি আলো ঠিকরোয় যে মন বলে, হীরে নয় তো?

গল্প বলার আর গল্প লেখার মধ্যে সাধারণতঃ এই প্রভেদ থাকে যে, গল্প বলার মধ্যে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না, গোড়া থেকেই তার হওয়া চাই নিখুঁত নিটোল। মর্মরের টুকরোর উপরে মর্মরের

টুকরো বসিয়ে তাজমহল গড়া হচ্ছে, সে চলতে পারে শুধু গল্প লেখার বেলায়। গল্প বলার সময়ে সে ভাবে অগ্রসর হলে চলে না। নদীর জলধারার মতো তার শুরু থেকেই ছুটে চলা চাই।

অবনীন্দ্রনাথও এই রকম গল্প বলতেন। সবই তাঁর বলা-গল্প, লেখা-গল্পের জাতের একটিও নয়। সে কেমন গল্প? এক পংক্তি পড়তে-না-পড়তে চোখ-কান দুইই একসঙ্গে খুলে যায়। চিত্ত উদ্গ্রীব হয়ে অমনি তার সঙ্গে ছুটে চলে। বাড়তি কথার অবকাশ থাকে না, গোঁজামিল দেবার তর সয় না। এসব গল্প তাঁর ছবি আঁকার মতোই নিখুঁত, সপ্রকাশ, স্পর্শকাতর, প্রাণচঞ্চল, হাসিকান্নায় ভরপুর। এতটুকু চাতুরী নেই কোথাও, যেমনটি ভেবেছেন ঠিক তেমনটি লিখেছেন; যেমনটি মনে এসেছে ঠিক তেমনটি বলে গেছেন, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনটিরও খেই ধরেছেন।

বার বার এই কথাই মনে হয়, এ কেমন জাদুকর যে মুখটি খুললেই অমনি মনের নাড়ির উপর গিয়ে আঙুলটি পড়ে! রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে যা-কিছু বলেছেন সবই বুদ্ধির ছাড়পত্র নিয়ে, হৃদয়ের সদরদরজায় সগৌরবে পৌঁছেছে; অবনীন্দ্রনাথের কথা যেন খিড়কিদোর খোলা পেয়ে, একেবারে মনের অন্দরমহলে হাজির হয়েছে। কবিসম্রাটের সিংহাসনের পায়ের কাছে পৌঁছতে পারলেও আমরা ধন্য হয়ে যাই, আর নিজেই এসে অবনপটুয়া ছেলেদের খেলাঘরের এক কোণায় তার আঁকার সরঞ্জম ছড়িয়ে বসে, কারো ডাকার অপেক্ষায় থাকে না।

বড় সহজ একটি মানবতার গুণে অবনীন্দ্রনাথ এমন একক ও অদ্বিতীয়। সেটি যদি না থাকত, শুধু কলমের কারচুপি আর রঙ তুলির বাহাদুরি দিয়ে এমন সেরা কারিগর তৈরি হত না। যে কথা তাঁর রঙ তুলি বলে বলে শেষ করতে পারে নি, কাগজের উপরে কালির আঁচড়ে সেই কথাই ফুটে বেরিয়েছে। কোনো বড় বড় পাণ্ডিত্যের কথা নয়, কূট-তর্কজালে জড়ানো কোনো গূঢ় রহস্য নয়, কেবলি বাঁচার কথা, মরার কথা, গরিবের ঘর আলো করে ছেলে হওয়ার কথা, ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা, পাওয়ার কথা, হারানোর কথা, সুখের আশার কথা, দুঃস্বপ্নের জ্বালার কথা, হাসির নীচে নীচে কান্নার স্রোতের কথা, দুঃখের কালো মেঘের ধারে ধারে সোনালি পাড় লেগে থাকার কথা। মাঠে ঘাটে ঘুরে এসে মায়ের কোলের কাছে দুধ-চিড়ে খাবার কথা, দূরে থেকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির অশান্তির কথা, গরিবদের কথা আর মখমলের বালিশে মাথা রেখে রাজারানীদের চোখের জল ফেলার কথা।

পড়তে পড়তে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। এসব যে আমাদেরি মনের কথা, আমাদেরি ব্যর্থতার গ্লানি মাখা, আমাদেরি সোহাগের রঙে রাঙা। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ, কোন্ ফাঁকে আমাদের ঘরের মানুষটি হয়ে আমাদেরি মতো যা পাবার নয় তারি সন্ধানে অন্ধকারে বেড়াচ্ছেন। এ বড় সহজ গুণ নয়।

লোকে তাঁকে রূপকথার রাজা বলে থাকে। সমস্ত জীবনটাই তাঁর কাছে নাকি একটি পরীদের গল্পের মতো; সবচেয়ে স্থূল কথার নীচেও তাঁর একটা অবাস্তবতার ভিং থাকে বলে শোনা যায়। কিন্তু তাই কি? বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালার এক জায়গায় তিনি বলছেন· "সৌন্দর্যে ভরা, রসে ভরা, রঙে ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর করে রচনা করা এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্তা নিয়ে বর্তে থাকবে, নয়ন ভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণ ভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না, পরশ

করে পুলকিত হতে চাইবে না ; মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস ; এ যিনি মানুষকে মন দিয়ে সৃষ্টি করলেন, তাঁর ইচ্ছে কখনো হতে পারে না।"

তার পরে শিল্পী তাঁর নিজের অফুরন্ত ছেলেমানুষির রহস্যের সন্ধান বলে দিচ্ছেন, যার মধ্যে তাঁর গল্পের কুঁড়ি ধরেছে : "সেই শিশু, দিনরাত কাজেকর্মে ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগাল— মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলাঘর বাঁধলে— কল্পনা পক্ষীরাজের অতি অপূর্ব আস্তানা, সেখানে কাজ হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠল মস্ত কাজ। · ·শিশুকালের হারানো চমৎকারি কাঁচ, অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে সেইটে বার করে সাদাসিধে কাজের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে, কৌতুকে কৌতূহলে ভরে উঠল সৃষ্টির সামগ্রী। যেসব ইন্দ্রিয় কেবলি হিসেবের কাজে, পাহারার কাজে লেগেছিল, তারা হয়ে উঠল কৌতূহল-পরায়ণ এবং সন্ধানী দিনের পর দিন, বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উল্টে-পাল্টে খেলতে আর দেখতে অথবা শুনতে লেগে গেল।"

কই, এ তো অবাস্তব স্বপ্নবিলসীর ভ্রান্তির মতো শোনাচ্ছে না ; বিশ্বসত্তার নিগূঢ়তম রহস্যের সন্ধান না জানলে এমন কথা কার রসনাতে জোগায় ? গল্প-লিখিয়েদের পুঁজির কথা যে এসব। থলিতে করে তাকে বাইরের কোনো জগত থেকে আনতে হয় না। এইখানে আমাদের ঘরের কোণায় কোণায়, গোয়ালের পিছনে, ছোটবেলার খেলার জায়গায়, আমবনে জামবনে, টিফিনের ঘণ্টার শব্দের মধ্যে তিল তিল করে সে জমা হতে থাকে। ছোটবেলাকার বোবা মন তার কথা বলতে জানে না, কচি মুখে ভাষা জোগায় না। তার পর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে "একটু একটু করে খেলাঘর ভেঙে গেল এবং কচি ছেলেকে কাজের যন্ত্র-তন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে !" এও অবনীন্দ্রনাথের কথা।

তবে সুখের বিষয় মাঝে মাঝে অকস্মাৎ শিল্পীর হাতের বঙ্কিম একটি রেখা দেখে, গানের কলির একটুখানি সুর শুনে, কবেকার কোন পুরোনো গল্পের দুটি পংক্তি পড়ে, অমনি "কাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে মনের মরুভূমির উপরে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে শ্যামল ছায়া নামল, জল ভরে এল চোখের কোণে, কান শুনলে বাঁশির সুর উন্মনা হয়ে, কাজ-ভোলা মন বকুলতলার নিবিড় ছায়ায় খুঁজতে লাগল ছেলেবেলার হারানো খেলার সাথীকে।" অমনি যে আঁকল আর যে দেখল, যে গল্প বলল আর যে শুনল, দুজনাই কৃতার্থ হয়ে গেল।

যারা নিজেদের ছোটবেলার কথা ভুলে যায় এ জাদু তাদের জানা থাকে না। যদি-বা তারা গল্প লিখল সে হয়ে উঠল পাকাবুড়োর গল্প, যা পড়লে কই এমন করে মন-কেমন তো করে না। অবনীন্দ্রনাথের নিজের ছোটবেলাটি ছোট একটি রসের নাড়ু হয়ে তাঁর মনের মধ্যে জমা ছিল, কলম ধরলেই সেই রস চুঁইয়ে পড়ে লেখার মধ্যেও মধু ঢালত। এমন একটা উষ্ণ কোমল মধুর পরিবেশ তৈরি করে দিত, যার এলাকায় পা দিলেই মন বলে এই তো আমার নিজের চেনা ঘরটিতে ফিরে এলাম, কিন্তু এ ঘরের দেয়ালে এমন করে চিত্র করলে কে ? তাই তো, আমাদের ছোটবেলাটি তো বড় মধুর ছিল !

সব সেরা লেখক এমন জিনিস হাতে ধরিয়ে দেয় যাকে এক নিমেষে একান্ত আপনার বলে চেনা যায়। কিন্তু যে কোমল স্নেহের আলোটি ঠিক জায়গায় না পড়লে নিজেকেও চেনা যায় না, অপরকেও চেনা যায়

না, সেটি ফেলবার সাধ্য দৈবাৎ দু-একজন ভাগ্যবানের কপালে জোটে। অবনীন্দ্রনাথ সেই ক্ষণজন্মাদের একজন।

এদের তৈরি করা যায় না। শুধু এদের কেন, কোনো সৃষ্টিকারকেই তৈরি করা যায় না। সৃষ্টির রহস্য হাতে নিয়ে জন্মালে পর, বড়জোর খানিকটা স্থানকালপাত্রের আর উত্তম নজিরের সুবিধাটুকু করে দেওয়া যায় মাত্র। যে গল্প-লিখিয়ে হয়ে জন্মায় নি সে পাঁচ শো গল্প লিখেও লিখিয়ে হয়ে ওঠে না, বরং সময় কালে কলম বন্ধ করলে সেও বাঁচে আর পাঠকও বাঁচে। তবে ঐ স্থানকালপাত্র দিয়ে গড়া উত্তম পরিবেশ না পেলে, ক্ষমতার ঘুমন্ত বীজটি হয়তো তেমন করে অঙ্কুরিতই হয় না। সুখের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথ সেটি পর্যাপ্তভাবেই পেয়েছিলেন।

তাঁর ছোটবেলাটি ছিল একটি অসাধারণ ছোটবেলা। ঐতিহ্যময় এক পরিবারে, প্রায় ঐতিহাসিক এক বাড়িতে, বাগ্‌দেবীর বরপুত্রদের মাঝখানে তাঁর শৈশব কেটেছিল। কচি মনে রঙ ধরাতে যা-কিছুর প্রয়োজন সব তিনি পেয়েছিলেন। রহস্যময় দুই বিশাল বাড়িতে আনাগোনা, যুগান্তকারী মনীষীদের দেখা-সাক্ষাৎ, গানবাজনা, নাটক-অভিনয়, সাহিত্যালোচনা, স্বদেশিয়ানা, সমাজসেবা— কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি। অন্তরের কৃষি-জমিতে লাঙল পড়েছিল, সার পড়েছিল, জল পড়েছিল। কল্পনার পাখায় পালক গজিয়েছিল।

ছোটবেলা থেকে কানের চারদিকে জমিদারবাড়ির জমকালো জীবনযাত্রা গমগম করত, উজ্জ্বল অবহিত দুই চোখের নজর এড়িয়ে গেল এমন খুব অল্প জিনিসই ছিল। তোষাখানার চাকররা কে কার মুনিবের গড়গড়ার নল লুকোল, বাড়িতে কে এল কে গেল, কোন্ বই অভিনয় হল আর সর্বোপরি অবনীন্দ্রনাথের কিশোর জীবনের নায়ক রবীন্দ্রনাথের মাথায় নতুন কি খেয়াল এল, এই নিয়ে তরুণ চিত্তখানি সদাই প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকত। তার উপরে গল্প শোনা; রাতে শোবার সময় ঝি-চাকর মাসি-পিসি তো ছিলই, দিনের বেলাতে বাড়িতে অপ্রত্যাশিত আগন্তুকরাও সব সময়ে ছাড়া পেত না। কল্পনার পাখি এমনি করে খুদকুঁড়ো সংগ্রহ করে ডানার বল বাড়াল।

অনেকে বলেন, বড় খেয়ালী লেখা অবনীন্দ্রনাথের। খেয়ালী কেন খাম-খেয়ালী বললেও চলে। মাথা নেই মুণ্ডু নেই, যত রাজ্যের আজগুবি কথা এক জায়গায় এনে জমা করেছেন। সাধারণ পাঠকের এসব নাকি বোঝার বাইরে, ছোটদের বইগুলো ছোটরা কেন, তাদের বাবা-মা'রাও বুঝে উঠতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথ নিজে বলছেন— "শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন, শুনতে পারেন; এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারল না, সেইটেই বলে যান ভাবুক, কবিতায় ছবিতে রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে; অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিনরাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরি মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনাভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক— যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন।"

খেয়ালের লেখাগুলো তা হলে অবোধ শিশুদের জন্যে লেখা হয় নি, অতি পাকা বুড়ো যারা চিরকালের মতো শৈশবের ঠিকানা হারিয়েছে, এসব হয়তো তাদেরি জন্যে লেখা। বুড়োদের শিশুকাল চেনাবার পাঠ

এসব। বড় বুদ্ধিমান সমালোচকরা বলে থাকেন, ছোটরা বই পড়তে ভালোবাসলেও, বই বিচার করবার বুদ্ধি তাদের থাকে না; তাই শিশুপাঠ্যগুলি তখনি পরীক্ষায় পাস করে যখন হৃদয়বান বুড়ো পাঠকদেরও মনঃপূত হয়। তবে ঐ হৃদয়বান হওয়া নিয়েই আসল কথা। যতক্ষণ না সহানুভূতিশীল বয়স্ক বিচারক ছোটদের বইকে ভালো বলেছেন, ততক্ষণ সে বইকে ভালো বলা চলে না, ছোটদের কাছে সে যতই না জনপ্রিয় হোক। ওদের অনভিজ্ঞ রুচিতে ভালো লাগে যা, তাকেই ভালো বলে মনে হয়। তবে বড়দের বিচারেও কেবল মাত্র সেই বইকেই ছোটদের জন্য ভালো বই বলা চলে, যে বই পড়ে ছোটরাও আনন্দ পায়। নইলে সমালোচক মহাশয় যাই বলুন-না কেন, শিশুজগতে যে বই উতরলো না, তাকে ছোটদের জন্য ভালো বই বলা চলে না। যে বই ছোটরা বোঝে না, অনেক সময় তাও তাদের ভালো লাগে; কিন্তু যে বইএ রসের অভাব, সে বই অচল। এই মানদণ্ড দিয়েই অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে বিচার করা চাই।

শিশুদের জন্যে লিখতে গেলে, আরো কতকগুলো অলিখিত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। ভাষা হওয়া চাই সহজ সরল, কথার মানেটা যদি বা যুক্তির জগতে অগ্রাহ্য হয়, রূপের জগতে শব্দের জগতে কথাকে আগে বসতে হবে আসর জমিয়ে। ছোট ছেলে যাতে কথাগুলো পড়বামাত্র তার চোখের সামনে রূপের রঙের শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যায়, কানে বাজে মৃদঙ্গ ঢোল করতাল জগঝম্প শিঙ্গা অর্থাৎ প্রাণে-ভরপুর ভাষা চাই, যা শুনলেই শিশুর মন চনমনিয়ে উঠবে।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "খুব খানিকটা ন্যাকামোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলাকওয়াগুলোকে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য ফিরে পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা— শিশুকাল ন্যাকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না, সে যথার্থই ভাবুক, এবং আপনার চারিদিককে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায়, এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায়।"

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে খোকারা খোকামি ভালোবাসে না। যেই তারা লিখতে শেখে, তাদের মধ্যে দু-একজন অমনি গল্প লিখতে শুরু করে দেয়। সেসব গল্প হয় বুড়োমিতে ভরা; অবিশ্যি কাঁচা হাতে অপরিপক্ব বুদ্ধিতে যতখানি কুলোয়। বুড়োদের সম্বন্ধে গল্পও তারা পড়তে ভালোবাসে। তাদের খুদে জগতের মাঝখানে তারা নিজেরা থাকলেও, তাদের চারদিক ঘিরে নিরাপদ করে রেখেছে বড়দের একটা পাকা বনেদ। বড়দের নইলে তাদের একদণ্ডও চলে না। ছোটদের মুখে গল্প শোনার চেয়ে, বড়দের মুখের গল্পই তাদের বোধ হয় বেশি ভালো লাগে। যার তার মুখের গল্প নয়, পাকা গল্প-বলিয়েদের চিনে নিতে ছোটদের এতটুকু দেরি লাগে না। তারা জানে গল্প-বলিয়ে বয়সে বুড়ো, কিন্তু তবু তাদেরি আপনার লোক; দু জনেরি চোখে একই স্বপ্নের ঘোর। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "দৃষ্টি দু জনেরি তরুণ, কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখে নি, আর একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে, কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।"

তার মানে হল ছোটদের জন্য লেখা খুব সহজ নয়। বড়দের দরবারে যারা আসন পেল না, তারা যেন হাত পাকাবার আশায় এ আসরে ঢুকবার চেষ্টা না করে। পাকা লিখিয়ে ছাড়া এখানে কেউ কড়ি পাবে না। যেসব শত শত অক্ষম লেখক অপটু হাতে কলম ধরে শিশু পাঠকদের চোখে ধুলো দিতে চায়, তাদের কথা মনে করে শিল্পী বলছেন, "ন্যাকামো দিয়ে, শিশুর আবোল-তাবোল আধ ভাষা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে. অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ব ভাঙাচোরা টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে বসে বসে কেবলি শিশু

কবিতা শিশু ছবি লিখে চললেই, মানুষ 'কবি' 'শিল্পী' 'ভাবুক' বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মনভোলানো হয়, এ ভুল যারা করে চলে, তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে, কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলেভুলোনো ছড়া একেবারেই ছেলেমান্‌ষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি।"

এই তো বেশ শিশুপাঠ্যের একটা কাজ চালাবার মতো সংজ্ঞা পাওয়া গেল, এবার এরি সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য বইগুলিকে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু 'শিশুপাঠ্য বই' কোন্‌গুলিকে বলা যায়? অবনীন্দ্রনাথের বেলায়, 'পথে-বিপথে', 'আলোর ফুলকি' আর প্রবন্ধগুলি ছাড়া শিশুপাঠ্যের তালিকা থেকে কোন্‌টিকেই বা বাদ দেওয়া চলে? 'আলোর ফুলকি'ও অনেক ছোট ছেলে পড়ে হেসে কেঁদে আকুল হয়েছে, একবারো সন্দেহ করে নি এ বুড়োদের প্রেমের হতাশা ব্যর্থতার কাহিনী। ছোটদের জন্য লিখতে গেলে যে বিশ্বের সব কথাই লেখা যায়, বাদ দিতে হয় শুধু যেটুকু তাদের বোধগম্য নয়, অবনীন্দ্রনাথের বই পড়লে এ কথাও বারবার মনে পড়ে। তবে কথাটি নতুন কিছু নয়।

কথাটি যে নতুন নয় তার প্রমাণ পৃথিবীর রূপকথার ভাণ্ডার। এইসব রূপকথা, যার জাদুকাঠির ছোঁয়া লেগে মানুষের ছেলেমেয়েদের শৈশব হয়ে ওঠে সুমধুর, এদের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোথাও এতটুকু ছেলেমানুষির পরিচয় পাওয়া যায় না। সবই বাস্তব জগতের নির্মম সত্য দিয়ে ঘেরা; ছোটবেলায় মা-মরার দুঃখ, নিষ্ঠুর সংমার হৃদয়হীনতা, অন্যায় সন্দেহের নিদারুণ গ্লানি, সর্বস্বান্ত গৃহহীন হওয়া, ব্যর্থ ভালোবাসা, ভালোবাসার মানুষকে পেয়েও হারানো, নিদারুণ দুঃখে জীবনের অবসান কিম্বা অলৌকিক উপায়ে সুখের পুনর্বাসন। এর মধ্যে ছেলেমানুষির অবকাশ কোথায়? সবই পাওয়ার ব্যর্থতা, আর না পাওয়ার সান্ত্বনা সেই ইচ্ছাময় চিন্তা। এই বৈ তো নয়। অথচ এই গল্প বারবার শুনেও ছোটদের তৃপ্তি হয় না, বই পড়ে পড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যায়, তবু বলে ঐ বইই আরেকখানি চাই। জানা গল্প রোজ একবার করে শোনা চাই। এ রহস্যের উত্তর কে জানে?

অবনীন্দ্রনাথের গল্পগুলির কথাই ধরা যাক, নতুন করে কখানি গল্প লিখেছেন তিনি? সব চাইতে মনোহর গল্প তাঁর এখান থেকে ওখান থেকে ধার করা। 'শকুন্তলা' পৌরাণিক কাহিনী; 'ক্ষীরের পুতুল' রূপ-কথা; 'রাজকাহিনী' হল ইতিহাস; 'নালক' হল গৌতমবুদ্ধের গল্প; 'খাতাঞ্চির খাতা' ইংরিজি গল্প 'পিটার প্যানের' ছায়া; 'বুড়ো আংলা' সেল্মা লাগেরলফের রচিত একখানি বইকে অবলম্বন করে লেখা; 'আলোর ফুল্‌কি' ফরাসী লেখক রোস্তাঁদের বিখ্যাত গল্পের নতুন রূপ; 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'ঘরোয়া' 'মাসি' নিজের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লেখা; 'মারুতির পুঁথি' 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'ও লোককথা আর পুরাণের জগাখিচুড়ি খেয়ালের রসে ডুবিয়ে তোলা। নিজের তৈরি তাহলে আর কখানিই বা বাকি রইল? তবু বলতে হয় তাঁর ছাব্বিশ-সাতাশখানি বই একান্তভাবে অবনীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অপর কেউ তাদের এমন রূপ দিতে পারত না। আসলে গল্পের ঘটনা দিয়ে সাহিত্যের বিচার হয় না, গল্পের মধ্যে সাহিত্যিক নিতান্ত যে নিজস্ব রসটি ভরে দেন, তাই দিয়েই গল্পের সফলতা বিফলতা এবং এই জন্যেই ছোটছেলেরা বারে বারে একই গল্প শুনতে চায়, প্রতিদিন নতুন করে সেই রসটুকু উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে। নতুনত্ব চায় না তারা, অনেক সময় গল্পে নতুনত্ব আনবার জন্য একটু এদিক-ওদিক করলে, অমনি

তারা সেটি শুধরিয়ে দেয়। নতুনত্ব চায় না ওরা, গল্পের মধ্যে চিরন্তনকে খোঁজে; তাকে একবার পেলে নিজের চিন্তার সত্তার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়। সেইজন্য ছোটদের পাঠ্য নির্বাচন খুব সহজ কাজ নয়। তবে সুখের বিষয়, হাঁসের মতো জলটুকু বাদ দিয়ে দুধটুকু খাবার ক্ষমতা নিয়ে তারা জন্মায়।

'ক্ষীরের পুতুল' যখন লেখা হয়, লেখকের বয়স তখন বড় জোর বাইশ-তেইশ। কিন্তু গোলাপ যেমন গাছের ডালে পরিপূর্ণ রূপটি নিয়ে ফুটে ওঠে, তাকে শেখাবার পড়াবার দরকার হয় না, তেমনি পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে এ বই লেখা হল, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও একটি কাঁচা হাতের আঁচড় দেখা গেল না। শেষ-বয়সের লেখা 'মাসি', ছেলেদের বইও বটে, বুড়োদের বইও বটে, তাতেও এর চেয়ে পাকা কারিগরির চিহ্ন নেই। তফাত শুধু এই তকতকে ঝরঝরে 'ক্ষীরের পুতুল', নিরেট ক্ষীরের তৈরি, ; আর 'মাসি' বইখানির ফাঁকাগুলি সারা জীবনের স্মৃতির গমক দিয়ে ভরা; 'ক্ষীরের পুতুলে'র গোড়াতেও ক্ষীর, শেষেতেও ক্ষীর, দুয়োরানীর দুঃখের কথাও বড় মিষ্টি, সুখের কথাতেও ততই মধু, যেখানেই ভেঙে মুখে দেওয়া যায়, মুখ সুদ্ধ মিষ্টি হয়ে যায়। আর 'মাসি' বইটি এতটুকু নাড়াচাড়া করলে, অমনি ঝমঝম করে বেজে ওঠে, লেখকের জীবনের হারানো জিনিসের কথা শুনতে গিয়ে নিজের জীবনের যা কিছু গিয়েছে, তারাও এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। 'ক্ষীরের পুতুলে'র মধ্যে ওস্তাদের হাতের ওস্তাদিটাকে পাওয়া যায় আর 'মাসি'র মধ্যে ওস্তাদ সুদ্ধ ধরা পড়েন। নইলে হাতের কারিগরি পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কতটুকুই বা বদলিয়েছে।

ঐ যে শুরুতে বলা-গল্প আর লেখা-গল্পের কথা হল, 'ক্ষীরের পুতুল', আর শুধু 'ক্ষীরের পুতুল' কেন, অবনীন্দ্রনাথের সব গল্পই বলা-কথা; লেখা-কথার নিয়ম মেনে কেউ চলে না। লেখা-কথার নমুনা তাঁর প্রবন্ধগুলি, সে আবার এমনি উঁচু দরের লেখা কথা, যে যতবার পড়া যায় নব নব অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়; যতবার চিন্তা করা যায়, নতুন নতুন চিন্তা অঙ্কুরিত হয়।

ছোটদের সব গল্পকেই হতে হয় বলা-গল্প। ব্যাখ্যানার জন্যে ফাঁক রাখতে হয় না, দম নেবার জন্য থামতে হয় না। সে এক-দমকা দক্ষিণ হাওয়ার মতো, এক-পশলা আষাঢ়ে বৃষ্টির মতো, ফুরফুর করে উড়ে এল রিমঝিম করে ঝরে পড়ল, আকাশকে মাটিকে স্নিগ্ধ মধুর করে দিল, যত জ্বালা জুড়িয়ে দিল, ভিজা-উবরা করে দিল, তবে না কচিকচি মনে চিন্তার ঘুমন্ত-বাজগুলি নিঃশব্দে মাটির নীচে অঙ্কুরিত হতে থাকল।

'ক্ষীরের পুতুলে'র গল্প শুরু হচ্ছে—"এক রাজার দুই রানী, দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন, সাত শো দাসী তাঁর সেবা করে—পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল—সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন, সাত সিন্দুক ভরা সাত রাজার ধন মাণিকের গহনা—সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ। আর দুওরানী—বড়রানী, তাঁর বড় অনাদর বড় অযত্ন। রাজা বিষনয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন,—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবাকালা। পরনে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি; শুতে দিয়েছেন ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

"সুওরানী ছোটরানী, তাঁরি ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।"

এমনি করে জীবনের দুঃখ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ একটি সুর তুলে, গল্প শুরু হয়ে গেল। এতটুকু সময় নষ্ট হল না, একটি বাড়তি কথা হল না। 'নালক' শুরু হচ্ছে—"দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক সে একটি ছোটছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না! এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল···সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল, ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো। চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো। সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন, কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেকো।"

আর তো থাকা গেল না, বনের মাঝের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে সন্ন্যাসী যেমন চলে গেলেন, নালক চুপ করে বটতলায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বুদ্ধদেবের সারা জীবনের ছবি দেখতে শুরু করে দিল; একের পর এক। আর নালকের ঘরে থাকা হল না, পাঠশালার পড়া ফেলে, ভালোবাসায় ভরা মায়ের ঘর ফেলে, দেবলঋষির সঙ্গে সেও বুদ্ধদেবের চেলা হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলে নালক, একের পর এক, কিন্তু যাঁর জন্য ঘরছাড়া হল তাঁকে আর দেখল না। অনেক বছর পরে আবার যে দিন মার কাছে ফিরবে বলে ঋষির তপোবন ছাড়ল, ঠিক তার পর দিন বুদ্ধদেবের নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। নালকের সঙ্গে দেখা হল না। না-দেখার অন্তরে যে চরম দেখা নালকের জীবন তাই নিয়ে ধন্য হল।

বুড়ো আংলা আরম্ভ হচ্ছে—"রিদয় বলে ছেলেটি নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গোরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি···এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না"···অমনি গল্প শুরু হয়ে গেল। এমন দুষ্টু ছেলের চিরকাল যা হয় হৃদয়েরও তাই হল, গণেশঠাকুরের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে তাঁর শাপে এক বিঘৎ লম্বা বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে গেল। তার পর বইএর বাকি পাতা ধরে গণেশঠাকুরের সন্ধানে হৃদয়ের কৈলাস যাত্রার গল্প, সেখানে গিয়ে, তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে, আবার তাকে মানুষ হতে হবে। সে যে কত লোমহর্ষণ ব্যাপার তারপরে একের পর এক ঘটে যেতে লাগল সে বলে শেষ করা যায় না, বইটি পড়তে হয়। অবশেষে যখন সব পণ্ড হয়ে যাবার জোগাড় তখন "কাঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন— কিছু ভাঙিস্ নি তো?"

ছোটছেলে মাত্র খেয়ালের রাজ্যে বাস করে। দেয়ালে প্রদীপের আলোতে দাদুর ছায়া পড়ে যেন বুড়ো ভাল্লুক। নীল আকাশে মেঘ ভেসে যায় যেন পালতোলা নৌকো। স্নানের ঘরের দেয়ালে ছ্যাৎলা পড়ে রঙ ধরেছে যেন পরীদের নাচের সভা বসেছে। রান্নাঘরের উনুনের আগুনে কতই না যুদ্ধবিগ্রহ্। 'খাতাঞ্চির খাতায়' অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুস্কিল হবে, তাই এই

লুকোনো দেরাজে চাবি নেই; একটা করে খিল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমন কি রাতের স্বপ্নের ছবিও এই ছোট্ট খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে।... অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজ খাতা, লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেল না; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ঐ খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে একদিন আমার সবুজ খাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি সে খাতার গুণ— আরেকটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদলি করে ছিলুম আর কি! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কি রঙ দিয়েই সেসব ছবি লেখা! বাজারে সে রঙ পাবার জো নেই।"

এ কিন্তু শুধু খেয়ালের কথা নয়। গোড়ার কথাটি অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও নয়, যে ইংরেজি 'পিটার প্যানের' গল্প অবলম্বন করে 'খাতাঞ্চির খাতা' লেখা হয়েছিল, তাতেও ছোটছেলেদের মনের দেরাজের সবুজ বইয়ের কথা আছে। কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টিকারের সৃষ্টির রহস্যের এমন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় না। ছোটদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির কথায় অবনীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—"ছেলেভুলোনো ছড়া একেবারেই ছেলেমানষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখাশোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি"— এও সেই একই কথা।

ছোটদের চিন্তাজগতের মানুষ-জন্তুরা নিতান্তই মনগড়া নয়; বাস্তবজগতের ছায়াগুলি যেমন যেমন চেহারা নিয়েছে তাদের মনের আয়নায়, তাই দিয়েই ভরে উঠেছে ওদের জগৎটি। এ সবই ওদের "দেখাশোনার ছবি ও ছাপ", তবে একেবারে ক্যামেরায় তোলা ফোটোগ্রাফের মতো হুবহু নকল নয়, কচি মনের রঙ ধরা বড় জীবন্ত এসব ছবি ও ছাপ। মনের আয়নায় পড়ে একটু অদলবদল করা।

এরই কথা শিল্পী আরো বলেছেন, "বিশ্বজগৎ একটি নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে লেখার ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে, কাজেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমাখানি।"

প্রতিদিনকার কাজের জগতে যা ঘটে, তার বাইরে গেলেই লোকে কানে হাত দিয়ে বলে, "থামো, বড় বেশি খেয়ালি লেখা হচ্ছে, ওর মানে বোঝা যাচ্ছে না।" বিলিতী ছবি আর আমাদের দেশের ছবির মধ্যেও এই তফাত দেখা যেত সেকালে। ওঁরা আঁকতেন প্রকৃতির জগতে যেখানে যেমনটি হয়; শুধু কুরূপকে করে দিতেন সুরূপ, নয়তো কুরূপের মধ্যে থেকে সুরূপকে জাদুবলে বের করে আনতেন। আর ভারতের শিল্পীরা বিশ্বপ্রকৃতির বাস্তব ইঙ্গিতটি ধরে নিয়ে নিজেদের মনের ভাবের ছবি আঁকতেন। আজকাল অবিশ্যি আর এ তফাত বড় দেখা যায় না। পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক ছবিই ভাবের ছবি।

তাই যদি হয়, সাহিত্যের বেলাতে অন্য নিয়ম হবে কেন? স্রষ্টা তো নন ফোটোগ্রাফার। সাহিত্যের কেমন একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে মানুষের স্থূল জীবনযাত্রার ছবি যে যত তীব্র করে তুলে ধরবে, সেই হবে তত বড় লেখক। মোটামোটা সাত শো পাতার বই লেখা হয়, কিন্তু তাতে হাসির খোরাক

থাকে এক মুঠিও না। এই কি তবে জীবনের প্রকৃত চিত্র? একেই সাহিত্যের আদর্শ বলে মানতে হবে? রামায়ণ মহাভারতের কথা ধরা যাক, কি নিদারুণ শোকের গল্প, কি ব্যর্থতা, কি হাহাকার, ভালোবাসার কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি লজ্জা, অপমান, বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার কাহিনী, কিন্তু কি মধুর রসে ভরপুর। দুজনার তলায় তলায় কি সরসতার আহ্বান। মনে হয়, এ জীবন অনন্তকালের পটে একটি কালো বিন্দু বৈ তো নয়। সংসারের লীলাখেলা যায় ফুরিয়ে; মনে সন্দেহ জাগে, একি তবে সত্যি নয়, রঙবেরঙ চন্দ্রাতপের নীচে মঞ্চে সাজানো যাত্রাভিনয় শুধু, অধিকারী কি তবে অন্তরালে দাঁড়িয়ে কলকাঠি ঘোরাচ্ছেন?

সে যাই হোক, পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী যখন মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন, দেখেন সঙ্গে চলেছে একটি কুকুর। তাড়ালেও ফেরে না। একে একে পথে যেতে পড়তে লাগলেন তাঁরা, কুকুর কিন্তু পড়ল না। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে চলল স্বর্গদ্বার অবধি। সেই ধর্মরাজ।—এ ছবি যিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন রসের স্বর্গের কোনো রহস্যই তাঁর জানতে বাকি ছিল না। এই হল ভারতীয় সৃজনশিল্পের মূল ও কুসুম। স্থূল ছবিটি তোলে ফোটোগ্রাফার, শিল্পী দেন তৃতীয় নেত্র ফুটিয়ে, সে হল ভাবের চোখ, রসের চোখ।

এই ভাবের চোখ দিয়েই অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছিলেন। কোনোটি সাদা চোখে দেখেছেন, কোনোটি বা ভাবের চোখে ধরা দিয়েছে, কোনোটি শুধু মনে ভেবেছেন, কোনোটি স্বপ্নে দেখেছেন আর কোনোটিকে চেয়ে চেয়ে খুঁজে পান নি,—সৃষ্টিকারের মনে সব একাকার হয়ে যায়; এমনি করে খেয়ালের রাজ্যের সৃষ্টি হয়। সে রাজ্যে যুক্তি সব সময় টিকতে পারে না, তাই বলে তাকে একেবারে মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজহাঁস সাঁতরে চলে নদীর জলের উপরে, সেই জলের উপরেই ঢেউএর সঙ্গে রাজহাঁসের ছায়া ঢেউএর সঙ্গে কত না রসিকতা করে, রাজহাঁসের চেয়ে কি সে কম সত্যি?

ছোটবেলা থেকে রামায়ণের গল্প শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ শুরু করছেন 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'—

"আষাঢ়ান্ত বেলায়, শাস্ত্রমত তেল কালি আর লঙ্কার ধুমো দিয়ে শ্লেষ্মা শোধন করে, তবে চাঁইবুড়ো 'পোড়া লঙ্কার পুঁথি' পাঠ শুরু করলেন, হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে।"

তা, হনুমন্তের মন্তব্যটি তবে কি? না,

"মানবের মান গুম্ফে আর কর্ণমূলে,
বানরের মান লম্ফে আর লাঙ্গুলে।"

এইবার পোড়া লঙ্কার গল্প শুরু হল। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট— সবাই লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করলেন হেঁট, তখন একমাত্র বীর হনুমান 'জয়রাম লঙ্কাধাম' বলে লাফ দিলেন। চল্লিশ যোজন তনু হনুমান চলেছেন, সকালের রাঙ্গা মেঘখানার মতো সমুদ্রের উত্তর পার থেকে দক্ষিণ পারে উড়ে। তিন ভাগ পেরিয়েছেন সমুদ্র আর এক ভাগ গেলেই লঙ্কা।...লঙ্কার বন্দরে ডম্ ডম্ ডঙ্কা বাজছে, রাক্ষস-রাক্ষসীরা কোমর ধরাধরি করে নাচ করছে, তা দেখা যাচ্ছে; গান করছে, তা পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।" এই রাক্ষস-রাক্ষসীরাই চাঁইবুড়োর পুঁথির নায়ক-নায়িকা, শ্রীরামচন্দ্র এর মধ্যে খুব বেশি মাথা গলান না, বরং পারলে একটা প্রবাদ হয়েই যেন থাকতে চান, পারেন না অবিশ্যি সব সময়ে। এদিকে হনুমান হয়ে যান শেষ অবধি একটি উৎপাত বিশেষ।

হনুমান লঙ্কায় পৌঁছব-পৌঁছব করছেন, সমুদ্রের জলে তাঁর চল্লিশ যোজন কলেবরের সাড়ে তেতাল্লিশ গুণ ছায়া পড়েছে, এমন সময় বন্দররক্ষিণী রাবণের পেয়ারের গো-সাপিনী সুরসা সাপিনী সেই ছায়া গিলতে শুরু করেছে! ব্যাপার দেখে ওপারে দাঁড়িয়ে রাম লক্ষণ অঙ্গদ জাম্বুবান ইত্যাদি স্তম্ভিত! রাম বাণ মারতে যাবেন, এমন সময় পবনদেব ছুটে এসে তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। রাম অমনি হাত গুটিয়ে বসলেন। বানররা তো অবাক। জাম্বুবান বুঝিয়ে বললেন, বাণ মারবেন কি করে, বাণ মারলে যে সুরসার পেটে হনুমান সুদ্ধু শিকে পোড়া হয়ে যাবেন! ভাগ্যিস রামের মনে পড়ল, নইলে কি একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হত!

অঙ্গদ বললেন, "কাণ্ড আর কি এমন হত?" জাম্বুবান বললেন, "আহা, হনুমান মলে, হয় তোমাকে নয় আমাকে জবরদস্তি লাফ দিতে হত শত যোজন সিন্ধুপার— সুগ্রীব ছাড়ত না!"

তাই শুনে অঙ্গদ বললেন, "চেপে যাও, কথাটা চেপে যাও।"

এই রস অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কজনাই বা দিতে পারত?

'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, রোজ ভোরবেলা বাপের কাছে গিয়ে মহাভারতপাঠ শুনতে হত। মাঝে মাঝে বড় ভাইরা রামায়ণও পড়তেন। অবনীন্দ্রনাথ তখনো টানা পড়তে পারেন না, ভয়েই মরেন, এই বুঝি পড়বার হুকুম আসে! যাক, সে বিপদে আর কখনো পড়তে হয় নি, শুধু শ্রোতার আসনই নিতে হয়েছিল। তবে মনের তো আর লাগাম নেই, শুনতে-শুনতে সে মন কোথায় চলে যেত কেই বা জানে।

বুড়ো বয়সে শিল্পী লিখেছেন—

"বাল্যে পুতুলখেলার বয়সের সঞ্চয় এই শেষ বয়সের যাত্রাগানে, লেখায়, টুকিটাকি ইঁটকাঠ কুড়িয়ে পুতুলগড়ায় যে ধরে যাচ্ছিনে তা ভেবো না। সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনি যে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলেম, তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আমার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কি কাজে তার ঠিক নেই।"

তার পরে হয়তো অনেক দিন বাদে মনের এলোমেলো সংগ্রহে কখন টান পড়ে, যা ছিল বাজে জিনিস সেই হয়ে ওঠে বড় সুন্দর। শেষবয়সে যেমন অবনীন্দ্রনাথ মাঠেঘাটে বাগানের কোণে অযত্নে পড়ে থাকা কাঠকুটো, বাঁশের গিঁট, শেকড় বাকল যত্ন করে তুলে এনে, একটুখানি ছেঁটেছুটে তাই দিয়ে বানিয়ে ফেলতেন আশ্চর্য সব মানুষ জানোয়ার পাখি।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের ছোটবেলাটি নিরেট সোনার মতো গালিয়ে ফেলে তাই দিয়ে গল্প তৈরি করেছেন, তাই পড়লে মন করে উড়ু উড়ু। রাক্ষস খোক্কসের গল্প বলত চাকর দাসীরা; ভয় দেখিয়ে বলত, খবরদার গেটের বাইরে যাবিনে, বাদাম গাছে বেহ্মদত্তি আছে! আরেকবার বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল একজন রাক্ষস এসে, অবনীন্দ্রনাথের বাবামশাইএর সামনে বসে নাকি কাঁচা মাংস খাবে। এমন দৃশ্য না দেখেও থাকা যায় না, গেলেন ছুটে দক্ষিণের বারান্দায় বাড়ির অন্যান্য ছোটছেলের সঙ্গে। সত্যি সত্যি এক থালা নুন-মাখা কাঁচা মাংস এল আর একটা অতি সাধারণ চেহারার রাক্ষস গপাগপ্ সেগুলো খেয়ে, বখসিস নিয়ে চলে গেল!

রাক্ষসের গল্প এ ছেলে লিখবে না তো কে লিখবে। চাঁইবুড়োর পুঁথিতে বর্ণিত রাক্ষসরাও এই ধরণের রাক্ষস, সদাই করে খাই-খাই। একটা ঘটনা বলি।

সূর্পণখা গেছে রাবণের সঙ্গে পাতালে বলিরাজার বাড়িতে। সেখানে নিপাতক দৈত্যকে বধ করে বলি রাজাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করে "সূর্পণখা ঢুকেছে গিয়ে বলিরাজার অন্দরে। সেখানে দেখে সব ভোঁ ভোঁ। —বলিরাজার অন্দর বাড়ি, রন্ধনশালায় চড়েনি হাঁড়ি, তরি-তরকারির গন্ধমাত্র নাই! ...খিড়কি ঘাটে গিয়ে সূর্পণখা দেখে দাসীরা কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজতে বসেছে। বললে তাদের দুটো খেতে দাও মাসি...সব দাসীর প্রধানা কুব্জা—কংস দাসী সে সোনার থাল থেকে নিজের উচ্ছিষ্ট যেমন সূর্পণখার মুখে দেওয়া, সূর্পণখা তাকে সুদ্ধ গপ্ করে গিলে ফেলা! তার পর বাকিদের ফলার করে যেই গিয়ে রাবণের কাছে দাঁড়িয়েছে, তিনি বললেন, "কি খেয়ে এলি ভগ্নী?"

সূর্পণখা বললে, "উচ্ছিষ্টভোগ। বোষ্টমবাড়ি কি না, তাই আজ হাঁড়ি চড়েনি।"

ছোটবেলায় শোনা যত রাক্ষসের গল্পের একটি বড়ি বানিয়ে দিলেন শিল্পী ঠুসে চাঁইবুড়োর পুঁথিতে। তবে ছোটবেলা তো আর শুধু রাক্ষসের গল্প দিয়ে তৈরি নয়, তার আর-একটা দিক দুঃখ দিয়ে ঠাসা, আর ছোটবেলার দুঃখগুলো যে কি তীব্র কি দুরপনেয় সে কথা যে-ই এককালে ছোট ছিল, সে-ই জানে; দুঃখের কাহিনী শুনলে ছোটছেলের মন যেরকম ব্যথায় ভারি হয়ে ওঠে, তার তুলনা নেই। শিল্পীর মনেও নব-রসের হাট, যেমনি খিলখিল হাসির খোরাক, তেমনি বুক-ভরা কান্নার সঞ্চয়। যেমন এই পৃথিবীর জীবনযাত্রাতেও।

'রাজ কাহিনী'র মতো আর-একটি বই নেই বাংলা ভাষায়, রাজস্থানী ইতিহাসের গল্প, কাহিনীগুলি নিতান্ত মনগড়া নয়, বাস্তব ঘটনা অবলম্বন করে লেখা, কিন্তু শিল্পীর হাতে পড়ে শুকনো ইতিহাস হয়ে উঠেছে জীবনকাব্য। সেসব কাহিনীর কথা যে-সে ভাবতে পারে না, কারণ শুধু তথ্য-গত কথা দিয়ে তারা তৈরি হয় নি, জীবনের চিরন্তন সত্যগুলি, মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি তাদের মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে। পার্থিব সুখের খোঁজে ছুটে বেড়ানো যে কত বড় ব্যর্থতা, জীবনে যারা ধন্য হয় তারা যে নিজের মনের মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পায়, নিজের বাইরে যে অপূর্ব সুন্দর পৃথিবী তার রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে, বিধাতা কত দয়া করে তাকে মানুষের জীবনকে মধুময় করবার জন্যে পেতে রেখেছেন, লোভ করে গ্রাস করবার জন্যে নয়; প্রতি গল্পের ছত্রে ছত্রে এই পুরোনো সত্য কথাটি নব নব রূপ ধরে মনকে মুগ্ধ করে, ভাবের আবেগে আকণ্ঠ ভরে দেয়।

প্রত্যেকটি গল্প একটি শিল্প-সৃষ্টি। শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রানাকুম্ভ, সংগ্রামসিংহ, সহজ সরল ভাষায় লেখা নয়টি গল্প নব রসের আধার। স্নেহ প্রেম দয়া ক্ষমা হিংসা লোভ নিষ্ঠুরতা বিশ্বাসঘাতকতা সবাই ইতিহাসের কাঠামো চড়ে কি যে অপূর্ব অদ্ভুত রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে বইখানি না পড়লে কল্পনা করা যায় না।

রস বলতে শুধু হাসির কথা না বোঝালেও, রসিকজনের মন থেকে হাসি কখনো দূরে থাকে না। সেইজন্য শোক দুঃখ দৈন্য হতাশা কেউই শিল্পীকে রেহাই দিল না, তবু শিল্পী অদম্য উৎসাহ নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে লেগে রইলেন। নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "কত সুখদুঃখের মান-অপমানের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আর্টিস্টের মন তৈরি হয়। আমরা সব সৃষ্টিছাড়া, প্রকৃতি-মায়ের

আদুরে, কোলের কাছাকাছি ছেলে, একটা বুনো ভাব আছে। সবার সঙ্গে মেলেনা…। সুখদুঃখ আমাদের বেশি করে বাজে, জীবন উপভোগ করবার ক্ষমতাও আমাদের বেশি। প্রকৃতি আমাদের বেশি করে দিয়েছে সবই। একটু আলো দেখি, ছুটে বেরিয়ে পড়ি।"

একেই বলে স্বষ্টিকারের সন্ধানী দৃষ্টি, এ নাইলে, কোনো স্বষ্টির কাজই হয় না ; না আঁকা, না লেখা, না সুরসাধনা। কি খোঁজে স্বষ্টিকার? খোঁজে সত্যের একটু খুঁটি, সেই খুঁটিটুকু ধরে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়া যায়। একটি রূপের রেখা, এক পোঁচ রঙ, একটি পাখির সুর, একটি পুরোনো স্মৃতি।

এক জায়গায় বলছেন শিল্পী শিল্পরচনার কথায়, কৃত্রিমতার স্থান নেই এখানে—"মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটল, এর বেশিও তো শিল্পীর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।" আরো বলছেন, "শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ…রসবোধই নেই রস-শাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়"—এ ক্ষেত্রে 'ততটা' অর্থে 'কিচ্ছু না'। তারপরে শিল্পী বলছেন, "এই যে আলোমাখা রামধনুকের রঙ্গে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের অফুরন্ত রস, এ তো মাটি থেকে প্রস্তুত রঙের বাক্সে ধরা পড়ে না, কালির দোয়াতেও নয়, বীণার খোলটার মধ্যেও নয়। এ বাঁধা পড়ে মনে। এই হল সমস্ত রস-শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ পাঠ।"

যার মনে সে রস বাঁধা পড়ল না, তার চোখও ফুটল না ; চিরকাল সে রইল রূপরসের জগতের মাঝখানে অন্ধ হয়ে, কালা হয়ে। বটগাছতলায় মা-ষষ্ঠীর যেটের বাছাদের দেখতে পাওয়া তার কর্ম নয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পস্বষ্টি সম্যক্ বুঝতে হলে— কি চিত্রে, কি সাহিত্যে—এই কটি কথা তা হলে মনের পটভূমিকায় এঁকে রাখতে হয়। গোড়ায় আসা চাই চোখফোটার পালা ; চোখফোটা মানেই দেখতে জানা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল সম্পত্তির কোন্‌টি নিতে হয় আর কোন্‌টি ফেলতে হয় বুঝতে পারা।

তারপরে আসে যথার্থ যে শিল্পী তার স্বকীয়তার কথা। স্বষ্টির মধ্যে নিজের অন্তরের খানিকটা দিতে না পারলে সার্থক স্বষ্টি হয় না। অবনীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন একটা অন্তরঙ্গতার, মানবতার গুণ, যা একান্ত তাঁর নিজস্ব, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও কোনো প্রভাব নেই।

তৃতীয় কথা হল খেয়াল রাজ্যের কথা, রূপকথার জন্মরহস্য মানুষের যে শিশুকালে তার কথা। এই হল বুড়োদের শিশুকাল চেনাবার পাঠ, এই হল বিশ্বসত্তার নিগূঢ়তম রহস্য, মনের মধ্যে জমা করা ছোটবেলার ছবি ও ছাপ, যার মধ্যে শিল্প ও গল্প দানা বাঁধে।

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরসিকের সঙ্গে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার সম্পর্ক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন কোনো বিস্তৃত প্রমাণপঞ্জী নেই যাতে প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা থেকে রবীন্দ্ররচনাকে আলোকিত করা যেতে পারে। যা আছে তা সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার থেকে একেবারে পাথুরে প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না, কিছু অনুমান করা যেতে পারে যা নিতান্ত অমূলক নয়। 'জীবনস্মৃতি' থেকে আমরা জানতে পারি যে 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হবার পর প্রিয়নাথ সেনের অনুকূল সমালোচনায় উভয়ের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। কিন্তু এই প্রিয়নাথই 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে ইতিপূর্বে কবির সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হবার সময়ে বা তার আগে প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বা তারও আগে। কাজেই বলতে পারি, আঠারো-উনিশ বছর বয়স থেকেই প্রিয়নাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ।

'জীবনস্মৃতি'তে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া ফরাসি জার্মান ও আমেরিকান সাহিত্য প্রিয়নাথ সেনের খুব ভালো পড়া ছিল। ইংরেজি সাহিত্য তো শিক্ষিত লোকে সকলেই সেকালে পড়তেন। কিন্তু ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যের চর্চা (অবশ্যই অন্যান্য ভাষার মাধ্যমে) খুব বেশি লোক তখন করতেন না। সেকালের মুষ্টিমেয় কয়েকজন linguistএর মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রিয়নাথ সেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়নাথ সম্পর্কে লিখছেন: 'সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শী, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল।'[১] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন: 'When I first saw him Preonath could read French and Italian in the original, and subsequently learned other European languages. Persian he learned last and I borrowed from him a splendid edition of Hafiz's poem with an English translation.'[২]

ফরাসি সাহিত্যের ভিক্টর হুগো, গোতিয়ে, মপাসাঁ ও বালজাক প্রিয়নাথের প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হুগোর খুবই ভক্ত ছিলেন তিনি এবং রবীন্দ্রনাথের মনেও এই ভক্তি কিছু তিনি সঞ্চার করে থাকবেন। কারণ 'ভারতী'তে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথকে হুগোর অনুবাদ করতে দেখি। 'প্রভাতসংগীতে'র মধ্যে হুগোর অনুবাদ স্থান পেয়েছিল। পরে অবশ্য প্রভাতসংগীত থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। 'মানসী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ হুগোর 'Les Contemplations' কাব্যের তুলনা করেছিলেন। জানি না এই বইএর প্রতি প্রিয়নাথই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কি না। তা করা অস্বাভাবিক নয়,

---

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি: পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

২ Some Celebraties, Modern Review, May, 1927 পরে 'Reflection and Reminisiences' নামক বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

কারণ এই সময়ে প্রিয়নাথ তাঁর আলোচনার সঙ্গী, তাঁর সঙ্গে বই আদান-প্রদান করছিলেন। গোতিয়েরের প্রতি প্রিয়নাথের ভক্তি এই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মনে গোতিয়ের লেখা *Mademoiselle De Maupin* বিশেষ ছায়াপাত করেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুজোর পর রবীন্দ্রনাথ যখন দার্জিলিঙ থেকে ফিরে আসেন তখন সার্কুলার রোডের বাড়িতে সাহিত্যচর্চার জন্য 'সমালোচনীসভা' স্থাপিত হয়েছে।[৩] বিহারীলাল, প্রিয়নাথ প্রভৃতি সকলেই সেখানে আসছেন। এই সময়েই প্রিয়নাথ সেন গোতিয়ের *Mademoiselle De Maupin* বইখানি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। তার পর প্রিয়নাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'এবার ভারতীতে যে কবিতাটি যাবে সেইটে সঙ্গে আনবেন। মেজদাদার *Medemoiselle De Maupin* খুবই ভালো লাগচে —কাল এসে সমস্ত শুনবেন।'[৪] এই বই পড়েই আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর আদর্শে রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হন। তার পরেই 'কড়ি ও কোমলের' যুগ। সৌন্দর্যকে সে সময়ে চারুকলারূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে নারীদেহের জয়গান এই আর্ট-সর্বস্ব মতবাদের ঝোঁকে রচিত হয়েছিল। অবশ্য পরে এই আর্ট-সর্বস্বতাকে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি, তার চেয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থীয় আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত সৌন্দর্যবোধের মধ্যে অনেক বেশি বিস্তৃতি দেখতে পেয়েছিলেন। লোকেন পালিতকে একটি চিঠিতে সে কথার উল্লেখ করেছেন। তবে সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীন আনন্দসৃষ্টির কথা তিনি যে মেনে নিয়েছিলেন তাতে আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর প্রভাব বিশেষভাবে রয়ে গেছে। এ ছাড়া মপাসাঁ ও বালজাকভক্ত প্রিয়নাথ নিশ্চয় বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[৫] রবীন্দ্রনাথের উপর বদলেয়ারের প্রভাব নিয়ে শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে নিছক অনুমাননির্ভর জল্পনা চলেছিল তার কিছুটা সত্যভিত্তি পাওয়া যাবে প্রিয়নাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুত্বের মধ্যে। প্রিয়নাথ সেন বদলেয়ার্ ভক্ত ছিলেন। কাব্যের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য ছাড়া কিছু নয় তার সমর্থন করতে গিয়ে 'কাব্যকথা' প্রবন্ধে[৬] প্রিয়নাথ বলছেন: 'কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা— ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্ম্য— heresy— অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ফরাসি কবি এবং সমালোচনা Baudelaire (বদলেয়ার) যাহাকে heresie de l'ensignment বলিয়াছেন।' অন্যত্র 'মানসী' কাব্যের সমালোচনায়[৭] 'বর্ষার দিনে' কবিতাটির প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন, 'যে সকল কবি বা কল্পনাব্যবসায়ী মানবজীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভাবর্ণনে পটু— Poe, Baudelaire বা Hawthorne— তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই।' এ ছাড়া ফরাসি কবিদের মধ্যে ভেরলেন এবং লে-কৎ-দে-লিল-এরও ভক্ত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এইসমস্ত কবির সঙ্গে নিশ্চয়

৩ রবীন্দ্রজীবনী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড, পৃ ১৫৫। সংশোধিত সংস্করণ, ১৩১৭ পৌষ।

৪ 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' বইটির পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পত্র ৮।

৫ এ বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলেন:

'রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙালা ছোট গল্পের আদর্শ কি হবে তা নিয়ে যে বিচার বিবেচনা চলেছিল, তিনি তাতে যোগ দেন নি, তবে সে বিচার বিতর্কের কথা যে তিনি শুনেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।…এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ছোট গল্পের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইংরেজি, ফরাসি ও রুশ গল্পের আদর্শ দেখেছিলেন।' ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ। বেতারজগৎ। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা।

৬ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পত্র ১০২।

বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে প্রিয়নাথ কোন্ কবি সম্পর্কে কতখানি তাঁকে সচেতন করে দিয়েছিলেন তা আরও প্রমাণ পেলে বলা যাবে। রাস্কিনের আলোচনায় প্রিয়নাথ তাঁর আদর্শের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও ফরাসি কলাকৈবল্যবাদের প্রেরণায় তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ -ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও যে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাওয়া যায়: 'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য ও নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং আচরণের সৌন্দর্য সবই ললিতকলা-বিধির অধিকারভুক্ত কিন্তু সৌন্দর্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। কিন্তু ধর্মনীতির সৌন্দর্য যে সৌন্দর্য নয় এ কথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য তেমনি সুন্দর— কেবল তা অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ। গান বর্ণগোচর সুন্দর, রূপ চক্ষুগোচর সুন্দর, সাধুহৃদয় মনোগোচর সুন্দর। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের জন্য উৎসুক আছি।'[৭]

আমেরিকান কবিদের মধ্যে পো, হুইটম্যান এবং হথর্ন প্রিয়নাথের বিশেষ প্রিয় লেখক ছিলেন। 'মানসী' আলেচনা-প্রসঙ্গে 'অহল্যা' কবিতাটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ইহার ভিতর জড়জগতের সহিত এমন-একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধহয় যেন, Walt Whitmanএর সৃষ্ট বিশাল প্রাণ Shelley-র অমরবীণা লইয়া ঝঙ্কার করিতেছে।' 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটি আলোচনা করতে গিয়েও হুইটম্যানের কথা তাঁর মনে হয়েছে। পো তাঁকে অদৃষ্টপূর্ব রহস্যময় জগতের সন্ধান দিয়েছে। হথর্নের বিশিষ্টতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এইসমস্ত কবির বারবার উল্লেখ দেখে মনে হয়, আলোচনার সময়েও নিশ্চয় তিনি এঁদের সম্পর্কে অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনাতেও যে এঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হোত তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ করবার বিষয়, পো কিংবা হুইটম্যান পড়বার প্রমাণ প্রিয়নাথ সেনের আগে বা সমসাময়িক যুগে বিশেষ পাই না। এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় প্রিয়নাথ যে রবীন্দ্রনাকেও উৎসাহিত করেছিলেন তাতে সন্দেহ কি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছে Mark Twainএর সংগ্রহ চেয়ে পাঠিয়েছেন: 'Mark Twainএর Selection যদি তোমার কাছে থাকে এখানে আগমনকালে সঙ্গে এনো— পরিজনবর্গকে সায়াহ্নে আমি পড়ে শোনাই।'[৮]

জার্মান কবিদের মধ্যে গ্যেটের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন প্রিয়নাথ। এবং যে যুগে প্রিয়নাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত বৈঠক বসছে সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে পড়তে আরম্ভ করেন। এ ছাড়াও সাধারণভাবে জার্মানসাহিত্যের আদান-প্রদান তাঁদের মধ্যে চলত: 'আপনার German Popular Stories আজ পাঠাচ্ছি।'[৯] লিখছেন প্রিয়নাথকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে।

ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন প্রিয়নাথ। শেক্স্পিয়র মিল্টনের কথা ছেড়ে দিলে রোমান্টিক কবিরাই তাঁর মনের রসপিপাসা মিটিয়েছিল। এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কাব্যের কলাশাস্ত্রে রোমান্টিকদের যে বিশেষ দান আছে তা স্বীকার

---

৭ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি বইটির পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পত্র ২৪।

৮ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পত্র ১২০।

৯ 'কাব্যকথা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি।

করে নিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মিশিয়েছিলেন কলাকৈবল্যবাদের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় কম-বেশি এই দুটি আদর্শই কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রিয়নাথ খুঁজে পেয়েছিলেন শেলি হুগো হুইটম্যান এবং ব্রাউনিঙকে। মাঝে মাঝে টেনিসন ও সুইনবার্নকেও খুঁজে পেয়েছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। 'মানসী'র আলোচনায় তার প্রমাণ আছে। আর এই জন্যই অন্তত দুবার রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে তাঁকে কলম ধরতে দেখা যায়। একবার দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণের বিরুদ্ধে, অন্য বার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে।[১০]

এখন উভয়ের মতৈক্যের কথায় আসা যাক। প্রিয়নাথ সেন 'কাব্যকথা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টি সম্পর্কে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে আপত্তি তুলেছিলেন তারই বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। কাব্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি যে প্রতিদিনের ব্যবহারিক কাজে লাগে না এবং না লাগাতেই তার সার্থকতা এ কথা মিল্, গোতিয়ে এবং কোলরিজের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি। প্রিয়নাথ যে রোমান্টিক কবিদের ভক্ত সেই রোমান্টিক কবিদের আদর্শকেই বাংলা কাব্যে রূপ দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কয়েকজন রোমান্টিক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া উভয়েরই একরকম ছিল। বায়রনের যে স্বভাব প্রিয়নাথের চোখে খারাপ ঠেকেছে, রবীন্দ্রনাথের রুচিতেও তা ভালো লাগে নি এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থকে যে গুণে প্রিয়নাথ উঁচু আসন দিয়েছেন, সেই গুণেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছেন।

মানসীর 'বিরহানন্দ' 'ক্ষণিক মিলন' ইত্যাদি কবিতার প্রসঙ্গে বায়রনীয় উন্মাদনা সম্পর্কে প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছেন: 'কিন্তু এসকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্‌লেমি বা ন্যাকামি নাই— প্রেমহীন বিরহের হাহুতাশ নাই, 'আন্ ছুরি' 'খাই বিষ' নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দবিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকাশক্তি অর্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চিরসুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byronদিগের বোধহয় ইহা ভালো লাগিবে না।'

ভারতীতে প্রকাশিত (১২৯৩ চৈত্র) 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: 'এমনকি অনেকে নাই যাঁহারা বলিবেন, 'আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কী?' ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়তো অনেক সমালোচকের 'কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব' করিবে এবং শিরায় শিরায় 'রীণ্ রীণ্' করিতে থাকিবে! ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়্ফড়্ ছট্‌ফট্ বিষছুরি এবং দড়ি-কলসী না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়তো ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া কাব্যি বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালীর ব্যবস্থা: যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও

১০ বিচিত্রপ্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জ্বলন্ত' চুল্লিতে হাঁকডাক ঝালমসলা ও খরতর ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।'

বায়রন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই রকম মনোভাবের পূর্বাভাস এর আগেও ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে পেয়েছি (১২৮৭ আষাঢ়, 'বাঙালী কবি নয় কেন' প্রবন্ধে): 'জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতিসূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাঙলা কবিতার মধ্যে তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাবে আমরা ভালো করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালোই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডারচর্ম মন অতি মৃদুস্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা বাইরনের ভক্ত।'

অন্যত্র 'চিত্রাঙ্গদা'র আলোচনায় প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করছেন: 'সাহিত্যসেবিমাত্রই জানেন, কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পাঠকালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব ক্রমশই মন্দীভূত হইয়া আসে। আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পরিচয়ে রসহীন বলিয়া বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য অনুভূত হইতে থাকে, এবং ক্রমশ তাহারা চিত্তের উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করে।

'Byronএর প্রথম 'চটক' ইংরাজী সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এদিকে Wordsworth-এর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহার কবিতাসমূহের গভীর এবং মর্মগত সৌন্দর্য উপলব্ধ হয়।'

লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে ('সাহিত্য'-পত্রোত্তর) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন: 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত ফরাসিস সৌন্দর্য সত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বত প্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়— তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন, তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই-যে এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।'

'রস্কিন' প্রবন্ধে কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছেন: 'এই বিশেষত্ব বলেই— এই নিজস্ব গৌরবে— মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের অনুকরণপ্লাবিত বঙ্গদেশে 'বঙ্গসুন্দরী'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী রসগ্রাহী উপযুক্ত পাঠকমাত্রেরই নিকট বিশেষ আদর ও পূজা পাইয়াছেন এবং সে আদর, সে পূজা ক্রমশই বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।' দেখা যাচ্ছে বিহারীলালের বিশিষ্ট প্রতিভা কেবল রবীন্দ্রনাথেরই প্রশস্তি পায় নি প্রিয়নাথেরও প্রশংসাধন্য হয়েছিল। কিন্তু তিনি লিখতেন কম বলে তাঁর মত সাহিত্যজগতে ততটা সুপরিচিত নয়।

উনিশ শতকে ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের যখন নবজীবনের সূচনা হল, তখন অনেকেই খাঁটি বাঙালিত্ব গেল বলে হাহুতাশ করেছিলেন। কিন্তু সে আঘাত যে নতুন প্রাণশক্তিরই

সূচক এই ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'সোনার কাঠি' প্রবন্ধে[১১]। তিনি বলেছিলেন: 'য়ুরোপের··· প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করে পাই।' 'রস্কিন' প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ এই সোনার কাঠির স্পর্শকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন: 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এই ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সাহিত্যচর্চারই ফল। সেইজন্য এই নবজাত সাহিত্যে একটু ইংরেজীগন্ধ থাকিতে পারে, এবং বিদ্বেষীরা এই সাহিত্য সম্বন্ধে যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন, এই বিলাতি গন্ধই সর্বপ্রধান। কিন্তু এ দোষ অনিবার্য।··যে কারণে শিশু লাটিন সাহিত্যে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব— যে কারণে শিশু ইংরেজি সাহিত্যে গ্রীক, লাটিন এমনকি প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যেরও প্রভাব— এবং বহুদিনের কথা নয়, এ দেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্বে আমাদের তদানীন্তন বাঙ্গালা রচনার ভিতর যে কারণে পারসীক সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেই সকল অমোঘ-কারণ-সঙ্ঘাতে আমাদের আজিকার সাহিত্যেও এই বিলাতি গন্ধটুকু দেখিতে পাই।··বাগ্‌দেবীর এই বিচিত্র বসন বিলাতি তাঁতে প্রস্তুত হইলেও এবং বিবিধ বিলাতি কারুকার্যে খচিত হইলেও ইহা আমাদের দেশীয় ভাব সৌষ্ঠবের কোন হানি না করিয়া বরং তাহার গৌরব এবং সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে।'

'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি'র স্বল্পায়তন ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোরবয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি।··সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে··।' সেই বিকাশস্মৃতি ও বৈদগ্ধ্যের আদর্শ হুগো, গোতিয়ে, মপাসাঁ, বালজাক, হুইটম্যান, পো, বদলেয়ার ইত্যাদি পাঠের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নাথ ছিলেন একজন সত্যিকারের বিবলিওফিল। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'তিনি যে একজন বড় লেখক হন নি— তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক।' দুর্লভ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রথমশ্রেণীর পাঠক প্রিয়নাথ সৃষ্টির পিপাসা মিটিয়েছিলেন আর সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক প্রিয়নাথ যে হীরামুক্তামাণিক্যের ঐশ্বর্য দেখিয়েছিলেন তা-ই রবীন্দ্রনাথের মনে 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা' রচনার প্রেরণা বহন করে এনেছিল।[১২]

---

১১ উভয়ের সৌহার্দ্যের প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্যের উল্লেখ করতে পারি। ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রে প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রিয়নাথের কবিতাটির নাম 'বসন্ত অন্তে', রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির নাম 'প্রত্যুপহার'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রিয়নাথের কবিতাটির উত্তরেই লেখা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড: প্রিয়নাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি (পত্র সংখ্যা ১০০) এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রিয়নাথের চিঠি (পত্র সংখ্যা ৮ ও ৯) দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতন

ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন

যাঁরা বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যবহারিক দিকটি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চান এই বিষয়গুলি তাঁদের আগ্রহের সঞ্চার করবে।

আশ্রমে এখন ১৫০ জন ছাত্র আছে। তাদের অনেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে, তবে অধিকাংশই বাংলাদেশের। অধ্যাপকের সংখ্যা ২০ জনের মতো। তাঁদের অনেকে সপরিবারেই বিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করেন। ছেলেদের বয়স ছয় থেকে সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে। একেবারে-শিশুদের ভার কোনো অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত আছে। তারা অনেক সময় কোনো বিবাহিত অধ্যাপকের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করে। অধ্যাপকের স্ত্রী হয়তো এক সপ্তাহের জন্য দশটি শিশুর তত্ত্বাবধানের ভার নেন। সারা সপ্তাহ ধরেই তারা তাঁর কাছে খাওয়া-দাওয়া করে। পরের সপ্তাহে আবার আসে অন্য দশজন ছেলের পালা।

সব জাতের ছেলেই এখানে আছে। ভর্তির সময় এ কথা তাদের ভালো করেই বুঝিয়ে বলা হয় যে জাত মানা না-মানার বিষয়ে ছেলেরা স্বাধীন। খাবার পরিবেশনের ভার ছেলেরা পালা করে নেয়। তাতে রান্নাঘরের কর্মীদের পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হয়।

বিদ্যালয়ের বেতন সব ছেলের পক্ষেই সমান। কোনো কোনো গরিব ছেলেকে অবশ্য বিনা-বেতনে পড়তে দেওয়া হয়। লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার জন্য প্রত্যেক ছেলেকে মাসে ত্রিশ শিলিং-এর মতো দিতে হয় অর্থাৎ বছরে প্রত্যেক ছেলের জন্য পিতামাতার খরচ হয় কুড়ি পাউণ্ডেরও কম। কিন্তু এর থেকে বিদ্যালয়ের পুরো খরচের হিসেব পাওয়া যাবে না। কারণ ফি-বছরেই অনেক টাকা ঘাটতি পড়ে। সে ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব এযাবৎ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাই বহন করে এসেছেন।

বিদ্যালয়টিকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পক্ষে একটি অন্তরায় হল এই যে, ছাত্রদের অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। প্রত্যেক শ্রেণীতে অল্পসংখ্যক ছাত্র এবং প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার জন্য অবশ্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

পশ্চিম দেশবাসীর পক্ষে আশ্রমের বাইরের রূপ দারিদ্র্যসূচক বলে মনে হবে, কারণ ভারতবর্ষে যেখানেই শিক্ষাকে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে তার চিরাচরিত আদর্শ হল দারিদ্র্য। সুনিপুণ এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রতি গুরুত্ব পশ্চিমের শিক্ষায়তনগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু এ আদর্শ গৃহীত হয় নি; অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ভারতবর্ষে প্রকৃত শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকৃত।

ছাত্রদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে-সব গৃহ আছে সেগুলি বিশেষভাবে অনাড়ম্বর। ছাত্রাবাসগুলি নিছক খড়ের চালা দেওয়া ঘর, ইচ্ছে করেই এগুলিকে অনাড়ম্বর রাখা হয়েছে। কিন্তু অর্থের স্বাচ্ছল্য হওয়া মাত্রই হয়তো খড়ের বদলে সহজদাহ্য নয় এমন কোনো জিনিস ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে এক ছাত্রাবাসে আগুন লাগলে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ঘুচবে না।

হাঁসপাতালের জন্যও আমরা একটি নূতন গৃহ তৈরি করতে পারব আশা করছি।[১] এখন অসুস্থ

---

১. শান্তিনিকেতনের নূতন হাঁসপাতালটির নামকরণ পিয়রসনের নামেই হয়েছে।

ছেলেদের থাকবার পুরোপুরি ব্যবস্থা নেই ; সংক্রামক ব্যাধির জন্য পৃথক্ করে রাখবার ব্যবস্থার তো কথাই উঠে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ হাঁসপাতালটি তৈরি হলে আশেপাশের গরিব গ্রামবাসীদেরও উপকার হবে।

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত কতগুলি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ বিদ্যালয়ে উপহার হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। অর্থের সংগতি হলেই বর্তমান গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি নিদর্শ-গৃহও জুড়ে দেবার কথাও ভাবা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচী হল এই : সকালে সূর্যোদয়ের আগেই এক বৈতালিকের দল কবির রচিত একটি গান গেয়ে ছেলেদের জাগিয়ে দেয়। মাঠের নানা জায়গায় কুয়ো আছে। ঘুম থেকে উঠেই ছেলেরা সে-সব কুয়োতে প্রাতঃস্নান সেরে নেয়। স্নানের পর মৌন প্রার্থনার জন্য পনেরো মিনিট সময় রাখা আছে। ছাত্রেরা হয় বাইরে গাছের তলায়, না হয় সকালের আলোতে খোলা মাঠে গিয়ে বসে। তার পর উঠে এসে সমবেত কণ্ঠে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাচিত উপনিষদের একটি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে।

কিছু জলযোগের পর প্রায় সাতটায় ক্লাস আরম্ভ হয়। ক্লাস-ঘর নেই। তাই ক্লাসগুলো বসে হয় খোলা মাঠে, না হয় কোনো দালানের বারান্দায়।

সাড়ে এগারোটায় দুপুরের খাওয়া। তার পর যতক্ষণ দুপুরের রোদ থাকে ছেলেরা ঘরে বসেই পড়া তৈরি করে। অধ্যাপকেরা তাদের সঙ্গে থেকে প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। বিকেলের ক্লাস দুটোর সময় শুরু হয়ে চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত চলে।

বিকেলে ঠাণ্ডা পড়ে এলে ফুটবল খেলা হয়, কোনো কোনো ছাত্র বেড়াতেও চলে যায়। সূর্যাস্তের পর আবার পনেরো মিনিট মৌন হয়ে থেকে তারা সন্ধ্যা-উপাসনার মন্ত্র আবৃত্তি করে। কিছু ছাত্র একটি নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াতে যায়। এ বিদ্যালয়টি আশ্রমের ভৃত্য এবং আশেপাশের গ্রামবাসীদের জন্য খোলা হয়েছে।

রাত্রিতে খাবার আগেকার একঘণ্টা হল বিনোদনপর্ব। এই পর্বে কখনও-বা কোনো অধ্যাপক গল্প বলেন, কখনও হয় ম্যাজিকলণ্ঠন, কখনও আবার ছেলেরা নিজেরাই কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুতে যাবার ঘণ্টা পড়ে প্রায় নটায়, সাড়ে নটার মধ্যেই ছাত্রেরা সব ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে অবশ্য আদ্যবিভাগের ছেলেরা চলে যায় কোনো মাঠের গাছতলায়। সেখানে বসে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তারা গান করে।

বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক নেই। ব্যবস্থাপনার ভার আছে অধ্যাপকদের নিজেদের নির্বাচিত একটি কর্মসমিতির উপর। এই সমিতির একজন সদস্যকে একবছরের জন্য কর্মসচিব রূপে নির্বাচন করা হয়। তাঁর উপরেই কার্যত বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার থাকে। প্রত্যেক বিষয়ের একজন অধ্যাপক পাঠসমিতির পরিচালক নির্বাচিত হন। তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পাঠক্রম এবং শিক্ষণপদ্ধতি তৈরি করেন। তবে নিজের অভিপ্রায়-অনুযায়ী প্রত্যেক অধ্যাপকেরই নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বাধীনতা আছে।

কবি যদি আশ্রমে উপস্থিত থাকেন তবে কর্মসমিতির অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন ; অধ্যাপনার

কাজেও তিনি যোগ দেন। কিন্তু সন্ধেবেলার বিনোদনপর্বে ঘরোয়া পরিবেশে তিনি যখন নিজের রচনা পাঠ করেন তখনই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে অনুভূত হয়। অভিনয়ের সময় ছেলেদের তিনি যে শুধু অভিনয় করাই শেখান তাই নয়, তাঁর নিজের রচিত গান কি করে গাইতে হয়, তাও শিখিয়ে দেন।

নিজেদের সব ব্যাপারে যাতে নিজেরাই পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে সেজন্য ছাত্রদের উপর বহুলপরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন আছে; সমগ্র আশ্রমজীবনের পক্ষে অপরিহার্য কোনো প্রশ্নের সমাধানের জন্য সাধারণ ছাত্রসমিতি তো আছেই। পরীক্ষার সময় ছাত্রদের সততার উপর আস্থা রেখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। নানা অবস্থায় বসে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেখা যায়। কেউ আবার উঁচু গাছের দুটি শাখার সংযোগস্থলের মতো অগম্য স্থানও বেছে নেয়। কখনও-সখনও ছাত্রেরা এই বিশ্বাসের অপব্যবহার করে, কিন্তু দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করার জন্যই তারা বিশ্বাসের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। আর এর ফলে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই।

প্রাক্তন ছাত্রেরা নানা উপায়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রক্ষা করেন। বর্তমান আশ্রমিকেরা তাঁদের 'দাদা' বলে জানে। ডিসেম্বর মাসে যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়, তখন বহু প্রাক্তন ছাত্র কবির রচিত নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল-প্রতিযোগিতায় প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হয়। আন্তর্বিদ্যালয় খেলাধুলায় আমাদের ছাত্রদের মান দেখলেই বোঝা যাবে যে শরীরচর্চায়ও এরা পশ্চাদ্‌পদ নয়। আশ্রমের ছাত্রেরা কয়েক বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারগুলি দখল করেছে। ফুটবল খেলায় তাদের উৎকর্ষের মান নিয়েও তারা গর্ববোধ করতে পারে। ছাত্রদের শিক্ষায় যেমন মনের চর্চা আছে তেমনি শরীর-চর্চাকেও বাদ দেওয়া হয় নি।

আগেই বলেছি, খোলা জায়গায় ক্লাসগুলো হয়। তাই জটিল আসবাবপত্রের প্রয়োজনও হয় না। প্রত্যেক ছাত্র বসবার জন্য সব ক্লাসেই একটি করে ছোটো আসন নিয়ে আসে। শিক্ষক বসেন কোনো গাছের তলায় অথবা ছাত্রাবাসের বারান্দায়। মুক্ত হাওয়ায় এই ক্লাসগুলির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এতে ছাত্রদের মন সতেজ থাকে এবং তার ফলে প্রকৃতিকে সহজে উপলব্ধি করা যায়। মনে পড়ে একদিন আমার ক্লাসের মধ্যিখানে পড়া থামিয়ে একটি ছেলে মাথার উপরে একটি পাখির গানের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। পাখির গান না থামা পর্যন্ত আমরা পড়া থামিয়ে মন দিয়ে পাখিটির গান শুনলাম। তখন বসন্ত এসেছে। যে ছেলেটি পাখির গানের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সে বলল, "কেন জানি নে, কিন্তু এ পাখির গান শুনলে যে আমার কি হয় আমি বুঝিয়ে বলতে পারি নে।" আমিও তাকে এর বেশি বোঝাতে পারি নি, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে আমার পুরো ক্লাসটি ওই পাখির গানের থেকে যা শিখেছিল আমি পড়িয়ে কোনোদিন তাদের ততটা শেখাতে পারি নি। সে শিক্ষা তারা জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। আমারও যেন কিছুদিনের জন্য কান খুলে গেল। আগে কখনও এত সচেতন-ভাবে ওই পাখির গান শুনি নি। ছেলেরা ফুলও খুব ভালোবাসে। সুগন্ধি কোনো ফুল সবার আগে তোলবার জন্য তারা অনেক সময় ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। সে-ফুলে মালা গেঁথে তারা অধ্যাপকদের দেয়, কখনও বা দেয় স্বয়ং কবিকে।

দিনের শেষে যদি কোনো ক্লাস থাকে তবে ছেলেরা অনুমতি নিয়ে নিকটবর্তী কোনো গ্রামে বা নদীর তীরে চলে যায়। পথে যেতে যেতেই তাদের ক্লাস হয়। এরকম হলে ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। আমরা একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি; রাত্রির খাবারের আগে ফিরতে হবে এইটুকু ছাড়া তখন আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না।

ছোটোদের পাঠ্যতালিকায় প্রকৃতিপাঠ বলে একটি বিষয় আছে। একবার একসত্রকাল একটি পুরো ক্লাস নিকটবর্তী অঞ্চলের সবরকম ঘাসপাতা সংগ্রহ করেই কাটিয়ে দিল। সময় সময় পায়ে কাঁটা বিঁধিয়েও অপ্রত্যাশিত একটি উদ্ভিদের নমুনা জোগাড় করে তারা নিজেদের সংগ্রহ পূর্ণ করে। নূতন ছেলেদেরই শুধু এ-ধরণের অভিজ্ঞতা কিছু কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়। অন্যসব ছেলেরা সারাক্ষণ খালি পায়ে থাকে বলে আশ্রমের আশেপাশের কাঁকর এবং কাঁটার পথে চলে চলে তাদের পা শক্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও রাত্রির আকাশ পরিষ্কার থাকলে কোনো অধ্যাপক নক্ষত্র-পরিচয়ের সরল বিষয়গুলি আলোচনা করেন এবং ছোটো একটি দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদ এবং নক্ষত্রগুলি দেখিয়ে দেন। ম্যাজিকলণ্ঠনের স্লাইড যদি পাওয়া যায় তবে বাইরে বা কোনো ছাত্রাবাসের ভিতরে ছবি দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ম্যাজিকলণ্ঠনের যন্ত্রসাজানো বা পর্দাখাটানোর জন্য উৎসাহী এবং নিপুণ ছাত্রের কখনও অভাব ঘটে না।

বিদ্যালয়ের সব স্তরেই বাংলা শিক্ষার বাহন। তবে সহযোগী-ভাষা হিসেবে ইংরেজিও শেখানো হয়।

নিচু ক্লাসে Direct পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেরা যখন ইংরেজি বুঝতে আরম্ভ করে তখন তাদের কাছে সরল ইংরেজিতে রূপকথা বা দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বলা হয়। গল্পটি যদি তাদের ভালো লাগে তবে কত সহজে তারা গল্পের ভাষাও বুঝতে পারে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আমি নিজেই দেখেছি যে George Macdonald-এর "The Princess and Curdie" বা "The Princess and Goblin"-এর মতো গল্প তেরো চোদ্দো বছর বয়সের বাঙালি ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে; যদিও বিদেশী ভাষায় বলা তবু পরবর্তী অধ্যায়টি শোনার জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত থাকে না।

যাঁরা বাইরে থেকে বিদ্যালয়টি দেখতে আসেন প্রত্যেক ছাত্রের মুখের উপর নিশ্চিত আনন্দের রেখাটি প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যে-সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষাপাসই ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত সে-সব বিদ্যালয়ের জীবন সম্বন্ধে স্বভাবতই যে বিরূপ মনোভাব থাকে এখানে তা একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরীক্ষা নীচের শ্রেণীগুলি থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু যে-শিক্ষক ছাত্রকে পড়ান তিনিই বৎসরে একবার ছাত্রের উন্নতির প্রতিবেদন তৈরি করেন।

প্রত্যেক সত্রের শেষে কবির একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপক এবং ছাত্রেরা বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয় শান্তিনিকেতনেই হয়। কলকাতা থেকে বহু লোক অভিনয় দেখতে আসেন, কবি নিজে অভিনয়ে যোগ দিলে তো আর কথাই নেই। তিনি নিজেই অভিনেতাদের তৈরি করেন। প্রথমে তিনি নাটকটি একবার সকলকে শুনিয়ে পাঠ করেন। তার পর আবার যারা বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে পাঠ করেন। নাটকের মহড়া যতদিন চলে ততদিন ক্লাস প্রায় হয়ই না, কারণ সারা স্কুলের ছেলেরা সারাক্ষণ মহড়াতে উপস্থিত থাকে। ছেলেরা জানালায় উঁকি মেরে কৌতুকপূর্ণ

এবং সরস দৃশ্যগুলি উপভোগ করছে এ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। শেষদিন ব্যস্ততার আর অন্ত থাকে না। কারণ মঞ্চ সাজাতে হবে, সাজসজ্জা-সমেত একবার মহড়াও হবে। এতে অবশ্য ছেলেদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, কারণ প্রায় পূর্ণাঙ্গ অভিনয় একবার দেখা হয়ে গেলে অভিনয়ের দিন প্রথম দেখার বিস্ময়টি আর থাকবে না। অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেলে যখন নৃত্যে ও গীতে নাটকটির মর্মার্থ প্রকাশিত হতে থাকে তখন ছাত্র এবং অন্যান্য দর্শক উভয়েরই আগ্রহের আর সীমা থাকে না। এইভাবে, সচেতন প্রয়াস ছাড়াও কবির ভাবধারা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অবচেতন মানসের মধ্য দিয়েই ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাপদ্ধতির একটি মূল নীতি। মাঝে মাঝে ইংরেজি, এমন-কি সংস্কৃত নাটকেরও অভিনয় হয়। বিদেশি ভাষায় বাঙালি ছেলেদের অভিনয়-ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বাঙলাতে অভিনয় হলে তো কথাই নেই, কারণ সেটা তাদের নিজস্ব জিনিস। অভিনয়ে তাদের প্রবণতা এত বেশি যে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়াই তারা নাটক তৈরি করে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় কলকাতায় কবির নূতন নাটক 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হয়েছিল। তাতে আট থেকে দশ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা ছিল গানের দলে। নাটকের অভিনয়-অংশে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। তারা শুধু গান করেছিল এবং নাচে যোগ দিয়েছিল। সত্যি বলতে, তারা যেন ছিল মঞ্চের উপরে একদল দর্শকের মতো। অভিনয় শেষ হবার পর তারা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে একদিন পুরো নাটকটি অভিনয় করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। প্রত্যেকটি ছেলে কলকাতার মূল অভিনেতাদের এমন নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করল যে অনুষ্ঠানটি প্রচণ্ড ভাবে সফল হয়ে উঠল। নাটকের কৌতুকপূর্ণ এবং গম্ভীর সবরকম রস পরিবেশনেই এই খুদে অভিনেতাদের কোনো খুঁত ছিল না।

ইংরেজ বালকদের তুলনায় বাঙালি বালকদের যে বিশেষত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা না বললে বিদ্যালয়ের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি হাঁসপাতাল আছে। ছেলেরা অসুস্থ হলে সেখানে থাকে, আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু অনাবাসিক রোগীও চিকিৎসার জন্য এখানে আসে। একজন পাসকরা ডাক্তার আছেন কিন্তু নার্সিংএর পুরোপুরি কাজ ছেলেরাই করে। স্কুলের কোনো সহপাঠী অসুস্থ হলে তারা রাত্রিতে পালাক্রমে দু ঘণ্টা করে জেগে থেকে রোগীর সেবা করে। এ বিষয়ে তাদের বিশেষ কোনো শিক্ষা না থাকলেও এমন একটি সহজাত প্রবণতা আছে যে নার্স হিসেবে তাদের জুড়ি মেলা ভার। শুধু নিজেদের প্রতিই যে তাদের এ যত্ন তা নয়। নিকটবর্তী গ্রামের লোকেদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা গ্রামে চলে যায় এবং হয়তো স্ট্রেচারে করে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে এসে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

যাদবের কাহিনী থেকে ছেলেদের এই প্রবণতার কথা বোঝা যাবে। যাদব ছিল স্কুলের নিচু শ্রেণীর একজন ছাত্র। বয়স তার বছর এগারো হবে, কিন্তু তার যেমন ছিল মেধা, তেমনি তার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনাও ছিল। আমাদের কাছেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আশ্রমেই তার মৃত্যু হয়।

প্রকৃতি-পাঠে তার আগ্রহের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে মিলে সে এক সময় নানারকম পাতা সংগ্রহ করছিল। কি নূতন পাতা সে সংগ্রহ করছে সেটা আমাকে দেখাবার জন্য সে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার ক্লাসে ছুটে আসত। তার সংগ্রহ যে অত্যন্ত মূল্যবান সে কথা বলার আগ্রহে তার কথাগুলো যেন ঠেলাঠেলি করে বেরতে চাইত। অন্য ছেলেরা কেউ তার মতো নানারকম পাতা

যোগাড় করতে পেরেছে কিনা এই ছিল তার প্রশ্ন। সব অধ্যাপকেরাই তার কাজে এই আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করতেন। ছোটো ছেলেদের সভায় সে মাঝে মাঝে ইংরেজিতে গল্প বলত। সে বলা তার বয়সের পক্ষে অসাধারণ ভালো।

যখন তার প্রথম অসুখ হল, তখন সে অসুখের গুরুত্ব ততটা বোঝা যায় নি। কিন্তু সপ্তাহখানেক বাদে তার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে আমরা স্থির করলাম তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ এখানকার ছোটো হাসপাতালের ব্যবস্থা গুরুতর রোগের উপযোগী ছিল না। বড়ো ছেলেদের মধ্যে অনেকেই পালা করে এই ছোটো রোগীটির সেবায় রাত জাগছিল। যেদিন সকালে তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তারা আট-দশ জন মিলে ধরাধরি করে একটি স্ট্রেচার নিয়ে এল। স্ট্রেচারে যাদবকে তুলে নিয়ে তারা স্টেশনের রাস্তায় রওনা হল। যাদব যেই বুঝতে পারল যে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখুনি তার সারা শরীরে একটা অস্বস্তি দেখা দিল। সে আর স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে চাইল না। সেই অসুস্থ শরীরে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমি আশ্রম ছেড়ে যাব না। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমি কিছুতেই যাব না। আমাকে আবার আশ্রমে নিয়ে যাও। কেন, কেন তোমরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।"

ডাক্তার ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, যাদব যদি এরকম হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকে তা হলে বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই ছেলেরা তাকে নিয়ে আবার আশ্রমে ফিরে এল। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে সে আশ্রমের দিকে ফিরে যাচ্ছে সে মুহূর্তেই সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তার মুখে আনন্দের আভাস দেখা গেল।

তার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। কলকাতা থেকে যতদূর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেও ফল পাওয়া গেল না। এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বুদ্ধিদীপ্ত এই ছেলেটিকে আর ধরে রাখা যাবে না। দিনের পর দিন ছেলেরা পালা করে তার রোগশয্যার পাশে বসে ডাক্তারের নির্দেশমত তার সেবা করতে লাগল। সারারাত জেগে কতবার তার তপ্ত দেহটি ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে দিতে লাগল।

তার মৃত্যুর দু-এক ঘণ্টা আগে আমি তার পাশে বসেছিলাম। অবসন্ন বিষাদ-মাখানো স্বরে সে বাংলাতে বলল, ফুল আর ফুটবে না। আমি তার কানে কানে বললাম, ভয় নেই, ফুল ফুটবে।

প্রত্যুষে আশ্রমের কাছের খোলা মাঠে তাকে দাহ করা হল। আগুনের শিখা যখন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল, তখন এ কথা আমার কাছে প্রতিভাত হল যে অন্তত আমাদের জন্য এই ক্ষুদ্র জীবনটি ফুটে উঠেছিল। তার সুবাস কোনোদিন মিলিয়ে যাবে না।

অনুবাদ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা'

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (২০ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের সম্পাদক স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায়-কৃত মূল পুঁথির পাঠ-সংশোধনে তাঁহার কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধনের সংগতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যে পাঠ-সংশোধন কাজের জন্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য বসন্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনেকখানি অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের প্রাপ্য বলিয়া মনে করি। আবার যে সংশোধনগুলি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া ডক্টর ভট্টাচার্য সমালোচনা করিয়াছেন সেগুলিরও বেশির ভাগই শহীদুল্লাহ সাহেবেরই প্রস্তাবিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ডঃ শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠ বিচার করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে যে নূতন পাঠের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সম্পাদক বসন্তরঞ্জন তাঁহার গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে (৩য় সংস্করণ হইতে) শহীদুল্লাহ প্রদত্ত সেই পাঠগুলি প্রায় সর্বাংশে মানিয়া লন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠবিচার সম্পর্কে শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৪৮ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

শহীদুল্লাহ প্রদত্ত পাঠ বসন্তরঞ্জন কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো যাইতে পারে।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ১ম মুদ্রণে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) :

দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে। (জ—৭)

২য় মুদ্রণে সম্পাদক পরিবর্তন করিলেন :

দুঈ পাণি লঘু মধ্য তনুত বিশালে।

শহীদুল্লাহ ২য় সংস্করণের পাঠ সম্বন্ধে জানাইলেন, 'ইহার অর্থ অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। কবি রূপ বর্ণনায় কেশ হইতে পদনখ পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে কপাল ও নাসার বর্ণনার মধ্যে হস্তের বর্ণনায় ক্রমভঙ্গ হয়। প্রথম মুদ্রণের পাঠই ঠিক।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৩য় সংস্করণ হইতে পুনরায় ১ম মুদ্রণের পাঠই গ্রহণ করা হইল। ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে।

২। ১ম মুদ্রণে :

করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্মিত কমলে। (জ—৭)

২য় মুদ্রণে সম্পাদক পাঠ পরিবর্তন করিলেন :

করকুরুবিন্দমাল নির্মিত কমলে।

শহীদুল্লাহ ১ম মুদ্রণের পাঠ সমর্থন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৩য় সংস্করণ হইতে ১ম মুদ্রণের পাঠই গ্রহণ করা হইল।

৩। ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল। (২য় মুদ্রণ, তা-৭)

শহীদুল্লাহর মতে, 'শুদ্ধ পাঠ খাইলে হইবে'।

৩য় সংস্করণে সম্পাদক 'খাইবে' কাটিয়া 'ফুল পিন্ধিলে সে খাইলে তাম্বুল' করিলেন। খাইলে সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিলেন, 'পুথিতে খাইবে'।

৪। মাঞ্‌ঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল
না করিহ গোঠ সঘনে। (২য় মুদ্রণ, বং-২৬)

শহীদুল্লাহর মতে, 'সয়নে (=শয়নে) বিশুদ্ধ পাঠ'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৩য় সংস্করণে :

না করিহ গোঠ সয়নে।

পাদটীকায় সম্পাদক লিখিতেছেন, 'পুথিতে সঘনে'।

৫। দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল॥ (২য় মুদ্রণ, বি-৬৫)

শহীদুল্লাহর মতে, 'প্রকৃত পাঠ জল'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক ৩য় সংস্করণে 'ডাল' তুলিয়া 'জল' বসাইলেন। এবং পাদটীকায় লিখিলেন, 'পুথিতে ডাল'।

৬। তরাসিনী (২য় মুদ্রণ, হা-৫, বি-৪৯)

শহীদুল্লাহর মতে, 'খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ তরাসিলী'।

সম্পাদক ৩য় মুদ্রণের উভয় স্থানেই তরাসিলী করিয়াছেন। এবং পাদটীকায় লিখিত আছে, 'পুথিতে তরাসিনী'।

৭। সব মন্ত্রি পাত্র লঞাঁ চিন্তির হীত। (২য় মুদ্রণ, জ-৪)

শহীদুল্লাহর মতে, 'খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ চিন্তিল'।

সম্পাদক ৩য় সংস্করণে 'চিন্তিল' পাঠই গ্রহণ করিলেন এবং পাদটীকায় লিখিলেন, 'পুথিতে চিন্তির'।

৮। কৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে কয়েক স্থানে 'ন' 'ল' মধ্যে গোলযোগ ছিল। এগুলি প্রথম লক্ষ্য করেন শহীদুল্লাহ সাহেব, বসন্তবাবু নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণে এই গোলযোগ ছিল। ৩য় সংস্করণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বাহির হইবার পূর্বে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ফলে এই সংস্করণটি শুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কারের জন্য বসন্তরঞ্জন অমর, কিন্তু পুঁথির শুদ্ধ পাঠ বিচারে তাঁহার অপেক্ষা শহীদুল্লাহ সাহেবের কৃতিত্বই বেশি।

বাংলা বিভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬ জানুআরি ১৯৬৪

শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

লেখকের উত্তর

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা' প্রবন্ধের প্রসঙ্গে শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের লিখিত প্রতিবাদপত্র পড়িয়া সুখী হইলাম। সুখী হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে তরুণবয়স্ক পাঠকদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে উৎসাহ ও অনুরাগ দেখা যাইতেছে।

সমালোচকের মূল বক্তব্য "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কারের জন্য বসন্তরঞ্জন অমর, কিন্তু পুঁথির শুদ্ধ পাঠ বিচারে তাঁহার অপেক্ষা শহীদুল্লাহ সাহেবের কৃতিত্বই বেশি।"

এই বক্তব্যের সমর্থনে পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে তিনি এমন কতকগুলি শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন যেগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণে অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণে ছিল না, কিন্তু তৎপরবর্তী সংস্করণ সমূহে পূর্বপাঠের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে। সমালোচক বলিতে চাহেন যে শহীদুল্লাহ সাহেব এই সংশোধনগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়াই বসন্তরঞ্জন পাঠ পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই কারণে পাঠবিচারের কৃতিত্ব বসন্তরঞ্জন অপেক্ষা শহীদুল্লাহ সাহেবের অধিক।

ডঃ শহীদুল্লাহ ছাড়াও যে আরও অনেকে কৃষ্ণকীর্তনের শব্দাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকাতেই সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ধৃত পাঠ যথাপ্রয়োজন গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক ইঁহাদের কাছে সমুচিত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ২৯ ফাল্গুন, ১৩৫১।" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৪২ এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও 'চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতেও পাঠবিচারে সম্পাদকমহাশয়ের সাহায্য পাইবার কথা। লিখিত প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত মৌখিক আলোচনাও পাঠবিচারে নিঃসংশয় অনেক সহায়তা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উপলক্ষে যাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত শব্দতাত্ত্বিকদের নাম পাওয়া যায়। বসন্তবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থখানিতে অনেক পণ্ডিতের অনেক চিন্তার যোগফল একত্র ক্রিয়া করিয়াছে। তিনি সকলের মতামত পরীক্ষা করিয়া যেটুকু তাঁহার মতে গ্রহণযোগ্য সেটুকু লইয়াছেন, যেটুকু পরিত্যাজ্য সেটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাহার দান কতটা আছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ গাণিতিক বিচার করা কঠিন এবং এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনও নাই। সম্পাদক সর্বশেষ সংস্করণে যে পাঠ গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছেন, তাহার প্রস্তাব যেখান হইতেই আসুক না কেন, গ্রহণ বর্জনের ভালমন্দের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহারই।

পত্রলেখক লক্ষ্য করিলে দেখিবেন আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২০ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) বসন্তরঞ্জন কর্তৃক সংশোধিত যে শব্দের তালিকা দিয়াছি তাহার সংখ্যা শ-দেড়েকের কম হইবে না। ইহার মধ্যে শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত সংশোধন কয়টি? শতকরা দশ, বড়জোর পনের।

আরও একটি কথা। শহীদুল্লাহ সাহেবের সকল প্রস্তাব বসন্তরঞ্জন গ্রহণ করেন নাই, সেটাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক। একটি কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাধার বচন শুণী মাহামুণী

বসিলী যোগ ধেয়ানে।—রাধাবিরহ, ৪৭ পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম দ্বিতীয় সংস্করণে 'বসিলী' পাঠই ছিল। পুঁথিতে বাসলী ছিল সম্পাদক তাহা কাটিয়া 'বসিলী' করিয়াছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ লিখিলেন, "পুঁথির পাঠ বাসলী তাহাই ঠিক।" কারণ মাহামুণী পুংলিঙ্গ, তাহার ক্রিয়া স্ত্রীলিঙ্গ (বসিলী) হইতে পারে না। বসন্তবাবু এই উক্তির অর্ধেকটা মানিলেন, 'বসিলী' হইতে পারে না, এই পর্যন্ত মানিলেন। কিন্তু 'বসিলী'র স্থলে বাসলী করিতে চাহিলেন না। অর্থের দিক দিয়া সঙ্গতির অভাববশতঃ ওই শব্দে তাঁহার মন সায় দিল না। এবার তিনি নূতন ভাবে চিন্তা করিলেন। ফলে 'বসিলী' হইল 'বসিলা'।

শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য বহুজনের নিকট ঋণী হইলেও পাঠবিচারে গ্রন্থসম্পাদকের কৃতিত্ব অসাধারণ। পত্রলেখক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কাহারও সহিত তুলনা করিয়া গুরুলঘু বিচার করা এ ক্ষেত্রে সংগত হইবে না।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ : বাংলা অনুবাদ। প্রথম খণ্ড (১-৫ম পরিচ্ছেদ)। অনুবাদক অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৬৯ সাল, পৃ ২০+২৫৬। মূল্য আট টাকা।

বঙ্গভাষায় অনূদিত বিশ্বনাথ কবিরাজের এই 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থখানিতে আছে— প্রথমে অনুবাদ-প্রসঙ্গ ও ভূমিকা, তার পর গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রবেশ-টীকা এবং পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট। ইহাতে মূল গ্রন্থ নাই। কেবল অনুবাদ এক হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

সাহিত্যদর্পণের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম নয়। শ্রীমদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি -সম্পাদিত সাহিত্যদর্পণেই ইহার প্রথম প্রয়াস বলিয়া আমার ধারণা। বিদ্যানিধি-মহাশয় টীকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন একটু বিস্তৃতিসহকারে। দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হইয়াছে প্রায় ৩০ বৎসর হইল। শুনিয়াছি এখন আবার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। তাহা ছাড়া, J. R. Ballantyne (ও পরে P. D. Mitra)-এর ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে মহাশয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম পরিচ্ছেদের টীকা-টিপ্পনী-সহকারে ইংরাজি অনুবাদও আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অনুবাদের প্রয়াস। বলাই বাহুল্যমাত্র যে অনুবাদকদ্বয় পূর্বসূরিদের গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থের অনুবাদ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ বেশ ভালোভাবেই দেখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁহারা কোথাও তাহার কোনো উল্লেখ করেন নাই, এমন-কি গ্রন্থপঞ্জীতেও নহে। ভাষান্তরিত হইলেও তাঁহারা যে ইংরাজি অনুবাদ সরাসরি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা পরে আলোচনা করা হইতেছে। সুতরাং পূর্বসূরিদের গ্রন্থ-আলোচনায় উপকৃত ইঁহাদের অনুবাদে কোনো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় নাই। এমন-কি ইঁহারা কোনো দিক্ হইতেই কোনো অভিনব আদর্শও উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই স্বকল্পনাপ্রসূত অনুবাদ দেখিয়াছি। ফল কথা এই যে, এই অনুবাদ-পাঠে আমি যারপরনাই বিস্মিতও হইয়াছি। কারণ তাঁহাদের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই মূলানুগত হয় নাই। অন্য পক্ষে অনুবাদপাঠে স্বতঃই মনে এই ধারণা জন্মে যে তাঁহারা হয়তো অনুবাদ-দৃষ্টে অনুবাদ করিয়াছেন। ক্রমশঃ বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি।

গ্রন্থ-সমালোচনা করিবার পূর্বেই মনে একটি প্রশ্ন জাগে— প্রকৃত অনুবাদক কে? কারণ অনুবাদকদ্বয় নিজেরাই বলিয়াছেন—

"অন্যতর অনুবাদক এই গ্রন্থের যে ভূমিকা ও টীকা লিখেছেন, তাতে মতামতের দায়িত্ব তাঁর নিজের।"

কে কাহাকে এই কথাটি বলিতেছেন? কেই বা অন্যতর অনুবাদক? ভূমিকার শেষে অবশ্য শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল মহাশয়ের নাম আছে। তাহাতে হয়তো বোঝা যায় যে তিনি অন্ততঃ ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রবেশকটীকার শেষে কাহারও নাম নাই। দুইজনের যুগ্মপ্রয়াসে যেখানে গ্রন্থরচনা, সেখানে ভাল-মন্দ দুইজনেরই প্রাপ্য।

অনুবাদকদ্বয় অনুবাদ-প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই অধিকারীর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে—

"সংস্কৃত না-জানা বাঙালী শিক্ষার্থীদের জন্য মূল 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, প্রকাশিত

হ'ল।" সত্য কথা বলিতে কি 'সংস্কৃত না-জানা' বাঙালি শিক্ষার্থীদের জন্য এইভাবে সাহিত্যদর্পণের অনুবাদ করিলে, তাহাদের ভুল ধারণা জন্মাইবে। কেবল অনুবাদ কেন— আলোচনা-প্রসঙ্গের বক্তব্যও কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথমেই ধরা যাক্ ভূমিকা। ভূমিকাতে যে কি বলিতে চাহিয়াছেন লেখক তাহা বোঝা কষ্টকর ; অর্থাৎ মনে হয়, কিছুই বলিতে চান নাই। 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' যে কি— তাহা লেখকের লেখা হইতে বোঝা যায় না। তিনি 'কবিধর্ম ও কবিকর্ম'— উভয়ের স্বরূপ জিজ্ঞাসাই সমগ্র 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কি যে 'কবিধর্ম' ও কি যে 'কবিকর্ম' সেই প্রশ্ন করিয়াও তার কোনো উত্তর দেন নাই। কেবল বলিয়াছেন যে—

"মুখ থেকে অভিশাপবাণী নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্মীকি বিস্মিত হয়েছিলেন : 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া', আমি যা বললাম সেটি কি ? কেন বললাম, কেমন ক'রে বললাম নয়, যা বললাম সেটি কি ?· · যা বললেন, তা আর যাই হোক না কেন, প্রথম লক্ষণটি হচ্ছে, তা 'পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ'"। (পৃ নয়)
এই প্রসঙ্গে লেখকের আধারস্থল শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র নিম্নলিখিত অংশটি দ্রষ্টব্য—

"ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগের শোকে যখন বাল্মীকি মুখ থেকে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন—

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥

'বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম— এ কী !'· ·শিষ্যকে বললেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥" —পৃ ৯-১০

এইখানে লক্ষণীয় এই যে অনুবাদকদ্বয় পৌর্বাপর্য রক্ষা না করিয়া এইরূপ একটি আকস্মিক উক্তি করিয়াছেন যে ইহাতে বক্তব্যটি অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহাদের উক্তির আধারস্থলে উহা পরিস্ফুট আছে।

তার পর তিনি 'কবিকর্মের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে' অলংকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গের যথোচিত আলোচনা না হইতেই (বরং কবিকর্মের স্বরূপটি অস্পষ্ট রাখিয়া) তিনি রসের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রসের প্রসঙ্গে তিনি আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের মতবাদ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনাটি বিশ্লেষণমূলক না হওয়ায়, রসজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ইহার পরেই প্রশ্ন আসিয়াছে "কবি কে ? কেমন ক'রে কবি কাব্য সৃষ্টি করেন ?" এইভাবে এক-একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি ভূমিকাটি সমাপ্ত করিয়াছেন। ভূমিকার আলোচনাগুলি ধারাবাহিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক না হওয়ায় সুষ্ঠু ও সংগত হয় নাই ; বরং লেখাটি অপক্ব ও ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এইবার ধরা যাক্ গ্রন্থের অনুবাদ। পূর্বেই বলিয়াছি যে অনুবাদ যথার্থ ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট ও অর্থবোধের অসুবিধা হইয়াছে। বক্তব্যটি বহুস্থলেই পরিস্ফুট হয় নাই। মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায়, মূলের ভাষার প্রাণ

অনেক স্থলেই নষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অনুবাদে অনেক মূলাংশও বাদ গিয়াছে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। মূলের রেখাঙ্কিত অংশগুলি অনুবাদে বাদ পড়িয়াছে এবং অনুবাদের রেখাঙ্কিত ও (?) এই চিহ্নটি মূলানুগত হয় নাই। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি মূল ও তাঁহাদের অনুবাদ, এবং Ballantyne ও বিদ্যানিধির অনুবাদ দিলাম।

১. মূল— গ্রন্থারম্ভে নির্বিঘ্নেন প্রারিপ্সিত পরিসমাপ্তিকামো বাঙ্ময়াধিকৃততয়া বাগ্‌দেবতায়াঃ সাম্মুখ্যমাধত্তে।

অনুবাদ— "গ্রন্থের আরম্ভে ঈপ্সিত কার্যের বিঘ্নহীন পরিসমাপ্তি কামনা করে বাগ্‌দেবীর উপস্থিতি প্রার্থনা করছি।"

বিদ্যানিধি— "(প্রবর্ত্তমান) গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য সরস্বতী দেবীর বাঙ্ময়বস্তুর অধ্যক্ষতাহেতু (অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এই হেতু) স্বকীয় বিঘ্নবিধ্বংসনের জন্য তাহারই উন্মুখতা সম্পাদন করিতেছেন।" (?)

Eng. Tr.—"At the beginning of this book, desiring the unobstructed completion of what he wishes to begin, he *i.e., the author-commenting on his own metrical treatise*—makes his address to the Goddess of Speech, because in the province of Eloquence it is she who is the constituted authority."

২, মূল— শরদিন্দু-সুন্দররুচিশ্চেতসি সা মে গিরাং দেবী।
অপহৃত্য তমঃ সন্ততমর্থানখিলান্ প্রকাশয়তু॥

অনুবাদ— "শারদ চন্দ্রের মতো যাঁর সুন্দরকান্তি সেই বাগ্‌দেবী আমার হৃদয়ব্যাপ্ত (?) অন্ধকার দূর ক'রে সর্বপ্রকার অর্থ প্রকাশ করুন।"

বিদ্যানিধি—"শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর লাবণ্যযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বাগ্‌দেবী মদীয় চিত্তের অন্ধকাররাশি বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র তত্ত্বার্থ নিরন্তর প্রকাশ করুন।"

Eng. Tr.—"May that Goddess of Language, whose radiance is fair as the autumnal moon, having removed the overspreading darkness, render all things clear in my mind!"

৩, মূল— চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥

অনুবাদ— "অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরও কাব্য থেকেই চতুর্বর্গফল প্রাপ্তি ঘটে, সেইজন্য এর স্বরূপ নির্ণয় করা হচ্ছে।" [এইখানে অনুবাদ মূলানুগত হয় নাই, মূলের ভাষার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে এবং অর্থেরও একটু বিকৃতি ঘটিয়াছে।]

বিদ্যানিধি— "কাব্য হইতে অল্পমতি ব্যক্তিবর্গেরও অনায়াসে চতুর্বর্গপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছি।"

Eng. Tr.—"Since the attainment of the fruits consisting of the class of four *i.e., the four great objects, of human desire—viz., Merit, Wealth, Enjoyment and*

Liberation—is pleasantly possible even in the case of those of slender capacity, by means of Poetry only, therefore its nature shall be now setforth."

বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। অনুবাদকদ্বয় যে কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই কয়টি উদাহরণ হইতেই বোঝা যাইবে। অধিক উদাহরণে আমার উপরিউক্ত মন্তব্যটি আরও পরিস্ফুট হইবে। দিগ্‌দর্শনের জন্য এই কয়টি উদাহরণ দিয়া বিরত রহিলাম।

এইবার প্রবেশকটীকা প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা বলিতেছি। 'প্রবেশক'টীকাতে অনুবাদকদ্বয় পি. ভি. কাণে (অবশ্য প্রথম দুই পরিচ্ছেদে), সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ টীকা সংগ্রহ করিয়াও গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ টীকাগুলি অত্যন্ত অসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন; এত সংক্ষিপ্ত ও আলোচনাবর্জিত যে এই টীকার কোনো প্রকার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় একত্র করা হইয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা 'সংস্কৃত না-জানা বাঙালী শিক্ষার্থী'রা এই টীকার দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে এবং ভুলপথে চালিত হইবে। টীকাতে কোথাও কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা আলোচনা নাই; বরং প্রতি স্থলেই অস্পষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবকাশ আছে। অল্পকথায় বলা যাইতে পারে যে টীকাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, টীকায় যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য লইয়াছেন, যথাযথ স্থানে তাহার কোনোপ্রকার উল্লেখ নাই, এমন-কি গ্রন্থের কোনো স্থানেই (গ্রন্থপঞ্জী ছাড়া) তাহা করেন নাই। সুধীসমাজের গ্রন্থে এই জাতীয় স্বীকারোক্তি অবশ্যকর্তব্য। কি ভাবে স্বীকার না করিয়া উঁহাদের গ্রন্থ হইতে অনুবাদকদ্বয় সাহায্য লইয়াছেন, তাহা নীচের কয়েকটি উদাহরণ হইতেই বোঝা যাইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের টীকায় উঁহারা সম্পূর্ণভাবে পি. ভি. কাণে মহোদয়কে অনুসরণ করিয়াছেন, এমনকি গ্রন্থের উদ্‌ধৃতির প্রসঙ্গেও। যেমন—

১. "জগতে নরত্ব···সকলের চেয়ে দুর্লভ। (পৃ ২, পঙ্‌ক্তি ৭-৯— উদ্‌ধৃতিটি অগ্নিপুরাণএর ৩২৭।৩-৪ শ্লোক। এই শ্লোকে কবিত্ব ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। শক্তি আর প্রতিভা এক। শক্তি অর্থে মম্মটভট্ট···বলেছেন— 'এমন সংস্কার যা কবিত্বের বীজস্বরূপ (কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ'— কাব্যপ্রকাশ ১।৩ বৃত্তি)।"

পি. ভি. কাণে মহোদয়ের গ্রন্থে এই কথাটি ঠিক এইভাবেই আছে।

যেমন—

"নরত্বং দুর্লভং occurs in অগ্নি 327. 3 and 4 (Ānandāsran ed.) . . . . . The Agnipurāna makes a distinction between কবিত্ব and শক্তি· শক্তি is the same as প্রতিভা······ শক্তি বা প্রতিভা is defined by মম্মট as কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ।" এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইঁহারা পি. ভি. কাণে মহাশয়কে এমনভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন যে তাঁহার অগ্নিপুরাণের Referenceটুকু পর্যন্ত অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাণে মহাশয় অগ্নিপুরাণের আনন্দাশ্রম সংস্করণ দেখিয়াছেন, অনুবাদকদ্বয় কোথাও তাহার নামোল্লেখ না করিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ বঙ্গবাসী ও আনন্দাশ্রম সংস্করণের মধ্যে শ্লোকসংখ্যায় পার্থক্য আছে। পাঠক-মহোদয়গণের বিচারের সুবিধার জন্য আমি উভয় সংস্করণ হইতে শ্লোকগুলি তুলিয়া দিলাম।

আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৩২৭ অধ্যায় পৃ ৪২০	বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩২৭ অধ্যায়
অগ্নিরুবাচ—	অগ্নিরুবাচ—
কাব্যস্য নাটকাদেশ্চ অলংকারান্বদাম্যম ।	কাব্যস্য নাটকাদেশ্চ অলঙ্কারান্ বদাম্যম ।
ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যেতদ্বাঙ্ময়ং মতম্ ॥১॥	ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যেতদ্বাঙ্ময়ং মতম্ ॥১॥
শাস্ত্রেতিহাসবাক্যানাং ত্রয়ং যত্র সমাপ্যতে ।	শাস্ত্রেতিহাসবাক্যানাং ত্রয়ং যত্র সমাপ্যতে ।
শাস্ত্রে শব্দ প্রধানত্বমিতিহাসেষু নিষ্ঠতা ॥২॥	শাস্ত্রেশব্দপ্রধানত্বমিতিহাসেষু নিষ্ঠতা ॥২॥
অভিধায়াঃ প্রধানতত্বাৎ কাব্যং তাভ্যাং বিভিদ্যতে ।	অভিধায়াঃ প্রধানত্বাৎ কাব্যং তাভ্যাং বিভিদ্যতে ।
নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা ॥৩ ॥	নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা ।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা ।	কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা ॥৩॥
ব্যুৎপত্তির্দুর্লভা তত্র বিবেকস্তত্র দুর্লভঃ ॥৪॥	

এখন পাঠকমহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে সংস্করণের উল্লেখ না করিয়া কেবল অগ্নিপুরাণের স্থলের নির্দেশ করিলেই চলিবে কি না ? কারণ সংস্কৃত গ্রন্থাদির সংস্করণভেদে অনেক সময়েই পাঠভেদ ও শ্লোকের সংখ্যা ভেদ হয়।

২. "গুণ একমাত্র রসেরই ধর্ম, শব্দ ও অর্থের ধর্ম নয়। গুণের কারবার রসের সঙ্গেই শব্দ ও অর্থের সঙ্গে নয়। তাই শব্দ অর্থের মধ্য দিয়ে গুণ কি ক'রে রসের উৎকর্ষ বাড়াবে ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে : এখানে গুণ বলতে গুণাভিব্যঞ্জক শব্দও অর্থ বুঝতে হবে। এখানে গুণের লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ গ্রহণ করতে। অর্থাৎ, যে শব্দগুলি (এবং অর্থও) গুণকে অভিব্যঞ্জিত করে। তারাই রসের উৎকর্ষ বিধান করে।"—পৃ ১৪৫

ঠিক এই কথাগুলি তিনি কিভাবে কাণে মহোদয়ের গ্রন্থ হইতে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নের অংশ হইতে বোঝা যাইবে।

"How do you say that Guṇas heighten রস through words and senses? গুণs are the properties of রস alone and not of শব্দার্থ; therefore having nothing to do with শব্দ and অর্থ, they cannot heighten রস through শব্দ and অর্থ." We reply : —"The word গুণ here is secondarily employed (*i.e.* by লক্ষণা) for words and meanings which develop excellences. Hence what is meant is this—that words (and senses), which develop excellences, heighten Rasa."

৩. "আকাঙ্‌ক্ষা···গৃহীত হ'ল। (পৃ ৯, পঙ্‌ ১৬-১৭)—আকাঙ্‌ক্ষা অর্থাৎ জানার ইচ্ছাটি শ্রোতার। শব্দের বা শব্দের অর্থের আকাঙ্‌ক্ষা থাকতে পারে না। আকাঙ্‌ক্ষা সচেতন প্রাণীর ধর্ম, অর্থাৎ আত্মার ধর্ম। আকাঙ্‌ক্ষা শ্রোতাগত কিন্তু এখানে আকাঙ্‌ক্ষাকে যে শব্দের ধর্ম বলা হয়েছে। তা গৌণ অর্থে। 'আকাঙ্‌ক্ষাযুক্ত শব্দ' অর্থে এই বোঝায় যে, কোন শব্দের অর্থ জানবার পর শ্রোতার মনে শব্দটির ওই অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য অর্থ জানার আকাঙ্‌ক্ষা জাগে।" —পৃ ১৪৬

পি. ভি. কাণে মহোদয়ের গ্রন্থে এই কথাগুলি ঠিক এইভাবেই আছে।

"আকাংক্ষা, as said in the text, is a desire to know (বিজ্ঞান). Desire cannot reside

in the words, nor properly speaking, in the senses. Desire is a property of sentiment beings alone. It is therefore that আকাংক্ষা is said to be আত্মধর্ম in the text. Then how is it that a word is said to be সাকাংক্ষ? We reply that this mode of speech is based on লক্ষণা;... a sense is said to be সাকাংক্ষ, because it produces in the mind of the listener of the word having that sense, a desire to know another meaning connected with the first."

৪. " 'অন্বিত নয়' বলাতে বাক্য ও মহাবাক্য থেকে পদের পার্থক্য বোঝানো হচ্ছে। কয়েকটি বর্ণ নিয়ে একটি পদ গঠিত হয়। বাক্যের মধ্যেও ব্যবহারযোগ্য একাধিক বর্ণ থাকে; কিন্তু এই বর্ণগুলিকে পদ বলা হবে না; কারণ, বাক্যের তথা মহাবাক্যের বর্ণগুলি পরস্পর অন্বিত কিন্তু পদের বর্ণগুলি অন্বিত নয়।" —পৃ ১৪৭

পি. ভি. কাণের সাহিত্যদর্পণের টীকায় এই কথাগুলি ঠিক এই ভাবেই আছে—

"The words 'not in logical connection' serve to exclude বাক্য and মহাবাক্য· Although a sentence consists of letters which are suited for use, still it is not to be called a word, because the parts of it are (অন্বিত) in logical connection with one another and not অনন্বিত, as in a word (the letters constituting which are not logically connected)"

৫. "শঙ্খচক্রযুক্তহরি··· 'রথাঙ্গ' এর অর্থ চক্র। (পৃ ১৯, পঙ্ : ৫-২০)—শঙ্খচক্র বিষ্ণুর সঙ্গেই সংযুক্ত বা সম্পর্কিত, তাই 'সংযোগ' বশত 'হরি' বিষ্ণুকেই বোঝাবে, ব্যাঙ্ সিংহ ইত্যাদি অন্য কোন অর্থ বোঝাবে না। সংযোগ অর্থে দু'টি বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত পারস্পরিক সম্পর্ক।" —পৃ ১৫৩

পি. ভি. কাণে—"সশঙ্খচক্রোহরিঃ—

"...Here হরি means Vishnu alone and not 'a monkey' or 'a lion' (which are also the possible meanings of the word হরি ... because of the conjunction of couch-shell and dicuss, which are generally associated with Vishnu. সংযোগ is defined as a connection between two things such as is generally known to exist between those two things only."

৬. " 'শঙ্খচক্রহীন হরি'— এখানেও 'হরি' বিষ্ণুকেই বোঝাবে। শঙ্খচক্রহীন বলাতে 'বিয়োগ সত্ত্বেও অন্যান্য অর্থ থেকে 'হরি' শব্দটি বিষ্ণু অর্থেই নিয়ন্ত্রিত।" —পৃ ১৫৩

"তদ্বিয়োগেন . . The word হরি in this example denotes Vishnu alone on account of the disjunction of শঙ্খ and চক্র।"

৭. " 'কর্ণ ও অর্জুন'—অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের 'বিরোধিতা' সুপরিচিত। এই জন্য কর্ণ বলতে কাণ বা অন্য অর্থ বোঝাবে না।" —পৃ ১৫৩

"In the example 'Karṇa and Arjuṇa', Karna is the son of the Sūta (Charioteer), and not any one else, called Karṇa 'or

the ear', because his hostility (বিরোধিতা) to Arjuṇa is famous."

৮. " 'স্থাণুকে বন্দনা করি'— এখানে 'স্থাণু' শব্দের অর্থ ন্যাড়াগাছ বা খুঁটি বোঝাবে না। কারণ ও দু'টিকে বন্দনা করা অর্থহীন। 'অর্থ' বলতে প্রয়োজন বা Motive." —পৃ ১৫৩

"In the example 'I salute Sthāṇu' the word Sthāṇu means 'Śiva' and not 'a post', as there is no purpose served in saluting a post. অর্থ means প্রয়োজন".

৯. " 'দেবতা সবই জানেন'— কথাটি রাজা বা ওই রকম কাউকে বলা হচ্ছে এই 'প্রকরণ' বা Context জানলে 'দেবতা' শব্দের অর্থ ঈশ্বর বোঝাবে না।" —পৃ ১৫৩

"In the example 'my lord knows everything', the word দেব means 'you, Sir,' and not God, the context being that the words are addressed to a King."

১০. " 'ভগবান পুরারি'— পুরারি শব্দের অর্থ নগরের শত্রু। কিন্তু এখানে ভগবান শব্দের 'সান্নিধ্য' বশত অর্থ হবে শিব।" —পৃ ১৫৩

"In the example 'the God, the foe of Pura', the word পুরারি means Siva, as we gather from the proximity of the word 'God'."

এইভাবে আরও বহুস্থলে তাঁহারা সরাসরি পি. ভি. কাণে মহোদয়কে অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থ-বিস্তৃতিভয়ে অধিক উদ্ধৃতি বাহুল্যমাত্র মনে করায় আর উদাহরণ দিলাম না। এইভাবে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়ের গ্রন্থ হইতেও সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত আকারে নামোল্লেখ না করিয়া ভাব সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ একটি উদাহরণ দিতেছি—

১১. "রসের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র— 'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ,— এই বিখ্যাত সূত্র থেকে। ভরতের সূত্রের 'নিষ্পত্তি' কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। ভট্টলোল্লটের মতে এর অর্থ 'উৎপত্তি', ভট্টশঙ্কুকের মতে 'অনুমিতি', ভট্টনায়কের মতে 'ভুক্তি' এবং অভিনবগুপ্তের মতে 'ব্যক্তি' বা 'অভিব্যক্তি'। ভরতের সূত্রটিই রসবাদের মূলভিত্তি।" —পৃ ১১৩

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাব্যালোকে এই কথাগুলি নিম্নলিখিতভাবে আছে—

"নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্-রস-নিষ্পত্তিঃ॥

—নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪

…বস্তুতঃ এই একটি সরল ও ক্ষুদ্র বাক্যই রসবাদের মূলভিত্তি। পণ্ডিত শ্রীভট্ট লোল্লট পূর্বমীমাংসা দর্শনের মতানুসারে, শ্রীশঙ্কুক ন্যায়দর্শনের মতানুসারে এবং শ্রীভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে বাক্যটির দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।…'রসের নিষ্পত্তি'— এই বাক্যের 'নিষ্পত্তি' শব্দ লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। ঐ শব্দটির অর্থ উক্ত আচার্যগণ যথাক্রমে 'উৎপত্তি', 'অনুমিতি,' ভুক্তি এবং 'অভিব্যক্তি' বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্বমত প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন।" —২য় সংস্করণ পৃ ৭০

ইহা ছাড়া, ছোট-বড় অনেক বিষয়ের উদ্ধৃতির জন্যও তাঁহারা কাণে মহোদয়ের শরণাপন্ন। নিম্নে দুই-একটির উদাহরণ দিলাম মাত্র।

১২. "অভিনব গুপ্তের গুরু ভট্টতৌত (দশম শতাব্দী) বলেছেন— 'প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী' "— কাণে— 'প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভামতা'।…"জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) বলেছেন— 'কাব্য-ঘটনানুকূলঃ (?) শব্দার্থোপস্থিতিঃ রসগঙ্গাধর"— কাণে—"কাব্যঘটনানুকুলশব্দার্থোপস্থিতিঃ"। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াও গ্রন্থের উৎকর্ষতার বৃদ্ধি পাইত যদি এইগুলি ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হইত। কখনও টীকাটি এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যে অর্থবোধের কষ্ট হয়। গ্রন্থটিকে প্রামাণিক করিবার জন্য আরও ব্যাখ্যা করিলে ভালো হইত। উদাহরণস্বরূপ দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি।

১. " 'এখানে শাশুড়ি…না যেন'। (পৃ ৫, পঙ্‌ ১৩-১৬)—শ্লোকটি প্রাকৃত 'গাহাসত্তসঈ' থেকে উদ্‌ধৃত"। —পৃ ১৩৯

সাহিত্যদর্পণে শ্লোকটি যেইভাবে উদ্‌ধৃত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবে শ্লোকটি "গাহাসত্তসঈ" (= গাথাসপ্ত-শতী)-তে নাই। শ্লোকটি অনেক পরিবর্তিত আকারে দেখা দিয়াছে। সুতরাং লেখকদ্বয়ের এইখানে এই বিষয়ে বিশেষ টিপ্পনী দেওয়া সংগত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রচলিত গাথাসপ্তশতীতে (নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ২১, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৩) এই শ্লোকটি সাহিত্যদর্পণে উদ্‌ধৃত পাঠরূপে নাই। সুতরাং শ্লোকসূচী হইতে শ্লোকটিকে উদ্ধার করা সম্ভব নহে। পি. ভি. কাণের Notes-এ বলা হইয়াছে যে শ্লোকটি গাথা-সপ্তশতীর সপ্তম শতকের ৬৭নং শ্লোক। সেই প্রসঙ্গে পাদটীকায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে মুদ্রিত পুস্তকে শ্লোকটির ভিন্নপাঠ দৃষ্ট হয়। এমন-কি ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। অনুবাদকদ্বয় যে এই প্রসঙ্গে কাণের গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পরবর্তী উক্তি হইতেই বোঝা যায় :

"বস্তুধ্বনির দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্লোকটি 'ধ্বন্যালোকে'-এ উদ্ধৃত হয়েছে।" —পৃ ১৩৯

পি. ভি. কাণেতে আছে—

"This is given as an example of বস্তুধ্বনি on p. 20 of the ধ্বন্যালোক।"

সুতরাং টীকা-টিপ্পনী ব্যতীত কেবল "শ্লোকটি প্রাকৃত 'গাহাসত্তসঈ' থেকে উদ্ধৃত" বলিলে টীকা লেখকদের দোষ হইবে বলিয়া ধারণা। বিশেষ করিয়া, যদি কোনো কৌতূহলী ছাত্র মূলগ্রন্থ অন্বেষণ করিতে চায়, তাহা হইলে সে বিভ্রান্ত হইবে। শ্লোকটি এই :

সাহিত্যদর্পণের পাঠ (সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, পৃ ১৬) :

"অত্তা এত্থ নিমজ্জই এত্থ অহং দিঅসঅং পলো এহি।
মা পহিস ! রত্তিঅংধঅ ! সজ্জাএ মহ নিমজ্জিহিসি ॥"

পি. ভি. কাণে কর্তৃক উদ্‌ধৃত পাঠ (পৃ ২৪)

এত্থ নিমজ্জই অত্তা এত্থ অহং এত্থ পরিঅণো সঅলো।
পহিঅ ! রত্তীঅংধর মা মহ সঅণে নিমজ্জিহিসি ॥"

নির্ণয়সাগর সংস্করণে কেবল কাণে মহোদয়ের "মহ" স্থলে "মহঁ" পাঠ আছে, এই মাত্র ভেদ।

২. "কখনো কখনো…স্পষ্টই হয়েছে। (পৃ ৪-৫, পঙ্ ২৭-৩০, ১-২)— উদ্ধৃত শ্লোকটি শীলা-ভট্টারিকার।"

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে কি প্রকারে অনুবাদকদ্বয় জানিলেন যে 'এই শ্লোকটি শীলাভট্টারিকার-শীলাভট্টারিকার নামে কোনো গ্রন্থ নাই। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে এই শ্লোকটিকে শীলাভট্টারিকার বলিয়া বলা হইয়াছে। এই কথা পি. ভি. কাণে মহোদয়ের গ্রন্থ হইতেই জানা যায়।

এইখানে আর একটি কথা আছে। এই শ্লোকের অনুবাদে মূলের forceটুকু রক্ষিত হয় নাই; বরং অনুবাদটি "নিছক" আক্ষরিক হইয়াছে। মূল শ্লোকসহ নিম্নে তাঁহাদের অনুবাদ দিলাম:

মূল: যঃ কৌমারহরঃ স এবহিবরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

অনুবাদ:

"যে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল সেই আমার বর; সেই চৈত্রের রাত্রি; সেই ফুল্লমালতীর সুরভি; তেমনই মত্তকদম্ব-বায়ু, আমিও তো সেই আমিই আছি; তবু রেবাতীরের বেতস-বেষ্টিত তরুতলের সেই সুরতলীলার জন্য এ হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়।" —পৃ ৪ ও ৭১

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা বৈদ্যনাথ অন্যভাবে করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ কাব্যপ্রকাশের উদাহরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদাহরণ চন্দ্রিকা নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে এই শ্লোকটির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। পি. ভি. কাণে মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উহা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। আমি সেখান হইতে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

"যঃ কৌমারহর ইতি। অত্র হি শব্দস্য যদ্যপীত্যর্থকতয়া অস্তি-ক্রিয়াধ্যাহারেণ চ যঃ কৌমারহরো বরঃ স এব যদ্যপ্যস্তি, চৈত্রক্ষপাস্তা এব যদ্যপি সন্তি, অস্মি চ সৈব যদ্যপ্যস্মি তস্মাপি তত্র রেবারোধসি তত্র বেতসীতরুতলে তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ চেতঃ সুমুৎকণ্ঠতে ইত্যন্বয়ঃ।"

পাঠক মহোদয়গণ শ্লোকটির অনুবাদ একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আমার ধারণা শেষোক্ত ব্যাখ্যার ধারায় অনুবাদ করিলেই ভালো হইত এবং অলংকারটিও স্পষ্ট হইত।

৩. "'লজ্জা এটা' ইত্যাদি। (পৃ ২ পঙ্ ২১-২৫)— শ্লোকটি মহানাটকের। রাক্ষসক্ষরে রাবণের আক্ষেপোক্তি।" —পৃ ১৩১

পূর্বটীকার ন্যায় এই টীকাটিও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ, মহানাটকের কোন্ সংস্করণে এবং কোথায় এই শ্লোকটি আছে, তাহা বলা সঙ্গত। কারণ, প্রচলিত মহানাটকের প্রচলিত অংশে (১-৫ অঙ্ক পর্যন্ত) এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। মহানাটকের দুইটি Recension আছে। একটি Recension এক হইতে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত স্বীকার করে এবং সেই পর্যন্তই পঠন-পাঠনের প্রচলন আছে। আর একটি সংস্করণে নবম বা দশম, এমন-কি চতুর্দশ (কখন কখন তাহার বেশি) অঙ্ক পর্যন্ত স্বীকার করে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সংস্করণের উল্লেখ না করিয়া কেবল 'শ্লোকটি মহানাটকের' বলিলে অসংগত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিস্তৃতভাবে কখন

এবং কি প্রসঙ্গে রাবণের এইরূপ আক্ষেপোক্তি হইয়াছিল তাহাও বলা প্রয়োজন। কারণ, সকল সংস্করণে একই প্রসঙ্গে ও একই স্থলেও শ্লোকটি উদ্‌ধৃত হয় নাই। যেমন জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণে নবম অঙ্কে এবং ক্ষেমরাজের সংস্করণে আরও বহু পরে শ্লোকটি আছে। সুতরাং 'শ্লোকটি মহানাটকের' কেবল এইরকম উক্তি ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, মহানাটকের পাঠ ও সাহিত্যদর্পণের পাঠ ভিন্ন রকমের—দুই-এর পাঠের গরমিল আছে। সুতরাং নির্বিবাদে শ্লোকটি মহানাটকের বলিলে ভুল হইবে। আমি পাঠকদের সুবিধার জন্য উভয় পাঠই উদ্‌ধৃত করিতেছি।

সাহিত্যদর্পণে ধৃত পাঠ—

"ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।
ধিগ্‌ধিক্‌শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকা বিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভি ভুজৈঃ॥"

জীবানন্দ ও ক্ষেমরাজে ধৃত পাঠ—

"ধিগ্‌ধিক্‌শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনপরৈঃ পীনৈঃ কিমেভি ভুজৈঃ।
ধিক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্থি রাক্ষসভটাঞ্জীবত্যহো রাবণঃ॥"

ইহার অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

"লজ্জাই এটা যে (?) আমার অনেক শত্রু আছে; তার উপরেও এই তাপসটা, সে আবার এইখানেই রাক্ষসকুল নিধন করছে। হায়, রাবণ (এখনও) বেঁচে আছে। ধিক্, ইন্দ্রজিৎ, ধিক্! কুম্ভকর্ণই বা জেগে কি করল? আর স্বর্গের মত গ্রামটুকু বিলুণ্ঠন করে বৃথা-বিক্রম-প্রকাশ করা এই হাতগুলো দিয়েই বা কি হ'ল?"

আমি নীচে কাণের ইংরাজি অনুবাদটুকুও দিলাম। বাংলা অনুবাদে মূলের force-টুকু রক্ষিত হয় নাই।

"That there are enemies (to me) is itself a humiliation ; to add to it, he is an anchorite and as such kills a number of Rākṣkhasas just here (under my nose). Oh wonder, then, that Rāvana lives yet ! [or Ha ! does Rāvana live?] Fie upon (my mighty son) the conqueror of Indra ; what is the use of Kumbhakarṇa being awakened? What is the use of these arms that are fattened or puffed up in vain with the spails of the puny hamlet of heaven?"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁহারা যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কাণের বইএ আছে। যথা—

"রামেণ রাক্ষসক্ষয়ে ক্রিয়মাণে ক্ষুব্‌ধান্তঃকরণস্য রাবণস্য স্বাধিক্ষেপোক্তিরিয়ম্।"

এইভাবে ইহাদের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াও টীকায় বহু অসংগত ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

১. "অনুবন্ধে"র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইঁহারা বলিয়াছেন—

"প্রত্যেক গ্রন্থেরই—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই চারটি অনুবন্ধ বা আবশ্যতা থাকে। এখানে প্রয়োজনের কথা ব'লে বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে। বিষয় ও প্রয়োজনের কার্যকারণ ভাবটিই সম্বন্ধ। যাদের জন্য গ্রন্থ রচিত হয়, তারা অধিকারী।" —পৃ ১৩০-১৩১

এইখানে বলাই বাহুল্য যে 'যাদের জন্য গ্রন্থ রচিত হয়, তারা অধিকারী' নয়। যাহারা সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসার মনোবৃত্তি লইয়া জানিতে আসে, তাহারা অধিকারী (তজ্‌জিজ্ঞাসুরধিকারী)। পি. ভি. কাণের টীকায় এই কথাটি ঠিক সুষ্ঠুভাবেই আছে।

"every book has four requisites or অনুবন্ধs as they are called, viz, অধিকারিন্, বিষয়, সম্বন্ধ and প্রয়োজন . . . Here the author spoke of প্রয়োজন and now speaks of the বিষয়. The সম্বন্ধ is that of কার্যকারণভাব between the প্রয়োজন and বিষয়. The অধিকারী is one *that wants to* learn the essentials of Poetry." [এইখানে পরম্পরের উক্তি তুলনীয়।]

২. "অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি বা অসম্ভব— এই তিনটি দোষ থেকে যে কোন সংজ্ঞাকেই মুক্ত হ'তে হ'বে।" —পৃ ১৩২

এইখানে অতিব্যাপ্তির পর "বা" শব্দটি প্রয়োগ করায় ভাষাগত বৈষম্য দেখা দিয়াছে। কারণ, তাহা হইলে দোষের সংখ্যা দুই হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে কাণের উক্তি তুলনীয় :

"Every definition must be free from three faults, viz. অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি and অসম্ভব."

৩. "'দোষ' শব্দটির সঙ্গে নঙ্-প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে 'অদোষ' শব্দটি তৈরি হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নঙ্-প্রত্যয়ের যোগে 'ঈষৎ' অর্থও হয়। অর্থাৎ 'অদোষ' শব্দের অর্থ 'দোষমুক্ত' এবং 'ঈষৎ দোষযুক্ত' দু'টিই হয়।" —পৃ ১৩৩

শুদ্ধিপত্রে "নঙ্"-এর স্থলে "নঞ্"-এর উল্লেখ করিলেও এখানে একটা দোষ রহিয়া গিয়াছে। "নঞ্" প্রত্যয় নহে ; উহা নিষেধজ্ঞাপন করে এইরূপ একটি অব্যয়ান্ত শব্দ। নঞ্-শব্দের সঙ্গে নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের নির্দেশ দিয়াছেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাস হয় না। সুতরাং 'অদোষ' স্থলে— ন দোষঃ— অদোষ এইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। নঞ্-প্রত্যয় যোগ হয় নাই। সুতরাং 'সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নঞ্ প্রত্যয়ের যোগে 'ঈষৎ' অর্থও হয়'— কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ।

এইখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে 'অদোষ'এর অর্থ যদি কেবল দোষরহিতই হয়, তাহা হইলে কাহাকেও কাব্য বলা যাইবে না। অতএব নঞ্‌এর কেবল নিষেধার্থক ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হইতে পারে কিনা, ব্যাখ্যাতৃগণ সেই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৈয়াকরণগণ নঞ্-এর ছয়টি অর্থ হইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা— সাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রশস্ততা এবং বিরোধ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'ঈষৎ'-এর উল্লেখ নাই। তাই কাণে মহোদয় আর একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে 'ঈষৎ'-অর্থেও নঞ্-এর প্রয়োগ হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং অনুবাদকদ্বয়ের উপরি-উক্ত মন্তব্যটি সংগত নহে, প্রত্যুত প্রমাদপূর্ণ।

৪. "গমের্ডোঃ ইত্যাদি। উনাদিসূত্র। গম্ ধাতুতে ড-প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন 'গো' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা চলে'।" —পৃ ১৫০

বলাই বাহুল্য যে গম্ ধাতুর সঙ্গে "ড"-প্রত্যয় যোগে 'গো' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে শব্দটি হইবে কেবল "গ"। কিন্তু "ডো" প্রত্যয় যোগে "গো"-শব্দের উৎপত্তি হইবে। শুদ্ধিপত্রেও ইহার কোনো উল্লেখ নাই। সেখানে আছে—

"পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি	পড়তে হবে
১৫০।২৪	'গমের্ডোঃ'।"

মূলের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নাই। ··উণাদির দন্ত্য "ন" স্থলে যে মূর্ধণ্য "ণ" হইবে তাহাকে মুদ্রাকর প্রমাদ হিসাবে ধরিয়া লইলেও "ড"-প্রত্যয়কে "ডো"-প্রত্যয় ভাবিবার কোনো কারণ আছে কিনা, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

পি. ভি. কাণের গ্রন্থে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ নাই। অনুবাদকদ্বয়ের গ্রন্থে ঐ তিন পরিচ্ছেদের অনুবাদ ও টীকা আছে। কিন্তু এই অংশের টীকা নিতান্তই কার্পণ্যদোষে দুষ্ট। কারণ, কোনো অংশেরই ব্যাখ্যা তেমন বিস্তৃতভাবে নাই। মনে হয় যেন সব কথাই অর্ধসমাপ্ত। এই অংশের বিষয়বস্তু একটু জটিল। অতএব বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করিতে পারিলে ভালো হইত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রস ও রসের স্বরূপ, চতুর্থে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ হিসাবে কাব্যের ভেদ এবং পঞ্চমে ব্যঞ্জনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির ধারাবাহিক আলোচনা ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়দের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আছে।

'সংস্কৃত না-জানা বাঙালী শিক্ষার্থী'রা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোনো প্রকার উপকৃত হইবে কিনা বলিতে পারি না, তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে যদি কেহ মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাহার সহিত পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানস্পৃহার কোনোপ্রকার পরিতৃপ্তি হইবে না। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিষয়বস্তুকে নিজের করিয়া পরে যদি তাহাদিগকে সহজভাবে পরের করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনুবাদকদ্বয়ের শ্রম সার্থক হইত। সংস্কৃত জানা বা না-জানা উভয়েই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে লেখকদ্বয় যদি শাস্ত্রকারদের বাক্য অনুসরণ করিয়া "অনুবন্ধ" চতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, গ্রন্থের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সমীক্ষা। শ্রীগোপাল ভৌমিক। জ্ঞানতীর্থ, কলিকাতা ১২। চার টাকা।

আঠার বছর আগে লেখা 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধটির সঙ্গে লেখকের অন্যান্য সময়ের কয়েকটি সাহিত্য-প্রবন্ধ একযোগে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তাঁর 'সাহিত্য সমীক্ষা'য়। মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে এ-সংগ্রহে তিনি 'বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি' সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই ধারণার অভিমুখ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা এই: 'সাহিত্য শিল্পের বিচারে আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদে আস্থাবান এবং সাহিত্যের বিবর্তন সমাজবিবর্তনের অনুগামী বলেই আমি মনে করি। সাহিত্যিকের

ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিয়েও তাঁর উপরে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রাভাবকে কোনো রূপে অস্বীকার করা চলে না বলেই আমার ধারণা।'

শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক যশস্বী কবি। তিনি প্রবন্ধ লিখে তাঁর যে ধারণা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, সেটি সত্যিই চিত্তাকর্ষক এবং বিতর্কসাপেক্ষ বিষয়। আদিতেই 'অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য' আখ্যায় ১৯০০ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি অর্ধশতকের বাংলা দেশ ও বাঙালি সমাজের প্রসঙ্গমাত্র উল্লেখ করেই তিনি একালের বিশ্বব্যাপী যন্ত্রসমারোহ— দুই মহাযুদ্ধের দুর্যোগ— এশিয়ার ভাববিপ্লব— গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের তৎপ্রতিনিধিত্ব— এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের চর্চা— রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ এবং এ দেশে রবীন্দ্রোত্তর অনুগামী সাহিত্যিকের বিষাদ নৈরাশ্য ইত্যাদি লক্ষণের কথা তুলেছেন। তার পর 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে সমালোচকের দায়িত্ব সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, 'শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন উপাদানের অন্তঃসম্বন্ধ নির্ণয় করা সমালোচনারই একটি প্রধান কাজ'। এই কাজটি সহজ নয়। শ্রীযুক্ত ভৌমিক জড়বাদ বস্তুজগৎ ভাবজগৎ হৃদয় ও বুদ্ধির পথ ইত্যাদি সুপরিচিত নানা প্রসঙ্গ খুবই দ্রুত স্মরণ করেছেন। সামন্ততন্ত্র থেকে বুর্জোয়া ধনতন্ত্র, সেখান থেকে জাতীয় সাহিত্য কিভাবে আন্তর্জাতিকতার দিকে এগিয়েছে, সে প্রসঙ্গও তিনি খুব তাড়াতাড়ি বলে গেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বিরোধ-বৈষম্যের কথা -সূত্রে তিনি স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তের সতর্কবাণীর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সেও খুব দ্রুতবেগে। মনে হয়, কবি গোপাল ভৌমিক এসব কথা এ বইয়ে যতটা বলতে পেরেছেন, পরে এসব বিষয়ে তাঁকে আরও ভাবতে হবে। 'সাহিত্য ও রাজনীতি' 'আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধ দুটিও তাঁর এই ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে এবং 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগ' ইত্যাদি নামে তাঁর আরও কয়েকটি রচনা এতে জায়গা পেয়েছে।

'সাহিত্য-সমীক্ষা' শ্রীযুক্ত ভৌমিকের কবি-মনটিকে বোঝবার পক্ষে সহায়ক। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ ও শিল্পানুরাগের কথায়-কথায় রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের কথা উঠেছে। সৌন্দর্যানুরাগী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে তিনি পাঠককে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন।

বইখানির একটি ত্রুটি অসংখ্য ছাপার ভুল।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বরলিপি

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে,
এ পারে কৃষি হল সারা,
যাব ও পারের ঘাটে।
হংসবলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে, তারার আলোয়,
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে।
ভাঁটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে,
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—
শুনি শুধু মাঝি গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন

সা -ঋা[২] II জ্ঞা -মা [ম]জ্ঞা ঋা । সা -া -া -া I সা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া
দি ০ না ন্ ত বে লা ০ ০ য়্ শে ০ ষে র ফ ০ স ল্

I জ্ঞা -মা মা -া । মা -া মপা -[প]মা I জ্ঞা -রা জ্ঞা জ্ঞঋা । সা -মা [ম]জ্ঞা ঋা
নি ০ লে ম্ ত ০ রী০ ০ প ০ রে দি০ না ন্ ত বে

I সা -া -া -া । -া -া -া -া I দ্া -া দ্া -ণ্া । ণ্া -া ণ্া -সা
লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ এ ০ পা ০ রে ০ কৃ ০

I সা -া -া -া । সা -ঋা ণ্া -া I সা -া -া -রা । রা -জ্ঞা -া -া
ষি ০ ০ ০ হো ০ লো ০ সা ০ ০ ০ রা ০ ০ ০

I সা -ঋা২ ঋা২ -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -মা I মা -া মপা -পমা । জ্ঞা -রা জ্ঞা জ্ঞঋা I
যা ॰ ব ॰ ও ॰ পা ॰ রে ॰ র॰ ॰ ঘা ॰ টে দি॰

I সা -মা মজ্ঞা ঋা । সা -া -া -া I সা -া সা সা । সা -া সা -ঋা২ I
না ন্ ত বে লা ॰ ॰ য়্ হ ঙ্ স ব লা ॰ কা ॰

I জ্ঞা -া জ্ঞা -মা । মা -া মা -পা I মা -া -ণা দা । পা -পমা জ্ঞা -ঋা I
উ ॰ ড়ে ॰ যা য়্ দূ ॰ রে ॰ ॰ র তী ॰ রে ॰

I সা -ঋা২ জ্ঞা -া । জ্ঞা -রা -জ্ঞা -রা I জ্ঞমা -জ্ঞমজ্ঞা -রজ্ঞা -া । -া -া -া -ঋা I
তা ॰ রা র্ আ ॰ ॰ ॰ লো॰ ॰॰॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ য়্

I সা -দা দা -া । দা -পা পা -া I পা -া পা -া । পা -া -মা -পা I
তা ॰ রি ॰ ভা ॰ না র্ ধ্ব ॰ নি ॰ বা ॰ ॰ ॰

I পা -া -দা -া । -া -া -পা -া I মা -পা মা -ণা । দা -া পা -মা I
জে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ বা ॰ জে ॰ মো র্ অ ন্

I জ্ঞা -া জ্ঞা -ঋা । সা -া সা -ণ্া I সা -ঋা২ জ্ঞা -া । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া I
ত ॰ রে ॰ তা ॰ রি ॰ ভা ॰ না র্ ধ্ব ॰ নি ॰

I জ্ঞা -া জ্ঞা -া । দ্া -ণ্া ণ্া -সা I সা -ঋা২ জ্ঞা -মা । জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞঋা I
বা ॰ জে ॰ বা ॰ জে ॰ মো র্ অ ন্ ত ॰ রে দি॰

I সা -মা জ্ঞা ঋা । সা -া -া -া I দ্‌া -া ম্‌া -দ্‌া । দ্‌া -া দ্‌া -ণ্‌া I
না ন্ ত বে লা • • র্ ভাঁ • টা র্ ন • দী •

I ণ্‌া -সা -া -া । সা -ঋা ঋা -া I ঋা -া -া -সণ্‌া । সা -া -া -া I
ধা ◦ ◦ য়্ সা ◦ গ র্ পা • • •• নে • • •

I দ্‌া -ণ্‌া ণ্‌া -সা । সা -জ্ঞা -ঋা -া I সা -া -া -া । -া -া -া -া I
ক ◦ ল ◦ তা ◦ • • নে • • ◦ • • • •

I সা -মা মা -া । মা -া মা -পা I জ্ঞমা -া জ্ঞরা -জ্ঞা । ঋজ্ঞা -ঋা -সা -া I
ভা • ব • না • মো র্ ভে• • সে• • যা • • য়্

I সা -ঋা২ জ্ঞা -মা । জ্ঞা -ঋা -জ্ঞঋা -া I সা -া -া -া । -া -া -া -া I
তা • রি ◦ টা • •◦ ◦ নে • • • ◦ • • •

I সা -দা দা দপা । পা পা পা পা I পা -মা পা -া । পা -দা -মপা -া I
যা • কি ছু◦ নি য়ে চ লি শে ষ্ স ন্ চ • •• র্

I সা -মা -া -া । মা -া মা -পা I মা -ণা দা পা । মজ্ঞা -রা -জ্ঞা -া I
সু • • থ্ ন য়্ সে • দু থ্ খ সে ন• • • য়্

I জ্ঞা -মা জ্ঞা -ঋসা । সা -ঋা২ জ্ঞা -জ্ঞঋা I সা -া -া -া । -া -া -া -া I
ন য় সে ◦◦ কা ◦ ম ◦ না • • • ◦ ◦ • ◦

I সা -ঋা^{২}জ্ঞা-া । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া I জ্ঞা -মা মা -া । মা -া মা -পা I
শু ॰ নি ॰ শু ॰ ধু ॰ মা ॰ ঝি র্ গা ন্ আ র্

I মা-া মপা -^{প}মা । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া I জ্ঞা -মা মা -া । জ্ঞা -রা জ্ঞঋা সা I
দাঁ ॰ ড়ে॰ র্ ধ্ব ॰ নি ॰ তা ॰ হা র্ স্ব ॰ রে॰ দি

I সা -মা ^{ম}জ্ঞা ঋা । সা -া -া -া II II
না ন্ ত বে লা ॰ ॰ য়্

এই বিশেষ গানটিতে কোমল ঋষভের শ্রুতির (ঋ^{২}) ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। গানটি মধ্যলয়ে ও তারযন্ত্র সহযোগে গেয়।

সম্পাদকের নিবেদন

সাহিত্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ না ক'রে সাহিত্যকে যাঁরা জীবন হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে তাঁদের দ্বারাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন সেইরূপ স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যসেবকের একজন, যাঁর কাছে সাহিত্যই ছিল জীবন। সাহিত্যের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর আবাল্যের— এ কথা তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। কিন্তু কথা দিয়ে তিনি এ কথা প্রকাশ না করলেও তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যেই এর প্রমাণ আছে। এই জন্যেই তিনি আমাদের স্মরণীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং দার্শনিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক— এ বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে। এই সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের যে রচনাটি মুদ্রিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যায়, তিনি লিখেছেন, "যাঁহারা সমগ্র বিজ্ঞান-বৃক্ষের যাবতীয় শাখা অবলোকন করিয়া এক সূত্র অন্বেষণ করেন, অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়া দেন, ইঁহারাই প্রকৃত দার্শনিক। ইঁহারা সংখ্যায় অল্প।"

১৮৬৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নূতন করে আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম।

রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন, আমরা এই সংখ্যায় তাঁর স্বহস্তলিখিত সেই পত্রটি মুদ্রণ করেছি।

১৩১২ সালে (১৯০৫) বঙ্গব্যবচ্ছেদের সংবাদ ঘোষিত হবার পর দেশে আলোড়ন উপস্থিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তখন সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি। এই সংকট মুহূর্তে সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করে তোলার দায়িত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্যে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করে বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরে অনুষ্ঠিত ক'রে এই কাজের সূচনা করা যেতে পারে ব'লে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে পরামর্শ দেন। এরই ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্ভব ঘটে। শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন' প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে বলে আমরা ভরসা করি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকারের 'এক শতাব্দীর কাব্য' প্রবন্ধে একটি শতকের কাব্যচেতনা ও কাব্যভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী রূপেই কীর্তিত, তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকও— এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। শ্রীলীলা মজুমদারের প্রবন্ধ থেকে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের কথা নূতন করে জানার সুযোগ পাওয়া যাবে।

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। 'চিঠিপত্র' অষ্টম খণ্ডে (প্রকাশ ১৩৭০ বৈশাখ) এই দুই সুহৃদের পত্রগুচ্ছ মুদ্রিত আছে। শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদারের রচনায় এঁদের সম্বন্ধে কিছু নূতন উপকরণ আছে।

স্বীকৃতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'অস্তিমশয়নে শাজাহান' চিত্রের ব্লক শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের রাজশাহী অধিবেশন (১৩১৫) চিত্রের পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার্থ সেণ্টিনারি স্যুভেনির ভলিউম' (১৯৬২) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আলোকচিত্রের ব্লক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়